মানুষের পায়ের আওয়াজ

প্রাগৈতিহাসিক নানাজনের
বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

মানুষের যখন লিপি ছিলনা, ইতিহাস লিখে যাওয়ার সুযোগ ছিলনা, সেটি প্রাগৈতিহাসিক কাল। মানুষের অস্থিত্বের ও অগ্রযাত্রার সিংহভাগ সময় জুড়ে রয়েছে এই প্রাগৈতিহাসিক কাল। এ অগ্রযাত্রার পায়ের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে স্পষ্টতর হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারছে একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও গবেষণার মাধ্যমে। এ গবেষণার ভিত্তিতে পৃথিবীর নানা প্রান্তের নানা যুগের মানুষের যে জীবন, যে সংস্কৃতি উদ্ঘাটিত হয়েছে তার ভিত্তিতেই এই বইয়ের গল্পগুলো রচিত হয়েছে। এক একটি গল্প বহু যুগের ওপারের এক একজন কল্পিত মানুষকে নিয়ে, যার জীবন-বৈশিষ্টের ও সুখ-দুঃখের কাহিনীতে ওখান-কার সেদিনের মানুষকে আমরা দেখতে পাবো।

আধুনিক বিজ্ঞানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভব হচ্ছে যে সামান্য একটু হাড়ের টুকরা অথবা কাদায় আটকানো ক্ষুদ্র পরাগরেণু থেকে সেদিনের পরিবেশ ও জীবন-সংগ্রামের এক একটি দিক উদ্ঘাটিত হতে পারে। অবশ্য পাথুরে নিদর্শন সব সময় মানুষের ভাবনা, স্বপ্ন, কল্পনা ধারণ করতে পারেনা। কিন্তু মানুষ সেই সুদূর অতীত থেকে যে সব নান্দনিক শিল্পকর্ম রেখে গেছে গল্পের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেখান থেকেও এসেছে। এ বইয়ের এক একটি গল্পের পেছনে এসব কী কী উদ্ঘাটন কাজ করেছে তার কিছু ব্যাখ্যা প্রত্যেকটি গল্পের সঙ্গে দেয়া হয়েছে। সেদিক থেকে বইটি আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেবার একটি প্রয়াসও বটে।

প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ

মানুষের পায়ের আওয়াজ

মানুষের পায়ের আওয়াজ

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

উ|ৎ|স|র্গ

আমার জীবনব্যাপী বন্ধু শামসুল হোসাইন ও
ভূঁইয়া ইকবালকে। শামসুল হোসাইনের ইতিহাস-অনুরাগ
এবং ভূঁইয়া ইকবালের সাহিত্যানুরাগ আমাকে
চিরকাল মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করেছে।

ভূমিকা

এই বইয়ের প্রত্যেকটি অধ্যায় আমার বানিয়ে লেখা একটি গল্প; গল্পগুলোর পাত্রপাত্রীর অধিকাংশের নামও আমারই দেয়া। কিন্তু এ গল্পগুলোর ওপর বিজ্ঞানের কড়া খবরদারী আছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানটি হলো প্রত্নতত্ত্ব। তখন লিপি না থাকার ফলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের জীবনের কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা আমাদের কাছে নেই। অন্যত্র লিপি উদ্ভাবনের অনেক পরও বহু মানবগোষ্ঠি এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে তাদেরও কোন বর্ণনা নেই। মানুষের উদ্ভবের পর থেকে অতি দীর্ঘ কাল জুড়ে এই প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্পর্কে আমরা একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উদ্ঘাটিত নিদর্শন থেকেই কিছুটা জানতে পেরেছি। সেই জানাটুকুর ওপর ভিত্তি করেই আমাদের এই গল্প। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ভাগ্যক্রমে কখনো ফসিল, হাড়, বসতবাড়ি, নানা হাতিয়ার, তৈজস, দৈনন্দিন কাজের ছাপ থাকা নিদর্শন ইত্যাদির ভাল নমুনা অথবা আভাস মাত্র আবিষ্কৃত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিদর্শন যা পাওয়া যায় তা হয় মামুলি ধরনের অথবা গতানুগতিক একই রকমের। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ঘাটিত নিদর্শনগুলো অদ্ভুত বাঙময় হয়— যেন মানুষগুলোর জীবনের গল্পের নতুন নতুন প্লট হাতে ধরিয়ে দেয়। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণা সম্পর্কে লেখাজোকা ঘেঁটে আমি ওরকম কিছু প্লট পাওয়ার চেষ্টা করেছি এবং সঙ্গে কিছু যৌক্তিক কল্পনা মিশিয়ে ছোট ছোট গল্প খাড়া করেছি।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সম্পর্কে পড়ার অভ্যাস থেকে, কোন কোন নিদর্শন নানা মিউজিয়ামে দেখে, বাকি অনেকগুলোর ফটো দেখে, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবন নিয়ে প্রায়শ ভেবেছি। পাওয়া তথ্যগুলো হয়তো সীমিত, কিন্তু তার কিছু কিছু এতই ভিন্ন স্বাদের যে সুদূর অতীতের এই মানুষগুলোর অন্যরকম জীবন মনের মধ্যে খুবই উঁকিঝুকি দিয়েছে। কখনো ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছি আমি ওদের একজন হয়ে ওদের দলে মিশে গেছি। এভাবে প্রাচীন জীবনকে মনে ধারণ করার একটি রোমান্টিক আনন্দ গল্পগুলো লেখার পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছে। এ গল্পের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে পাঠককে নিশ্চিত রাখার জন্য প্রত্যেক গল্পের পর একটি আলাদা অংশে সংক্ষেপে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি কী কী প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্ঘাটন এর নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে, তার কোনটি গল্পের কোন অংশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এভাবে আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের কিছু কিছু কৌশলের সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়ার সুযোগ হয়ে গেছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত একটি নিদর্শনকে আমরা সাদা চোখে যে ভাবে দেখি প্রত্নতত্ত্ববিদ তাতে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু দেখতে পান। এভাবে ওখানে প্রাপ্ত একটি সাধারণ জিনিসেরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে প্রত্নতত্ত্ববিদ একটি পরিবেশ, একটি জীবনধারা, এমনকি একটি পুরো সংস্কৃতি বা সভ্যতার সম্পর্কে নিখুঁত সিদ্ধান্ত টানতে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এই ক্ষমতা তাঁদের দিন দিন বাড়ছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রাচীন পশু-হাড়ের টুকরা বিশ্লেষণ করে জানা যায় এটি কোন পশুর, তা পোষা না বন্য, সে পশু কোন বয়সে কোন মৌসুমে মারা গেছে, কী রকম হাতিয়ার এর ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে, এটি খাওয়া হয়েছে কিনা, হলে কী রকম রান্না বা কাঁচা অবস্থায়, ইত্যাদি হরেক রকমের তথ্য। অনেক ক্ষেত্রেই একটি বসত এলাকায় এরকম নানা পশুর অসংখ্য হাড়ের টুকরার শ্রেণী বিন্যাস ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে শুধু সে সময়ের প্রাণী-পরিবেশ নয় ওই প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনধারাও ওঠে এসেছে।

একই কথা বলা যায় কাদার মধ্যে সংরক্ষিত সে যুগের উদ্ভিদের পরাগরেণুর আনুবীক্ষণিক বিশ্লেষণে সেখানকার উদ্ভিদ জগতকে উদ্ঘাটন করার ক্ষেত্রে। আবার রান্নার পোড়ামাটির হাঁড়ির সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়া খাবারের অণুগুলোর রাসায়নিক বিশ্লেষণে ওদের হাঁড়ির খবরও নেয়া সম্ভব হয়েছে। বসত বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত জায়গায় ব্যাপক ভাবে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া কাঠের থাম, হাতিয়ার ইত্যাদি থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদ ওখানে একটি অগ্নিকান্ডের খবর যেমন পান, তেমনি ওরকম অঙ্গার হয়ে যাওয়াটাই আবার ওই সব থাম বা হাতিয়ারকে বহু হাজার বছর ধরে পচন এড়িয়ে সংরক্ষিত করেছে বলে প্রত্নতত্ত্ববিদ ওগুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান উনবিংশ শতাব্দীতে সীমিত ভাবে শুরু হবার পর থেকে বছরের পর বছর সমসাময়িক উন্নততর প্রযুক্তিকে অনুসন্ধানের কাজে ব্যবহার করে এটি ক্রমেই শক্তিশালী হয়েছে এবং এখন সর্বাধুনিক বস্তুবিদ্যা, আলট্রা সানোগ্রাফি, ডিএনএ বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রয়োগ একে অভাবনীয় রকম নিখুঁত করে তুলেছে। এর কিছু কিছু ফলশ্রুতি আমাদের গল্পে ও গল্প শেষের আলোচনায় আমরা পাব।

আমাদের প্রত্যেক গল্পের শিরোনামে এসেছে এটি কোন সময়ের কথা, আজ থেকে কত বছর আগের ঘটনা তা; কারণ ওই মানুষদের কাহিনী বুঝতে হলে তার কালের পটভূমিতেই তাকে বুঝতে হবে। প্রত্নতত্ত্ববিদের জন্য এটি একটি বড় কাজ— পাওয়া নিদর্শনগুলোর কাল নির্ণয় থেকে ওই সময়টি জানতে পারা। ব্যাপারটি তাঁদের জন্য আরো কঠিন হয়ে যায় যখন ঠিক একই জায়গায় বহু ভিন্ন যুগের মানুষের বসবাসের কারণে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নানা যুগের নিদর্শন মিশে একাকার হয়ে থাকে। তখন প্রত্যেকটি নিদর্শনের বয়স আলাদা করে নির্ণয় করতে হয়। তাঁদের কাছে এভাবে বয়স নির্ণয়ের নানা উপায় রয়েছে বটে তবে সব থেকে

বেশি নিশ্চিত হওয়া যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে। এর মধ্যে কার্বন ডেইটিং নামে পরিচিত পরীক্ষিত পদ্ধতিটি সব চেয়ে উপযোগী, যাতে প্রাচীন জৈব বস্তুতে সাধারণ কার্বন আর তেজস্ক্রিয় কার্বনের বর্তমান অনুপাত থেকে বয়সটি বোঝা যায়। অধিকাংশ গল্পে আমরা যে সময়ের কথা বলেছি সে রকম সময়ের জন্য পদ্ধতিটি বেশ যুৎসই। কিন্তু এর জন্য জৈব নিদর্শন পাওয়া চাই— পচনশীলতার কারণে যেটি পাওয়া সহজ নয়। তাই হাড়, ঝিনুক-শামুকের খোলস, শিং ইত্যাদি কম পচনশীল জৈব নিদর্শনের ওপর নির্ভর করেই বয়স নির্ণয় করতে হয়। অবশ্য বিজ্ঞানীরা কৌশলে অন্য জিনিস থেকেও কার্বন ডেইটিং করতে পেরেছেন। যেমন পুড়ে অঙ্গার হওয়া কাঠ; ইট তৈরির সময় কাদার সঙ্গে চলে এসে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া বীজ খড় ইত্যাদি, রান্নার সময় পুড়ে মাটির হাঁড়ির সঙ্গে স্থায়ী ভাবে লেগে যাওয়া খাদ্য দ্রব্যের আস্তরন— এসবের কার্বন ডেইটিং করে তার সঙ্গে সঙ্গে ওই ইট বা ওই হাঁড়ির বয়সও জানা যায়। জীবন-নাট্যের যে রঙ্গমঞ্চ প্রত্নতত্ত্ববিদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে তার কালটি তাঁরা নিশ্চিত করে বলতে পেরেছেন বলেই আমরা সেই জীবন-নাট্যকে সে কালের পটভূমিতে ধরতে পেরেছি।

সেদিনের মানুষের অলিখিত গল্প বহু হাজার বছর পর এখন লিখতে গেলে তাদের জীবন-জীবিকার প্রযুক্তিটি বুঝতে পারাটি খুবই প্রয়োজন। পাওয়া নিদর্শনগুলো থেকেই গোয়েন্দা কাহিনীর মত সেদিনের প্রযুক্তি উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করতে হয়— যেমন বসত বাড়িটির যে ছিটেফোটা পাওয়া গেলো তার থেকেই বের করতে হবে কী কৌশলে বাড়িটি তৈরি হয়েছিলো, সেটিতে বসবাস কেমন ছিল। মানুষের দেড় লক্ষাধিক বছরের কাহিনীর প্রায় পুরোটা জুড়ে আছে পশুপাখি শিকারি আর বন্য ফল-মূল-শস্য সংগ্রাহক হিসেবে তার জীবন সংগ্রামের কথা— এসবকে ঘিরেই বিকশিত হয়েছিল তাদের প্রযুক্তি। শুধু শেষ হাজার দশেক বছর সময়ে এসেছিলো কৃষি প্রযুক্তি। শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের জন্য পাথরের, হাড়ের, শিঙের, উদ্ভিজ দ্রব্যের হাতিয়ার তৈরির কুশলতাই মানুষকে মানুষ করে তুলেছিলো— এটি মানুষের এক অনন্য সক্ষমতা। গল্পের পর গল্পে আমরা এসব হাতিয়ারের বিকাশ দেখলেও এর মধ্যে একটি গতানুগতিক ভাব থেকে যায়। হাতিয়ারের একই রকম কাঁচামাল, একই ধরনের প্রযুক্তি, জীবনের একই রকম চ্যালেঞ্জ। কৃষির উদ্ভাবনের পর সব বদলে গেছে— শুরু হতে পেরেছে সম্পূর্ণ নতুন রকম সংস্কৃতি।

হাতিয়ার শুধু কয়েকটি মাত্র জিনিসে তৈরি হলেও এবং তার মধ্যে টিকে থাকার মত জিনিসগুলোই শুধু আমাদের হাতে আসলেও, এসব হাতিয়ার তাদের নির্মাতা ও ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে অনেক কথা বলে দেয়। যেই অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে অতি সাধারণ জিনিসগুলো থেকে যথেষ্ট কার্যকর হাত-কুঠার, নানা কাজের ধারালো ছুরি, বর্শার মাথা হবার মত তীক্ষ্ণ অস্ত্র, বিশাল মাছকে বিদ্ধ করে

আটকাবার মত হারপুন ইত্যাদি ওরা তৈরি করেছে তা তাদের জীবনের অনেকখানি অংশ। উদাহরণ স্বরূপ পাথরের ওপর টুক্ টুক্ টুক্ পাথর ঠুকে ঠুকে যেই ধরনের প্রক্রিয়ায় এগুলোকে রূপ দেয়া হয়েছে সে সব কাজের ভেতরে না ঢুকলে ওদের জীবনের গল্প কিছুই বলা হয়না। আবার প্রযুক্তির কারণেই ওদের জীবনের সীমাবদ্ধতাগুলোও অদ্ভুত রকমের। যেমন পোড়ামাটির হাড়ি-কুড়ির উদ্ভাবনটি হয়েছে মাত্র ১০-১৫ হাজার বছর আগে। তার আগে কোন পাত্রে রেখে আগুনের ওপর রান্না চাপাবার কোন উপায় ছিলনা। খোলা আগুনে ঝলসিয়ে অথবা আগুনে উত্তপ্ত করা পাথর, ছাই, বা অঙ্গারের মধ্যে ঢুকিয়ে সেঁকেই রান্নার কাজ সারতে হত। পানি বা অন্য কোন তরলকে পাত্রে ধারন করাটাই কঠিন কাজ ছিল, বেতের ঝুড়ির ভেতর আলকাতরা লাগিয়ে তবে তাতে পানি রাখা যেত। ওই পানিকে একটু গরম করতে চাইলে তাতে উত্তপ্ত করে নেয়া পাথরের ছোট ছোট নুড়ি ফেলা ছাড়া অন্য উপায় ছিলনা। পোড়ামাটির পটারি এসে সব বদলে দিলো। এমনি করে প্রযুক্তির এক একটি উদ্ভাবন আমাদের এক একটি গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

পাথরের হাতিয়ার ইত্যাদির মত প্রযুক্তির সব নিদর্শন কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদের কাছে এত সহজে ধরা দেয়নি যে প্রযুক্তিটিকে চট্ করে বোঝা যাবে। গাছের গুড়ি, ডাল, পাতা-শণ-খড় দিয়ে তৈরি চমৎকার কুটিরগুলো কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; শুধু এগুলোর জন্য করা গর্ত, সামান্য ধ্বংসাবশেষ, কিংবা স্থানীয় ভাবে পাওয়া যাওয়া নির্মাণ উপকরণ ইত্যাদি থেকে সেই কুটিরের নির্মাণ শৈলী আন্দাজ করে নিতে হয়েছে। সাধারণ ভাবে পচে নিশ্চিহ্ন হলেও দৈবক্রমে কোন কোন জিনিসের ছোটখাট অংশ সংরক্ষিত হয়ে তার সাক্ষ্য রয়ে গেছে এখানে ওখানে। যেমন এমনি অদ্ভুত ভাবে কখনো শুষ্কতার কারণে অথবা বালি বা মাটির আচ্ছাদনের কারণে সংরক্ষিত হয়ে গেছে উদ্ভিজ আঁশে বোনা কাপড়ের একটুখানি টুকরা, কিংবা আলকাতরার আবরন দেয়া সুন্দর বুনোটের বেতের ঝুড়ির ছোট একটি ভাঙ্গা অংশ। অথচ এর থেকেই অনুসন্ধানে উদ্ঘাটিত হয়েছে এর পেছনের প্রযুক্তি, তাদের জীবনমানের অন্য একটি জগত।

প্রযুক্তির নিদর্শন থেকে জীবন-জীবিকার ধারাগুলো বোঝা যায়, কিন্তু মানুষের মন বোঝা যায়না। অথচ জীবনের গল্পের অনেকখানিই হলো মানুষের মন নিয়ে। তাদের চিন্তা, সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন, ভালবাসাকে উপজীব্য করতে না পারলে গল্প যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। এখানে এসে প্রাগৈতিহাসিক মানুষকে নিয়ে গল্প খাড়া করা কঠিন হয়। লিপির প্রচলন হবার পর এক একটি সমাজকে নিয়ে নানা লিখিত উপাদান আমাদের কাছেতো এসেছেই, সেই সঙ্গে অনেকের সম্পর্কে রীতিমত সাহিত্যও হাতে এসেছে— যেখানে স্বপ্ন, কল্পনা, বাস্তব, গুজব সবই মেশানো রয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরও ভাবনা, স্বপ্ন, কল্পনা নিশ্চয়ই সবই ছিল, কিন্তু পাথুরে-নিদর্শনে এসব মনের কথা ধরা পড়েনা।

তবে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এখানেও হার মানতে রাজি নন। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে সব চিত্র এঁকে গেছে, মূর্তি গড়ে গেছে, বা অন্য সব শিল্পকর্ম রেখে গেছে, তার মধ্যে কী রকম বাস্তবানুগতা, কী রকম নান্দনিকতা, কী রকম বিমূর্ততা রয়েছে তার বিশ্লেষণে মনের সন্ধান করতে তাঁরা কার্পন্য করেননি। এগুলোর মাধ্যমে সে মানুষদের বিশ্বাস, আচার, আনন্দ, ভীতি, ভালবাসা কিছুটা হলেও প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে গল্পের ওদিককার অন্তত কিছু উপাদান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে হয়তো আন্দাজের অবকাশ কিছুটা বেশি — কিন্তু তারপরও এর প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যগুলো কম জোরালো নয়। প্রত্নতত্ত্ব যে অদ্ভুত সব কারণে সীমাবদ্ধতায়ও ভোগে তার একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। বাইরে রোদ-বৃষ্টিতে মানুষের যে সব বসত ও জীবন যাপনের চিহ্ন রয়েছে সেগুলোর চেয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদের জন্য অনেক ভালভাবে সংরক্ষিত হয়েছে সে মানুষগুলোরই কবরের ভেতরটা। কাজেই কবরের ভেতরের পরিস্থিতি যতটা তাঁদের পক্ষে উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে জীবৎকালীন পরিস্থিতি অনেক সময় ততটা সম্ভব হয়নি। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদের ভাগ্য ভাল যে প্রাচীন কবরগুলো নেহাত মানুষের মরদেহই ধারণ করতোনা তাকে সাজিয়ে দেয়া বা তার সঙ্গে দেয়া নানা অলঙ্কার, উপকরণ, এমনকি পোষা প্রাণী দেহ ইত্যাদিও ধারণ করতো। এগুলো থেকে প্রচুর নিদর্শন যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে তেমনি জানা গেছে তাদের পারলৌকিক বিশ্বাস, অন্ত্যেষ্টির আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে নানা ধারণা। হয়তো ইহলৌকিক বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, জমকালো অলঙ্কার তাদের কম ছিলনা, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদের হাতে পড়লো কবরগুলোই বেশি। মরণে তাদের সাজ সজ্জা থেকে আন্দাজ করতে হলো জীবনে তারা কী রকম ছিলো, বা কী রকম ভাবতো। এমন পরিস্থিতি আমাদের গল্পকেও কিছু প্রভাবিত করে বৈকি।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পারিবারিক গঠন, সামাজিকতা, পরস্পরের প্রতি আচরণ ইত্যাদি দিকগুলো আমাদেরকে আন্দাজ করতে হয়েছে পরোক্ষ নানা সাক্ষ্য থেকে। গল্পের উপাদান হিসেবে তার পাত্র-পাত্রীর সামাজিকতার খবর অপরিহার্য। আত্মীয়তার সম্পর্ক, বিয়েশাদি ইত্যাদির সম্বন্ধে তথ্য পেতে প্রাচীন মরদেহগুলোর ডিএনএ বিশ্লেষণই জোরালো সাক্ষী। তবে এটি সহজ কাজ নয়, সব ক্ষেত্রে সম্ভবও নয়; কারণ হাজার হাজার বছরের প্রাচীন হাড় থেকে ব্যবহারোপযোগী অবিকৃত ডিএনএ পাওয়া খুবই দুরূহ। কিন্তু যেগুলো সম্ভব হয়েছে তা অভাবনীয় সব তথ্য দিতে পেরেছে। অনেক ক্ষেত্রে এত জটিল প্রযুক্তি ব্যবহার না করেই আমরা সামাজিকতার গুরুত্বপূর্ণ চিত্র পেয়েছি। যেমন একটি বড় পশু শিকার কেউ করলে পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে তার ভাগ দেয়ার অভ্যাসটি প্রত্নতত্ত্ববিদ জেনেছেন খুব সহজ উপায়ে। যেমন পাড়ার বিভিন্ন বাড়ির আগুনের অঙ্গারের কাছাকাছি একই পশুর খাওয়া বা ভাঙা হাড়ের বিভিন্ন টুকরা সনাক্ত করা গেল, আর সেটিই বলে দিল যে এরা নিজের শিকার করা বড় পশুর মাংস

প্রতিবেশীকে বাদ দিয়ে খেতোনা। শিকারের অনিশ্চয়তার দিনে সামাজিকতার এই রীতি যে সবার জন্যই মঙ্গলজনক ছিল তা বলাই বাহুল্য। এভাবে পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে সম্পর্ক, তাদের হাসিকান্না, সামাজিকতা ইত্যাদি নিয়ে গল্প খাড়া করতে গিয়ে অনেকটা গোয়েন্দা কাহিনী লেখার শিহরণ অনুভব করেছি, অবশ্য তা প্রত্নতত্ত্ববিদের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে।

আলাদা আলাদা এই ছোট গল্পগুলো স্থানে ও কালে একটি থেকে আরেকটি একেবারেই বিচ্ছিন্ন; যদিও কোন কোনগুলোর মধ্যে সুদূর কিছু সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে। প্রত্যেক গল্পকে তাই সুনির্দিষ্ট কাল আর সুনির্দিষ্ট স্থানের পটভূমিতে দেখতে হবে। তাই কালের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটিও শিরোনামে এসেছে; ঠিক ওই স্থানটিতে ও তার কাছাকাছি জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননই এ গল্পের সুযোগ করে দিয়েছে। পাঠকের কাছে সে জায়গাটির ঠিকানা দেবার সহজতম উপায় হলো আজ যে দেশের যে শহর বা পরিচিত জায়গার কাছে এটি রয়েছে সেটিই বলে দেয়া। যখনকার গল্প তখন রাষ্ট্র হিসেবে এই দেশের অস্তিত্বই ছিলনা, ওই শহরও হয়তো ছিলনা; কিন্তু আজকের পাঠক জায়গাটির আজকের পরিচয়েই ঘটনাস্থলটি কোথায় তা সহজে বুঝবেন। গল্পগুলোর কোনটির পর কোনটি হবে তাতে কালক্রমিক ধারাটি মোটামুটি অনুসরণ করলেও স্থানিক দিক থেকে আমাদেরকে পৃথিবীর এদিক থেকে ওদিকে প্রায়ই ছুটাছুটি করতে হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণার জায়গাগুলোকে অনুসরণ করতে গিয়ে। ওগুলো বাছাই করতে হয়েছে মানুষের পদযাত্রায় কিছুটা নতুন খবর ওই সময় কোথা থেকে এসেছে তার বিবেচনায়।

অবশেষে লিপির উদ্ভাবনে প্রাগৈতিহাসিক কালের অবসান যখন হলো, আমরা লিপিবদ্ধ ইতিহাসের কালে চলে আসলাম, তখন আমাদের গল্পও ফুরোলো বলে। তবে তারপরও কিছু গল্প থেকে যায়। দুনিয়ার বহু মানবগোষ্ঠিতে তার বহুকাল পরেও, এমনকি আমাদের কালের অনেক কাছে এসেও লিপি কিন্তু আসেনি, লিপিধারী অন্য মানুষের সঙ্গে তখনো তাদের দেখাও হয়নি। ওই দেখা না হওয়া পর্যন্ত সময়ে তাদের গল্প প্রাগৈতিহাসিক থেকে যাওয়াতে এখানে তাদেরও কিছু গল্পকে স্থান দিতে হয়েছে। আবার অতীতের কোন কোন বিলুপ্ত সমাজের ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে লিপির মত দেখতে নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ লিপিতে তাদের লিখে যাওয়া ইতিহাসও হয়তো ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তী কেউ তার পাঠোদ্ধার কখনো করতে পারেনি বলে ফলাফল প্রাগৈতিহাসিক থাকার মতই হয়েছে।

গল্পের ঘটনাস্থল বাছাইয়ে আমাদেরকে দুনিয়ার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটাছুটি করতে হবার আরেকটি কারণ হলো প্রত্নতত্ত্ব জিনিসটিই লটারি খেলার মত; কোথায় হঠাৎ করে একটি প্রাচীন বসতের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেলো আর সেখানে খনন করে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্ঘাটন ঘটলো, এগুলো ভাগ্যের ব্যাপার— সর্বত্র

সমানভাবে হয়নি, কোন নিয়ম মেনেও হয়নি। তাছাড়া প্রত্নতত্ত্ব সবার প্রতি সমান সদয়ও নয়; শুষ্ক বালিময় জায়গায়, পাথুরে জায়গায়, কাদায় বা বরফে সম্পূর্ণ আবৃত অবস্থায়, লক্ষ বছরও যেখানে নিদর্শনগুলো অবিকৃত থাকতে পারে, কিন্তু আর্দ্র-এঁদো জায়গায়, পলিমাটির ভাঙ্গা-গড়ার এলাকায় তা অল্প কিছুদিনও টেকেনি। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে গল্পগুলোর স্থান ও কাল লাফ দিয়ে দিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর মধ্যেও পাঠক হয়তো প্রাগৈতিহাসিক নানা জনের গল্পের মধ্যে যুগে যুগে মানুষের অগ্রযাত্রার একটি ধারাবাহিকতা খুঁজে পাবেন। এ যেন সব ছোট গল্প নিয়ে একটি বড় গল্প— সুদূর নানা কাল থেকে ভেসে আসা মানুষের পায়ের আওয়াজের গল্প।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

১. ইথিওপিয়ার হাদারে লুসিঃ ১৭
৩৫ লক্ষ বছর আগে

২. কেনিয়ার নারিকোটোমের বালক ঃ ৩২
১৫ লক্ষ ৩০ হাজার বছর আগে

৩. দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লোম্বোস গুহার সাজুনি ঃ ৪৬
৭০ হাজার বছর আগে

৪. ফ্রান্সের লাশাপেলের বুড়ো ঃ ৫৭
৬০ হাজার বছর আগে

৫. প্যালেস্টাইনের মানাত গুহার তন্বী ঃ ৬৪
৫৫ হাজার বছর আগে

৬. ইউক্রেনের পুশকারির বোরিস ঃ ৭২
২২ হাজার বছর আগে

৭. প্যালেষ্টাইনের ওহালোর কামরান ঃ ৮১
২২ হাজার বছর আগে

৮. প্যালেষ্টাইনের আইন মাল্লাহার কাস্তে ও হাতুড়ি ঃ ৯১
১৪ হাজার বছর আগে

৯. যুক্তরাষ্ট্রের বার্নেট গুহার মাইয়ারা ঃ ১০০
১৩ হাজার বছর আগে

১০. ফ্রান্সের মনট্রাসটুকের ভাস্কর ঃ ১১২
১৩ হাজার বছর আগে

১১. উত্তর জার্মানীর আরেন্সবার্গের বর্শাবাজ ঃ ১২৫
১২ হাজার বছর আগে

১২. সিরিয়ার আবু হোরাইরার যাযাবর ঃ ১৩৫
১২ হাজার বছর আগে

১৩. ইংল্যাণ্ডের স্টার ক্যারের অগ্নি ঃ ১৪৪
১১ হাজার বছর আগে

১৪. সিরিয়ার মুরেবেটের দাদীমা ঃ ১৫৫
১১ হাজার বছর আগে

১৫. ভারতের দমদমার আমদানী ঃ ১৬৬
১১ হাজার বছর আগে

১৬. জর্দানের বাইধার তানি তাঁতী ঃ ১৭৭
১০ হাজার বছর আগে

১৭. সাইপ্রাসের টেন্টার মুহাজির ঃ ১৮৭
১০ হাজার বছর আগে

১৮. ভারতের ভীমবেকতার শিল্পী ঃ ১৯৮
১০ হাজার বছর আগে
১৯. পাকিস্তানের মেহেরগড়ের মুন্নি ঃ ২০৭
সাড়ে আট হাজার বছর আগে
২০. চীনের জিয়াহুর ওস্তাদ ঃ ২১৮
৮ হাজার বছর আগে
২১. নাইজারের গোবেরোর রাখাল ঃ ২৩২
সাত হাজার বছর আগে
২২. জাপানের টোকিও উপকূলের কুমোর ঃ ২৪৩
সাত হাজার বছর আগে
২৩. পাপুয়া-নিউগিনির কুক জলাভূমির খামারি ঃ ২৫৪
৬ হাজার ৫ শত বছর আগে
২৪. মেক্সিকোর গুইলা নাকুইজ গুহার ওহাকা ঃ ২৬৭
আট হাজার বছর আগে
২৫. মিশরের এল্-আমরার পন্ডিত ঃ ২৭৭
সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে
২৬. ইরাকের উরুকের কেরাণী ঃ ২৮৭
পাঁচ হাজার বছর আগে
২৭. পাকিস্তানের হরপ্পার দেবদাসী ঃ ৩০৬
সাড়ে চার হাজার বছর আগে
২৮. চেক রিপাবলিকের ইউনিটিসের হাঁসুলি ৩১৮
কাকা চার হাজার বছর আগে
২৯. মেক্সিকোর সান লোরেঞ্জোর গুরু ঃ ৩২৭
তিন হাজার বছর আগে
৩০. যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ড সিটির উজি-ঠিকাদার ঃ ৩৩৯
দুই হাজার বছর আগে
৩১. বতসোয়ানার মধ্য-কালাহারির গোয়েন্দা ঃ ৩৫০
ছয় শ' বছর আগে
৩২. অষ্ট্রেলিয়ার বোটানি বে' তীরের বড়শিওয়ালি ঃ ৩৬৮
পাঁচ শত বছর আগে
৩৩. যুক্তরাষ্ট্রের কোলিংটনের কর্ত্রী-মা ঃ ৩৮০
পাঁচশত বছর আগে
৩৪. ইস্টার আইল্যান্ডের কড়ি ঃ ৩৯৪
চার শত বছর আগে

ইথিওপিয়ার হাদারে লুসিঃ
৩৫ লক্ষ বছর আগে

লুসিদের পরিবার এবং ওদের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যরা এইপ্‌দের (নরবানর) মধ্যে বেশ ব্যতিক্রমী একটি গোষ্ঠি। তাদের বসবাস গাছের ওপর হলেও এবং গাছের ডালে প্রচুর ঝোলাঝুলি করলেও নিচে নেমে ওরা দু'পায়ে হাঁটে। বাকি দু'পা ব্যবহার করে হাতের মত। এই বৈশিষ্ট জীবনের অনেক কিছুতে তাদেরকে অন্য এইপদের থেকে ভিন্ন করে ফেলেছে।

ইথিওপিয়ার হাদার নামক জায়গায় সাভানা তৃণভূমি এটি। এক সময় এখানেও ঘন বনভূমি ছিল; কিন্তু এখন ৩৫ লক্ষ বছর আগের দিনে এক সঙ্গে ঘন হয়ে থাকা বেশি গাছ নেই বল্‌লেই চলে। কোথাও কোথাও বেশ কিছু গাছ পরস্পর ঘন হয়ে এক এক জায়গায় অবশ্য রয়েছে— সেখানে ওদের মাথার ঝাঁকড়া ডাল-পাতার আচ্ছাদনগুলো পরস্পরের সঙ্গে লেগে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন শামিয়ানা গড়ে তুলেছে। কিন্তু সেটি বিরল ব্যাপার। বেশির ভাগ জায়গায় এক গাছ থেকে অন্য গাছ বেশ খানিকটা দূরে— আর মাঝখানটি তৃণভূমি। এ তৃণভূমিতে রয়েছে কোথাও কম, কোথাও বেশ উঁচু ঘাস, ঝোপ, বন্য শস্য। আফ্রিকার এই অঞ্চলটির জলবায়ু তখন এক দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল— ক্রমাগত শুষ্ক খরা দেখা দিচ্ছিল। এ কারণেই বনের ভাব ক্রমেই কমে গিয়ে সাভানা তৃণভূমির রূপটিই বহুদিন ধরে এখানে স্থিত হয়ে গিয়েছিলো। বর্ষায় আবহাওয়া কিছুটা আর্দ্র হয়, সাভানায় সবুজের ভাব বাড়ে, কিন্তু বাকি সময় ঘাসে আর ঝোপে লালচে ভাব আসে।

এই সাভানারই একটি এলাকায় লুসি আর তার পরিবারের সদস্যদের ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। বেশ কয়েক রকমের বানর আর এইপ এই তৃণভূমির নিয়মিত বাসিন্দা— আরো অনেক রকম বাসিন্দাদের মধ্যে। লুসির মত যারা তাদেরকেও এক রকম এইপের দলে গণ্য করা যায়। বানর জাতীয়দেরই একটি অগ্রবর্তী রূপ হলো এইপ বা নরবানর— বর্তমানের শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ওরাং ওটাং, উল্লুক নয়, ৩৫ লক্ষ বছর আগের অন্য রকম নানান বিভিন্ন এইপ। ওদের কোন কোনটি শিম্পাঞ্জী-গরিলাদের প্রাচীন পূর্বসূরি, আজকের মানুষেরও পূর্বসূরি।

ওই এইপগুলোর বেশির ভাগ সময় কাটছে গাছে গাছে। বানরদের তুলনায় এইপের প্রজাতিগুলো বেশ বড়— লেজ না থাকাটিও তাদের বড় বৈশিষ্ট। গাছের ওপরে চলাফেরাতে ওরা তাদের তার পা বেশ ব্যবহার করে বটে কিন্তু বানরের মত লেজ ব্যবহার করতে পারেনা। কালেভদ্রে মাটিতে নেমে এলে চার পায়ে হাঁটে, সামনের পায়ের ব্যবহার এমন ভাবে করে যেন মাথা উঁচিয়ে কিছুটা কব্জির ওপর হাঁটছে। এদের পুরুষরা অনেক বড়, স্ত্রীরা ছোট। স্ত্রী-পুরুষের দেহের সাইজে বেশ বড় রকমের পার্থক্য ওদের। পরিবারে এক পুরুষের সঙ্গে থাকে কয়েকজন স্ত্রী— আর বাচ্চারা তো আছেই। তবে এই এইপগুলোর দিন যে এখানে খুব ভাল যাচ্ছে তা বলা যাবে না। না আবহাওয়া, না গাছপালার অবস্থা কোনটিই তাদের অনুকূলে এখানে নেই। গাছপালার ওই শামিয়ানার মধ্যে সময় কাটানোর কারণ হলো গাছের ফলই তাদের প্রধান খাদ্য; সেই সঙ্গে অবশ্য ওখানকার উদ্ভিদের অন্য নানা অংশ।

লুসিদের কথা অবশ্য কিছুটা আলাদা। এইপ হলেও তারা একেবারে ভিন্ন ধরনের এইপ। আমাদের গল্প ওদের নিয়ে। তাদের একজনকে এই লুসি নামটি দেয়া হয়েছে অবশ্য লুসির পরিবারের এবং ওর পরিচিত অন্যদেরকে ইচ্ছে মত নাম দিয়ে দিচ্ছি গল্পের খাতিরে। নাম থেকেই বুঝছেন লুসি স্ত্রী লিঙ্গের— ওদের পরিবারে একজনই বয়স্ক পুরুষ বাপ্পা। আর বাপ্পার স্ত্রীদের মধ্যে লুসি ছাড়াও রয়েছে খুশি আর টুসি। লুসি ওদের সবার বড়। লুসির বাচ্চা দিক্কার বয়সই এখন তিন বছরের বেশি। আরো ছোট একেবারে নবজাত একটি বাচ্চাও লুসির আছে— দুষ্টু। পরিবারে আরো দুটি ছোট বাচ্চা আছে— খুশির বাচ্চা রুমু আর টুসির বাচ্চা ঝুমু।

ওরা সবাই গাছের ওপর থাকে, ওখানেই ঘুমায়— অন্য রকম সব এইপরা ওখানে যে ভাবে থাকে অনেকটা সেভাবেই। চট্ করে দেখলে বাকিদের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য চোখে পড়েনা। চেহারাটি মোটামুটি আর দশটা এইপের মতই— নাক একেবারে চ্যাপটা, নীচের চোয়ালটি বেশ খানিকটা বের হওয়া। মাথা ওদের মতই ছোটখাট। সারা গায়ে লম্বা লোম। গাছের ওপরে যখন থাকে তখন ডালে ডালে হাঁটে, আর ঝুলতে ঝুলতেও এ ডাল থেকে অন্য ডালে যায়— মেলা চেঁচামেচি করতে করতে। এই ঝোলার জন্য হাত দুটিও অন্য এইপের মত বেশ লম্বা অন্তত পায়ের তুলনায় তো বটেই। হাতের আঙ্গুলগুলোও বেশ বাঁকানো সহজে ডাল আঁকড়ে ধরার জন্য। বিশেষ করে পরিবারের ওই বাচ্চাগুলো— দিক্কা, রুমু আর ঝুমু সারাক্ষণ গাছের ওপর খেলছে, দাপাদাপি করছে; এই ঝুলছে আবার এই চার পায়ে হাঁটছে; কখনো কখনো ডালের ওপরেই সোজা হয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে— ওভাবেই হাঁটছে। গাছের কচি পাতা খেতে, তার চেয়েও বেশি মিষ্টি ফল খেতে তাদের দারুণ আনন্দ। খুব ছোট বলে দুষ্টু এখনো তার মা লুসির কাছেই থাকে, বড় একটা বিচ্ছিন্ন হয়না। তাদের বাবা বাপ্পা কিন্তু দলের সবার

থেকে শরীরে বড়, বেশ ভারী— লুসি, খুশি, টুসি এই স্ত্রীরা গড়পড়তা ৩০ কিলোর মত ওজনের হলেও বাপ্পার ওজন ৪০ কিলোর কম হবেনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা সবাই স্বচ্ছন্দে গাছের ডালে ডালে দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বাপ্পার নেতৃত্বে ওরা এমন ভাবে সেখানে থাকে যে ঐ গাছ ক'টাকে ওরা তাদের নিজেদের খাস তালুক বানিয়ে রেখেছে; অন্য কোন এইপ, বানর কোন কিছুকেই কাছে ঘেষতে দিয়না।

তবে লুসিদেরকে এবং তাদের প্রজাতির সব ব্যতিক্রমী এইপ্‌দেরকে আলাদা ভাবে চেনা যায় তাদের ওই গাছের আবাসে নয়, বরং তারা যখন গাছ থেকে নেমে আসে তখন। দিনের বেলায় পরিবারের অধিকাংশ সময় তাদের কাটে নিচে মাটির ওপর প্রায় উন্মুক্ত মাঠে। সে মাঠেও কিছু দূরে দূরে গাছপালা রয়েছে, বাদবাকি ভর্তি রয়েছে ঘাসে, ঝোপে, গর্তে-পাথরে, আর কিছু কিছু জলা-ডোবায়। এই সাভানা অঞ্চলের তো এটিই চিত্র।

এখানে ওরা যেভাবে চলাফেরা করে সেটি অন্য সবার থেকে আলাদা, অন্য কোন ধরনের এইপ তা করেনা। ওরা চলে খাড়া হয়ে দুই পায়ে— স্বচ্ছন্দে ওভাবে দুই পায়ে ক্রমাগত হাঁটতে হাঁটতে তারা সবাই চলে যেতে পারে বেশ দূরে দূরে। পরিবারের সবাই বেশ কিচমিচ আওয়াজ করতে করতেই এক সঙ্গে হাঁটে— দুপায়ের ওপর ব্যালেন্স রেখে এগিয়ে যেতে ওদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়না। তবে হাঁটার ভঙ্গিটি ঠিক কিন্তু আধুনিক মানুষের মত নয়, একটু যেন হেলে দোলে হাঁটা। আধুনিক মানুষের খাড়া হবার ও হাঁটার ধরন সম্ভব হয় তার কোমরের নিচের বস্তিদেশের হাড়গুলো মিলে কেমন যেন গোল বাটির আকার ধারন করেছে বলে। লুসিদের ক্ষেত্রেও তা কিছুটা হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি বাটির আকৃতি হয়নি। তাই হাঁটার ধরনটি আলাদা।

দিনের বেশির ভাগ সময় ওরা যে মাটিতে থাকে, হেঁটে এদিক ওদিক যায় তার বড় কারণ ওদের খাবার অভ্যাস অন্য এইপদের খাবারের থেকে কিছুটা আলাদা। হ্যাঁ গাছের ওপরের ফল ওরা যথেষ্ট খায় বটে কিন্তু তাতে ওদের তৃপ্তি হয়না। এই দুইপেয়ে এইপটার রসনা অভ্যাসটি কিছুটা বিচিত্র। গাছ-গাছড়ার নানা অংশ তাদের চাই। বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের রসালো শেকড়ের প্রতিও তাদের বেশ লোভ— ঠিক জানে কোথায় পাওয়া যায় বন্য ওসব শেকড়। মাটির ভেতর থাকা বা ওপরে পড়ে থাকা নানা বাদাম, বীজ ইত্যাদি ও তারা বেশ অভ্যস্ত। আরো বড় কথা— মাঝে মাঝে মাংসেও তাদের অরুচি নেই। অবশ্য বড় পশু পাখির মাংস খাওয়াতে তারা লোভ করতে যায়না। শিকার করে সে সব মাংস খাবে এমন সাধ্য তাদের নেই। বরং শিকার করার চেয়ে অন্যের শিকার হবার ভয়টিই তাদের মধ্যে বেশি। তাদের নজর যায় ছোটখাট কীট পতঙ্গ— ফড়িং, শুঁয়া পোকা এসবের দিকে, টিকটিকি জাতীয় ছোট ছোট প্রাণী হলেও বেশ ভালো; এসব ছোট নরম রসালো প্রাণী ধরে খেতে তাদের আনন্দ। ওই যে উদ্ভিদের ফল-মূল-পাতা বাদাম থেকে বেশির ভাগ খাবার তাদের আসলেও এর সঙ্গে প্রাণিজ

এসব উপাদেয় জিনিসের যোগ অন্য এইপদের তুলনায় ওদের খাদ্যকে বেশ মজাদার করে তোলে, পুষ্টিকরও বটে। তৃণভূমির মধ্য দিয়ে সপরিবারে হাঁটাহাঁটির এটিই বড় কারণ।

ভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে নানা জায়গায় যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে তাদের মতই অন্য কোন দলের সঙ্গেও দেখা হয়ে যায়। এগুলোও সাধারণত পারিবারিক দলই হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য একটু বড় দলও হতে পারে, এমনি কয়েকটি পরিবারের একত্র বাসের ফলে যা গড়ে ওঠে। ওই পথে দেখা হওয়াটি কিন্তু একেবারে নীরবে যায়না। একই এলাকায় থাকে বলে দলগুলোর মধ্যে চেনা-জানা আছে। তাই লুসিদের সঙ্গে অন্যদের দেখা হলে উভয়ে বেশ আনন্দিত হয়, চিৎকার করে রব তুলে সম্ভাষণ জানায়। দুই দলের বাচ্চারা বিশেষ করে পরস্পর একটু খেলাধূলা করে নেয়। না, ঠিক ভাষা ওদের নেই, স্বরতন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করে সব রকমের ধ্বনি যে তুলবে সে ব্যবস্থাও তাদের গলায় নেই। কিন্তু তাই বলে পরস্পরকে দেখলে আনন্দ প্রকাশ করতে পারবেনা, কিছু তথ্য বিনিময় করতে পারবেনা, এমনতো নয়। শুধু ওরা কেন যে কোন এইপই সেটি করতে পারে। তবে অন্য এইপদের তুলনায় আমাদের এই দুই পায়ে হাঁটা এইপদের তথ্য বিনিময়ের দক্ষতা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি। অতীত বা ভবিষ্যত নিয়ে খুব একটি চিন্তামূলক ভাব ওরা প্রকাশ করতে পারেনা, এমনকি অন্যের মনের কথা আন্দাজ করার চেষ্টা বা ক্ষমতাও তাদের নেই। কিন্তু তথ্য বিনিময় যে যথেষ্ট করে তা নি:সন্দেহ।

মাটির ওপর পথেঘাটে থাকতে তথ্য বিনিময় খুব বেশি জরুরি দুটি কারণে। আফ্রিকান সাভানার এই অঞ্চলটি কিন্তু ওদের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। ওদের মত তৃণভোজীদের শিকার করে খাওয়ার জন্য ওখানে বহু রকমের মাংসাশী প্রাণীরা ওৎ পেতে থাকে। ওই জায়গা এবং ওই সময়ের মাংসাশী শিকারী প্রাণীরা অসম্ভব রকমের ভয়ঙ্কর। লুসিদেরকে পরস্পর থেকে জেনে নিতে হয় সামনের রাস্তায় এসব শিকারি পশুর কোন আনাগোনা কেউ লক্ষ্য করেছে কিনা। আর যেই তথ্য বিনিময় করতে হয় তা হলো খাবারের প্রাপ্তি নিয়ে। লুসিদের মতো এইপদের মস্তিষ্ক অন্য এইপদের থেকে খুব একটা বড় না হলেও এর মধ্যে আশপাশের জায়গা, সেখানকার খাদ্য প্রাপ্তির পরিস্থিতি, বিপদসংকুল জায়গাগুলো ইত্যাদির একটি ভাল ধারণা তারা স্মৃতিতে রাখতে পারে। এর ভিত্তিতেই তারা চলাফেরা করে। তবে পরিস্থিতি সব সময় বদলাচ্ছে তাই তাদেরকে সাবধানে চলতে হয়, ওই সীমিত মস্তিষ্কে যা সম্ভব খবরও রাখতে হয়।

ওদের সবার বড় আতঙ্ক তলোয়ার-দেঁতো বাঘ-সিংহরা। এই তলোয়ার-দেঁতোগুলো তুলনামূলক ভাবে আধুনিক বাঘ-সিংহ থেকে আরো বড় ও আরো অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। হাদারের ওই সাভানা অঞ্চলে এই দেঁতোগুলোর বেশ

কয়েক রকম প্রজাতি বিচরণ করছে। তলোয়ার-দেঁতো বলার কারণ হলো অসম্ভব রকম বড় ছেদন দন্ত অর্থাৎ কুকুরে দাঁতগুলোর জন্য। ওপরের পাটি দাঁতে দুপাশে যে দুটি কুকুরে দাঁত সেগুলো এত মোটা ও লম্বা যে মুখ বন্ধ থাকার সময়ও মুখ থেকে দশ পনরো সেন্টিমিটার বাঁকা তলোয়ারের মত নিচের দিকে বেরিয়ে থাকে। মুখের এমন অস্ত্রের কারণে এরা এখানকার বড় বড় সব তৃণভোজীকে আক্রমণ করে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে পারে— যেমন ম্যামথ (বিশালাকায় প্রাচীন হাতি), হাতি, মোষ ইত্যাদি, আর এইপরা বা লুসিদের মতো ভিন্ন এইপরা তো নস্যি মাত্র। এই দেঁতোদের ভয়েই লুসিরা সব সময় আতঙ্কে থাকে অবশ্য অন্য নানা শিকারি জন্তুও কম যায়না। আত্মরক্ষার উপায়গুলোর মধ্যে হচ্ছে চোখ-কান খোলা রাখা। উচুঁ স্থানে থাকলে বেশি দূর পর্যন্ত দেখা যায়— ওদের কেউ না কেউ স্বাভাবিক ভাবেই সব সময় গাছের ওপর থাকলে খুব ভাল হয়, দূরে কোথাও শিকারি হিংস্র প্রাণী দেখলে মুখে বিশেষ শব্দ করে চেঁচিয়ে নিচের সবাইকে সতর্ক করে দিতে পারে। আর যারা নিচে আছে তারা দ্রুত কাছের গাছে উঠে পড়ে আত্মরক্ষা করে। তাই গাছে থাকা এবং গাছ বেয়ে ওঠা শুধু ফল সংগ্রহ, আশ্রয় ইত্যাদির জন্য জরুরি নয়, আত্মরক্ষার জন্যও খুব জরুরি। যাবতীয় অন্য এইপরা যেখানে চার পায়ে হাঁটে সেখানে লুসিদের গোষ্ঠির এই বিজাতীয় এইপটির দুপায়ে হাঁটার একেবারে ভিন্ন আচরণের মূলেও রয়েছে কিছুটা নির্ভয়ে ভূমিতে চলাচল করতে পারা— কারণ দু'পায়ে খাড়া থেকে হাঁটলে অধিক উচ্চতার কারণে সামনে-পাশে যথেষ্ট দূর পর্যন্ত নজর রেখে তারা চলতে পারে।

যদিও খাবার নিয়ে কাড়াকাড়িতে, অথবা রাতে-দিনে আশ্রয় ও খাবার যোগাড়ের জন্য এক এক এলাকার গাছের দখল নেবার ক্ষেত্রে অন্য সনাতন এইপরা লুসিদের গোষ্ঠিকে ছেড়ে কথা বলেনা, তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু লুসিদেরকে বেশ একটু সমীহের চোখে দেখে। গাছের নিচে তৃণভূমির মধ্য দিয়ে যে ভাবে তারা দুই পায়ে হেঁটে বেড়ায়, হিংস্র প্রাণীর উপস্থিতি যেভাবে তারা আগে টের পায়ও পরস্পরকে সতর্ক করে যার সুবিধা সুযোগ অন্য এইপরাও পায়— এসব কারণেই এই সমীহ। সব কিছুর মূলে হলো বেশির ভাগ আচরণে ওরা অন্য এইপদের মতো হলেও ওই দু'পায়ে হাঁটার ব্যাপারে ওরা একেবারেই অনন্য। মনে হয় সমীহটা সব এর সঙ্গেই জড়িত, অথবা বলা যায় এরা ফলেই যেন খানিকটা একটু বেশি বুদ্ধি, বেশি সক্ষমতার সুযোগ ঘটে। লুসিদের মতো পরিবারগুলোকে হাঁটার সময় লক্ষ্য করলেই এটি বুঝতে পারবেন। তলোয়ার-দেঁতো ওই সেকালের বাঘ-সিংহের মতো অমন ভয়াল শিকারি না হয়ে অপেক্ষাকৃত কম হিংস্র শিকারি জন্তু পথে পড়লে তারা বড় পাথরের খণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে অথবা লাঠি হাতে তাড়া করে প্রায়শ রক্ষা পেয়ে যায়। এও তারা পারে সব সময় হাত ফ্রি থাকে বলে এবং সেই হাতে খুব কুশলিভাবে না হলে পাথর বা লাঠি ধারণ করে সেটি ব্যবহার করতে পারার জন্য। বাপ্পা, লুসি, খুশি— পরিবারের বয়স্করা প্রয়োজনের সময় প্রায়ই

গাছের একটি ডাল লাঠি হিসেবে হাতে রাখতে চায়— আত্মরক্ষায় কাজে লাগে আর বাচ্চারা কথা না মানলে তাদেরকে শাসাতেও কাজে লাগে। ওরা দুই পায়ে হাঁটার সময় এই যে বেঢক লম্বা হাত দুটি ঝুলে থাকে দেখলেই বোঝা যায় যে তা যতটা না লাঠি চালানো বা পাথর ছোঁড়ার জন্য তৈরি হয়েছে তার চেয়ে বেশি দ্রুত স্বচ্ছন্দে গাছ বেয়ে ওঠা, হাতেপায়ে ডালের ওপর ছোটাছুটি করা, ফল পাড়া, আর শুধু হাতে ডাল ধরে ঝুলে ঝুলে এক ডাল থেকে অন্য ডালে চলা— এ সবের জন্যই তৈরি হয়েছে। হাতের আঙ্গুলগুলো সব সময় বেঁকে থাকে— তাই তাদের পক্ষে সহজে জিনিসপত্র ধরে বহন করা সহজ হয়না, কেমন জানি আনাড়ি ভাবে ধরা, আনাড়ি ভাবে ছোঁড়া।

কিন্তু তার মধ্যেও খুব মূল্যবান কিছু তাদেরকে হাতের মধ্যে নিতে হয়— বরং বলা যায় হাতের সাহায্যে কোলে নিতে হয়— তা হলো ছোট বাচ্চাদের। লুসির ছোট বাচ্চা দুষ্টু এখনো তার কোলেই থাকে, কখনো অন্যদের কোলেও থাকে— খুশি, বা টুসির, এমনকি বাচ্চার বড় বোন দিক্কারও। শুধু হাঁটার সময় নয়, গাছে ওঠার সময়, ডালে ডালে হাঁটার সময়, এমনকি ডাল থেকে ঝোলার সময়ও বাচ্চাকে হাতে জড়িয়ে কোলে রাখতে হয়— যেগুলো বেশ কঠিন কাজ। এমন কাজ কিন্তু অন্য এইপদের করতে হয়না, কারণ তাদের বাচ্চারা সব সময় মায়ের পিঠে আঁকড়ে ঝুলে থাকে— হাঁটার সময়, বা গাছে চলাচলের সময়। বাচ্চার হাত ও পা উভয়ে এ ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার বেশ উপযুক্ত একেবারে জন্মের পর থেকেই। মা'কে ওর দিকে নজরই দিতে হয়না— মা ব্যস্ত থাকে নিজের চলাচল নিয়ে। কিন্তু দুষ্টুর মতো বাচ্চাদের তা হবার উপায় নেই— কারণ এই দুই পায়ে হাঁটা এইপদের পা শুধু দাঁড়াবার ও হাঁটার উপযুক্ত করে তৈরি— আঁকড়ে ধরার উপযুক্ত করে নয়, বিশেষ করে পায়ের পাতা আর আঙ্গুল। ওরা জন্মায় পায়ের লম্বাটে পাতা নিয়ে যার আগায় প্রায় সমান এক লাইনে বেঁটেখাটো আঙ্গুলগুলো সাজানো আছে— এটি গোড়ালি, পাতা ও আঙ্গুল ব্যবহার করে দু'পায়ে হাঁটার জন্য উপযোগী। অন্য এইপদের পায়ের পাতা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার, বানর জাতীয় সবারও তাই। ওদের পায়ের পাতা অনেকটা তাদের হাতের পাতার মতই— আঙ্গুলগুলো যেন কিছুটা কাছাকাছি জায়গা থেকে নানা দিকে ছড়িয়েছে সব মিলে আঁকড়ে ধরার উপযোগী।

ওই যে লুসিরা হেঁটে গেছে তাদের পায়ের ছাপগুলো দেখছি— পায়ের পাতার মধ্যে কিছুটা গর্তের আভাস সহ প্রায় পুরো পাতা ও আঙ্গুলের ছাপ দেখা যায়। আপনার-আমার পায়ের ছাপের সঙ্গে খুব মিল লক্ষ্য করা যায়। এমন মিল অন্য এইপদের পায়ের ছাপে মোটেই দেখা যাবেনা। ছাপ থেকেই বোঝা যায় হাঁটার সময় তাদের কদম ফেলার ভঙ্গিটিও আপনার-আমার মতই, মোটেই অন্য এইপদের মত নয়। প্রথমে গোড়ালিটি মাটিতে পড়ে তারপর আঙ্গুলের দিক, আর সেখানে ভর দিয়ে পেছনে ঠেলে সামনে এগিয়ে যাওয়া।

লুসি এখন শুধু নিজের পরিবার নিয়ে হাঁটছেনা তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের আরো দু'একটি পরিবারের— সবাই পরস্পরের সঙ্গে বেশ মিলে মিশে পথ চলেছে। এটিও খুব সাধারণ ব্যাপার— এই দুইপেয়ে এইপরা বেশ সামাজিক প্রাণী। আসলে সব এইপরাই যথেষ্ট সামাজিক, কিন্তু সামাজিকতার দিক থেকে এই দুই পেয়েরা কিন্তু বেশ কিছুটা এগিয়ে। অবশ্য সাভানায় তাদের জনসংখ্যা মোটেই বেশি নয়— বেশ কিছু দূরে দূরে বাস করে। তাই এক সঙ্গে হাঁটতে দেখাটা বিরল ব্যাপার।

লুসিদের পরিবারে খাবারের পছন্দগুলো বুঝতে হলে তাদের দাঁতের খবর নেয়াটি দরকার। ওদের হাত পা'কে যেমন একটু কাছে গিয়ে দেখেছি সে ভাবে অবশ্য দাঁত দেখা খুব সহজ নয়। কখনো হা করা অবস্থায় দাঁতগুলো যদি দেখি একটি জিনিসে হয়তো অবাক হবো। অন্য সব এইপে সামনের দাঁতগুলো বিশেষ করে দুপাশে বেশ তীক্ষ্ণ যে ছেদন দন্ত বা কুকুরে দাঁত থাকে সেগুলো বেশ জবরদস্ত; কিন্তু এই দুই পেয়ে এইপের সামনের সব দাঁত অনেক ছোট— বিশেষ করে কুকুরে দাঁত তো অন্য এইপের তুলনায় বেশ ছোট— অনেকটা ছোট বয়সী এইপের মত। আরো পাশের দিকের যে পেষণ দন্ত সেগুলো অবশ্য বেশ বড় ও চওড়া। দাঁতের এই বৈশিষ্ঠের কারণে লুসিরা দাঁত দিয়ে বেশি শক্ত জিনিস কাটা চেরা করাতে অভ্যস্ত নয়, তবে শক্ত বাদাম ইত্যাদি পেষণ দন্ত দিয়ে ভাঙ্গতে পারে। এজন্যই ওরা নরম, রসালো ফল কীট পতঙ্গ, খুব ছোট নরম দেহী প্রাণী এসবই খোঁজে। সেক্ষেত্রেও হাতের ব্যবহারটি কিছু কাজে আসে। সুবিধামত কোন জিনিস নিয়ে তাকে হাতিয়ারের মত ব্যবহার করতে এরা অন্য সব এইপের থেকে খানিকটা এগিয়ে। যেমন কুড়িয়ে পাওয়া ধারালো পাথর দিয়ে টিকটিকির চামড়া ছাড়াতে বা হাড় থেকে মাংস আলাদা করতে দেখা যায়। খাবার জন্য মাটি খুঁড়ে শেকড় বের করতে কাছাকাছি জায়গা থেকে একটি একটি ছোট সুচালো কাঠি যোগাড় করে নিতেও তাদের দেখা যায়। উই পোকা ধরে খাবার জন্যও ওরা সরু কাঠি ব্যবহার করে— উইয়ে গর্ত বা ডিবির মধ্যে কাঠি ঢুকিয়ে এর সঙ্গে লেগে থাকা উইগুলো বের করে খায়।

নানা দিক থেকে পুরুষ বাপ্পাই পরিবারের কর্তা। অধিকাংশ এইপ গোষ্ঠির এই ভাবসাব এদের মধ্যেও রয়ে গেছে। পুরুষটির বড় ও ভারি হওয়া স্ত্রীদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার সহায়ক হয়। বাপ্পার কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এই এইপ ভাবটি প্রায় একই রকমের। তবে মা লুসির গা আঁকড়ে ধরতে না পেরে বাচ্চাদের যে অসহায়ত্ব সেটি এদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন। যে বাচ্চা যখন ছোট ছিল লুসিকে তাকে কোলে রাখার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে— এখন দুষ্টুকে নিয়ে তা থাকতে হয়। খাবার খোঁজার কাজ পরিবারের সবাইকেই করতে হয়— বাপ্পাকে যেমন করতে হয়, স্ত্রীরা লুসি, খুশি, টুসি সবাইকে করতে হয়, লুসির বড় ছেলে দিক্কাকেও। বড়রা শিশুদেরকে এটি শেখায়, বিশেষ করে মায়েরা। শেখাবার

আরো বড় বিষয় হলো হিংস্র জন্তু থেকে সতর্কতা— তাদের দেখা গেলে সতর্কবাণীগুলো বোঝা ও দ্রুত গাছে উঠে বা সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করা। দুষ্টুকে বাবা বাপ্পাও মাঝে মাঝে কোলে রাখে প্রয়োজনে, অন্যদেরকেও রাখতে হয়। শিশুর এই বাড়তি যত্নের প্রয়োজনে এদের পারিবারিক বন্ধন অন্য এইপদের চেয়ে একটু বেশি, শিশুর প্রতি বাবার মনোযোগও একটু বেশি। অবশ্য এই অসহায় শৈশব খুবই স্বল্পস্থায়ী— অন্য সব এইপের মতো এদের মধ্যে বাচ্চারা দ্রুত পূর্ণ বয়স্ক হয়ে পড়ে। এই যে লুসির ছেলে দিক্কা— তার বয়স মাত্র তিন বছর। এর মধ্যেই সে মোটামুটি পূর্ণ বয়স্ক হয়ে গেছে বলতে হবে। এই দিক থেকে অন্য এইপের তেমন কোন অমিল নেই। দ্রুত পূর্ণ বয়স্ক হয়ে বাবা মা'র সাহচর্য ছাড়াই ওরা নিজের জীবন যাপন করতে শেখে। শিগ্‌গির একদিন দেখা যাবে দিক্কা এক বা একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে নিজের আলাদা পরিবার গড়েছে। হাদারের ওই সাভানায় লুসিদের পরিবারের কাছাকাছি এই দুই-পেয়ে এই এইপ প্রজাতির নতুন পরিবারটিকেও দেখা যাবে।

লুসিদের জায়গা থেকে কিছু দূরে একটু ভিন্ন রকমের দুইপেয়ে এইপ রয়েছে— চলাফেরা লুসিদের মতই, আকার আয়তনও এরকম— কিন্তু দেহ বেশি ভারি, মাথার খুলি চোয়াল সব কিছু বেশি মোটা ও শক্ত, দাঁতগুলোও বড়, হাতে-পাও বেশি পুষ্ট। লুসিদের পরিবারের সঙ্গে ওদের কারো দেখা কখনো হয়েছে কিনা জানিনা, তবে হতেও পারে। দুই পায়ে হাঁটার দিক থেকে এবং অন্যান্য সব ব্যাপারে লুসিরা ও এরা একই ধরনের— তবে উভয়ে কাছাকাছি প্রজাতি হলেও ভিন্ন প্রজাতির। লুসিদেরকে সাধারণভাবে বলা যায় তন্বী দেহের, আর অন্যদেরকে বলা যায় গাট্টাগোট্টা। লুসিদের সঙ্গে তাদের দেখা হওয়া সব সময় সুখকর নাও হতে পারে। ঐ গাট্টাগোট্টা দু'পেয়েদের খাবারের অভ্যাসে মাংসের স্থান একটু বেশি। কাজেই দু'পেয়ে জাত ভাই হলেও কালেভদ্রে ওদেরকে আক্রমণ করে মেরে খেতে পিছপা হয়না। তবে উদ্ভিদ, মাংস যাই খাক না কেন অন্যরা যেভাবে কাঁচা খায় ওরাও সেভাবেই খায়। পারলে নিজেরা মেরে খায়, অন্য কেউ মেরে ফেলে গেলে তাও খায়। অবশ্য ওদের কেউই মূলত মাংসখেকো নয়, ওটি নেহাত তাদের স্বাদ বদলানোর খাবার। সব এইপের মতই ওরা মূলত উদ্ভিদভোজী— সে লুসিরাই হোক আর তাদের চেয়ে গাট্টাগোট্টা মাংস প্রিয় অন্য দুইপেয়েরাই হোক। ওরা সবাই এইপদেরই ভিন্ন প্রজাতি, মিলও বেশি এইপদের সঙ্গে, কিন্তু মিল কি শুধু এইপদের সঙ্গেই? ওদের হাঁটাটি লক্ষ্য করেছেন— তা কি মানুষের মত নয়?

আমাদের গল্প অবশ্য প্রধানত লুসিদেরকে নিয়ে— তাই তাদের পরিবারের সঙ্গে সাধারণ একটি দিন কাটাতে পারি। লুসি পরিবারের বাস তৃণভূমির একস্থানে ঘন হয়ে থাকা একটি বৃক্ষকুঞ্জে, গাছের ওপরে। রাতে ঘুমাবার আগে তারা তাদের গাছের ওপরের বিছানাটি নতুন করে তৈরি করে নিয়েছিলো। এজন্য পরস্পর ঘন সংবদ্ধ ডালপাতাগুলোকে বিছানার একটি পাটাতন হিসেবে ব্যবহার করেছে ওরা।

বেশ কিছু পাতা সংগ্রহ করে এই পাটাতনে বিছিয়ে পরিবারের সবার জন্য আরামের বিছানা তৈরি করা হয়েছে। ভোরে গাছের ওপর পাখির কলরব শুরু হলে লুসি, খুশি, টুসি এবং বাচ্চারা একে একে ঘুম ভেঙ্গে ওঠে পড়ে। পরিবারের কর্তা বাপ্পা সবার পরে ওঠলেও হাঁকডাক করে সবাইকে কর্ম চঞ্চল করে তুলেছে। দুষ্টু এখনো মায়ের দুধ খায়— লুসির প্রথম কাজ তাকে দুধ খাওয়ানো। অন্য বাচ্চারা— রুমু আর ঝুমু এখনো শিশু হলেও নিজেরাই গাছের ডালে দাপাদাপি করে ফল খুঁজতে খুব পছন্দ করে। তবে সকালের খাবার সংগ্রহের সত্যিকার দায়িত্বটি নেয় পরিবারের বয়স্করা— বিশেষ করে লুসি, খুশি আর টুসি— এই তিন মহিলা।

সাভানার কয়েক রকম গাছের ফল পাকার মৌসুম শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। এটি গ্রীষ্মের শেষে অপেক্ষাকৃত আর্দ্র মৌসুম। তবে ইথিওপিয়ার হাদারে আর পূর্ব আফ্রিকার কাছাকাছি অন্যান্য জায়গাগুলোতে বর্ষা বলতে তেমন কিছু নেই। কালেভদ্রে বৃষ্টি হয়। কেন জানি ওই ভোরেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এ অবস্থায় লুসিরা গাছে থাকাই পছন্দ করে— সেখানে গাছের শামিয়ানার ভেতরে বৃষ্টির প্রকোপ পৌঁছতে সময় লাগে। তারপরও ওরা ঠিকই ভিজে যায়— অল্পস্বল্প এমন ভিজতে ওরা অভ্যস্ত। তবে বৃষ্টি বেড়ে যাচ্ছিল বলে সবাই ঘন হয়ে থাকা বড় বড় পাতার এক একটি ডাল হাতে নিয়ে মাথার ওপরে ধরে মাথা ও গা বাঁচাবার চেষ্টা করছিলো— ঠিক ভেজার হাত থেকে নয় বরং বৃষ্টির বড় বড় ফোটার আঘাতটি কিছুটা অস্বস্থিকর বোধ হচ্ছিলো বলে। খুব শিগ্‌গির অবশ্য বৃষ্টি কেটে গেল, আর সবাই ধূমধাম করে ফল খোঁজার কাজে লেগে গেল। কাছাকাছি মৌসুমী ফল অনেকগুলোই প্রায় ওরা শেষ করে ফেলেছিলো। কাজেই ফলের খোঁজে একটু দূরে যেতে হলো।

ডাল থেকে মোটা বোঁটা খামচিয়ে ফল ছিড়ে নিতে আর ফলের পুরু খোসাটাকে ছিড়তে তাদের কোন অসুবিধা হয়না— এ ধরনের কাজে তাদের দাঁত ও চোয়াল বেশ উপযোগী। লুসি ও অন্যান্য স্ত্রীরাই ফল খুঁজে ছেড়ার কাজ করছে। খোসা ছিড়ে রুমু-ঝুমুদের হাতে তুলে দিচ্ছে। তবে বাচ্চারা নিজেরাও যে ছেড়ার চেষ্টা করছেনা তা নয়। বেশ খানিকটা ট্রেনিংও সাথে সাথে হয়ে যাচ্ছে। দলপতি বাপ্পা কিন্তু এসবে বড় একটি অংশ নিচ্ছে না। নিজের জন্য দু'চারটা ফল ধূমধাম ছিড়ে-ছিলে নিচ্ছে, অথবা অন্যদের ছেড়া ফলে ভাগ বসাচ্ছে। পরিবারে তার ভূমিকা টের পাওয়া গেল কিছু পরে। ভিন্ন এলাকা থেকে আসা একটি এইপ ও দু'তিনটি বানর লুসিদের গাছগুলোর কাছাকাছি গাছে বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলো। বাপ্পা এটি দেখতে পেয়ে অদ্ভুত চিৎকার করতে করতে ডালে ঝুলতে ঝুলতে লাফিয়ে নিচে মাটিতে পড়ে ওদিকে দৌড়ে যায়, একই সঙ্গে আগন্তুকদের দিকে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। দুই পায়ে স্বচ্ছন্দে এরা হাঁটতে পারলেও দৌড়ের ব্যাপার তেমন পারদর্শী নয় বলেই মনে হলো। দৌড়াবার সময় যেন বাপ্পার দেহের

ভারসাম্য তেমন থাকছেনা— টলে টলে যাচ্ছে। তা ছাড়া দৌড়াতে দৌড়াতে যা ছোঁড়ে তার লক্ষ্যভেদও মোটেই ভাল হয়না— দাঁড়িয়ে ছুঁড়লে সেটি হয়। ওই ব্যালেন্সের অভাবেই লক্ষ্যভেদ হয়ে ওঠেনা। তবে বাপ্পা এবং তার ঠিক পরে পরেই পুরো পরিবার যে ভাবে চিৎকার করেছে আর ছুটে এসেছে তাতে ওই আগন্তুকগুলো পালিয়ে বেঁচেছে। সবাই মিলে নিজেদের একক বসত রক্ষা করলেও আত্মরক্ষার মূল নায়ক ছিল প্রধান পুরুষ বাপ্পা। এই পরিবারে যদিও বাপ্পাই একমাত্র বয়স্ক পুরুষ— লুসিদের প্রতিবেশী আর একটি পরিবারে প্রধান পুরুষ ছাড়াও আরো দু'জন বয়স্ক পুরুষ রয়েছে, স্ত্রীর সংখ্যাও কিছুটা বেশি— মোট স্ত্রী ছয় জন। পরিবারটি বেশ বড়— অধিক পুরুষ থাকায় বসতের সীমানা রক্ষার কাজটি জোরদার হয়।

লুসিদের পরিবারকে শুধু যে অন্য এইপ, বানর ইত্যাদি থেকে নিজের এলাকাটি রক্ষা করতে হয় তাই নয়, নিজেদের প্রজাতির থেকেও করতে হয়— আর সেটি বেশি কঠিন। নিজেরা ছোট পরিবার বলে বেশি তৎপরতা দেখিয়ে ওই অসুবিধা অতিক্রম করতে হয়। আজ সেরকম কিছু না ঘটলেও অনেক সময় দলছুট কেউ কেউ এসে এলাকায় হানা দেয়, কখনো ওরা দলেবলেও আসে। সেক্ষেত্রে যুদ্ধটা কঠিন হয় কারণ লুসিদের যেমন দুই পায়ে দৌড়ে, হাতে পাথর ছুড়ে, লাঠি চালিয়ে ওদের বিতাড়িত করার সুযোগ আছে, ওদের ও সেই একই সুবিধা আছে। আজ সকালে অবশ্য গাছ থেকে নেমে একটু হৈচৈ করেই আগন্তুক এইপদেরকে তাড়ানো গেছে। আবার ধীরেসুস্থে গাছের ওপরে নিজ আবাসে ফিরে এসে তাদের ফলাহার শেষ করে লুসি পরিবার। লক্ষ্য করার মত মজার ব্যাপার হলো তাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ সালাপ। লুসিদের ভাষা নেই বটে কিন্তু নিজেদের মধ্যে এক রকম আলাপের সীমিত সব আওয়াজ ও ইশারা তাদের আছে। যেমন শিশু রুমু ঝুমুরা যখন খাওয়ার বদলে দুষ্টুমি করাটি বাড়িয়ে দিচ্ছিল— তখনই বাপ্পা তাদেরকে ধমক দিচ্ছিল— ওরা আবার বাপ্পার কৃত্রিম রাগের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লুসির অথবা অন্য কারো কোলে ওঠে আবদার করছিলো। তাদের মধ্যে আলাপের ভঙ্গি দেখে মনে হলো একটু পর যে তারা একটু বৈচিত্রময় খাবারের সন্ধানে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হবে তার একটি প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা চলছে।

নিচে দলেবলে নেমে দূরে কোথাও যাবার আগে এলাকাটি এসময় নিরাপদ কিনা একটু বুঝে নিতে হবে। এই এলাকায় হিংস্র মাংসাশী শিকারি প্রাণীর কোন অভাব নেই। এদের বিরুদ্ধে লুসিদের আত্মরক্ষার তেমন কোন ভাল উপায় নেই বুদ্ধি করে পালানো ছাড়া— বিশেষ করে ওই তলোয়ার-দেঁতো বিরাট সাইজের বাঘ-সিংহের হাতে পড়লে তো আর রক্ষা নেই। গাছ থেকে নামার আগে চারদিকে দেখে নিয়ে, কান পেতে শব্দ শোনে, লুসিদেরকে আঁচ করতে হলো হিংস্র প্রাণীর কোন আলামত কোথাও দেখা যাচ্ছে কিনা। এটি শুধু ওই জন্তুদের দেখে বা

তাদের গর্জন শোনে নয়, অন্যান্য নিরীহ তৃণভোজীরা কী আচরণ করছে সেটিও লক্ষ্য করছে ওরা। যদি হরিণরা আতঙ্কে থাকে— তাদেরকে এক দিকে পালিয়ে যেতে দেখা যায়, হাতিদের আচরণে অস্থিরতা দেখা যায়, গাছে বানররা আর্তনাদের শব্দ করে, তা হলে ভয় পাওয়ার কারণ আছে শিগ্‌গীর গাছ থেকে নামার কথা চিন্তা করতো না লুসিরা। আজকে কিন্তু সে রকম কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। তাই একটু ভালমন্দ খাবার যোগাড় করতে তারা তৎপর হলো।

সাভানার ঝোপঝাড়গুলোতে লুসিদের প্রিয় নানা খাবার মিলে— যেসব সন্ধান ওরা ভালই রাখে। হাঁটার সময় বাপ্পা আর পরিবারের আরো কেউ কেউ গাছ থেকে ডাল ভেঙ্গে যুৎসই লাঠি বানিয়ে নিলো। ঝোপের ওপর বাড়ি মেরে বন্য শস্য ছাড়িয়ে খেতে এটি সাহায্য করবে— আগন্তুক অন্য কেউ এসে বাগড়া দিলে তাতেও কাজে লাগবে। গাছের তলায় পড়ে থাকা ফল, বাদাম ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করতে দেরি করছিলো না ওরা। কাছেই একটি জায়গা লুসিদের চেনা আছে যেখানে কাসাভা জাতীয় পুষ্ট শেকড়ের বেশ প্রাচুর্য আছে। শেকড়গুলো খুঁড়ে বের করার কায়দা জানতে হয়। লুসি, আর খুশি এমন ভাবে লাঠি দিয়ে মাটি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এগুলো তুলছিল আর বাচ্চাদের দেখিয়ে একই কাজ করতে বলছিলো তাতে মনে হতে পারে যে শুধু শেকড় খাওয়ার নয় শেকড় তোলার পদ্ধতি শেখাবার একটি ট্রেনিং সেশন চলছিলো ওখানে। শেকড় তোলার ওই খোঁচাখুচির সময় মাটিতে ও ঝোপে পাওয়া যাচ্ছিল নানা রকম কীট পতঙ্গ— কোনটি শুঁয়াপোকার মত, কোনটি কেঁচোর মত, কোনটি ফড়িঙের মত। এগুলোই হলো ওদের রসনা তৃপ্তির সব চেয়ে মজাদার জিনিস বিশেষ খাবার। মুশকিল হলো এদের কোন কোনটি বেশ সচল— ধরতে গেলেই পালিয়ে যায়। তাই এসব ধরতে ও খেতে কৌশল লাগে— কোনটিকে কাঠি দিয়ে আটকিয়ে, কোনটিকে আচমকা হাত চালিয়ে ধরে এটি সম্ভব হয়— বড়রা ছোটদেরকে শেখাচ্ছিল কেমন করে ধরতে হবে এগুলো। খুশি বেশ বড়সড় একটি টিকটিকি ধরে ফেলেছিলো— এই নিয়ে সবার মধ্যে কী উত্তেজনা! টিকটিকিটি কেমন মরা পাতার মত চেহারার আর রঙের। আধা সবুজ আধা খয়েরি রঙের ঝোপের মধ্যে এমন ভাবে মিশে ছিলো যে সহজে দেখা যাওয়ার কথা নয়। তাই নিশ্চিন্ত মনে ঝিমুচ্ছিলো ওটি— তবে খুশির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। এমনি আরো দু'একটি অপেক্ষাকৃত ভাল খাবার জুটে গেলে সবাই তৃপ্তি করে খেলো।

হাদারের সাভানায় দুপুর গড়ালে বিকেলে রোদ খুব তপ্ত হয়। লুসি পরিবার একটি গাছের যুৎসই ছায়া খুঁজছিলো বিশ্রামের জন্য— কিন্তু তার আগে একটি ডোবার মত জায়গায় গিয়ে সবাই পানি খেয়ে নিলো। পানি খাওয়ার জায়গাটি তুলনামূলক ভাবে বেশ সরগরম। সে সময় ওখানে বেশ কিছু হরিণ রয়েছে, কয়েকটি বানর ও অন্য এইপ রয়েছে— তবে নিজেদের মত আর একটি দলের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেলো এখানে। এরা কাছেই থাকে, মাঝে মাঝে এভাবে দেখাও

হয়, এটি একটি পরিচিত পরিবার শুধু নয়, আত্মীয় পরিবারও বটে; খুশির বোন এখন এই পরিবারের অংশ। ওরা কিছুক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে গা ঘেষাঘেষি করলো— মনে হচ্ছিলো যেন পরস্পরের গন্ধ নিচ্ছে, একরকম স্বল্প বাচনের আলাপও যেন চললো। কিছুক্ষণ পর দুই দল দুদিকে চলে গেলো।

লুসিরা সবাই গাছের ছায়ায় বসে, গড়াগড়ি খেয়ে, ভরপেটে বিশ্রাম নিচ্ছিলো; তবে শত্রুর ব্যাপারে তখনো খুব সচেতন— চোখ মেলা, কান খাড়া। যে কোন সময় ঝোপের ভেতর থেকে ওৎ পেতে থাকা তলোয়ার-দেঁতোরা বের হয়ে আসতে পারে; সাবধান না থাকলে সবাইকে নিয়ে দ্রুত গাছে ওঠার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত কম বিপদ ঘটতে পারে যদি জাত ভাইদের কেউ এই সুযোগে তাদেরকে আক্রমণ করে ভয় দেখাতে আসে। তাদের এলাকাটির ওপর কারো কারো নজর পড়েছে— সুযোগ পেলেই ওরা আক্রমণ করে। ভয় দেখানোই প্রধান উদ্দেশ্য, তবে দু একটি বাচ্চাকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতেও পারে, এমনকি বয়স্কদেরকেও আহত নিহত করে অঞ্চল ছাড়া করার চেষ্টা করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ডাক দিলে প্রতিবেশী বন্ধু পরিবারের কেউ কেউ তাদের রক্ষায় এগিয়ে আসতে পারে এইই ভরসা। আশঙ্কা আছে, তাই সতর্ক থাকতে হয়— তবে এমন ঘটনা যথেষ্ট বিরল, এর জন্য ওরা তাদের ভাল খাবার সংগ্রহ, বিশ্রাম এসব বন্ধ করেনা। আজকেও শেষ বিকেলের বিশ্রামটি ভালই উপভোগ করছে। বিশেষ করে ছোট রুমু, ঝুমু তাদের বড় ভাই দিক্কা আপন মনে বাবা-মাদের ঘিরে ঘিরে ঘুরলো, গড়াগড়ি খেলো। আর কোলের বাচ্চা দুষ্টু তো লুসির কোলে ঘুমিয়েই পড়েছিলো।

সন্ধ্যা নামার বেশ আগেই ওরা সবাই গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে পড়লো— এবার নিজেদের আস্তানার বৃক্ষকুঞ্জের দিকে হাঁটা। আঁধার হবার আগেই সেখানে ওঠে ডালপালার বিছানা আবার পাততে হবে। রাতের আঁধারে নিচের ভূমিতে ঝোপ ঝাড়গুলো নিশাচর সব হিংস্রদের দখলে চলে যায়। সেখানে থাকাটি মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

* * *

১৯৭৪ সালে পূর্ব আফ্রিকায় ইথিওপিয়ার আফার অঞ্চলের হাদারে 'লুসির' ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছিলো। তার পুরো কঙ্কাল না হলে যে ৪০ শতাংশ হাড় পাওয়া গিয়েছিলো তা সঠিক ভাবে সন্নিবেশ করে পুরো কঙ্কালটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গিয়েছে। এ ফসিলের বয়স নির্ণয় করে বোঝা গেল ৩৫ লক্ষ বছর আগে লুসি এই অঞ্চলে বাস করতো। লুসি নামটিও তখন দেয়া হয়েছিলো পপ গ্রুপ বীটলদের বিখ্যাত গান 'লুসি ইন দি স্কাই উইদ ডায়মন্ড' অনুসরণ করে। লুসির ফসিল বিশ্লেষণ করে সব চেয়ে বড় আবিষ্কারটি ছিলো যে সে স্বচ্ছন্দে দুই পায়ে হাঁটতে পারতো। খাড়া হলে তার হাঁটুর কব্জা যেভাবে পুরো লক্ হয়ে আটকে যায়, এবং তার কটি দেশের যে গঠন, তাতেই ব্যাপারটি বোঝা গেছে। আর এখানেই লুসির বড় অনন্যতা— এই একটি মেয়ে এইপ যে মানুষের

মত হাঁটতে পারতো। দেখা গেলো তার অধিকাংশ দেহ-বৈশিষ্ট একটি এইপের (যেমন শিম্পাঞ্জি) মত। কিন্তু কিছু কিছু দিক যেমন মুখাবয়ব, ছোট দাঁত, ইত্যাদি দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সে মানব-সদৃশ।

তবে সব চেয়ে গুরুত্বের বিষয় যেটি সেই মস্তিষ্কের আকার বা জটিলতায় সে মানব-সদৃশ নয়। তার মস্তিষ্কের আকার ৪৪০ কিউবিক সেন্টিমিটারের (সিসি) বেশি নয় যা আজকের একটি শিম্পাঞ্জির থেকে সামান্য বড়, আর আমরা মানুষের যে প্রজাতি তার গড়পড়তা মস্তিষ্কের আয়তন হলো ১৩৫০ সিসি। মানুষের মানবিক যে সব বৈশিষ্ট— যেমন উচ্চতর বুদ্ধি, চিন্তা, আবেগ এগুলো মস্তিষ্কের আকার ও জটিলতার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। সেই হিসেবে লুসিকে খুব একটা মানুষের মত বলা যায়না। তার খাদ্যাভ্যাস, বাসস্থান, অধিকাংশ আচরণ ইত্যাদিও তখনকার দিনের নানা এইপের সঙ্গেই মেলে বেশি। তারপরও ওই যে দুই পায়ে হাঁটার সক্ষমতা, হাতের ব্যবহার ইত্যাদি দিক থেকে মনে হচ্ছে এইপের কোন শাখার যে প্রথম মানব-মুখী যাত্রা শুরু হয়েছিলো লুসিরা তাদেরই অংশ। মনে হচ্ছে ওর মাধ্যমেই মানুষের পায়ের আওয়াজ ক্ষীণ ভাবে হলেও আমাদের কালে প্রথম এলো।

লুসির ফসিল বিশ্লেষণে যা পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতেই আমরা আমাদের গল্পটি খাড়া করেছি। ওর পরিবারের বর্ণনা দেয়ার কাজে সহায়ক হয়েছে লুসির প্রায় সমসাময়িক আরো কিছু ফসিল আবিষ্কার। এগুলোর বিশ্লেষণে মনে হচ্ছে ওরা সব একই প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত— যার নাম দেয়া হয়েছে *অষ্ট্রালোপিথেকাস আফারানসিস* যার প্রথম শব্দের মানে দক্ষিণের নরবানর আর দ্বিতীয় শব্দটি এসেছে ওদের বাসভূমি ওই আফারের নামে। লুসির প্রাপ্তি স্থানের কাছেই হাদারের আর একটি জায়গায় এই প্রজাতির আরো তেরো জনের আংশিক ফসিল সনাক্ত করা গেছে— মোট ২০০টি আলাদা ফসিল হাড় থেকে। ওরাও প্রায় একই সময়ে জীবন কাটিয়েছে। ভাবসাব দেখে ওদেরকে এক সঙ্গে বলা হয় 'প্রথম পরিবার'। এছাড়া ওই অঞ্চলেরই দিক্কা নামক জায়গায় পাওয়া গেছে এই প্রজাতিরই একটি তিন বছর বয়সী বাচ্চার প্রায় পুরো মাথার ফসিল— যাকে দিক্কা শিশুও বলা হয়। এরও বয়স লুসির লাখ খানেক বছরের ভেতরে। এর নামেই আমরা গল্পে লুসির বড় বাচ্চাটির নাম দিয়েছি দিক্কা।

আবার উত্তর তানজানিয়ার লীটিলি নামক জায়গায় ৩৭ লাখ আগের কিছু পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে যা আশ্চর্যজনক ভাবে মানুষের পায়ের ছাপের মত— মোটেই এইপের মত নয়। খুব সম্ভব এগুলো লুসির মত আফারানসিসের পায়ের ছাপ যাতে মানব-সদৃশতা ও দু পায়ে হাঁটার বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত হয়েছে। এগুলো ১৯৭৮ সালে আবিষ্কার করেছেন বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ লীকি পরিবার— লুই, তাঁর স্ত্রী মেরী এবং তাঁদের ছেলে রিচার্ড লীকি। গত কয়েক দশকে পাওয়া এই ক'টি বিখ্যাত ফসিল এবং আরো বেশ কিছু ফসিল প্রাপ্তি ও গবেষণার ভিত্তিতে *অষ্ট্রালোপিথেকাস আফারানসিসের* জীবন সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া গিয়েছে। ফসিল গবেষণা তার একটি উৎস হলেও তাদের সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকা আজকের শিম্পাঞ্জি ও গরিলা পরিবারদের জীবন নিয়ে গবেষণা থেকে, এবং ওদের নিয়ে ডিএনএ গবেষণা থেকে আরো অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। লুসিদের কথা সে সবের ভিত্তিতেই কল্পিত।

সবকিছু থেকে মনে করা হচ্ছে পূর্ব আফ্রিকার ওই অঞ্চলে ৩৯ লক্ষ বছর থেকে ২৯ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত এই প্রায় দশ লক্ষ বছর *আফারানসিসেরা* অর্থাৎ লুসির মতো

আদিতম মানব-সদৃশরা বাস করেছে। এটি একটি দীর্ঘ সময়। আমরা আধুনিক ধরনের মানুষ যেই প্রজাতি সেই হোমো সেপিয়েন্সরা এর এক পঞ্চমাংশ সময়ও এখনো বাস করিনি। ওই দীর্ঘ সময় ধরে ওরা বিবর্তিত হয়েছে। গত শতাব্দীর বিশের দশকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া মাথার, চোয়ালের কিছু ফসিলের সন্নিবেশে এমন এইপের পরিচয় পাওয়া গেছে যাও লুসির সময়ের বা তার কয়েক লক্ষ বছর পরের কালের— কিন্তু *আফারানসিসের* মতই খানিকটা মানব-সদৃশ। লুসির অঞ্চল পূর্ব আফ্রিকায়ও ওদের পাওয়া গেছে। লুসিদের থেকে ভিন্ন প্রজাতি বলে তাদের নাম *অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস*। তাদের ভারি দেহ পুরু মাথা, চোয়াল ও দাঁতের জন্য এরা লুসিদের গল্পের গাট্টাগোট্টারা। তাদের আগেও মানব-সদৃশরা ছিলো তবে সাদৃশ্য এদের থেকেও কম ছিলো— ওই ভাবে মনে করা হয় পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ বছর আগেই এইপ থেকে মানব সদৃশরা প্রথম আলাদা হতে আরম্ভ করেছিলো।

আলাদা কেন হয়েছিলো? বিবর্তিত হওয়ার ফলেই হয়েছিলো, একটু একটু করে। তাদের মধ্যেকার কোন কোন ব্যতিক্রমী গুণাগুন পরিবর্তিত পরিবেশে অধিক কাজে লেগে গিয়েছিলো বলে সেগুলো যাদের ছিলো তারা বেশি সুবিধা পেয়েছে, নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পেরেছে বেশি। ফলে তারা বেঁচেছে অপেক্ষাকৃত বেশিদিন, সন্তানও তাই রেখে যেতে পেরেছে অন্যদের চেয়ে বেশি। ওই সন্তানরা আবার ওই গুণ ছড়িয়েছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ চারপেয়েদের মধ্যে অল্প কিছু দু'পেয়ে বেশি সুবিধা পেয়ে ভিন্ন দু'পেয়ে প্রজাতিতে পরিণত হয়েছিলো। বিবর্তন এভাবেই কাজ করে। এভাবেই একটু একটু করে পরিবর্তন এনে বিবর্তন ক্রমে আরো প্রজাতি সৃষ্টি করেছে— যারা আরো বেশি মানব সদৃশ। আমাদের এর পরের কিছু গল্প তাদের কাউকে কাউকে নিয়ে। তারপর থেকে সব গল্প অবশ্য হুবহু আজকের মানুষ *হোমো সেপিয়েন্সদের* নিয়েই, কারণ ইতোমধ্যে বিবর্তন এই মানুষকেই দৃশ্যপটে নিয়ে এসেছে, আর কিছুদিন মানুষের পাশাপাশি বাস করে আগের মানব-সদৃশরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে এই মানুষদের পায়ের আওয়াজও আসছে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক অতীত থেকে একটু একটু করে।

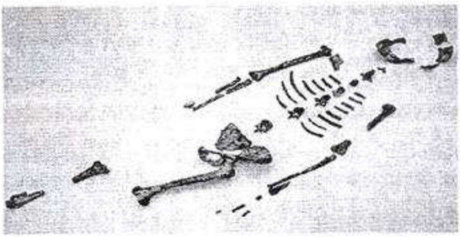

লুসির বিন্যাসকৃত ফসিল

আফ্রিকানাস মাথার ফসিল

দিক্কা শিশুর মাথার ফসিল

লুসির প্রজাতির মানব-সদৃশ পায়ের চিহ্ন
(তানজানিয়ার লীটলিতে আবিষ্কৃত,
লুসির প্রায় সমসাময়িক)

কেনিয়ার নারিকোটোমের বালক ঃ
১৫ লক্ষ ৩০ হাজার বছর আগে

বালক বয়সেই অসুখে মারা গিয়েছিলো সে। তীক্ষ্ণ করে নেয়া পাথরের হাতিয়ার দিয়ে শিকারে পটু এই ছেলেটি তাদের গোষ্ঠির অন্য সবার মত খাড়া সুঠামদেহী ছিল। কিন্তু বলা মুশকিল তার মৃত্যুতে সেদিন তার বাবা-মা কেঁদেছিলো কিনা, শোকার্ত হয়েছিলো কিনা।

কেনিয়া, দক্ষিণ সুদান এবং ইথিওপিয়ার পরস্পর সংলগ্ন জায়গাতে রয়েছে তুর্কানা নামের হ্রদ। এর পশ্চিম পারে কেনিয়াতে নারিকোটোম নামের জায়গাটি। মোটের ওপর শুষ্ক জায়গা এটি, বৃক্ষ আচ্ছাদন খুব কম— সাভানা তৃণভূমিরই অংশ বলা যায়। পনরো লক্ষ ত্রিশ হাজার বছর আগে এখানকার দৃশ্যপটে অন্যান্য নানা প্রাণীর মধ্যে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠেছিলো নানা দিক থেকে আজকের মানুষের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে এমন অনেকে। ওই সাধারণ অঞ্চলটিতে ওরা কয়েক লক্ষ বছর ধরেই আছে। তারো আগে ওদের কাছাকাছি অন্য রকম প্রজাতি ছিলো যাদের সঙ্গেও আজকের মানুষের বেশ সাদৃশ্য ছিলো। পরে ওদের নাম হয়েছে ইরেকটাস অর্থাৎ 'সোজা খাড়া'। ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার বছর আগে তুর্কানা হ্রদের পারের ওই নারিকোটোমের বাসিন্দা আমাদের গল্পের মূল চরিত্রটিও ছিল এই ইরেকটাস প্রজাতির। কিশোর বয়সী একজন পুরুষ ইরেকটাস হিসেবে ওকে অন্যরা নাম দিয়েছেন নারিকোটোমের বালক, আবার কেউ কেউ দিয়েছেন তুর্কানার বালক। আমরা তাকে শুধু 'বালক' নামেই ডাকবো।

আমাদের বালক বাল্য বয়সেই মারা গিয়েছিলো— প্রায় বারো বছর বয়সে। আমাদের গল্পের প্রধান অংশ ওই বার বছর বয়সী বালককে নিয়ে। তাছাড়া রয়েছে তার পরিবারের লোকজন আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের মধ্যে নানা বয়সীরা।

বালকের যে পরিবার সেটি একটি গড়পড়তা ইরেকটাস পরিবারের মতই। নারিকোটোমের তৃণভূমিতে এরকম পরিবার যে খুব বেশি আছে তা বলা যাবেনা, তবে স্থানীয় প্রাণীদের মধ্যে তারা খুবই বিশিষ্ট— হাতিয়ার তৈরি করে দলবেঁধে শিকার করে বলে। এখানে ছোট বড় নানা তৃণভোজীদের রাজ্যে শিকারি হিসেবে

হিংস্র প্রাণী বেশ কিছু রয়েছে। কিন্তু বালকের পরিবার সহ ইরেকটাসের এক একটি ছোট দল যখন বড় কোন হরিণ বা মোষের মত শিকারের পেছনে লাগে তখন তাদের সুকৌশল শিকারটি ওই হিংস্র প্রাণীর শিকার থেকে বেশ আলাদাই বলতে হবে। বালকের বয়স এখন বারতে পড়েছে— এর মধ্যেই সে বেশ ছিমছাম সুঠামদেহী একজন ইরেকটাস হয়ে ওঠেছে এবং নিয়মিত পরিবারের সঙ্গে শিকারে যোগ দিচ্ছে। কয়েক বছর আগে থেকেই সে লম্বায় তর তর করে বেড়েছে, এখন পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। ওর বড় ভাইয়ের বাড়ার উদাহরণ যদি দেখি তবে আরো চার পাঁচ বছরের মধ্যে সে ছয় ফুট লম্বা খাড়া মজবুত শরীরের একজন দীর্ঘাঙ্গী ইরেকটাস তরুণে পরিণত হবার কথা। ওর বাবা সুরুজ ও মা বানু দুজনেই এমন।

মা তুলনামূলক ভাবে কম লম্বা, ওজনও কিছুটা কম— কিন্তু পার্থক্যটি বেশি নয়। পুরুষ আর স্ত্রীর মধ্যে দেহ আয়তনের যে বিশাল ব্যবধান এইপদের মধ্যে দেখা যায়, আগেকার অন্য মানব-সদৃশদের মধ্যেও দেখা গেছে, সেটি কিন্তু ইরেকটাসদের মধ্যে নেই— স্ত্রীর দেহাবয়ব কিছুটা ছোট হলে পুরুষের বেশ কাছাকাছি। বালকের বড় ভাই কাজলও এখন খুব কেজো তরুণে পরিণত হয়েছে। বালকের দুই ছোট বোন, আর খুব সম্প্রতি নতুন ভাইয়ের জন্ম হয়েছে— সবাই এখনো তাকে বেবী বলে। বোন দু'জনের নাম দিশা আর মিশা— তিন বছর বয়সী মিশা আর সাত বছর বয়সী দিশা বালক আর কাজলের সঙ্গে লাফঝাপ আর খেলাধূলা করেই অধিকাংশ সময় কাটায়।

কোথায় রয়েছে এই পরিবারের বাসা? হ্যাঁ সাভানা তৃণভূমিতে তখনকার শুষ্ক পরিবেশে ওদের একমাত্র আশ্রয় ছিলো অস্থায়ী ভিত্তিতে পাথরের নানা গুহার মধ্যে। বালকদের পরিবার আরো কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে মিলে জনা পঁচিশেকের একটি দলের মধ্যে রয়েছে। প্রধানত শিকারের ও বসবাসের সুবিধার জন্যই নিকটাত্মীয়দের নিয়ে এরকম দল গড়া। বড় বড় পশু শিকার করার সময় পরিবারের বাইরেও দলের অন্তত কিছু মানুষের সহযোগিতা দরকার হয়। অবশ্য ছোটখাট শিকার ওরা পরিবারের কয়েক জন মিলেই করে ফেলে। খাবারের জন্য ওরা সবাই শিকার করা মাংসের ওপরেই নির্ভর করে যদিও সেই সঙ্গে অন্য জন্তুর শিকার করা এবং ওদের তাড়া খেয়ে ফেলে যাওয়া অভুক্ত মাংস, সংগ্রহ করা ফলমূল ইত্যাদির মেশাল দিতে তাদের আপত্তি নেই। জনা পঁচিশেকের ওই দলটি সীমিত এক জায়গায় বেশিদিন শিকার করলে সেখানে নতুন শিকারে টান পড়ে, ফলমূলও আর এই ভাবে পাওয়া যায়না। হিংস্র জন্তুর শিকার করা অভুক্ত মাংসেরও অভাব হয়। সেজন্যই কয়েক বছর পর পর পুরো দলের সঙ্গে বালকদের পরিবারকেও নতুন জায়গায় নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে যেতে হয়।

বালক ও কাজল কদিন ধরে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। তারা বাবা-মা'র কাছে শুনেছে শিগ্‌গির দল এখানকার বাস তুলে নতুন আনকোরা জায়গার

সন্ধানে বেরুবে— এমন জায়গায় যাবে যেখানে বহুকাল ধরে ইরেকটাসদের বসত হয়নি, হয়তো কখনোই হয়নি। এমন যাত্রা তারা তাদের অল্প বয়সেও কয়েকবার দেখেছে। তখন বেশ মজাই পেয়েছিলো। কিন্তু এখন ওরা দু'জনেই যথেষ্ট বড় হয়েছে— কাজলতো বটেই। স্থান বদলের ঝকমারি তারা বেশ বুঝতে পারছে। বিশেষ করে একেবারে নবজাত ভাইটিকে নিয়ে তাদের মায়ের যে অসুবিধা হবে তা ওরা বুঝতে পারছে। তাই তাদের উদ্বেগ। তবে এই যে আলাপ, এই যে ঠাঁই বদলের সিদ্ধান্ত, তা নেয়া হলো কী ভাবে?

ইরেকটাসদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সক্ষমতা যথেষ্ট ভাল না, ভাষার ক্ষমতা তাদের নেই; সব ভাব মুখের উচ্চারণে প্রকাশ করতে বুকের পেশির ওপর যেরকম নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার, এবং গলায় শব্দ সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া থাকতে হয় ইরেকটাসদের দেহে তা নেই। ভাব প্রকাশের ভাষা ধারনের মতো উন্নত মস্তিষ্কও তাদের নেই। কিন্তু যেটুকু আওয়াজ তারা করতে পারে— তার এত বৈচিত্র যে তাতেই দৈনন্দিন জীবনের কাজ চলার মতো যোগাযোগ চালাতে পারে। তাদের গুহার বাসায় খাওয়া দাওয়া সারার পর পরিবারের সবাই যে ভাবে হৈচৈ করে কথা বলে তাতেই ব্যাপারটি বোঝা যায়। দলের মধ্যে যারা গুরুজন স্থানীয়রা আছে বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো তারা এভাবেই নেয়— যেমন ঠাঁই বদলাবার সিদ্ধান্ত। ভাষার অবর্তমানে এ সব যোগাযোগ সোজাসাপটা কিছুতে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য।

তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ওদের বুদ্ধিমত্তা যথেষ্ট— কারণ সেকালের যে কোন প্রাণীর তুলনায় তাদের মস্তিষ্ক বড় — যদিও তা আধুনিক মানুষের চেয়ে এখনো ঢের কম। তাদের বুদ্ধিমত্তার অনেকখানিই বোঝা যায় শিকারের ক্ষেত্রে। সেই শিকারে সহায়তার জন্য ও শিকার করা পশুর সদ্ব্যবহার করার জন্য যে হাতিয়ার তারা বানাতে শিখেছে সেখান থেকেও। আমাদের বালকের বয়স মাত্র বার বছর, কিন্তু তার দিকে তাকালেই বোঝা যায় কেমন শিকারি তৈরি হতে যাচ্ছে সে। শরীরের গঠনে এইপদের সঙ্গে এই মানব-সদৃশ ইরেকটাসের অনেক পার্থক্য। ওরা এইপের মত বুক সরু, পেট মোটা নয়, তাদের বুক ও পেট সামনে গড়া ছিমছাম সোজা। মুখের দিকে যদি তাকাই সেখানেও দেখি এইপের থেকে অনেক পার্থক্য। হ্যাঁ আধুনিক মানুষের মত অবশ্য নয়— চোখের ভ্রূর কাছে বেশ খানিকটা ফোলা, থুতনি বলতে তেমন কিছু নেই; তবে মাথার খুলিটি বেশ বড়। শুষ্ক আবহাওয়ার জায়গায় সব সময় ছুটাছুটি করে শিকারের সন্ধানে থাকতে হলে দেহের আর্দ্রতা রক্ষা করা চাই— উন্নত নাক তার জন্য সহায়ক। এইযে ছিমছাম শরীর, এইপের মত দীর্ঘ হাত না হয়ে পরিমিত সাইজের হয়েছে এবং পা যে অনেক লম্বা হয়েছে তাও কিন্তু দৌড়-ঝাপ করার সুবিধার জন্যই। শরীর ছিমছাম হওয়াতে দেহের ভল্যুমের তুলনায় তার গায়ের তলের বিস্তার যেখান দিয়ে দেহের তাপ বেরিয়ে গিয়ে ছুটাছুটির সময় শরীর ঠাণ্ডা হতেও পারে বেশি। শরীরে ঘামের সৃষ্টিটিও দেখার মত। ঘাম শুকাবার সুবিধার

জন্য শরীরের লোমের পরিমাণও অনেকটা কমে গেছে— তাই তাকে বনমানুষের চেয়ে মানুষের মতই মনে হচ্ছে বেশি। লোমহীন গায়ের রংটি ভালই টের পাওয়া যাচ্ছে— যা কিনা বেশ কালো। এও এখানকার প্রখর সূর্য তাপে খালি গায়ে খোলা জায়গায় ছুটাছুটি করার সুবিধার জন্যই— যাতে ক্ষতিকর সূর্য কিরণ চামড়ায় কম ঢুকতে পারে।

কাজল আর বালক এই দুই ভাইকে দেখছি সারাক্ষণ ছুটাছুটি করে শিকার-শিকার খেলতে— কখনো কখনো সেই খেলা আবার সত্যিকার শিকারেও পরিণত হচ্ছে। তবে বয়স্করা যখন দলেবলে বড় শিকারের আয়োজন করে তখন এই কিশোর-তরুণদের ভূমিকাটি কিছুটা গৌণ হয়ে যায়। কারণ এসব শিকার শুধু গায়ের শক্তি বা দৌড়াবার সক্ষমতার ওপর নির্ভর করেনা। শিকারের অস্ত্র, হাতিয়ার ইত্যাদি দক্ষ ভাবে চালাবার ওপরও নির্ভর করে শিকারের সাফল্য; অর্থাৎ কিনা অভিজ্ঞতাও এখানে একটি বড় বিষয়। হাতিয়ার তৈরি আর হাতিয়ার ব্যবহার এই দু'দিক থেকেই ইরেকটাসদের দক্ষতা কিন্তু যথেষ্ট— যে ভাবে তারা উপযুক্ত পাথর খুঁজে নিয়ে আর একটি পাথর ঠুকে ঠুকে এর থেকে পাতলা পাতলা টুকরা ভেঙে বের করে মূল পাথরটিকে একটি মোক্ষম তীক্ষ্ণ হাতিয়ারে পরিণত করে সেটি দেখার মত।

বালকদের পরিবার যে গুহায় থাকে তার ঠিক সামনেই তাদের হাতিয়ার তৈরির একটি ব্যবস্থা আছে। প্রায় দেখা যায় ওদের বাবা সুরুজ ও মা বানু ওখানে বসে নতুন কিছু হাতিয়ার তৈরি করছে— কখনো বড় ছেলে কাজলকেও বাধ্য করে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। হাত এখনো কাঁচা হলেও বালকেরও খুব সখ এই হাতিয়ার তৈরিতে যোগ দিতে, তাকেই বরং দেখা যায় খুব মনোযোগ দিয়ে হাতিয়ার তৈরি দেখতে, এবং তা অনুকরণ করার চেষ্টা করতে। এভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখা আর নিজে করার চেষ্টাটি ইরেকটাসদের সক্ষমতা গড়ে ওঠার পেছনে বিরাট কাজ করেছে। এভাবেই বংশ পরম্পরায় ওরা একই রকম হাতিয়ার তৈরি করতে শিখেছে।

সুরুজ এই কাজে খুবই দক্ষ। আশেপাশের পাথরগুলো থেকে যুৎসই আয়তনের ও আকারের পাথর খুঁজে ওরা ওখানে জমা করে, যাতে যে কোন সময় ইচ্ছে হলেই কয়েকটি হাতিয়ার তৈরি করে ফেলা যায়। এর মধ্যে একটু বেশি শক্ত অপেক্ষাকৃত সরু মোটামুটি সিলিন্ডার আকৃতির কিছু পাথর যোগাড় করা থাকে যেগুলোকে হাতিয়ার তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অনেকটা হাতলবিহীন ধারালো হাতুড়ির মত। সুরুজ বাম হাতের ওপর হাতিয়ারে পরিণত করার পাথরটি মেলে ধরে, ডান হাতে মুঠো করে ধরা ধারালো হাতুড়িটি তার ওপর ঠুকতে থাকলো। সঠিক জায়গায় সঠিক কোণে তেরচা করে না ঠুকলে কোন ফল হতোনা। এখানেই সুরুজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাটি কাজে আসে। পাথরের ঠিক কোন জায়গায় ঠুকলে কাজ হবে সেটি বোঝা যায় তার গায়ে ইতোমধ্যে থাকা

ফাটলগুলো লক্ষ্য করে। সুরুজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে তাই করছিল। কখনো মাটিতে শোয়ানো থাকা একটি প্রশস্ত সমতল পাথরে ওপর হাতে ধরে রেখে তার ওপরই হাতুড়ি ঠুকছিলো সে। উদ্দেশ্য তার একটিই— ওই পাথরটিকে ধীরে ধীরে একদিকে চোখা ও ধারালো করে তুলতে হবে, সেই সঙ্গে গোটা পাথরটিও কিছুটা ছিমছাম হয়ে উঠছিলো।

সুরুজ ইতোমধ্যে যে সব হাতিয়ার বানিয়েছে তার অধিকাংশের ক্ষেত্রে বলা যায় এগুলো অনেকটা চোখের অশ্রু বিন্দুর আকৃতির। নানা ভাবে ব্যবহার হয় এগুলো— শিকারের সময় হাতে ছুঁড়ে মারলে আঘাত গুরুতর হতে পারে। তা ছাড়া কাছ থেকে হাত-কুঠারের মত ব্যবহৃত হয়— হাতল ছাড়া কুঠার। সুরুজ আর কিছু হাতিয়ার তৈরি করছিলো যেগুলোর ধারালো অংশকে সে এতটা চোখা করেনি বরং একটু লম্বাটে ধারালো অংশ তার— কাটা চেরায় ছুরি বা করাতের মত কাজ করবে। বানু আর কাজলকে নিয়ে সুরুজ যখন এসব তৈরি করতে বসে তখন মনে হয়না যে তারা শুধু একটি কর্তব্য কাজ করছে— বরং মনে হয় এও তাদের মধ্যে একটি আলাপ, একটি সৃজনশীল শিল্পকর্ম। ভাষার অভাবে মুখের যে আলাপ সীমাবদ্ধ, নিজেদের কিছুটা উন্নত মস্তিষ্ক যেন তার বিকল্প এনে দিয়েছে এই হাতিয়ার তৈরির দক্ষতার মাধ্যমে। অবশ্য সুরুজরা যে হাতিয়ার তৈরি করছে তা মোটেই আহামরি কিছু হয়নি— কোন রকম মসৃণতা বা ফিনিশিং এর নেই। সাধারণ পাথরের মধ্যে যদি পড়ে থাকে তখন চট্ করে কেউ বুঝতেও পারবেনা যে এগুলো যত্নে তৈরি করা হাতিয়ার। তবুও ওই নারিকোটমে এত রকম প্রাণীর মধ্যে শুধু এই প্রাণীরাই— ইরেকটাসরাই— বুদ্ধি দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করতে পারে।

সুরুজদের দল যখন শিকার করতে যায় তখন ওই তৈরি অস্ত্রগুলো ছুঁড়ে মেরে শিকারকে যতটা ঘায়েল করতে পারে সাধারণ কোন পাথর ছুঁড়ে তা পারতোনা। প্রায় প্রতিদিনই ছোটখাট শিকারে বেরুচ্ছে বালকের পরিবার। সেদিন প্রতিবেশী আর একটি পরিবারের সঙ্গে মিলে বড়সড় এক শিকারে গিয়েছিল ওরা। সম্প্রতি অনেক দিন খরার পর দু'এক পশলা বৃষ্টির কারণে সাভানার ঘাসে একটু সবুজের ছোঁয়া লেগেছে, এখানে যে দু'একটি ডোবার মত আছে তাতে কিছুটা পানিও জমেছে। তাই বেশ কিছু বড় জাতের হরিণের আনাগোনা এদিকে বেড়েছে। দলবদ্ধ বড় শিকারের সুযোগ বেড়েছে। ওরা হরিণের চারণ ক্ষেত্রের দিকে নীরবে এগিয়ে হরিণগুলোকে তিন দিক থেকে ঘেরাও করে হঠাৎ সমস্বরে বিকট আওয়াজ করে তাড়া করলো। হঠাৎ তাড়া খেয়ে ভ্যাবাচেকা খাওয়া হরিণগুলো দিকবিদিক দিশাহারা হয়ে নানা দিকে ছুটতে গিয়ে শিকারিদের কারো না কারো কাছে দিয়ে যাচ্ছিল। তখনই ওরা পাথর ছুঁড়ে এবং তাদের তৈরি পাথরের হাতিয়ার ছুঁড়ে তাদেরকে আহত করছিলো। সুযোগ পেলে খুব কাছে থেকে তাদের হাত-কুঠার দিয়ে তাদের মাথায় আঘাত করছে। এরপর ওরা বেশি

আহত দু'একটি হরিণের পেছনে ছুটেছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে আরো আহত করে কাবু করা না যাচ্ছে। আমাদের বালকও আরো দু'একজনের সঙ্গে মিলে এমনি একটি আহত হরিণকে তাড়া করেছিলো। সে কি ছোটা! ইরেকটাসরা তাড়াতাড়ি তরুণ হলেও এই বার বছর বয়সে বালককে নিতান্ত কিশোরই বলা যায়— দেহ ছিমছাম পাতলা, অন্যদের তুলনায় মুখের কচি ভাব স্পষ্ট। কিন্তু এ বয়সেই দ্রুতগামী শিকারের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অতি দ্রুত ছুটতে তার সক্ষমতা দেখার মত।

দ্রুত দৌড়াবার সক্ষমতা এসেছে পায়ের গঠন, তার পেশী, এবং বিশেষ করে পায়ের পাতার গোড়ালির ও আঙ্গুলের বিশেষ গঠনের ফলে। শিকার সাফল্যের অন্য দিকটি হলো ওই রকম দৌড়াবার সময়ও দেহের ব্যালেন্স ও চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একই জায়গার ওপর বজায় রাখতে পারা, যাতে করে সে দ্রুত চলমান হরিণের গতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবয়ব চোখের ওপর রাখতে পারে এবং এরকম চলমান অবস্থাতেই তাকে সঠিক জায়গায় আঘাত করতে পারে। এসব কঠিন কাজ। কানের অভ্যন্তর ভাগ ও উন্নত মস্তিষ্কের ফলে এমন ব্যালেন্স ও এমন দৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বালকের পরিবার আর তাদের সঙ্গী পরিবারের সেদিনের শিকারটি দারুণ হলো। শেষ পর্যন্ত দুটি ছোট হরিণ আর একটি বিশাল শূকর মেরে তারা ঘরে আনতে পেরেছে।

এগুলোকে এখন ছিলতে হবে কাটা-চেরা করতে হবে। তার আগে ওই হরিণ ওই শূকরকে ওরা বয়ে নিয়ে এলো বালকদের গুহার সামনে— কিছুটা গুহার আড়ালে। প্রত্যেকটিকে কয়েকজন মিলে যে ভাবে বয়ে আনলো তাতেই বোঝা গেল— শুধু একসঙ্গে বুদ্ধি করে শিকার করতেই তারা পাকা নয় পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে একসঙ্গে সামাজিক ভাবে কাজে হাত লাগিয়ে কেমন করে কঠিন কাজ করতে হয় সেটিও তাদের রপ্ত। সত্যিকার অর্থে আলাপ করার মত ভাষা নেই, কিন্তু যেটুকু পারে তাতেই তাদের মধ্যে এরকম কাজে বোঝাপড়ার অভাব হয়না। শিকার করা পশুগুলোকে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসাটি জরুরি কারণ মৃত শিকারের গন্ধে শিগ্‌গির হিংস্র প্রাণীদের আগমন হবে— অন্তত হায়েনা আর শকুনের যে হামলা হবে তা প্রায় নিশ্চিত।

পাথরের যে হাতিয়ার তারা তৈরি করেছে তা দিয়ে কোনরকমে চামড়া আলাদা করতে পারে। অনেকগুলো বড় ছুরি বা করাতের মত— মাংস কেটে নেয়ার কাজে আসে। তবে হাড়সহ মাংস কুপিয়ে কাটার জন্য ওরা তৈরি করে রেখেছে বেশ ভারী হাত-কুঠার— অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হাত-কুঠারের থেকে খুব ভিন্ন কিছু নয়। ইরেকটাসদের এসব পাথরের হাতিয়ারে কাটা-চেরার কাজ কোন রকমে চলে বটে কিন্তু হাতিয়ার হিসেবে এগুলো খুব দক্ষও নয় সুন্দরও নয়— শুধু কাজই চলে। কিন্তু এই হাতিয়ারই তাকে আশপাশের পুরো প্রাণীজগতের মধ্যে একটি অদ্ভুত অনন্যতা দিয়েছে। অবশ্য ইরেকটাসদের নিকট-জ্ঞাতি অন্য দু'একটি

মানব-সদৃশ প্রজাতিরও এই একই গুণ রয়েছে। ওদেরো কেউ কেউ বালকদের কাছাকাছি এলাকাতে থাকে।

শিকারের এলাকা থেকে বালকদের বাড়িটিই অপেক্ষাকৃত কাছে— তাই সব কিছু এখানেই নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের হাতিয়ার দিয়েই কাজ চলছে। তবে কাজের লোক অনেক। শিকারের সময় অন্যান্য সঙ্গী পরিবারের যারা ছিল তারা তো আছেই, যারা ও সময় যার যার ঘরে ছিল তাদেরও অনেকে এসেছে মাংস কেটে কুটে নিতে সাহায্য করতে এবং যা পারে এখানেই খেয়ে নিতে। শিকারি সংগ্রাহকদের জীবনের এইই বৈশিষ্ট— যখন শিকার মিলেছে তখন সবাই মিলে যত পার খেয়ে নাও, অন্য সময় প্রায় অভুক্ত থাক। অবশ্য গাছ গাছড়া থেকে সংগ্রহ করে যা আনে তাতে অন্য সময়টা কিছুটা পার করা যায়— বন্য ফল-মূল শাক-পাতা, এগুলো সব সময় কিছু যোগাড় করা যায়, তা ছাড়া সঠিক মৌসুমে বন্য শস্যও গাছ থেকে ঝেড়ে নেয়া যায় ওগুলো নিজে নিজে মাটিতে পড়ে নষ্ট হবার আগেই। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় এদিক থেকে ইরেকটাসদের সুবিধা হলো ওরা সব ধরনের খাবারই খেতে পারে, এবং খেতে ভালও বাসে। শুধু মাংস, বা শুধু উদ্ভিদ খেতে হবে অন্যান্যদের মত তাদের এই গোঁ নেই— তাদের শরীর বিচিত্র রকম খাবার হজম করতে পারে।

কিন্তু আজ এসব চিন্তা নেই— এই পরিবারগুলো আজ পেট ভরে মাংস খাবে। সদ্য শিকার করা তাজা মাংস কাঁচা খেতে ওদের আপত্তি নেই— বিশেষ করে মগজ, কলজে, ফুসফুস, কিডনি এসব নরম অংশ, তাজা রক্ত এসব কাঁচা খেতে তো ভালই লাগে। বড়রা তো বটেই ছোটরাও কাড়াকাড়ি করে এগুলো খেলো। মাথার মগজ এবং হাড়ের ভেতরের মজ্জা খেতে ওদের বিশেষ ভাবে ভাল লাগে। তবে সেগুলো বের করে খাওয়া বেশ কষ্ট। এ জন্য খুলি বা হাড় ভাঙ্গতে বিশেষ রকম ভারী হাত-কুঠারও তারা বানিয়েছে। সেটি দিয়ে সুরুজ হাড় ভেঙ্গে ফেলে তার থেকে মজ্জা বের করে খাওয়ার জন্য ছেলে মেয়েদেরকে দেয়, নিজেও খায়। তবে আজকের ভোজনটি এক্ষুণি শেষ হয়ে যাবেনা।

ওদের ভাগ্য ভাল যে বালকদের বাড়িতে ছোট একটুকু আগুন সংরক্ষিত ছিল। দশ বারো দিন আগে জঙ্গলে শুকনা ঘাসে ও ঝোপে দাবানল সৃষ্টি হয়েছিলো। এমনটি মাঝে মাঝে হয় বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে। এরকম যখন হয় এলাকার সব পশুপাখি ভয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু তাদের গুহার বেশি কাছে না হলে ইরেকটাসরা ভয় পায়না, বরং এর সুযোগ নেয়। তাই এবারের দাবানল থেকে আগুন জ্বালিয়ে এনে যত্ন করে গুহায় সেটি ছোট আকারে জ্বালিয়ে রেখেছিলো। মাঝখানে কিছু বৃষ্টি হলেও ওরা খুবই যত্নে রেখে ওই আগুনকে নিভতে দেয়নি। এভাবে ছোট একটা আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারলে তা নানা কাজে লাগে। রাতের বেলাতেও এর আলোতে গুহার ভেতরে কাজকর্ম করতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হলো গুহার সামনে আগুন জ্বালিয়ে রেখে রাতে হিংস্র পশু থেকে নিশ্চিন্ত

থাকতে পারে। কখনো কখনো শিকারের সময় পশুদের ভয় দেখাতেও আগুন ব্যবহার করা যায়। শুধু বেশি দিন জ্বালিয়ে রাখাটাই সমস্যা। নিজেরা আগুন সৃষ্টি করতে পারেনা বলে সময় সময় দাবানলের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আগুনটি তারা সব সময় ব্যবহারে পায়না। তবে খুব চেষ্টা করে দাবানল ইত্যাদিতে পাওয়া আগুনকে গুহার এক কোনে একটি হেঁশেলের মত জায়গায় লাকড়ি-ডাল-শুকনা পাতা ইত্যাদি সুন্দর করে সাজিয়ে ধিকি ধিকি জ্বলার মত করে সংরক্ষণ করতে। সময়মত ওখান থেকে আগুন নিয়ে নানা কাজে তখন লাগানো যায়। ওই যে হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহার যেমন তাদেরকে বাকি সব প্রাণী থেকে বিশিষ্ট করেছে, এই আগুনের ব্যবহারও তাই করেছে।

আজ অবশ্য আগুনের বিশেষ ব্যবহার রয়েছে কাঁচা মাংস তরতাজা বেশ কিছু খাওয়ার পর বাকি মাংস আগুনে ঝলসাবার কাজে। এটি তারা তখনও খাবে, আবার কিছু পরের জন্য রেখেও দেবে। খোলা আগুনে মাংস ঝলসে নেয়াটাই কাজ। তাতে শক্ত মাংস নরম হয়, স্বাদ বদলানো যায়— ঝলসানো মাংসের স্বাদের কোন তুলনা হয়না। অন্যান্য পরিবার থেকে যারা এসেছে তারা সবাই কিছু কিছু ঝলসানো মাংস সঙ্গেও নিয়ে যাবে। এত সব কাজের মধ্যে সবাইকে ছোট বালিকা শিশু দুজন দিশা আর মিশাকে সামলে রাখতে হচ্ছে। ওই ঝলসানো আগুনের কাছে দাপাদাপি করতে গিয়ে তাদের না আবার আগুনের আঁচ লাগে।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে, গোছানোর কাজ কাল সকালের জন্য তুলে রেখে ওরা যার যার পরিবারের গুহায় চলে যায়। পরিবার সদস্যের তুলনায় বালকদের স্বল্প পরিসরের গুহা, এর মধ্যেই তাদেরকে গাদাগাদি করে ঘুমাতে হয়। আগুন না থাকলেও দিনের বেলায় সামনের দিকটায় অন্তত যত আলো ঢোকে তাতে ভেতরে কাজ করতে অসুবিধা হয়না। রাতের বেলা অবশ্য ভিন্ন কথা। এখন আগুন আছে বলে রাতেও কিছু আলো পাওয়া যাচ্ছে। গুহার ভেতরটা যে খুব পরিস্কার বা গোছালো তা বলা যাবেনা— পাথরের নানা হাতিয়ার ছড়ানো ছিটানো তো আছেই— সে সঙ্গে হাতিয়ার হিসেবে হাড়, গাছের ডাল ভাঙ্গা ইত্যাদিও রয়েছে— কোন রকমে অস্ত্র বা হাতিয়ারের মত করে নেয়া, খুব বেশি কুশলতার পরিচয় নেই তাতে। সে সঙ্গে রয়েছে পশুর শুকনা চামড়া। মজ্জা বের করার জন্য ভাঙ্গা হাড়ও প্রচুর ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। এগুলো আবর্জনা মাত্র, তবে চামড়াগুলোর মনে হয় কিছু ব্যবহার আছে, ঠান্ডা পড়লে গায়ে দেয়ার জন্য— অথবা বাইরে রোদবৃষ্টির থেকে রক্ষা করার আচ্ছাদন হিসেবে। অবশ্য না তাকে পোষাকের মত রূপ দেবার কোন চেষ্টা আছে, না তাঁবুর মত— সব ব্যবহার করা হয় কিছুটা যেনতেন রূপে। গুহার ভেতর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের অথবা কাটা চেরার জন্য ব্যবহারের পাথরের হাতিয়ার প্রচুর থাকলেও শস্য অথবা অন্য কিছু গুড়ো করার মত কোন হাতিয়ার দেখা যায় না। শস্য তারা এমনিতেই খায়— সাধারণ পাথরে ঘষে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে চিবিয়ে খেতে অভ্যস্ত। গুহার মধ্যে সব

চেয়ে চোখে পড়ার জায়গাটি হলো কোনায় একটুখানি হেঁশেলের মত জায়গা। যখন আগুন সংরক্ষণ সম্ভব হয় তখন এখানটিতেই তা করা হয়। তা ছাড়া মাংস ঝলসানোর জন্য চুলার মত করে আগুন বড় করেও নেয়া হয় এখানে। ছোটখাট শিকারের মাংস এখানেই ঝলসানো যায়। সুযোগ হলে এখানে পাথর গরম করে খুব উত্তপ্ত করে নেয় ওরা, তারপর ওই উত্তপ্ত পাথরের ওপর শস্য দানা রেখে এক রকম ভেজে খেতে পারলে আলাদা মজা হয়। অবশ্য এ ভাবে খাওয়া দাওয়ায় আগুনের ব্যবহার বালকদের জন্য একটি বিলাসিতার মত। কখনো কখনো সম্ভব হয়, সব সময় হয়না।

বালককে যে এখনো পূর্ণবয়স্ক বলা যায়না তার কারণ সে একজন ইরেকটাস। অন্য কোন এইপ যদি সে হতো বহুদিন ধরেই তাকে পূর্ণবয়স্ক বলে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু ইরেকটাসদের মধ্যে এমন একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখা দিয়েছে যা আর কোন এইপে নেই মানব-সদৃশ অন্য কারো মধ্যে নেই। এটি হলো দীর্ঘ শৈশব ও কৈশোর। বালকের বয়স এখন বার বছরের মত হলেও সব দিক থেকেই সে এখনো কিশোর, তার শরীর এখনো বাড়ন্ত— আরো কয়েক বছর তাই থাকবে। মানসিক পরিপক্কতার দিক থেকেও অনেকটা সে রকমই। এই পুরোটা সময় সে যে একেবারে অকর্মা ছিল তা কিন্তু নয়। যেমন সেদিনের শিকারের সময়ও সে হরিণের পেছনে ছুটেছে, অস্ত্র ছুঁড়েছে। কিন্তু এগুলো সবই এখানো তার শিক্ষার অংশ— পরিবারের বড়রা ওই ছোটবেলা থেকে তাকে শেখাচ্ছে। সে যখন বড় ভাই কাজলের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিয়েছে, কুস্তি করেছে, সবই করেছে খেলাচ্ছলে। এরকম খেলতে খেলতেই সে নানা লক্ষ্য বস্তুর দিকে পাথর ছুঁড়েছে টার্গেট প্র্যাকটিস করার জন্য। ওরা শিকার-শিকার খেলেছে। যখন শিকার হচ্ছেনা তখনো সে দ্রুত চলমান হরিণের দিকে দৌড়ে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে দেখেছে দৌড়ের অবস্থাতেও লক্ষ্য ভেদ করতে পারে কিনা। এসব ব্যাপারে বড় ভাই কাজল ছাড়া বাবা সুরুজও সব সময় তাকে নিজেদের কাজের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে যা প্রধানত ট্রেনিং দেবার মত। এসব খেলা ও প্র্যাকটিস কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি— ছেলেবেলার শিক্ষা। অন্য সব মানব-সদৃশদের মধ্যে এটি ব্যতিক্রমী।

আসলে ব্যতিক্রমী বিষয়টি হলো ইরেকটাসের শিশুরা নবজাতক থেকে শুরু করে বেশ খানিকটা বয়স পর্যন্ত বাবা-মায়ের ওপর এবং পুরো পরিবারের ওপর খুব নির্ভরশীল থাকে। দীর্ঘ শৈশব ও বাল্যকাল তাই এরকম নির্ভরশীলতার সময়— যখন ওরা কমবেশি অসহায় থাকে। অন্য এইপদের ক্ষেত্রে কী দেখছি? ওদের ক্ষেত্রে জন্মের পর থেকেই শিশুর নড়াচড়ার এমন কি ছোটাছুটির যথেষ্ট সক্ষমতা থাকে, নিজেরাই এসে নিজের উদ্যোগে মায়ের দুধ খেতে পারে, প্রয়োজনে মাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে এবং ওই অবস্থায় মা স্বচ্ছন্দে সব কাজ এমনকি ছুটাছুটি করতে পারে। ইরেকটাস বা তাদের সমধর্মী মানব-সদৃশরা

এর ব্যতিক্রম। এদের শিশুরা অসহায়— অনেক দিন ধরে তাদের যত্ন নিতে হয়। সুরুজ আর বানুর শত ব্যস্ততার মধ্যেও ওই অসহায় শিশুদের দেখাশোনা করা, তাদেরকে শেখানো ইত্যাদি একটি বড় কাজ হয়ে রয়েছে।

অসহায়দের যত্ন নেবার ব্যাপারটি ইরেকটাস শিশুদের ক্ষেত্রেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। বয়স্ক অসমর্থদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটিও ইরেকটাসদের মধ্যে খুব অনন্য ব্যাপার। বালকদের গুহা থেকে খুব বেশি দূরে নয় এমন একটি জায়গায় বাস করে সুরুজের এক চাচাতো ভাইয়ের পরিবার। ভাইয়ের স্ত্রী তরুণী বয়সেই দারুণ ভাবে অসুস্থ— তা আজ বছরের ওপরে হয়ে গেলো। এটি একটি গুরুতর হাড়ের অসুখ যার ফলে তার পক্ষে তেমন কোন নড়াচড়া করা সম্ভবই হয়না— শিকার বা খাবার সংগ্রহ করা দূরে থাক, বাড়িতেও অন্য কোন কাজে আসা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এমনকি এনে দেয়া খাবার নিজে ঠিক মত তুলে খাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয়না। কিন্তু যেহেতু পরিবারের মধ্যে আছে তাই এত দিন ধরে বেঁচে আছে— কারণ পরিবারের সবাই তার সেবাযত্ন করছে, তাকে খাইয়ে দিচ্ছে। অন্যান্য এইপের ক্ষেত্রে এমনটি হবার সম্ভাবনা নেই। তবে তাদের সহায়তা দেবার ভঙ্গিটি দেখে মনে হয় এটি অনেকটা যান্ত্রিক, এটি খুব দরদ বা আবেগ তাড়িত বলে মনে হয়না। এমনটি মনে হবার কারণ শিকার করতে গিয়ে বা নানা দলের মধ্যে মারামারি-যুদ্ধের সময় নিজের দলেরও যারা আহত হয় তাদেরকে চিন্তা ভাবনা করে উদ্ধার করার, যত্ন নেবার বা তাদের জন্য দু:খ করার কোন আবেগ অভিব্যক্তি ওদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায়না। তাই ওই আত্মীয়াকে খাবার দাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখাটি হয়তো সে ওখানে ওদের মধ্যে সব সময় আছে বলেই ঘটছে— খুব সুচিন্তিত ভাবে ঘটছে তা বলা যাবেনা। তবু এখানে এমন একটি মানবিকতা রয়েছে যা ইরেকটাসরাই প্রথম দেখাচ্ছে।

ওই যে মারামারি বা যুদ্ধের কথা বলা হলো সেটি কিন্তু ইরেকটাসদের মধ্যে বরং বেশ একটু বেশিই দেখা যায়। বালকদের পরিবার সহ অন্য যারা আত্মীয় পরিবার কাছাকাছি থাকে ওদের মধ্যে সাধারণ মারামারি ও একেবারে কম হয়না। ওরা সব এক দলের। কিন্তু বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রায়শ যে দলবদ্ধ মারামারি দেখা যায়, তাতে গুরুতর আহত ও নিহত হবার ঘটনা যথেষ্ট ঘটে। সেদিক থেকে বলতে গেলে কাজল, বালক এসব তরুণদেরকে খুব দুর্ভাগা বলে মনে হয়। তাদের জীবন খুব বেশি হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে আবদ্ধ। প্রায় প্রতিদিন তাদেরকে কাটাতে হয় শিকারের আবহে। শিকারের ভঙ্গিটিও খুব নিষ্ঠুর— ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলো এত স্থূল যে দূর থেকে প্রাণীকে কিছু আহত হয়তো করা যায়, কিন্তু পুরো ঘায়েল করতে হলে হাত-কুঠার দিয়ে সামনা সামনি তার সঙ্গে রক্তারক্তি করে লড়তে হয়। হয়তো সেখান থেকে ইরেকটাসদের এমনি যুদ্ধে অভ্যস্ত হওয়া— যা কিনা নিজেদের মধ্যেও নিষ্ঠুর হানাহানির নিত্যকার অভ্যাসে পরিণত

করেছে। এর অনেকটাই স্ত্রী ইরেকটাসদের ওপর দখল প্রতিষ্ঠার জন্য এক পুরুষের সঙ্গে অন্য পুরুষের মারামারি। পাথর আর পাথরের হাত-কুঠার প্রয়োগ সহ এই মারামারিতে নিষ্ঠুরতার কোন সীমা থাকেনা। তবে ভাগ্য ভাল যে ইরেকটাসদের মাথার খুলি অদ্ভুত রকমের পুরু ও শক্ত। হাত-কুঠারের আঘাতে শরীরের অন্যান্য অংশ সহজে আহত হলেও মাথা সহজে ফাটেনা বা মগজে আঘাত মারাত্মক হয়না।

ইরেকটাসদের জীবন যে নিরাপদ নয় তা বলাই বাহুল্য। হিংস্র প্রাণী, শিকার করতে গিয়ে আহত হওয়া, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে আহত হওয়া এগুলো প্রচুর ঘটে— এবং গুরুতর আহতরা অনিবার্যভাবে মৃত্যুর দিকে চলে যায়। আর নানা রকম রোগ তো আছেই। তাই স্বাভাবিক পরিণত বয়সে মৃত্যু বরণ করার সুযোগ অধিকাংশ ইরেকটাসের হয়না। আমাদের চেনা পরিবারটিতে সাম্প্রতিককালে এরকম মৃত্যু বেশ কয়েকটি ঘটেছে। জন্মের সময় শিশু মৃত্যু হয়েছে বানুর বেশ কয়েকবার। ইরেকটাসের সন্তান জন্ম বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার— জন্মের সময়েই অনেকে মারা যায়। অন্যান্য এইপদের তুলনায় এটি বেশি হবার কারণ সোজা খাড়া চলতে গিয়ে নিম্নাঙ্গের হাঁড়ের বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে সন্তান জন্মের পথটি সংকুচিত হয়েছে অথচ মস্তিষ্কের আকার এইপের তুলনায় অনেক বড় হয়েছে। তবুও রক্ষা যে জন্মের সময় মস্তিষ্ক অপরিপূর্ণ ও ছোট থাকে— দীর্ঘ বাল্যকালে ধীরে ধীরে সেটি আরো বড় হয়।

বালকদের পরিবারটিতে অবশ্য শিশু-মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে বেশ ক'জন শিশু বড় হয়ে ওঠেছে— কাজল, বালক, দিশা, মিশা। শিশু কালে মা-বাবার যত্নটি এজন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বেশ খানিকটা বড় না হওয়া পর্যন্ত এদেরকে কোলে কোলে নিয়ে ঘোরাফেরা করতে হয়েছে বানুকে। তারপরও যথেষ্ট বড় না হওয়া পর্যন্ত এ যত্ন অব্যাহত ছিল। শিকার, যুদ্ধ ইত্যাদিতে এত বিপদের ঝুঁকির মধ্যেও ওরা বড় হয়েছে। আমাদের গল্পটিও তাই বিয়োগান্ত হওয়া এড়াতে পারেনি। বালক শেষ পর্যন্ত কৈশোর কাটিয়ে তারুণ্যে পৌছতে পারেনি— তার আগেই ওর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুটি হয়েছে অসুখে; বেশ কিছুদিন ধরে ওর দাঁতের মাড়িতে প্রদাহ দেখা দিয়েছিলো। এমন প্রদাহ হওয়াটি খুব অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়; কিন্তু বালকের ক্ষেত্রে এটি তার রক্তে সংক্রমিত হয়ে ব্লাড পয়জনিঙের কারণ হয়েছিল। বেশ কিছুদিন ভুগে শেষ পর্যন্ত বালক মারা গিয়েছে।

ভাবতে ইচ্ছে করে বালকের মৃত্যুতে বাবা সুরুজ ও মা বানুর মনের অবস্থা কী হয়েছিলো? বড় ভাই কাজল বা ছোট দু'বোন দিশা মিশাও কি তার জন্য শোকার্ত হয়েছিলো কিনা। এটি বোঝা শক্ত— কারণ ইরেকটাসদের চোখে মুখে আবেগের প্রকাশ খুব গৌণ। হয়তো তাদের মস্তিষ্ক শোকের বা অন্য আবেগের উপযুক্তই নয়। নিজের ছেলের এত বড় হয়ে করুণ মৃত্যু এটি যে কোন মায়ের জন্য কঠিন অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই ইরেকটাস মা কি তার ছেলের মৃতদেহ সামনে

রেখে কেঁদেছিলো? তার জন্য অন্তত কিছুকাল পৃথিবী কি অসার হয়ে গিয়েছিলো? খুব সম্ভব নয়। কারণ ভাষা তাদের ছিলনা— ভাষার সঙ্গে চিন্তার ও আবেগের যে উচ্চ পারঙ্গমতা আসে তার সুযোগ ওদের ছিলনা। বালক মারা যাওয়ার পর পরিবারে তাকে নিয়ে কোন কথা হয়নি। পাশের পরিবার থেকে কেউ সমবেদনা জানতে আসেনি। ওই ১৫ লক্ষ বছর আগের ইরেকটাস মানুষ অতটা মানুষ এখনো হয়ে ওঠতে পারেনি।

*   *   *

১৯৮৪ সালে কেনিয়ার নারিকোটোম নামক জায়গায় একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ ফসিল কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে— গবেষণার সর্বশেষ ফলাফল অনুযায়ী যা ১২ বছর বয়সী এক মানব সদৃশ বালকের। তার জীবনকাল মনে হচ্ছে প্রায় ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার বছর আগের। কেনিয়া, সুদান ও ইথিওপিয়ার সংযোগ স্থলে তুর্কানা হ্রদের পারে ওই জায়গায় আরো কিছু কিছু ফসিলের অংশ বিশেষ সময় সময় পাওয়া গিয়েছে— যার থেকে মানব-সদৃশ একটি প্রজাতির ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যাকে বৈজ্ঞানিক নাম দেয়া হয়েছে— *হোমো ইরেকটাস*। আমাদের মত মানুষের সঙ্গে এর সাদৃশ্যটি এত বেশি যে তাকে 'হোমো' অর্থাৎ 'আমরা' গণভুক্ত করা হয়েছে। আর খাড়া দেহ বলে ইরেকটাস প্রজাতি। এ প্রজাতি সম্পর্কে সব চেয়ে অধিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে নারিকোটোমের ওই পূর্ণাঙ্গ ফসিল থেকে— যার নামই হয়ে পড়েছে নারিকোটোমের বালক। শারীরিক দিক থেকে হোমো ইরেকটাসরা আধুনিক মানুষের খুব কাছাকাছি— যদিও মস্তিষ্ক এখনো আমাদের তুলনায় বেশ কিছু ছোট, তাই চিন্তার সক্ষমতার দিক থেকে, ভাষার দিক থেকে মোটেও সমকক্ষ ছিলনা। তবুও অনেকটা বুদ্ধি নির্ভর ভাবে শিকারি-সংগ্রাহকের জীবনের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠেছিল ওরা। ফসিল সাক্ষ্য থেকে দেখা গেছে যে আফ্রিকার ওই অঞ্চলে ২০ লক্ষাধিক বছর আগে থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের টানাপোড়েনে ওখানে বেশ কয়েকটি অগ্রসর মানব-সদৃশ প্রজাতির উদ্ভব হয়েছিলো। সেগুলোর মধ্যে ইরেকটাস প্রজাতিটিই অনেক দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিলো।

সেই বিশ লক্ষ বছর আগে পূর্ব আফ্রিকায় উদ্ভব হয়ে ১৭-১৮ লক্ষ বছর আগে এদের উত্তসূরীরা আফ্রিকা থেকে ধীরে ধীরে এক দিকে আজকের এশিয়া-ইউরোপ সংযোগ স্থল জর্জিয়া এবং অন্য দিকে মধ্য ও পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো— যার প্রমাণ জর্জিয়াতে (জর্জিয়া মানুষ), ইন্দোনেশিয়ার জাভাতে (জাভা মানুষ), চীনের বেইজিংয়ে (পিকিং মানুষ) পাওয়া বিখ্যাত সব ফসিল থেকে। এমনকি মাত্র ত্রিশ হাজার বছর আগেরও হোমো ইরেকটাসের ফসিল জাভাতে পাওয়া গিয়েছে। ইতোমধ্যে আফ্রিকার প্রায় কাছাকাছি জায়গায় উদ্ভব হওয়া আমাদের প্রজাতির মানুষ হোমো সেপিয়েন্সরাও আফ্রিকা থেকে ধীরে ধীরে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, ভারত ও পূর্ব এশিয়ায়, এমন কি অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো। এতে মনে হচ্ছে হাজার তিরিশেক বছর আগে অন্তত ইন্দোনেশিয়ার জাভাতে হোমো ইরেকটাস আদি মানব এবং হোমো সেপিয়েন্স আধুনিক মানব একই সময় কাছাকাছি জায়গায় কয়েক হাজার বছর বাস করেছে। যদিও নারিকোটোমের বালকের কাল থেকে ওই শেষের ইরেকটাসদের সময় ১৫ লক্ষ বছর পরের এবং এর মধ্যে মস্তিষ্ক, দেহ গঠন ইত্যাদিতে ইরেকটাসরা হয়তো যথেষ্ট

পরিবর্তিতও হয়েছিলো তবুও উভয়ে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মোটা দাগে একই রকম ছিল— যারা এর পর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইরেকটাসদের সম্পর্কে সব চেয়ে বেশি তথ্য আমরা নারিকোটমের বালকের ফসিল থেকেই পেয়েছি আর পেয়েছি দীর্ঘ প্রায় বিশ লক্ষ বছরের মধ্যে তাদের তৈরি পাথরের যে সব প্রচুর হাতিয়ার পুরা-তত্ত্ববিদরা আবিষ্কার করেছেন তার থেকে।

এই অত্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও ইরেকটাসদের তৈরি পাথরের হাতিয়ারে খুব বড় ধরনের কোন উন্নয়ন আসেনি— তাদের কুশলতার ও প্রযুক্তি চিন্তার সীমাবদ্ধতাটি বরাবর থেকেই গেছে। এর থেকে উন্নত মানের হাতিয়ার তৈরি করেছে তাদের সময়কালের মধ্যেই অন্য প্রজাতির মানুষ যাদের মস্তিষ্ক ও সক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে উন্নত ছিল। ইরেকটাসদের নিজেদের মধ্যে মারামারি-খুনাখুনির আধিক্যটি বোঝা গেছে ওদের অস্ত্রের দ্বারা ভয়াবহ ভাবে আহত-নিহত হবার স্পষ্ট চিহ্ন সহ প্রচুর ইরেকটাস ফসিল অংশ পাওয়াতে।

একটি পূর্ণবয়স্ক ইরেকটাস ফসিলে হাইপার ভিটামিনোসি নামের একটি হাড়ের অসুখ লক্ষ্য করা গেছে এবং বোঝা যাচ্ছে যে গুরুতর এই অসুখ নিয়েই রুগী অন্তত কয়েক মাস বেঁচে ছিলো। এই অসুখের ওই পর্যায়ে অন্যের সেবাযত্ন, খাইয়ে দেয়া ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব ছিলনা। সেখান থেকে আমরা ইরেকটাসের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক মানবিকতা ছিল বলেও ধারণা করতে পারছি। যদিও বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে অন্যের মন বোঝা, অতীত-ভবিষ্যতের চিন্তা করতে পারা, এবং আনন্দ বা শোকের আবেগে আপ্লুত হবার মত সূক্ষ্ম অনুভূতির অভাব ছিল।

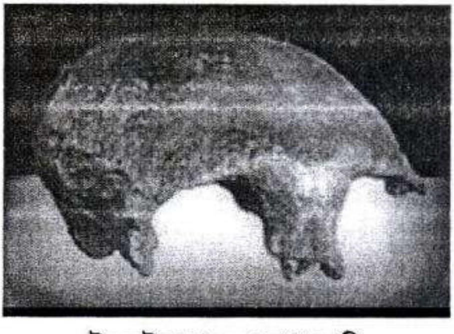

ইরেকটাস মানুষের মাথার খুলি

নারিকোটামের বালকের
বিন্যাসকৃত ফসিল

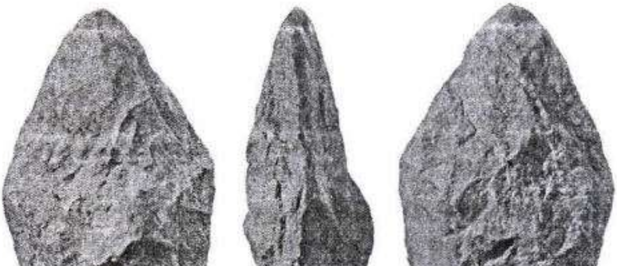

ইরেকটাস মানুষের হাতিয়ার

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লোম্বোস গুহার সাজুনি ঃ ৭০ হাজার বছর আগে

সাজতে ভালবাসে বলেই সে সাজুনি। শুধু দেহের সাজে আর অলঙ্কারে নয়, হাতিয়ারের যে নান্দনিক ফিনিশিং তারা দেয় তাতেই বোঝা যায় যে এরা একেবারেই আমাদের প্রজাতির মানুষ শুধু নয়, আমাদের সংস্কৃতিরও মানুষ।

জায়গাটি দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘেঁষে। সাজুনির পরিবার এখানকার নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ওদের যাযাবর জীবন— শিকার যখন যেদিকে ভাল পাওয়া যায় সেদিকেই ওরা যায়। এক এক সময় বেশ ক'দিনের জন্য আশ্রয় নেয় কোন গুহায়। ওভাবে ব্লোম্বোস গুহায় কাটিয়েছে অনেক দিন। আসলে বহুদিন পর পর ফিরেও এসেছে এ গুহায়। এই যে ঘুরে বেড়ানো তা কিন্তু শুধু নিজের পরিবার নিয়ে নয়, বেশ কয়েকটি পরিবারের এক সঙ্গে ৩০-৪০ জনের একটি দল। পরিবারগুলো আত্মীয়তায় পরস্পর সম্পর্কিত, এক সঙ্গে শিকারের খোঁজে ঘোরে, যখন যেখানে থাকে পরস্পরের কাছাকাছি জায়গায় আশ্রয় খুঁজে নেয়।

এমন বেশ কিছু দল এ অঞ্চলে রয়েছে— ওরা সেপিয়েন্স মানুষ— অর্থাৎ আমাদের মতই মানুষ। আগে যে ইরেকটাস প্রভৃতি নানা মানব-সদৃশরাও ছিল তাদেরই একটি বিবর্তিত হয়ে এই আফ্রিকাতেই সেপিয়েন্সরা উদ্ভূত হয়েছিলো আরো লাখ খানেক বছর আগে। সাজুনিকে এখনো বয়সে তরুণীই বলা যায়, যদিও এই পরিবারে বৌ হিসেবে এসেছে তাও বছর দশেক হয়ে গেলো। ওর মুখের দিকে যদি তাকাই মুখমণ্ডল, চোয়াল, থুতনি, সব আধুনিক মানুষের মত। সব চেয়ে বড় কথা ওদের মাথার খুলিটা আজকের আমাদের মতই বেশ সুগোল ও বড় যার কারণ মস্তিষ্কের বড় আকার। বড় মস্তিষ্কের বুদ্ধির গুণেই ওরা আর মানব-সদৃশ নয়, আমাদের মতই মানুষ।

মোটামুটি এই এলাকায় বছরের পর বছর ধরে ঘুরে বেড়ানো দশ বারটি দলের মধ্যে এক ধরনের খুব দূর সম্পর্কের জানাশোনা আছে। তবে দৈনন্দিন শিকার বা ঘুরে বেড়াবার সময়, কিংবা গুহায় বসতের সময় ওরা ওই নিজেদের

৩০-৪০ জনের দলের মধ্যেই থাকে, অন্য কোন কারো সঙ্গে দেখা হয়না। তবে বছরে দু'তিনটা সময় অবশ্য এলাকার সব দল নির্দিষ্ট একটি জায়গায় একত্র হবার চেষ্টা করে— এই যেমন বসন্ত মেলার সময়। সমুদ্রের তীরে খোলা জায়গায় ও সময় তারা বেশ কয়েকটা দিন এক সঙ্গে কাটায়— ওখানে যে যেমনটি পারে লতাপাতা পশু চামড়া ইত্যাদি দিয়ে সাময়িক আশ্রয় আপাতত তৈরি করে নেয়। ও সময় বড় শিকারের চিন্তা তারা করেনা, কারণ আগে থেকেই ফলমূল ইত্যাদি বেশ কিছু জমা করে রাখে। তবে ছোটখাট শিকার, সমুদ্রে মাছ ধরা এও চলে অনেকটা ফুর্তি করে, কিছুটা দূরের মানুষ বা নূতন পরিচয় হওয়া মানুষদেরকে চমৎকৃত করার জন্য। এই বসন্ত মেলাটাই তাদের আনন্দের জন্য করা— তিন চারশ মানুষ এ ভাবে এক জায়গায় একত্র হওয়াটাই একটি বিরল ঘটনা।

এ সময় সেখানে চলে পুরানো পরিচিতদের সঙ্গে পুনর্মিলন; নতুনদের সঙ্গে পরিচয় হওয়া; সবাই মিলে গান, নাচ, ফুর্তি। সাজুনির সঙ্গে তার বরের দেখা হয়েছিলো এমনি একটি বসন্ত মেলায়— কয়েক জন স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে মিলে সমুদ্র থেকে ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে। সেই থেকে নিজেদের মধ্যে একান্তে কথা, পরিবারগুলোর মধ্যে কথা, তারপর ওই মেলার ক'দিনেই বিয়ে। মেলা শেষে সে বরের পরিবারের সঙ্গে চলে এসেছিলো এই ব্রোম্বোস গুহায়। ওর বরের নাম সাজু। না, সাজুর বৌ বলে তার নাম সাজুনি হয়নি, ওর বাবা-মাই তাকে সাজুনি নাম দিয়েছিলো সাজ-গোজের দিকে তার একটু অতিরিক্ত মনোযোগের কারণে। সাজুর দুই ছোট ভাই ওর সঙ্গেই এই একান্নবর্তী পরিবারে থাকে। তাদের বিয়েও এ ভাবে বসন্ত মেলায় হয়েছে। সাজুর দুটি মেয়ে এখন সাত আর তিন বছরের। ভাইয়ের ছেলেটির বয়সও তিন বছর। এ পরিবারে আরো মোট চারটি সন্তান জন্মের পর ছোট্ট শিশু থাকতেই মারা গেছে। ওদের মধ্যে একজনের কবর এই ব্রোম্বোস গুহার সঙ্গে লাগানো আর একটি ছোট্ট গুহায়, যেখানে সাজুদের বাবার কবরও রয়েছে। অন্যদের মৃত্যু অবশ্য তাদের ঘোরাঘুরির অন্য পর্যায়ে হয়েছে বলে তাদের কবরগুলোও ভিন্ন জায়গায়। কবর দেয়ার এই অভ্যাসও ওদেরকে মানব-সদৃশদের থেকে আলাদা করছে।

ওই যে বসন্ত মেলা, বিয়েশাদি, আনন্দ করা ইত্যাদি ছাড়াও তার আর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে— সেটি হলো পণ্য বিনিময়। ওদের সবার কাছে সব কিছু সহজলভ্য নয়। যেমন যারা সমুদ্র ঘেঁষে ঘোরাঘুরি করে তাদের কাছে যুৎসই বড় ঝিনুকের খোল, পুঁতির দানার মত ছোট ছোট শামুক ইত্যাদির সংগ্রহ গড়ে ওঠে তাড়াতাড়ি। ওরা এর কিছু কিছু বিনিময় করে অন্যদের সঙ্গে— হয়তো বিশেষ কিছু হাতিয়ারের সঙ্গে। আমাদের সাজুনির চোখ কিন্তু থাকে ওই শামুকের পুঁতি আর ঝিনুকের খোলের ওপর। এজন্য বর সাজু আর দেবর ও তাদের স্ত্রীদেরকে সে খুব উৎসাহিত করতো কিছু বাড়তি বাহারি হাতিয়ার তৈরি করে রাখতে মেলার আগে আগে— নিজেও কম করতোনা। এ সবকে অলঙ্কারের সঙ্গে বিনিময় করা যাবে।

দুই মেয়ের যত্ন নেয়া, তাদেরকে এটা সেটা শেখানো, বড় শিকারে অংশ না নিলেও সংসারের জন্য নানা রকম খাবার সংগ্রহ করা, সে খাবার রান্না বা অন্য ভাবে উপযুক্ত করে নেয়া, এসব কাজে সাজুনির নিশ্বাস ফেলার সময় সাধারণত হয় না। এর মধ্যেই ফাঁকে ফাঁকে সে তার আসল আনন্দের আয়োজনটুকু করে— মেলা থেকে পছন্দের জিনিস আনতে বিনিময় সম্ভার তৈরি তারই একটি। মেলায় সাজুনির পছন্দ পুঁতির মত ছোট ছোট শামুক আর বড় রূপালী ঝিনুকের খোলগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরে সাজুনি ওগুলোর ওপর অনেক কাজ করে। ওই ছোট শামুকের প্রত্যেকটিকে সে হাড়ের তৈরি তীক্ষ্ণ তুরপুন অস্ত্র দিয়ে ছিদ্র করে। তারপর পশুর রগের চিকন শক্ত সুতায় গেঁথে সেগুলো দিয়ে গলার মালা তৈরি করে। নিজের জন্য তো বটেই সে পরিবারের সবার জন্য এরকম অনেক সুন্দর সুন্দর মালা গড়ে দেয়। গলায় পরাবার জন্য ঐ শক্ত পিচ্ছিল সুতায় উপযুক্ত গিট্টু দেবার কায়দাও সে রপ্ত রয়েছে। তার আরেকটি কাজ ঝিনুকের খোলে সুন্দর সব ডিজাইন আঁকা। হাড়ের খুব চোখা অস্ত্র দিয়ে আঁচড় কেটে এই ডিজাইন সে আঁকে, হাড়ের সুন্দর চকচকে টুকরার ওপরও একই ভাবে ডিজাইন আঁকে। চিহ্নিত ঝিনুকের খোলকে কখনো কখনো ছোট ডিব্বা হিসেবে ব্যবহার করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য শুধু আলঙ্কারিক— সৌন্দর্য চর্চার অংশ। মেলা থেকে সাজুনি কয়েকটি বড় ঝিনুকের খোল এনেছিলো— এগুলো শাঁখের মত শক্ত ও মোটা, ভেতরটা বেশ বড়সড় বাটির মতো। এ বাটির মধ্যে নানা রঙ মিশিয়ে সাজুনিরা রীতিমত একটি প্রসাধনী তৈরির কারখানা বানিয়ে ফেলেছে।

ওই অঞ্চলের কোথাও কোথাও সুন্দর লাল মাটির নরম ডেলা পাওয়া যায় যা গুড়ো করলে মিহি লাল পাউডারের মত হয়ে যায়। মেলায় এগুলো আনা হয় বিনিময়ের জন্য। সাজুনির চোখ সব সময় থাকে এগুলোর ওপর। তাছাড়া লাল মাটির আরো কিছু কিছু ডেলা পাওয়া যায় যা বেশ শক্ত— তবে ধারালো পাথরের ছুরি দিয়ে কেটে নানা আকৃতিতে আনা যায়। নরম ডেলাগুলো সাজুনিরা বাড়িতে এনে তার লাল মাটির গুড়াকে ঝিনুকের খোলে সামান্য চর্বির সঙ্গে মিশিয়ে সুন্দর লাল ক্রিম তৈরি করে। আবার নিজেদের চুলাতে যে কাঠকয়লা তার গুড়ো দিয়ে প্যাষ্ট বানিয়ে কালো ক্রিমও তৈরি করে। উৎসবাদিতে মুখে ও গায়ে লাল ক্রিম মাখা ওদের একটি প্রিয় প্রসাধন। অন্য সময় ডিজাইনের খাতিরে কোথাও কোথাও কালো ক্রিমের ছোপ দেয়। ওই ডিজাইন অবশ্য ওরা এক ধরনের জাদু-টোনার কাজের জন্য শরীরের উল্কির মতো আঁকে— ধারণা হলো এতে শিকারের পশু ভয় পাবে, তাড়াতাড়ি কাবু হবে। সঠিক দিনে সঠিক এরকম প্রসাধনী গায়ে মাখার কাজে সাজুনি এক পাকা বিউটিশিয়ান।

লালমাটির শক্ত ডেলাগুলোকে সুন্দর আয়তাকার সাইজ করে কেটে তার ওপর আঁচড়কাটা ডিজাইন— এগুলো এক ধরনের সাজিয়ে রাখার অলঙ্কার। আবার এও অন্য ভাবে জাদু-টোনারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাজুনিদের মত

পরিবারের মানুষরা যে স্থানীয় নানা গুহায় বা বাইরে পাথরের ওপর লাল মাটির ডেলা, কাঠকয়লা, চক ইত্যাদি দিয়ে সরল আঁকে কিছু কিছু ছবি এঁকে রেখেছে— তাও বড় পশু শিকারের কাজে জাদু-টোনার প্রভাব নিয়ে নিজেদের বিশ্বাসের কারণে। একদিকে এই প্রসাধন, অলঙ্কারের সৌন্দর্য চর্চা এসবের নান্দনিকতা, অন্যদিকে জাদু-টোনার মাধ্যমে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারার বিশ্বাস, এসব উচ্চতর মনোজগতের লক্ষণ। ৭০ হাজার বছর আগের এই সময়টাতে এসে সেপিয়েন্স মানুষের মস্তিষ্কে এমনি গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন ঘটেছিলো।

উচ্চতর মনোজগতের পেছনে মূল নিয়ামকের কাজ করেছে তার পূর্ণাঙ্গ ভাষার সক্ষমতা। ভাষার বিস্তারিত সৌকর্যই তাকে জটিল চিন্তায় সক্ষম করে তুলেছিলো। এটিই আবার তাকে জটিল শিল্প, নান্দনিকতা ও উন্নত হাতিয়ার তৈরির কুশলতাগুলোর প্রথম মৃদু উন্মেষ ঘটাতে ও অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করে তা শেখাতে পারদর্শী করে তুলেছিলো। সাজুনির মত সেপিয়েন্সরা এমন ভাষার অধিকারী বলেই সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা গল্প গুজবে ব্যস্ত থাকে। নিজেদের ভূত-ভবিষ্যত নিয়ে কথা যেমন, তেমনি সামনের বসন্ত মেলার আয়োজন নিয়ে, ওদের কথা চলে। এমনকি নিজেদের দলের কোন ছেলে ওই মেলায় কোন ভিন দলের কোন মেয়ের আবার সাক্ষাতের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে সে গুজব ছড়াতেও তারা কম যায়না।

সাজুনির স্বামী সাজু এবং তার দেবররা ওদের গুহার মধ্যে যে হাতিয়ার তৈরি করে সেখানে বসে কিছুক্ষণ তাদের হাতের কাজ দেখলে ওই উন্নত মস্তিষ্কের পরিচয় আরো ভাল ভাবে পাওয়া যায়। হাতিয়ার এখন নানা জিনিস দিয়েই ওরা বানাচ্ছে। সব চেয়ে জবরদস্তগুলো অবশ্যই পাথরের, কিন্তু উদ্ভিদ ও প্রাণীজ জিনিস দিয়ে এমন সব মোক্ষম হাতিয়ার ওরা তৈরি করছে যা দেখে অবাক হতে হয়— যেমন হরিণের শিঙের বর্শা ও হারপুন, (বড় মাছ শিকার), হাড়ের ছুরি, ইত্যাদি। বর্শা জিনিসটির অস্থিত্ব আগে ছিলইনা— অথচ ওরা এখন কত রকম ভাবে বর্শা তৈরি করছে। একটি ভারী দৃঢ়, লম্বা দণ্ড এমন ভাবে কায়দা করে শিকারের দিকে ছুঁড়ে দিলাম এটি চট্ করে পড়ে না গিয়ে, বাতাসের বাধা ভেদ করে অনেক দূরে গিয়ে ঠিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে তাকে আহত করলো— এটি শিকারের পুরো ব্যাপারটিই বদলে দিয়েছে। দূর থেকে এভাবে আহত করার নিপুণ উপায় হাতে এসে যাওয়াতে শিকারের সময় নিজের দেহের ওপর ঝুঁকিও অনেক কমে গেছে ওদের— এই বিশাল পশুগুলোর একেবারে কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই তো আর করতে হচ্ছেনা। হরিণের শিঙের প্রান্তটি তীক্ষ্ণ করে নিয়ে কিছু বর্শা তৈরি হলেও বেশি কার্যকর ভারিগুলো তৈরি হয় অন্য কিছুতে। এই বর্শাগুলোর মূল দন্ডটি আসে গাছের ডাল থেকে আর আসল অস্ত্রটি হলো পাথরের তৈরি বর্শাগ্র। কীভাবে ওরা পাথরকে বিশেষ আকৃতি দিয়ে এই বর্শাগ্র তৈরি করছে আর তা গাছের ডালের দণ্ডের মাথায় লগিয়ে নিচ্ছে সেটি দেখার

মত। একই কথা কোয়ার্টজ, ফ্লিন্ট জাতীয় যুৎসই পাথরের তৈরি ছুরি, চামড়া ছিলার ছোট ছুরি, কোরানি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বলা চলে।

পাথরের এ হাতিয়ারগুলো তৈরি করা হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম নির্মাণ কৌশল অনুসরণ করে— একটি পর্যায়ের পর অন্য পর্যায়ে কয়েক ধাপে। যেমন প্রথমে স্থূল পাথরকে মোটামুটি প্রয়োজনীয় সাইজে কাটছাট করে নেয়ার জন্য ভারি হাতুড়ির (সেটিও পাথরের) ব্যবহার। তারপর সূক্ষ্ম কাজের জন্য হালকা হাতুড়ির ব্যবহার। এই পর্যায়টি রীতিমত অভিনব— ধারগুলো থেকে একটু একটু করে পাথরের চলতা তুলে ফেলে তাকে প্রয়োজন মত তীক্ষ্ণ সুচালো অথবা লম্বা ক্ষুরধার করে তোলা। আর এই কাজটি করা হয় হাতুড়ি চালিয়ে নয়, বরং হরিণের শিঙের খুব শক্ত ও তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ পাথরের সঠিক বিন্দুতে রেখে তার ওপর হাতের কোনাকুনি চাপ প্রয়োগে— যতক্ষণ না চাপের ফলে ওখানে পাথরের ছোট্ট পাতলা চলতা ওঠে আসে। আরো দারুণ কথা এ কাজটি করার সুবিধার্থে ওরা এ পর্যায়ে পাথরকে আগুনে তাতিয়ে তারপর ঠান্ডা করে নেয়— এতে চাপের মুখে চলতা ওঠানোটি সহজ হয়। এভাবে তাপে প্রক্রিয়াকরণ আর চাপে চলতা তোলা হাতিয়ার তৈরিতে এক নূতন দিগন্ত সেপিয়েন্সরা সদ্য আয়ত্ব করেছে। কিন্তু ইতোমধ্যে সাজুরা সহ এ এলাকার মানুষ এতে বেশ অভ্যস্ত।

সাজুরা এভাবে পাথরের যে সব হাতিয়ার তৈরি করছে তা শুধু খুব কার্যকরই হচ্ছেনা তার মধ্যে একটি বিশেষ নান্দনিকতাও দেখা যাচ্ছে— এর সুন্দর ফিনিশিঙের এর কারণে। এদের বেশির ভাগ ছোট বড় ডিম্বাকৃতি পাতলা জিনিস— অনেকটা গাছের পাতার আকৃতি, যদিও এতটা পাতলা নয়। এদের মধ্যে অনেকগুলোর ধারালো অংশ পাতাটির দুই কিনারাতেই, আর আগাটি তীক্ষ্ণ। পাতার জমিনের মত দুই চেপ্টা চওড়া পিঠ বেশ সুন্দর সমতল করা যদিও মসৃণ নয়। বর্শাগ্রের জন্য মুখটা বিশেষ ভাবে তীক্ষ্ণ করে তোলা। এই ফিনিশিঙের ভাব দেখেই বোঝা যায় যে এগুলো পুরানো সেপিয়েন্সদের অথবা তারো আগের ইরেকটাসদের যেনতেন ভাবে তৈরি হাত-কুঠার নয়। আর এই সূক্ষ্ম ও যত্ন করে গড়ে তোলা ফিনিশিঙের কারণেই সাজুনি আশা করছে যে এবার মেলায় এরকম কিছু বর্শাগ্রের বিনিময়ে ওরা কিছু ভাল লাল মাটির প্রসাধনী কিনতে পারবে। তাছাড়া পরিবারের সবাই চাইছে সুন্দর ভাবে পালিশ করা শক্ত লাল মাটির আয়তাকার ডেলার ওপর বিশেষ ডিজাইনের কিছু পূজা-সামগ্রী ওখান থেকে আনতে। সবাই বলে এমন জিনিস সঙ্গে রাখলে বিপদ-আপদ সহজে আসতে পারেনা। এই যে বিশেষ বিশেষ কারো হাতে তৈরি হাতিয়ারের বৈশিষ্ট ও সুনাম, যেগুলোকে অন্যরা বিনিময়ের মাধ্যমে পেতে চায়, এটিও এই সেপিয়েন্সদের একটি বাহাদুরি। পাতলা পাথরের ছিমছাম ছুরি, হরিণের শিঙের বর্শা যাতে হারপুনের মত কাঁটা কাঁটা অংশ রয়েছে, করাতের দাঁতের মত ছোট ছোট দাঁত সহ পাথরের কাস্তে- এমনি সব জটিল হাতিয়ারও ওখানে কেউ কেউ তৈরি করছিলো।

বড়, মাঝারি, ছোট সব ধরনের প্রাণী শিকার করার জন্য যুৎসই হাতিয়ার সাজু-সাজুনিদের পরিবার এবং তাদের দলে বেশ ভালই রয়েছে। বর্শা নিক্ষেপের নিপুণতার কারণে এসব শিকারে ঝুঁকিও কমে গেছে অনেক। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ওরা এমন শিকারের ওপর সব সময় নির্ভর করছেনা। খাবার দাবারের ব্যাপারে ওরা খুবই উদার— নানা রকম খাবারের যোগাড় করে হরদম রুচি বদল করছে। কিছু কিছু ফলমূল বন্য শস্যতো রয়েছেই, তবে সমুদ্রের কাছে বলে শামুক-ঝিনুক, মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করে খাওয়া ওদের একটি নিত্য কাজ। বড় বড় শিকার যদিও একটি বড় লক্ষ্য, কিন্তু ছোট ছোট প্রাণী মেরে খাওয়ার নানা সহজ কৌশলও তারা বের করেছে। ফাঁদ পেতে ইঁদুর বা খরগোসের মত ছোট পশু যেমন ধরছে, পাখি শিকারও করছে। পাখির ডিম, টিকটিকি, পতঙ্গ এসবও বাদ যায়না। বড় পশু শিকারে বেশি ব্যস্ত পরিবারের পুরুষরা। সাজু এবং তার দুই ভাই তো তাদের শিকারের দলের বাকিদের সঙ্গে মিলে সব সময় হয় শিকারের পরিকল্পনা করছে নইলে সত্যি সত্যি শিকারেই যাচ্ছে। এ সময় বৌয়েরা এবং ছোটরা ওই বাদবাকি খাবারগুলো সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকছে— মাছ ধরা, ফাঁদ পাতা, পাখি শিকার, ফলমূল-পাখির ডিম-টিকটিকি সংগ্রহ করা, ইত্যাদি। অন্য প্রাণীর তুলনায় এই মানুষদের বলা যায় সর্বভুক। এ জন্য তাদের খাবারের নিরাপত্তা অন্যদের তুলনায় বেশি। শিকারের অভাবের দিনেও ওরা বেশ চালিয়ে দিতে পারে।

গুহার এক পাশে ধিকি-ধিকি আগুন জ্বালিয়ে রাখে ওরা। বার বার আগুন সৃষ্টি করার ঝামেলা থেকে রেহাই পেতেই এটি করে, কারণ কাঠে কাঠ ঘষে যে কোন সময় আগুন জ্বালাতেও পারে নিজ থেকেই। কাজেই সব খাবারই ঝলসিয়ে, গরম করে খেতে পারে। হাতিয়ার তৈরিতেও তাপ লাগানোর সুযোগটি চমৎকার কাজে লাগায়।

মাসের পর মাস ধরে একটি এলাকায় যখন শিকার-সংগ্রহ করে শিগ্‌গীর ওরকম খাবারের পরিমাণ কমে আসে। তাই কিছুদিন ধরেই কথাবার্তা চলছে আপাতত তারা এই ব্লোম্বোস গুহা এলাকায় আর থাকবেনা— এখনকার বাস উঠিয়ে একটু পশ্চিমের দিকে যাবার চেষ্টা করবে। ওদিকেও সমুদ্র থেকে বেশি দূরে যাবেনা— তবে ঝোপঝাড় আর বৃক্ষের সমারোহ সেখানে বেশি বলে আশা করছে যে বড় শিকার ওদিকে বেশি মিলবে। তাছাড়া গত মেলাটি এখানে হয়েছিলো বলে এই দিকটা আরো অনেকগুলো দলের নজর পড়েছিলো। তারা সবাই মিলে এখনকার পশু-পাখির সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে; তাই আবার বেরিয়ে পড়ার পরিকল্পনা।

গত কিছুদিন ধরে তাই দলের মধ্যে সলা-পরামর্শ চলছে। সাজুকে প্রায়ই যেতে হয় সেখানে পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করতে। নানা দিক থেকে ব্যাপারটি ভেবে দেখা হচ্ছে। কতদূরে যাবে তারা, কোনদিকে যাবে। গত মেলার সময় বহু

দূরের বিভিন্ন জায়গা শিকারের পশু-পাখি, বিশেষ করে বড় শিকার ইত্যাদিতে ভরপূর থাকার কথা শুনেছে। এসব অনেকটা ভাসা ভাসা গুজবের মত শোনা গেছে— একের বর্ণনা আবার অন্যের সঙ্গে তেমন মেলেওনা। মনে হয় যারা বলছে তারা নিজেরা কেউ ওসব জায়গায় যায়নি, অন্যের কাছে শুনে বলছে। তেমনি আবার খুবই সুফলা সব সমুদ্র তীরের কথাও শুনেছে জোয়ারের পর প্রত্যেক ভাটাতে বিস্তীর্ণ বালুকা বেলা খুলে যায়, যেখানে শামুক-ঝিনুকের মেলা বসে যায়। সবার সব কথা শুনতে গেলে চলেনা— তবে তার মধ্য থেকে বেশি মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে যা জানা গেছে তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হলো। উপকূল ধরেই তারা আরো পশ্চিমে যাবে অন্তত কয়েক শ' মাইল পশ্চিমে, যেখানে এখনো যথেষ্ট সবুজ বজায় আছে, আছে বড় বড় শিকার।

তৈরি হতে বেশ কিছু দিন সময় লাগলো। সাজু-সাজুনি পরিবারের কিছু উদ্বিগ্ন সময় কাটলো কী সঙ্গে নেবে, কী ফেলে যাবে এই সিদ্ধান্ত নিতে। যেই নতুন জায়গাটায় গিয়ে ওরা বসত গড়বে বলে ঠিক করেছে সেটি সম্বন্ধে খুব ভাল কোন ধারণা নেই। ওখানে পৌছতে, বা সেখানে সুবিধা না হলে অন্য একটি জায়গা খুঁজে নিতে কতদিন লেগে যাবে সেটিও বলা মুশকিল। এর মধ্যে পুরো দলকে প্রতিদিন যারা যেভাবে পারে ওদিনের মত কোন আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। ওই ধরনের আশ্রয়ে ব্যবহারের জন্য কিছু শুকানো পশু-চামড়া সঙ্গে নিতে হবে, আর কিছু হাতিয়ার। খুব বেশি কিছু সঙ্গে নিয়ে বোঝা বাড়ানো যাবেনা। দলে অনেক ছোট ছোট শিশু রয়েছে— তাদেরকে কোলে নিয়ে বা পিঠে ঝুলিয়ে হাঁটার কথাটি মনে রাখতে হবে। পথে যেখানে যা পাওয়া যায় শিকার করে, কুড়িয়ে এনে ক্ষিধে মেটাতে হবে— বিশেষ করে পানির যোগানটি বেশ ভাবনায় রাখতে হবে।

শিকারের সব হাতিয়ার যে সঙ্গে নেয়া যাবে তাও নয়। প্রয়োজনে পথের মধ্যেই কিছু কিছু তৈরি করে নিতে হবে— আপাতত কাজ সারার মত করে। সাজুনির সব চেয়ে খারাপ লাগছিলো তার কিছু কিছু অলঙ্কার ফেলে যেতে হচ্ছে বলে— বিশেষ করে বড় বড় কিছু সুন্দর জিনিস মেলা থেকে খুব সখ করে যা এনেছিলো। এগুলোর মধ্যে ডিজাইন করা লাল মাটির প্রিজম আকৃতির জিনিস, খোদাই করা হাড়ের কাজ— এসবকে নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই; ব্লোম্বোস গুহাতেই এগুলো রইলো। আবার কখনো যদি এদিকে ফেরা হয়, আর অন্য কেউ যদি এগুলো নিয়ে না যায় বা নষ্ট না করে, তা হলে আবার ফেরত পাওয়া যাবে। গায়ে পরার ছোট ছোট ঝিনুকের মালার অলঙ্কার অবশ্য ওরা যে যত পারলো পরে নিলো— তারপরও ফেলে যেতে হলো অনেক। জানেনা যেখানে যাচ্ছে সেখানে কাছাকাছি মানুষের বসত কেমন আছে, এদিককার মত ওখানে মেলা জমে কিনা, এসব চমৎকার কারুকাজের পসরা নিয়ে সেখানেও বিকিকিনি চলে কিনা।

তবে নতুন আবাসের সন্ধানে যেতে বড় দুশ্চিন্তা অবশ্য এগুলো নয়— তা হলো নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা। সেপিয়েন্সরা এখন সৌন্দর্যচর্চা করে, নিজেদেরকে

প্রসাধনী ও অলঙ্কারে সুন্দর করে সাজাতে পছন্দ করে; বিনোদনও পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় এবং পসরা বিনিময়ের জন্য মেলায় একত্রিত হয়— সবই সত্যি। কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে সহিংস সংঘাত কিন্তু বরাবরের মত রয়ে গেছে। বরং অস্ত্রের দক্ষতা বাড়াতে ঝগড়া- মারামারি ইত্যাদি প্রায়ই খুনাখুনিতে পর্যবেশিত হচ্ছে। তাছাড়া একত্র বাস করা, শিকার করা ইত্যাদির যে দল তা আগেকার দিনের চেয়ে বড় হওয়াতে দলের মধ্যে এবং বিভিন্ন দলের একে অন্যের মধ্যে শত্রুতাও সৃষ্টি হচ্ছে প্রায়ই— যা মারামারি এবং অপরাধজনিত কাজের জন্ম দিচ্ছে। ভাল একটি শিকারের জায়গা নিয়ে, ভাল একটি গুহার অধিকার নিয়ে প্রায়ই দুর্বলের উপর সবল গিয়ে চড়াও হচ্ছে— গায়ের জোরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে। এজন্য নিরীহ পরিবারগুলোকে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। বিশেষ করে যে সব জায়গায় শিকার বা সংগ্রহের সুযোগ কমে গেছে সেখানে অন্য মানুষ মেরে খাওয়ার বহু গুজব তারা শুনেছে। তাই অজানার পথে পাড়ি দিতে বন্য হিংস্র পশুর ভয় যেমন তাদেরকে সব সময় উদ্বিগ্ন করে রেখেছে অন্য অপরিচিত মানুষের দল থেকে আক্রমণের ভয়টিও মোটেই কম নয়। অধিকাংশ আক্রমণ ও খুনখারাবির লক্ষ্য অবশ্য লুটপাট, এবং বিশেষ করে বলপূর্বক স্ত্রী সংগ্রহ।

দলের কেউ আক্রান্ত হলে অন্যরা বাধা দেবে এটিই আশা করা হয়— তারপরও সাবধানের মার নেই। পথে পথে খাদ্য সংগ্রহ বা শিকার করতে গিয়ে কেউ কেউ দলছুট হয়ে গেলে তাদের বিপদ ঘটতেই পারে। সামনে তাদের দীর্ঘ পথ। বিভিন্ন জায়গায় কোন রকমে রাত কাটাচ্ছে; তারপর আবার এগিয়ে যাচ্ছে— যতদিন তাদের কাম্য যুৎসই জায়গায় না গিয়ে পৌঁছতে পারছে। তাদের চোখে এমন একটি জায়গার স্বপ্ন যেখানে ফলমূল, শিকার, অন্যান্য উপাদেয় খাবারের প্রাচুর্য থাকবে। অন্যরা গিয়ে ভীড় করার আগে, ভাল গুহাগুলো দখল হয়ে যাওয়ার আগে তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারবে এটিই আশা। তবে তারা জানে যে এমন জায়গা পাওয়া গেলেও সেখানে তাদের চিরকাল থাকা হবেনা। কিছুকাল পর ওখান থেকেও তাদের আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। হয়তো আবার তারা ফিরে আসবে ব্লোম্বোস গুহায়।

* * *

আজকের আমাদের মত আধুনিক মানুষ *হোমো সেপিয়েন্স* (যে নামের অর্থ 'জ্ঞানী আমরা') প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলো আফ্রিকায় প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগে। খুব সম্ভব ইরেকটাসদের একটি শাখা থেকে অন্তত পাঁচ লক্ষ বছরের বিবর্তনে বড় মস্তিষ্কের এই আধুনিক মানুষ এসেছে। প্রথম দিকে কিছুটা ভিন্ন প্রাচীন ধাঁচের সেপিয়েন্সরা এসেছিলো। তাদেরই একটি শাখাকে বলা হয়েছে নিয়ানডার্থাল— যারা ওই প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে সেপিয়েন্স শাখা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো, এবং এক পর্যায়ে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপে চলে গিয়েছিলো। প্রাচীন ধাঁচের সেপিয়েন্সরা তো ক্রমে বদলেছেই, সেপিয়েন্সরা নিজেরাও দেড় লক্ষ বছর আগে উদ্ভূত হয়ে কিছু কিছু বদলেছে— বিশেষ করে তাদের

মস্তিষ্ক, চিন্তা করার শক্তি, ভাষার ক্ষমতা, অন্যের চিন্তাকে বোঝার ক্ষমতা, অতীত ও ভবিষ্যত নিয়ে ভাবার ক্ষমতা— এগুলো এ সময় ক্রম বিবর্তনে উন্নত হয়েছে। এই উন্নতি অনেকটা সম্পূর্ণতা পেয়ে গিয়েছিলো আফ্রিকাতেই প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লোম্বোস গুহায় পাওয়া ওই সময়ের ফসিল, নানা হাতিয়ার, নানা অলঙ্কার এবং আফ্রিকার অন্যান্য কিছু জায়গায় একই সময়ের অনুরূপ প্রাপ্তি থেকে আমরা এসব জানতে পেরেছি।

ব্লোম্বোস গুহার মধ্যে পাওয়া গেছে আঁচড় কেটে ডিজাইন আঁকা লালমাটির প্রিজম আকৃতির ডেলা, ছোট ছোট পুঁতির আকারের শামুকের গায়ে গর্ত করা যাতে বোঝা যায় যে এদেরকে মালার মত করে পরা হতো। পাথরের যে হাতিয়ার পাওয়া গেছে তাতে আগের যে কোন হাতিয়ারের থেকে অধিক কার্যকারিতা শুধু নয় অধিক ছিমছাম সৌন্দর্যের ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পাওয়া গেছে পাথরের সুন্দর বর্শাগ্র। তা ছাড়া শিঙের তৈরি বর্শা ও অন্যান্য হাতিয়ারও ছিল। সুন্দর ডিজাইন করা হাড়ের সরঞ্জামও পাওয়া গেছে। শিকার করা বড় বড় পশুর হাড় যেমন চিবুনো, ভেঙ্গে মজ্জা বের করা অবস্থায় পাওয়া গেছে তেমনি ছোট পশু, পাখি, মাছ, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদির হাড় অথবা খোলসও পাওয়া গেছে। বিচিত্র খাদ্য গ্রহণে তাদের অভ্যাসটি ভাল ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

প্রসাধনীর প্রতি ওখানকার বাসিন্দাদের টান স্পষ্ট। গায়ে মাখার ক্রিম বানানোর জন্য লাল মাটিকে পিটিয়ে পাউডার করার হাতুড়ি, ক্রিম তৈরিতে মাখানোর পাত্র হিসেবে ব্যবহারের বড় ঝিনুকের খোলস, ইত্যাদির ব্যবস্থাগুলো এমন চমৎকার অবস্থায় পাওয়া গেছে যে সেদিনের সেপিয়েন্সদের প্রসাধনের অভ্যাস, অলঙ্কারের অভ্যাস, চিত্রিত করার অভ্যাস বেশ প্রমাণিত। গুহার কাছে ধারে পাথরের গায়ে জীবজন্তুর ছবির আভাস পাওয়া গেছে। এসব অনেক কিছু দেখে মনে হয় ওদের শুধু থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে বেঁচে থাকাটাই লক্ষ্য ছিলনা, সৌন্দর্য প্রীতি এবং আচার-বিশ্বাসও ছিল। যেমন করে সাজিয়ে যত্নে অন্যান্য জিনিস সঙ্গে দিয়ে মৃতদেহ কবর দেবার নমুনা পাওয়া গেছে তাতেও এমন আচারের প্রমাণ মেলে।

বলতে গেলে এক ধরনের মানব সভ্যতার উন্মেষ তখন হয়েছিলো যা খাওয়া পরার প্রয়োজনীয়তার বাইরে গিয়ে সৌন্দর্য, শিল্প, নান্দনিকতা, বিশ্বাস ইত্যাদিকে সর্ব প্রথম গুরুত্ব দিয়েছে। বহু পরে এখন থেকে ৩০-৪০ হাজার বছর আগে ইউরোপের সেপিয়েন্সদের মধ্যে এই ব্যাপারগুলো আরো স্পষ্ট ভাবে দেখা গেছে বটে তবে সেখানে নিদর্শনের প্রাপ্তি ও গবেষণা অনেক বেশি হয়েছে বলেই হয়তো তা নজরে এসেছে বেশি। কাজেই আমরা বলতে পারি উন্নত হাতিয়ার, নান্দনিকতা, ভাষা ইত্যাদি নিয়ে মানব সভ্যতার প্রথম লক্ষ্য করার মত স্ফুরণ আমরা ৭০ হাজার বছর আগে আফ্রিকাতেই দেখতে পেয়েছি।

ও সময়েই সেপিয়েন্সদের বেশ কিছু কিছু দল আফ্রিকার সীমা পেরিয়ে এক দিকে মধ্যপ্রচ্যে ও পরে ইউরোপে গেছে একটু একটু করে কিছু দূরত্বে অভিবাসী হয়ে। একই ভাবে সমুদ্র তীর ধরে আফ্রিকা থেকে পূর্ব দিকে ভারতে ও পরে পূর্ব এশিয়ায় ও আরো পরে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পৌছেছে। প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে ওরা এক দিকে ইউরোপের দূরবর্তী প্রান্তে ও অন্যদিকে অষ্ট্রেলিয়ায় পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো। ওই সব বিভিন্ন স্থানে প্রাচীনতম মানব বসতিগুলো আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ববিদরা আমাদের মত মানুষের এই অভিবাসনগুলো নিশ্চিত করেছেন।

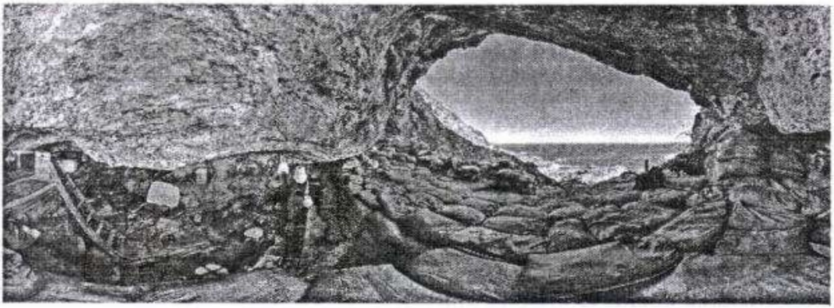

ব্লোম্বোস গুহা

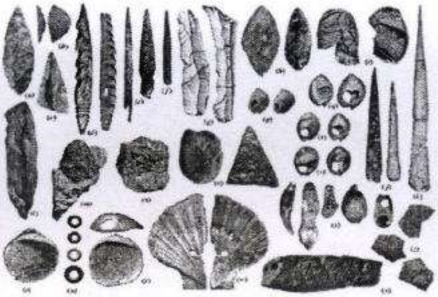

নানা হাতিয়ার ও অলঙ্কার

হাতকে স্টেনসিল হিসেবে
ব্যবহার করা গুহাচিত্র

সরাসরি অথবা হাতের স্টেনসিলে
আঁকা গুহাচিত্র

লাল মাটির শক্ত চিত্রিত ডেলা

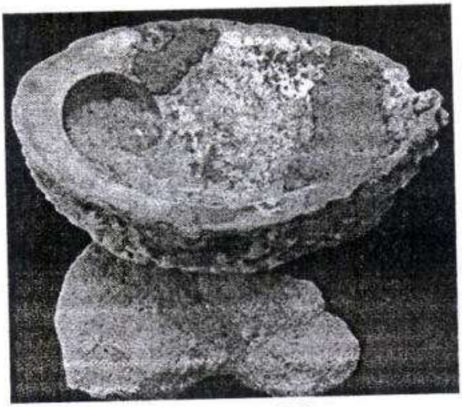

বড় শঙ্খের খোলকে প্রসাধনী মিশ্রণে ব্যবহার

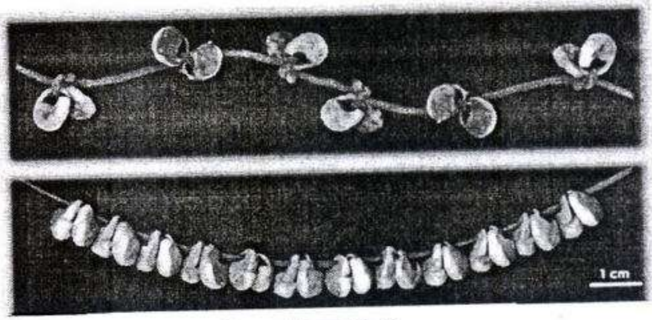

শামুক খোলের মালা

ফ্রান্সের লাশাপেলের বুড়ো ঃ
৬০ হাজার বছর আগে

নিয়ানডার্থাল প্রজাতির মানুষ এই বুড়ো এই তীব্র শীতের দেশে শীতে ও বার্ধক্যে কষ্ট পান। নিজের ছেলেমেয়েরা অবশ্য তাকে যত্ন-আত্তিতেই রাখে। কিন্তু তাঁর বেশি কষ্ট হয় নিজেদের মধ্যে অরাজকতা ও খুনখারাবি অসম্ভব পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বলে। অন্যদিকে গুজব শুনছেন দূর দেশে নতুন এক ধরনের মানুষ দেখা দিয়েছে যারা নিজেদের অদ্ভুত ফন্দি ফিকিরের মাধ্যমে সবাইকে টেক্কা দিচ্ছে।

ওরা শীতের দেশের মানুষ— ষাট হাজার বছর আগে ইউরোপের অন্যান্য জায়গার মত ফ্রান্সেও চলছে বরফের যুগ। তবে লাশাপেল ফ্রান্সের যেখানে অবস্থিত সেখানকার অবস্থা তত খারাপ নয়। উত্তরাঞ্চলগুলোতে তখন প্রায় ক্রমাগত তীব্র শীত— স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ডের উত্তর দিকের জায়গাগুলো, স্ক্যান্ডিনেভিয়া এসবতো বছরের পর বছর বরফেই ঢাকা পড়ে আছে। এক রকম মানুষ ওখানেও পৌঁছে গিয়েছিলো বটে তবে শীতের দাপটে তাদের অধিকাংশ এখন দক্ষিণে চলে এসেছে অপেক্ষাকৃত কম শীতের জায়গায়, যেমন ফ্রান্সের লাশাপেলে। এরা নিয়ানডার্থাল মানুষ— আমাদের মত সেপিয়েন্সদের থেকে খুব যে ভিন্ন তা বলা যাবেনা, তবে কিছু বিষয়ে তো আলাদা বটেই। তাছাড়া বহুকাল শীতের দেশে থাকতে থাকতে গায়ে গতরেও অনেকটা শীতের উপযোগী হয়ে পড়েছে। এই লাশেপেলের বুড়োর কথাই ধরা যাক— সবাই তাকে বুড়ো বলে ডাকে ৪০ বছর বয়স হয়ে গেছে বলে, আর বেচারা হাড়ের রোগে এমনিতেই একটু কুঁজো হয়ে আরো বেশি বৃদ্ধের ভাব নেয়াতে। সমসাময়িক নিয়ানডার্থালদের জন্য চল্লিশ একটি বেশ পরিণত বয়স— খুব বেশি কেউ এত দীর্ঘ জীবন পায়না। বেশি বয়স এবং জরা আক্রান্ত হলেও আমাদের বুড়োর নিয়ানডার্থাল শরীর কিন্তু এখনো বেশ পেশীবহুল, বেঁটে শরীরটা বেশ গাট্টাগোট্টা। এগুলো শীতের বিরুদ্ধে নিয়ানডার্থালদের রক্ষা কবচ।

বুড়ো একটি গুহায় তার পরিবারের সঙ্গে থাকেন— পরিবারের কর্তা তার বড় ছেলে, তবে ছোট এক ছেলেও সঙ্গে থাকে। দুই ভাইয়েরই বৌ রয়েছে, বড়

ভাইয়ের দুই ছেলে দুই মেয়েও পরিবারে রয়েছে। শরীরের অবস্থার জন্য বুড়ো এখন কাজকর্ম তেমন করতে পারেননা— তবে তাঁকে দেখাশোনার জন্য পরিবারে লোকের অভাব নেই। ছেলেমেয়েগুলোকে দেখলে সেপিয়েন্সদের থেকে খুব ভিন্ন মনে হয়না— বেশ ফুটফুটে চেহারা, গৌর বর্ণ, চুল বাদামী-সোনালী। তবে বড়দেরকে দেখলে সেপিয়েন্সদের সঙ্গে তফাতটি ভাল বোঝা যায়— শরীর অনেক ভারী, কপাল ও মুখ কেমন যেন একটু সামনের দিকে ঢালু, থুতনি তেমন নেই, চোখের ভ্রুর জায়গাটি বেশ ফোলা। মাথা বেশ বড়— কাজেই মস্তিষ্ক মোটেই আমাদের চেয়ে ছোট নয়, বরং একটু বড়ই বলতে হবে। তবে খুলিটি আমাদের মত গম্বুজ আকৃতির হয়ে আসেনি, কেমন জানি একটু চেপটা। বড় থ্যাবড়া নাকটিও একটু চোখে লাগে। ওরা যে সেপিয়েন্স নয়, তা শুধু চেহারায় নয়, আচরণে-বুদ্ধিতেও ধরা পড়ে।

তবে উভয়ের জীবনযাত্রার কথা যদি বলি ষাট হাজার বছর আগে— এই বরফের যুগে নিয়ানডার্থাল আর সেপিয়েন্সে কী বা তেমন তফাৎ ছিল। উভয়কেই শিকার করে, সংগ্রহ করে খাবার যোগাতেই দিনের বড় অংশ কাবার করে দিতে হয়। ফ্রান্সের ঠিক এই জায়গায় সেপিয়েন্সরা অবশ্য এখনো নেই, কাজেই ওখানে সর্বত্র নিয়ানডার্থালদেরই বাস। লাশাপালে বুড়োর পরিবার যেখানে থাকে তার কাছাকাছি আরো বেশ কিছু পরিবার রয়েছে, যাদের নিয়ে ওদের দল। নিজের জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন বুড়ো। যৌবনে তার মত শিকার এ তল্লাটে কেউ করতে পারতো না। উত্তরের সব জায়গা সব সময় বরফের তলায় থাকলেও এ দিকটায় শীত অপেক্ষাকৃত কম, শিকার করার মত বড় বড় পশু— ঘোড়া, হরিণ ইত্যাদি নেহাত কম পাওয়া যায়না। তাছাড়া ওই শীতেও নেকড়ে, শেয়ালের মত ছোট প্রাণীও পাওয়া যায়। তখন মোটের ওপর নিজের পরিবারের সাত আট জনের দলের ওপর বলতে গেলে বুড়োই নেতৃত্ব দিতেন। লাশাপালের চারদিকে বহু মাইলের মধ্যে এ দল যাযাবরের মত ঘুরে বেড়িয়েছে— কোন এক জায়গায় দু'এক মাসের বেশি থাকেনি। ওই দু'এক মাসের জন্য এক জায়গায় পশু চামড়ায় কোনভাবে একটি তাঁবু বানিয়ে নিয়েছে। এ তাঁবুর কাঠামো প্রায়ই তৈরি হয় ম্যামথের বিশাল সাইজের হাড় দিয়ে, হাতির মত দেখতে কিন্তু হাতির চেয়ে অনেক বড় ম্যামথ এই অঞ্চলে দেখা যায়। হাড় দিয়ে তারা আরো নানা জিনিস ও হাতিয়ার তৈরি করে। ওখানে শিকার কমে গেলে দলের সবাই তাঁবু তুলে আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। তারা জানত আশপাশে নিয়ানডার্থাল মানুষের আরো দল আছে— তবে তারা এত বড় জায়গায় এত কম সংখ্যায় ছিল যে প্রচুর ঘোরাঘুরি মধ্যেও সারা জীবনে কতবার যে এরকম অন্য দলের সঙ্গে দেখা হয়েছে তা হাতে গুণে বলা যায়। তাই নিজেদের ছোট দলের ভেতরেই জীবন কাটিয়ে এই বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত অবস্থায় চলে এসেছে।

কিন্তু সেই যৌবনের কথা ভিন্ন। শিকার, শিকার, শিকার — এটিই ছিল বুড়োর একমাত্র নেশা। বড় ছেলেটি তখন শিশুমাত্র — তাকে বৌ আর অন্যান্যরাই সামাল দিতো। বুড়োর কাজ ছিল হাতিয়ার তৈরি, শিকার করা আর শিকার করা পশুকে কেটেচিরে, আগুনে পুড়ে খাওয়ার উপযুক্ত করার কাজে নেতৃত্ব দেয়া। অন্যদল থেকে যখন এসব কাজের পারদর্শী কয়েকজন তাদের দলে এসেছিলো তখন বুড়ো কিশোর বৈ তো নয়। তখন থেকে ওদের কাছেই তাঁর শেখা— পাথরের ওপর পাথর ঠুকে ঠুকে নিয়ানডার্থালদের হাতিয়ার তৈরির কাজ। পাথরের যে সব চলতা ভেঙ্গে ওঠে আসে সেগুলো দিয়ে তৈরি হয় ছুরি, কোরানি ইত্যাদি, আবার যে পাথর থেকে এ চলতা ওঠানো হলো তাকে সুন্দর হাত-কুঠারে রূপ দেয়া হয়। লাঠির আগায় তীক্ষ্ণ করা পাথর লাগিয়ে বর্শাও তৈরি হয়। এসবের তৈরি শেখা যেমন জরুরী ছিল তেমনি দক্ষ ভাবে এদের ছুঁড়ে শিকারকে ঘায়েল করাটাও শিক্ষণীয় ছিল। এসব ভালই আয়ত্ব করেছিলো বুড়ো। ওই যে অন্যদল থেকে যারা পরিবার পরিজন নিয়ে এসেছিলো তাদেরই এক মেয়ে পরে বুড়োর বৌ হয়েছিলো। তবে বর্শা ও দূরে বর্শা নিক্ষেপের কৌশল ওই পারদর্শীদের মধ্যেও বেশি উন্নত হয়নি। এখনো যেন সম্মুখযুদ্ধে তীক্ষ্ণ অস্ত্রকে হাতের গুতো দিয়ে শক্তির জোরে শিকারের গায়ে বিদ্ধ করাটাই প্রধান কৌশল।

নিজের শিকারের সেই দিনগুলো তখন অতীত, শিকারের দায়িত্ব এখন তাঁর ছেলেরা নিয়ে নিয়েছে। হাতিয়ারও তারাই তৈরি করে, যদিও বুড়োর নির্দেশনা সেক্ষেত্রে কখনো কখনো কাজে লাগে।

এই শীতের দেশে বড় সমস্যা হলো গরম পোষাকের যোগান থাকা। পশু চামড়াই সম্বল, তবে তাকে ঠিক পোষাকের মত বানিয়ে নিয়ে গায়ে পরার কৌশল ওদের জানা নেই মাঝখানে একটি বড় ছিদ্র করে কোন রকমে মাথাটি গলিয়ে নেয়া— এইটুকুই করতে পারে। এতে ভাল শীত নিবারণ হয় না। যৌবনে এ নিয়ে পরোয়া করতেননা বুড়ো— কিন্তু এখন বৃদ্ধ বয়সে শীতে খুব কষ্ট হয়, বিশেষ করে বাতের অসুখে হাত পাগুলো শীর্ণ বাঁকা হয়ে গেছে বলে কষ্ট আরো বেশি হয়। তবুও ভাল যে আজকালকার নিয়ানডার্থাল পরিবারে বয়স্ক গুরুজনদেরকে যত্ন নেয়া হয় ভাল। এক সময়ের ডাক সাইটে বুড়ো এখন বলতে গেলে তেমন কোন কাজেই লাগেনা। কিন্তু পরিবারেই কেউ তো নয়ই, এমনকি দলের কেউও তাঁকে গলগ্রহ মনে করেনা। শীতের কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য ওরাই সব সময় তাঁকে উনুনের পাশে বসিয়ে রাখে— যাতে সব সময় কম বেশি আগুনের আঁচ থাকে। দাঁতের মাড়ির অসুখের কারণে দাঁত বলতে কিছুই এখন নেই বুড়োর। ছেলেরা, ছেলের বৌ এবং কখনো অন্যরা পাথরের হামানদিস্তায় তাঁর খাবারগুলো গুড়ো করে অথবা বেটে দেয়— তবেই তিনি খেতে পারেন।

তারপরও বুড়োর মনে শান্তি নেই। শরীরের কষ্টের চেয়েও বেশি তাঁর মনের কষ্ট। নিজেদের মধ্যে কেন জানি হানাহানি বেড়ে যাচ্ছে। তাঁদের দলের মধ্যে

কলহে মারা পড়েছে তাঁর জোয়ান এক ছেলে। ওকে কবর দেয়ার সময় পরিবারের সবাই গিয়েছিলো শুধু বুড়ো যেতে পারেননি তাঁর অসুস্থতার জন্য। কিছুদিন আগে আর একটি দলের লোকেরা আক্রমণ করেছিলো তাঁদের ক্যাম্প। তবে ভাগ্য ভাল যে বড় ছেলের বৌ কিছুটা জখম হওয়া ছাড়া কেউ মারা যায়নি। কিন্তু ওরা তাদের দল থেকে একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো— বুড়োর ছোট ভাইয়ের মেয়েকে। এরকম অপহরণের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। বিভিন্ন দলের মধ্যে দেখা সাক্ষাত মেলামেশার সুযোগ সম্প্রতি এদিকটায় কমে গেছে বলেই এমনটি হচ্ছে। অন্য দল থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্য পাওয়া যাচ্ছেনা যেমনটি বুড়োর যৌবন কালে সহজে পাওয়া গেছে।

একাকী বসে বুড়ো চিন্তা করেন— পুরানো কথা এবং সাম্প্রতিক কথা নিয়ে চিন্তার ক্ষমতা নিয়ানডার্থালদের আছে। কিন্তু সেপিয়েন্স মানুষদের মত পূর্ণাঙ্গ ভাষা তাদের নেই— সেই অভাবের একটি প্রভাব চিন্তার সক্ষমতার ওপরও পড়ে, একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলাপের ওপর তো অবশ্যই পড়ে। যদিও মস্তিষ্ক তাদের যথেষ্ট বড়, সেপিয়েন্সদের থেকেও সামান্য বড়; কিন্তু জটিল চিন্তায়, ভাষা সৃষ্টিতে এবং আরো কিছু ক্ষেত্রে এর সক্ষমতা কিছুটা কম। তারপরও নিয়ানডার্থালদের মানবিক গুণের ঘাটতি বড় একটি দেখা যায়না। ওরা আপনজন কেউ মারা গেলে শোকে অভিভূত হয়, আর সেটি প্রকাশও করে।

এই পরিবার বা আশপাশে কাউকে ৩০-৩৫ বছরের বেশি বাঁচতে দেখা যায়নি। বুড়োর ৪০ বছর বয়স নিয়ানডার্থালদের মধ্যে খুবই বিরল। তাই ভগ্ন স্বাস্থ্য, জরা ইত্যাদিতে ভোগার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নানা শোকেও ভুগতে হয়েছে। পরিবারের ও প্রতিবেশীদের অনেক প্রিয় মানুষ এর মধ্যে চলে গেছে। যত্ন করে ওদের অনেককে সাজিয়ে গুছিয়ে কবর দিয়েছে অন্যান্যদের সঙ্গে বুড়োও। মানুষের মৃতদেহকেও সম্মানের চোখে দেখতে তারা অভ্যস্ত। তাদের আবেগ প্রকাশের ক্ষমতাটিও যথেষ্ট স্পষ্ট— যদিও ভাষাটি একেবারেই সীমাবদ্ধ। বুড়ো যে আজ তাঁর বেঁচে থাকার জন্য অন্যদের ওপর একেবারেই নির্ভরশীল, নিজের অতীত স্বাস্থ্যবান জীবন যে আজ কেবলই স্মৃতি, এটি বুড়োকে আরো আবেগ তাড়িত করে রাখে সারাক্ষণ।

যখন একটি নির্দিষ্ট আশ্রয়ের মধ্যে থাকেন তখন বুড়ো ভালই থাকেন। সমস্যাটি বেশি হয় যখন দলশুদ্ধ সবাই পরবর্তী আশ্রয়ের পথে ঘোরাঘুরিতে থাকে। বুড়োর জন্য হাঁটার কাজটি বড়ই কষ্টের— অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে খুবই ধীরে ধীরে হাঁটতে হয় তাকে। এতে দলের গতি কমে যায়। দলের জন্য বহু রকম সমস্যা হয়, কিন্তু তবুও বুড়োকে কেউ তিরস্কার করেনা, বা তাঁর অযত্ন হতে দেয়না।

শীতের মধ্যে আশ্রয় ও উষ্ণতার ব্যবস্থা, শিকার, আত্মরক্ষা, হাতিয়ার তৈরি, মাঝে মাঝেই ঠাঁই বদলের যাত্রা— এ সবেই দিন কেটে যায় বুড়োর দলের

নিয়ানডার্থালদের। এর মধ্যে একটি বিনোদন হলো রাতের বেলা আগুন জ্বালিয়ে গল্প করা। ভাষা তাদের সীমিত— তাই কল্পনার রাজ্যে ভাসার মত গল্প হয়না— সাধারণ শিকার, ঘোরাঘুরি, এসবের অভিজ্ঞতার গল্পগুলোই আসে; হিংস্র জন্তুর আক্রমণ, নিজেদের মধ্যে মারামারি তাও। তবে ওই আটপৌরে গল্পের মধ্যেও বুড়ো আভাস পায় এখান থেকে অনেক অনেক দূর দেশে ভ্রমণ করেছে এমন দলের লোকদের কাছে নাকি শোনা গেছে তারা নতুন ধরনের এক রকম মানুষের দেখা পেয়েছে যাদের ভাবসাব অদ্ভুত, গায়ে-গতরে নিয়ানডার্থালদের তুলনায় হালকা পাতলা, দীর্ঘাঙ্গ; চেহারাও কিছুটা ভিন্ন। ওদের হাতিয়ার উন্নত, নিজেদের মধ্যে কথার আওয়াজের বহু রকম ওঠানামা ঘটিয়ে চুটিয়ে কথা বলতে পারে ওরা। আর সে সব কথার মধ্য দিয়ে ফন্দি ফিকির করতে ওস্তাদ ওরা। ওভাবে ফন্দি ফিকিরের মধ্য দিয়ে কাজ করে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে ওরা। বুড়ো ভাবে এতটা বয়স হলো এমন মানুষের কথা বাপের জন্মে শুনিনি— নিশ্চয়ই নিজেদের কাউকে ওরা এমন অদ্ভুত মানুষ বলে ভুল করছে; নইলে হয়তো পুরো ব্যাপারটিই একটি গুজব।

* * *

এখন থেকে পাঁচ ছয় লক্ষ বছর আগে আফ্রিকাতে *হোমো ইরেকটাস* মানুষের কয়েক রকম বিবর্তিত রূপের সৃষ্টি হয়েছিলো যার মধ্যে দু'একটি প্রায় সেপিয়েন্স মানুষের পর্যায়ে পড়ে— কারণ তাদের মস্তিষ্ক অনেক বড় হয়ে ওরা নানা সক্ষমতায় সেপিয়েন্স মানুষের অনেক কাছাকাছি এসেছিলো। ওদের মধ্যে আধুনিক মানুষ বা সেপিয়েন্সদের সৃষ্টি হয়েছিলো দেড় দুই লাখ বছর আগে। ওদের একটি এগিয়ে যাওয়া দলে সাজুনির পরিবারকে আমরা দেখেছি দক্ষিণ আফ্রিকায়।

ওই প্রায়-সেপিয়েন্স মানুষের আর একটি শাখাকে নাম দেয়া হয়েছে নিয়ান-ডার্থাল— ওরা প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে *হোমো ইরেকটাস* থেকে আফ্রিকায় বিবর্তিত হয়েছিলো। পরে ওদের কেউ কেউ মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে এসে ওখানে বেশ ছড়িয়ে পড়েছিলো। ওখানকার নানা জায়গায় বিভিন্ন সময়ের নিয়ানডার্থালদের প্রচুর ফসিল ও বসবাসের নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে। এভাবে পাওয়া গেছে অন্তত এক লাখ বছরের বেশি সময় আগে থেকে মাত্র ত্রিশ হাজার বছর আগেরও খুব ভাল ফসিল ও ভাল নানা নিদর্শন। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ওই ফসিলের হাড় এত ভাল অবস্থায় আছে যে তার ডি এন এ পরীক্ষাও সম্ভব হয়েছে। এই সব থেকেই আমরা লাশাপালের বুড়ো এবং তাঁর পরিবার ও দলবলের সাধারণ বর্ণনাটি খাড়া করতে পেরেছি। বিশেষ করে এক লক্ষ বছরেরও বেশি সময় আগে থেকে ইউরোপ যেভাবে বরফের যুগে আক্রান্ত হয়েছিলো তার মধ্যে বেঁচে থাকতে গিয়ে নিয়ানডার্থালদের দৈহিক পরিবর্তনগুলো হয়েছিলো— জীবনধারাও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলো। তাদের থুতনিবিহীন, কিছুটা ঢালু কপালের, চেপটা মাথার খুলির যে খুব ভিন্ন চেহারা তা ফসিল থেকে উদ্ঘাটিত হয়েছে বুদ্ধির ও হাতিয়ার কৌশলের দিক থেকে ভিন্ন হবার ব্যাপারটিও নিদর্শনগুলো থেকে বোঝা গেছে। আরো গবেষণায় এখন জেনেছি নিয়ানডার্থালরা সেপিয়েন্স মানুষের থেকে খুব আলাদা বা খুব বেশি পিছিয়ে ছিল তা বলা যাবেনা।

লাশাপালের বুড়ো নিজে বাস করতেন ওই ৬০ হাজার বছর আগে ফ্রান্সের ওই জায়গায় নিয়ানডার্থালদের একজন হিসেবে। এটি আমরা জানি কারণ সেখানে একটি গুহার মধ্যে তাঁর প্রায় পূর্ণ ফসিল পাওয়া গেছে। আর সেই সঙ্গে পাওয়া গেছে নিয়ানডার্থাল বসবাসের অনেক নিদর্শন— প্রায় এক হাজারেরও বেশি নানা নির্দশন। এর মধ্যে রয়েছে ফ্লিন্ট পাথরের তৈরি নানা উপযুক্ত হাতিয়ার— ছুরি, বর্শাগ্র, কোরানি, চামড়া ছিলার ছোট হাতিয়ার ইত্যাদি। হাতিয়ারগুলোর বৈশিষ্ট হলো ৬০ হাজার বছর আগের এই হাতিয়ার এর সূক্ষ্ম উৎকর্ষের দিক থেকে দুই লক্ষ বছর আগের নিয়ানডার্থাল হাতিয়ারের প্রায় একই পর্যায়ে রয়ে গেছে— খুব বেশি নতুন উদ্ভাবনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। সেই সঙ্গে নানা বিচিত্র বড় পশুর হাড় পাওয়া গেছে যার অনেকগুলোতে হাতিয়ারের কাটাচেরার ও খাওয়ার আলামত রয়েছে এর মধ্যে গরু, বল্গা হরিণ, ঘোড়া ইত্যাদির হাড় যেমন আছে তেমনি আছে নেকড়ে, শেয়াল ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত ছোট প্রাণীরও হাড়।

১৯০৮ সালে আবিষ্কৃত এই ফসিলে বুড়োকে পাওয়া গেছে গুহাটির ভেতরে ঠিক মাঝখানে সযত্নে তৈরি করা একটি কবরের ভেতরে। কবরটি ও তার সঙ্গের কিছু জিনিসপত্রে বোঝা যায় যে এটি হচ্ছে পরিকল্পনা করে যত্নে তৈরি করা একটি কবর। নিয়ানডার্থালরা যে মৃতদেহকে সম্মান করতো এবং তার সৎকারের সঙ্গে ওদের একটি আনুষ্ঠানিকতা ছিল এমন ধারণা এর থেকে পাওয়া যায়। ফসিলটির হাত-পাগুলো কিছুটা বিকলাঙ্গ ছিল এবং তার ঘাড়ে, কাঁধে, পিঠে নিতম্বে ওষ্টিয়ো-আর্থারাইটিস নামের গুরুতর হাড়ের অসুখের চিহ্ন দেখা গেছে। তার দাঁতে মাড়ির গুরুতর প্রদাহের কারণে দাঁত মনে হয় বহুদিন ধরে একটিও কার্যকর ছিলনা। নিতম্বের এমন একটি হাড় ভাঙ্গা অবস্থায় দেখা গেছে যেটি মনে হয় অনেকদিন ধরে যত্নে নিশ্চল রাখার মাধ্যমে পরে ধীরে ধীরে সেরে উঠেছিল। এ সব থেকেও সেদিনের নিয়াডার্থাল মানবিক আচরণ সম্পর্কে বেশ খানিকটা ধারণা পাওয়া গেছে। ১৯০৮ সালে ফ্রান্সের ওই গুহায় আবিষ্কৃত হবার পর এই নিয়ানডার্থাল মানুষটিকে সবাই 'লাশাপেলের বুড়ো' বলেই ডাকে।

৬০ হাজার বছর আগে ওই সময় লাশাপেলের কাছাকাছি কোন সেপিয়েন্স অর্থাৎ আমাদের মত মানুষ ছিলনা বটে, কিন্তু সে সময়েই বা তারো আগে থেকে আফ্রিকার সঙ্গে সংযোগ স্থলে মধ্যপ্রাচ্যে ইতোমধ্যেই আফ্রিকা থেকে অভিবাসী হয়ে কিছু সেপিয়েন্স মানুষ বসবাস করছিলো এবং স্থানীয় পুরানো আদিবাসী নিয়ানডার্থালদের নিকট প্রতিবেশী হিসেবেই তাদের অনেকে ছিলো। অর্থাৎ মানুষের দুই প্রজাতি নিয়ানডার্থাল ও সেপিয়েন্স এক সঙ্গে সেখানে ছিলো— পরে ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলেও ৩০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত এভাবে ছিলো।

লাশাপালের বুড়োর কঙ্কাল

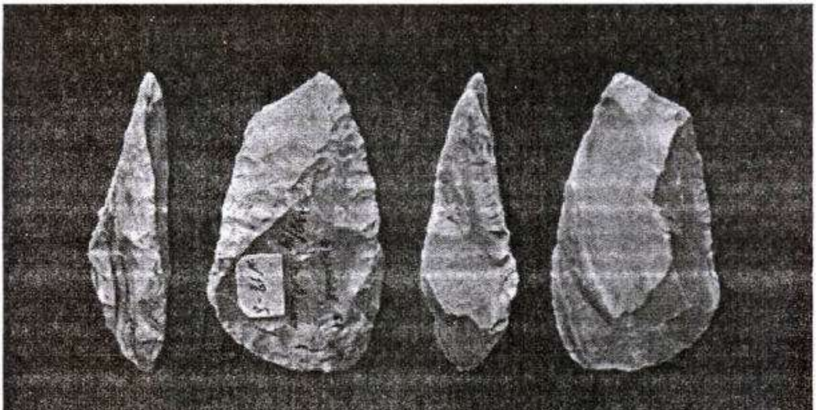

নিয়ানডার্থালদের পাথুরে হাতিয়ার

প্যালেস্টাইনের মানাত গুহার তন্বী ঃ
৫৫ হাজার বছর আগে

শুধু নিজের সমাজকে নয় নিজের মানব গোষ্ঠি সেপিয়েন্সদেরকে অগ্রাহ্য করে তন্বী ভালবেসেছে নিয়ানডার্থাল তরুণ বাসুকে। তন্বী অবশ্য বাসুকে স্থায়ী ভাবে পায়নি; কিন্তু ওই ভালবাসার ফলে আমরা আজকের সেপিয়েন্সরা পেয়েছি আমাদের বংশধারায় কিছু নিয়ানডার্থাল ডি এন এ।

প্যালেস্টাইনের সঙ্গে লেবাননের যেখানে সীমান্ত সেখানেই রয়েছে মানাত গুহা— আর আজ থেকে ৫৫ হাজার বছর আগের দিনে ওখানকার বাসিন্দা হলো তন্বীদের পরিবার। তন্বী ষোল বছর বয়সী তরুণী— আমাদের মতই সেপিয়েন্স মানুষ। মধ্য প্রাচ্যের এই অঞ্চলে তন্বীদের মত সেপিয়েন্স মানুষ বসত করছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে— কিন্তু তার আগে বহুদিন ধরে এখানে আছে অন্য রকম মানুষ নিয়ানডার্থালরা। তন্বীদের পূর্বপুরুষরা আফ্রিকা থেকে এসেছে বেশি দিন আগের কথা নয়। তাই এখনো নিয়ানডার্থালদের তুলনায় এলাকায় তাদের সংখ্যা কম।

মানাত গুহায় তন্বীদের যে পরিবার তা খুব বড় নয়— তন্বীরা তিন বোন, এক ভাই— তন্বীর ছোট ভাই ও ছোট বোন এখনো নেহাত শিশু। তন্বীর বড় বোন এখন কাছেই আর একটি পরিবারের বৌ। তন্বী নিজে বাবা-মার সঙ্গে থাকে, ছোট ভাইবোনকে যত্ন নিতে তাদের সাহায্য করে, এবং শিকার-সংগ্রহের কাজেও বাবা-মাকে সাহায্য করে। ওর দু'জন ছোট কাকাও ওই মানাত গুহায় তাদের সঙ্গে থাকে। ওদের পরিবারিক শিকারে শিশুরা ছাড়া সবাই যোগ দেয়। দলবদ্ধ ভাবে কঠিন শিকারগুলো যখন হয় তখন ৩০-৪০ জন পর্যন্তও দলে থাকে। আর যাযাবর জীবনে ঘোরাঘুরির দলটিও ষাটের কম সদস্যের হবেনা। আসলে এই দলটি এই মানাত অঞ্চলের বলতে গেলে এক মাত্র সেপিয়েন্স দল। মানাত অঞ্চলে স্থিত হয়ে ওরা থাকছে তাও বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল— অন্য সেপিয়েন্স প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় এবং প্রতিবেশী নিয়ানডার্থালরা শিকারের ব্যাপারে ওদের মত তত দক্ষ না হওয়াতে এই সময়টায় এখানে শিকারের পশু-পাখির অভাব হয়নি। তাছাড়া অন্য

সেপিয়েন্সদের মতো এরাও সর্বভূক। এখানে বন্য বার্লি এবং বন্য গম প্রচুর পাওয়া যায়; তাছাড়া খরগোস, কাঠবিড়ালি জাতীয় এবং গিরগিটি, টিকটিকি জাতীয় ছোট ছোট শিকার সব সময়েই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। তাই ঘটা করে বড় প্রাণীর শিকার কম করেও নানা বৈচিত্রময় খাবার খেয়ে ওরা বেশ তৃপ্ত। পাখির ডিম ও গিরগিটির মত সরীসৃপের ডিমও তাদের জন্য খুব উপাদেয় খাবার।

নিজেদের পরিবারে এবং কখনো কখনো নিজেদের বড় দলের মধ্যেই তন্বীদের দিন কাটে। বিশেষ করে তার বড় বোন যে পরিবারে বৌ হয়ে গেছে, এবং তার কাকাদের একজনের বিয়ে হয়েছে যে পরিবারের মেয়ের সঙ্গে, ওদের প্রায় সবার সঙ্গে তন্বীর যথেষ্ট খাতির। সুযোগ হলেই তাদের সঙ্গে গল্প-গুজব-আড্ডা চলে। একত্রে শিকার আয়োজন করার মাধ্যমে প্রায়ই এ সুযোগ আসে। ওদের ভাষা, ওদের নানা বিশ্বাস, আর ওসবকে কেন্দ্র করে নানা আচার অনুষ্ঠান, এ সবের মিল ওই বড় দলেরও সবাইকে আপন করে রাখে। পরস্পরকে দেখাবার জন্য নিজেদের দৈহিক সাজ-সজ্জা, অতিরিক্ত প্রসাধনী করা— এসবও সেপিয়েন্স সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের যথেষ্ট সুযোগ তন্বীর আছে— ওই সুযোগ যে সে নেয়না তা নয়। কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে তার মধ্যে কেমন যেন একটি উদাস প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। যারা তার খুব ঘনিষ্ঠ তারা হয়তো লক্ষ্য করেছে যে একটি বিষয়ে পরিবারে বা বন্ধুগোষ্ঠিতে অন্যদের সঙ্গে তার মতের বা আচরণের মোটেই মিল হতে চায়না। অন্য সবাই এ অঞ্চলের নিয়ানডার্থাল মানুষদেরকে যেমন একেবারেই মানুষ বলেই গণ্য করেনা, তন্বী কিন্তু সেটি মানেনা— বরং নিয়ানডার্থালদের প্রতি তার একটি গভীর পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।

বহুকালের স্থানীয় বাসিন্দা হলেও নিয়ানডার্থালদেরকে তন্বীদের গোষ্ঠি অর্থাৎ সেপিয়েন্সরা পাত্তা না দেবার অনেক কারণ রয়েছে। একে তো তারা দেখতে সেপিয়েন্সদের থেকে বেশ আলাদা— ওরা তন্বীদের মতো ছিমছাম দেহের, পূর্ণ থুতনি ও উন্নত নাক নিয়ে 'স্বাভাবিক' দেখতে নয়; যদিও এই স্বাভাবিকতা আপেক্ষিক ব্যাপার। নিয়ানডার্থালদের চোখে তাদের নিজেদের চেহারাকে বেশ ভালই মনে হয়— নিজেদের অনেককে মনে হয় দারুণ সুন্দর। তন্বীদের দলের সবার কাছে নিয়ানডার্থালদের জীবনযাত্রার গতি অর্থহীন ও মামুলি প্রকৃতির মনে হয়। তারা যে ওদের সম্বন্ধে খুব খবর রাখে তাও অবশ্য নয়— পারত পক্ষে তাদেরকে এড়িয়েই চলে। জনশ্রুতিতে যা জানে তা হলো ওরা নিজেরা যেমন দেহে স্থূল ওদের কাজকর্মও স্থূল প্রকৃতির। ঠান্ডার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে পশু চামড়ার পোষাক তারা ব্যবহার করে তাকে তন্বীর দলের লোকেরা পোষাক বলেই মানতে রাজি নয়— কারণ কোন সেলাই ওর মধ্যে নেই। দুই হাত, দুই পা আলাদা করে ঢেকে সারা শরীরের জন্য ফিট করা যে পোষাক সেপিয়েন্সরা ব্যবহার করে তার ধারে কাছেও ওটা নেই, শুধু কোন রকমে শুকনা পশু চামড়া

দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে নেয়া। আরো বড় কথা ওদের সত্যিকার ভাষা বলে কিছু আছে বলে মনেই হয়না। এদের খুব কম লোকই অবশ্য নিয়ানডার্থালদের কাছে গিয়ে তাদের কথা বোঝার চেষ্টা করেছে। বরং যা ছিটেফোটা তাদের কথা কানে এসেছে তাতে সে কথাকে ওরা ভাষা না বলে এক রকম গোঙানি বলে পরিহাস করে।

নিয়ানডার্থালদের হাতিয়ারগুলোর মধ্যে কোন রকম সৌকর্য নেই বলেও তারা মনে করে— যেমন ওদের বর্শার যে ছিরি— ছুঁড়ে দিলে ওপরের দিকে সুন্দর ভাবে কোনাকুনি গিয়ে আবার নামতে নামতে বহুদূরের পশুর গায়ে যে বিদ্ধ হবে তার জো নেই; বড় জোর কাছের পশুর গায়ে যেনতেন ভাবে লাগতে পারে। ওরা মনে হয় পশু শিকারে নিজের গায়ের শক্তি দিয়ে কাছাকাছি থেকে আঘাত করার ওপরেই বেশি নির্ভর করে; হাতিয়ারগুলোও সেভাবেই তৈরি। আর শুধু পোষাক আর হাতিয়ারের কথাই বলি কেন, নিয়ানডার্থালরা নিজেদের শরীরের বা আবাসের সৌন্দর্যের দিকেও তেমন কোন খেয়াল করেনা; নিজেদের গুহার বা তাঁবুর চারিদিকে ফেলনা খাবারদাবারের, চিবোনো হাড়, পশু চামড়া ইত্যাদির এমন জঞ্জাল গড়ে তোলে যে ওদিকে যাওয়া যায়না। অবশ্য যারা এসব কথা বলছে তাদের নিজেদের গুহাগুলোও যে খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তা বলা যাবেনা। যদিও তারা অবশ্য নিজের দেহের ওপর লাল মাটির পাউডার, ক্রীম মেখে, সুন্দর পাথরের মালা পরে একটু বেশিই সাজগোজ করে। মোটের ওপর মানাত গুহা অঞ্চলের এই সেপিয়েন্সরা নিয়ানডার্থালদেরকে একটু বোকা সোকা মানুষের গোষ্ঠি মনে করে।

নিয়ানডার্থালরা নিজেরা অবশ্য নিজেদের সম্বন্ধে এমন মনে করেনা। এখানে চরম শীত বা গরমের মধ্যে, অনেক সময় বেশ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ওরা যে ভাবে পুরো অঞ্চলটিতে নিজেদের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে সেটিকে তারা নিজেদের বাহাদুরি মনে করে। তাছাড়া ওদের সৌন্দর্যপ্রীতি নেই বা কাজের সৌকর্য নেই তাও ওরা মনে করেনা। তাদের অলঙ্কার তৈরি, ছবি আঁকা ওসব ওই নবাগতদের চেয়ে কম কিছু নয়। ওদের যে আচার-অনুষ্ঠান আছে তা কিছুটা ভিন্ন হলেও ওই নবাগতদের তুলনায় কোনটা কম জৌলুশের নয়। তাছাড়া ওরা তো এই নতুন মানুষদের কাছ থেকেও শেখার চেষ্টা করেছে। কাছের এই মানুষরা তাদের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন না হলেও কিছু দূরে তাদেরই অন্য দল রয়েছে যাদের সঙ্গে ওরা অলঙ্কার, হাতিয়ার ইত্যাদি বিনিময় করেছে, সে সব তারা ব্যবহারও করেছে। ভাষা না বুঝলেও তাদের সঙ্গে কাজ কারবার করতে ওদের বেশি অসুবিধা হয়নি। শুধু এই নতুন ধরনের মানুষদের মধ্যে অনেকেই যে নানা ফন্দি ফিকির করে তাদের ক্ষতি করতে চায়, তাদেরকে টিটকারি দেয়, তাদের নিয়েই আপত্তি। ওদের কাছে মনে হয় এই সেপিয়েন্স মানুষগুলো সব সময় নিজেদের মধ্যে একটানা নানা বিচিত্র আওয়াজ তুলে শলা-পরামর্শ করছে; তাদের কথার যেন শেষ নেই।

তন্বীর দলে সবাই যে নিয়ানডার্থালদেরকে ছোট করে দেখে তা নয়— দু' একজন আছে যারা ওদেরকে এড়িয়ে যায়না, কাজেকর্মে ওদের গুহায় যায়, ওদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। ওদের মধ্যে অবশ্য তন্বী নিজে হলো সবচেয়ে এগিয়ে। তন্বী নিয়ানডার্থালদের বেশ কয়েকজনকে চেনে। আলাদা হলেও সে ওদেরকে বোকা সোকা বা কোন দিক থেকে হীন বলে মনে করে না। বরং ওদের সরল জীবন, সাদামাটা বেশভূষা, খেটে খাওয়া ও সংগ্রামী মানসিকতার মধ্যে সে একটি আকর্ষণ বোধ করে যা তার নিজের মানুষদের মধ্যে দেখেনা। তার কাছে নিয়ানডার্থালদের তুলনায় তার আত্মীয়স্বজন সেপিয়েন্সদেরকে অনেক বেশি স্বার্থপর ও গোঁড়া মনে হয়। সেপিয়েন্সরা নিজেদেরকে খুব বিচক্ষণ বলে গর্ব করে বটে কিন্তু তন্বীর কাছে মনে হয় এই বিচক্ষণতা আসলে অন্যকে ঠকাবার কাজেই বেশি ব্যবহৃত হয়। তন্বীর এই ধারণাগুলো এক দিনে তৈরি হয়নি। এর জন্য মূলত দায়ী কাছেই একটি গুহায় থাকা নিয়ানডার্থাল পরিবারের একটি ছেলে বাসুর সঙ্গে তার সখ্যতা। ছেলেটি তার চেয়ে দু'এক বছর বড় হবে, কিন্তু প্রায় বছর খানেক ধরে ওরা দু'জনে বেশ ভাব— যা এখানকার নিয়ানডার্থাল আর সেপিয়েন্স মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার।

সদ্য তরুণ বাসুর খুব ব্যস্ত সময় কাটে— কারণ শিকার, হাতিয়ার তৈরি সহ পরিবারের দৈনন্দিন যাবতীয় কাজের অনেক দায়িত্বই তার ওপর এসে পড়ে। কিন্তু এসবের মধ্যেই তার সঙ্গে তন্বীর দেখা হয়, দূরে গিয়ে অন্যান্যদের অলক্ষ্যে কোন কোন কাজের ফাঁকে। কথা না বুঝলেও ওদের মধ্যে সুন্দর একটি বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গেছে। তন্বী বাসুর কাজগুলো তন্ময় হয়ে দেখে— কেমন করে সে একা একটি ছোট হরিণকে অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করে কিছুক্ষণের মধ্যে খাদ্যে পরিণত করে। সেটিকে কেটেকুটে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার আগে অনেক সময় এর খানিকটা আগুনে ঝলসে দু'জনে মিলে খেয়েছে। এও যেন তাদের একটি আনন্দের পিকনিক। তন্বীও মাঝে মাঝে পেষা গমে তৈরি পিঠা অথবা পাখির ডিম মেশানো খাবার এই পিকনিকে নিয়ে আসে। বাসু এসব খেতে অভ্যস্ত ছিলনা, কিন্তু এখন তন্বীর হাতে পড়ে দিব্যি খায়। ওদের মধ্যে সাধারণ অর্থে কোন কথা হয়না, কিন্তু মনের যোগাযোগে এবং চোখের হাতের শরীরের ভাষায় অনেক কথা হয়। পারিবারিক প্রয়োজনে তন্বীকে যে প্রায়শ একঘেঁয়ে অনেক কাজ করতে হয়; বাসুর সাহচর্যে ও সহায়তায় এখন তা খুব সহজ তো হয়েছেই বরং আনন্দের কাজে পরিণত হয়েছে।

ওই কোথাও সবুজ কোথাও মরুময় জায়গায় ছোট ছোট নানা সরীসৃপ ও তাদের ডিম সংগ্রহ, পেকে গেছে অথচ এখনো ঝরে যায়নি এমন বন্য গমের শস্য সংগ্রহ, আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য শুকনা খড়কুটা যোগাড়— এ সবে তন্বীকে সাহায্য করার ব্যাপারে বাসুর ক্লান্তি নেই। ও সমস্ত কাজে সে অভ্যস্ত ছিলনা, তন্বীর কাছে শিখেছে। বাসুর বলিষ্ঠ হাত যে তন্বীর জ্ঞাতিদের তুলনায় একটু বেশি

পেশীবহুল, ওর কপাল যে একটু নিচু, ভুরু যে একটু উঁচু এটি তম্বীর কাছে বিজাতীয় কিছু মনে হয়না— বরং বেশ মায়াভরা বলেই মনে হয়। তার নিজেদের গোষ্ঠির ছেলেদের তুলনায় বাসুকে সব দিক থেকেই তার অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়— সেই সূত্রে বাসুর বাবা-মা ও অন্যদেরকেও। তবে ওদের এই মেলামেশা তারা যথা সম্ভব অন্যদেরকে এড়িয়েই করতো— নইলে এ নিয়ে কথা হবে, এতে বাধা আসবে। সেপিয়েন্সরা নিয়েনডার্থালদেরকে মানুষ বলেই গণ্য করেনা; আর নিয়ানডার্থালরা ওদেরকে বিশ্বাস করেনা, সন্দেহের চোখে দেখে, অবশ্য তাদের উন্নততর কলা-কৌশলের কারণে কিছুটা সমীহও করে।

তম্বী-বাসুর সখ্যতা ক্রমেই ভালবাসায় রূপ নিয়েছে, এবং সেটি দৈহিক সম্পর্কেও গড়িয়েছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সেপিয়েন্স ও নিয়েনডার্থাল উভয় গোষ্ঠিতে সম্ভবমত যা হয় সেভাবে মেয়েটি স্ত্রী রূপে ছেলেটির বাড়ি চলে যাবে এমনটি হবার কোন জো ছিলনা; বিষয়টি বরাবর গোপনই ছিল। এর মধ্যে তম্বীরা মানাত গুহার বাস তুলে শিকারের নতুন এলাকার খোঁজে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলো— যদিও তার মন পড়ে ছিলো ওই নিয়ানডার্থাল ছেলেটির কাছে। ওই অবস্থাতেই এক সময় তম্বীর একটি ছেলে হলো— যা ওই যাযাবর সেপিয়েন্স পরিবারে এই বয়সী মেয়ের জন্য খুব অবাক হবার মত কিছু ছিলনা। বাবা-মা'রা যদিও তম্বীর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো তার সেদিকে মোটেই আগ্রহ ছিলনা আপাতত। নবজাত ফুটফুটে ছেলেটি পরিবারের অন্য সব নবজাতকের মতই হয়েছে। তার রংটা যে সেপিয়েন্সদের তুলনায় একটু বেশি ফর্সা, কপালটি যে একটু নামানো এসব লক্ষ্য করার মত এমন স্পষ্ট কিছু ছিলনা। যেটুকু লক্ষ্য করার ও জানার তা তম্বী একাই করেছে ও জেনেছে। মধ্যপ্রাচ্যের মানাত অঞ্চলের পরবর্তী প্রজন্মের সেপিয়েন্সদের মধ্যে ওভাবে তম্বীর ছেলের মাধ্যমে খানিকটা নিয়ানডার্থাল বংশগতি মিশে গিয়েছিলো। এমনটি যে আরো অন্য কারো কারো ক্ষেত্রেও এ অঞ্চলে হয়নি তা বলা যাবেনা। তবে ঘটনাটি যে বিরল তা স্বীকার করতে হবে। হাজার হলেও সেপিয়েন্সরা আর নিয়ানডার্থালরা তো ঠিক একই প্রজাতির মানুষ নয়।

* * *

২০১৫ সালের জানুয়ারীতে প্যালেষ্টাইনের লেবানন সীমান্তের কাছে মানাত গুহায় ৫৫ হাজার বছর আগের সেপিয়েন্স মানুষের মাথার খুলির ফসিল পাওয়া গেছে এবং সেই সঙ্গে মানব বসতির নানা আলামত। এর আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে মোটামুটি ওই সময়ের নিয়ানডার্থাল ও সেপিয়েন্স মানুষ বসতির আরো নমুনা দেখা গেছে। নানা সাক্ষ্য প্রমাণে জানা যায় যে তারও কিছু আগে প্রায় ৬০ হাজার বছর পূর্বের সময়ে আফ্রিকা থেকে কিছু কিছু সেপিয়েন্স মানুষ মধ্য প্রাচ্যের এসব জায়গায় পৌছে গিয়েছিল— সেদিক থেকে ওখানে তারা নবাগত। কিন্তু ওই আফ্রিকা থেকেই কয়েক লক্ষ বছর আগে আসা নিয়ানডার্থাল মানুষরা বহুকাল ধরেই এসব জায়গায় বসত করছিলো— সেই অর্থে ওরা

ওখানে আদিবাসী। বিভিন্ন কালের নিয়ানডার্থালদের নানা ফসিল ঠিক ওই অঞ্চলে পাওয়া গেছে। আমাদের আলোচ্য সেই ৫৫ হাজার বছর আগে উভয়ে মানাত গুহার কাছে প্রতিবেশী ছিল। সেপিয়েন্সরা নিয়ানডার্থালদের তুলনায় বেশ ভিন্ন এবং অনেক দিক থেকে অগ্রগামী হলেও ওসময় কাছাকাছি থাকার কারণে তাদের মধ্যে কিছুটা যোগাযোগ সৃষ্টি হয়।

পরে ৪০ হাজার বছর আগের সময়ের দিকে ইউরোপের বরফ যুগের মধ্যেই সেপিয়েন্সরা ইউরোপের নানা অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখানেও কোন কোন জায়গায় নিয়ানডার্থালদের কাছাকাছি বসবাস করেছে। সর্বশেষ বরফযুগ তীব্র হলে অধিকাংশ মানুষ ইউরোপের দক্ষিণের অঞ্চলগুলোতে ছিল। সেপিয়েন্সরা ওই অবস্থায়ও ছবি আঁকা, মূর্তি তৈরি, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে এক ধরনের কালচার সৃষ্টি করেছিলো যা ৭০ হাজার বছর আগের আফ্রিকায় সেপিয়েন্স কালচারের উন্মেষের তুলনায় আরো অগ্রগামী ছিল (যে উন্মেষটি সাজুনির গল্প থেকে আমরা দেখেছি)। অন্যদিকে নিয়ানডার্থালরা শীতের বিরুদ্ধে উন্নততর কৌশলের সুযোগ না নিতে পেরে, সেপিয়েন্সদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার চাপে বা আরো কোন অজানা কারণে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই গত ৩০ হাজার বছর ধরে ওখানে এবং দুনিয়ার সর্বত্র শুধু একই প্রজাতির মানুষই আছে— আমাদের মত সেপিয়েন্স মানুষ।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা গত শ'-দেড়শ' বছর ধরে ইউরোপে, মধ্য প্রাচ্যে, পশ্চিম এশিয়ায় বহু প্রাচীন নিয়ানডার্থাল ও সেপিয়েন্স মানুষের ফসিল, আবাস ইত্যাদি আবিষ্কার করেছেন এবং এগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। এমন কি এত প্রাচীন মানুষের প্রায় অবিকৃত ডি এন এ ও তাদের কঙ্কালের হাড় থেকে উদ্ধার করে তার মধ্যে জিন-বিন্যাসগুলো আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। নিয়ানডার্থাল আর সেপিয়েন্স মানুষের ধারা পৃথক হয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগে— এই দীর্ঘ সময়ে ওদের জিন-বিন্যাসে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে নিয়ানডার্থাল বৈশিষ্ট নিয়ে বিশেষ জিনগুলো সব নিয়ানডার্থালে থাকলেও তা সেই প্রাচীন সেপিয়েন্সের ডিএনএ বিশ্লেষণে কখনো পাওয়া যায়নি। এতে বোঝা যায় দীর্ঘকাল ওসময় কাছাকাছি বাস করলেও এবং উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রজনন করার মতো খুব কাছাকাছি প্রজাতি হলেও এই দুই মানব প্রজাতির মধ্যে কখনো জিন মিশ্রণ হয়নি।

কিন্তু কিছু সাম্প্রতিক আবিষ্কারে দেখা যাচ্ছে যে আফ্রিকার বাইরের সেপিয়েন্সদের মধ্যে কিছু বিরল নিয়ানডার্থাল জিন পাওয়া যাচ্ছে— যা আফ্রিকায় থাকা মানুষদের মধ্যে দেখা যায়না। উদাহরণ স্বরূপ ৪৫ হাজার বছর পুরোনো সাইবেরিয়ার কিছু সেপিয়েন্স ফসিলের ডিএনএ বিশ্লেষণে এমন নিয়ানডার্থাল জিন পাওয়া গেছে যা দেখে মনে হচ্ছে ৫৫ হাজার থেকে ৬০ হাজার বছর আগে সেপিয়েন্স ও নিয়ানডার্থাল মানুষের মধ্যে কিছু কিছু জিন মিশ্রণ ঘটেছিল। সব কিছু থেকে আরো মনে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে মানাত গুহার অঞ্চলে এমনটি সবার আগে ঘটার সম্ভাবনা বেশি। আর সেখান থেকেই আমাদের তন্বী ও বাসুর প্রেম কাহিনীর কল্পনা।

এখন আরো ব্যাপক ভাবে দেখা যাচ্ছে যে আফ্রিকার বাইরের— অর্থাৎ ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ার মানুষের মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণে নিয়ানডার্থাল জিন রয়েছে, অর্থাৎ পূর্বপুরুষের দিক থেকে নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে আমাদের এইটুকু

আত্মীয়তা আছে এবং আমরা হয়তো এইটুকু নিয়ানডার্থাল বৈশিষ্ট বহন করছি। আফ্রিকার মানুষের সঙ্গে তার পুরো ইতিহাসে কখনো পরবর্তী নিয়ানডার্থালদের সংশ্রব ঘটেনি বলে এই নিয়ানডার্থাল জিন পাওয়া যায়না। এর মাধ্যমে আরো বোঝা যাচ্ছে যে নিয়ানডার্থালদেরকে আমরা আমাদের থেকে যত আলাদা আগে মনে করেছি তারা মোটেই তা নয়। বরং তুলনামূলক ভাবে সাম্প্রতিক গত ৫৫ হাজার বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের ভেতর তাদের কিছু জিন বৈশিষ্ট আমরা ধারণ করছি। ৩০ হাজার বছর আগে সর্বশেষ নিয়ানডার্থালরাও পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে— কিন্তু তাদের কিছুটা বংশধারা আমাদের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে বৈকি!

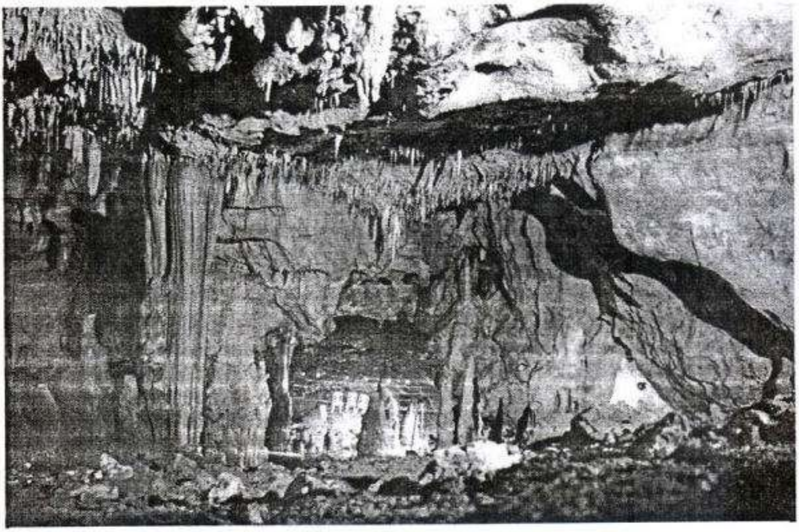

মানাত গুহা

মানাত গুহায় পাওয়া খুলি

মানাত গুহার হাড়গোড়

ইউক্রেনের পুশকারির বোরিস ঃ ২২ হাজার বছর আগে

প্রায় সারা বছর বরফ ঢাকা শীতে বৃক্ষবিহীন ওই কঠিন তুন্দ্রাতে বিশালকায় হাতির মত ম্যামথের হাড়-চামড়া-দাঁতের উপকরণ দিয়ে ঘর তুলেছে পাঁচটি পরিবার। হরিণ শিকার তাদের একমাত্র জীবিকা। এক পরিবারের কর্তা বোরিস কাজে হম্বিতম্বি করে বটে, কিন্তু রাতের ভোজের পর দারুণ আড্ডাবাজ।

পূর্ব ইউরোপের এই ছোট্ট একাকী গ্রামটিতে মাত্র অল্প ক'জন মানুষই থাকে (২২ হাজার বছর আগের এই সময়ে এসে মানুষ মাত্রই সবাই আমাদের মত হোমো সেপিয়েন্স)। তাদের মধ্যে মুরব্বি গোছের বয়স্ক মানুষদের কাছে প্রায়ই শোনা যায় কী ভাবে গত বহু বছর ধরে শীত খালি বাড়ছেই তো বাড়ছেই। এসব তারা নিজেদের জীবৎকালে যেমন দেখছে তেমনি তাদের বাপ-দাদার কাছেও শুনে এসেছে। শীত ওদের বড় শত্রু— যেমন ঠান্ডা পরিবেশ, তেমনি হু-হু করে উত্তর দিক থেকে আসা কনকনে শীতল বাতাস জীবনযাত্রাকে খুব কঠিন করে তোলে। চারিদিক বরফে ঢাকা— বলতে গেলে সারা বছরেই এই অবস্থা। এর মধ্যেই তাদেরকে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে। তার মানে এই নয় যে পুশকারি অঞ্চলের এই গ্রামের মানুষের যাযাবর জীবনটিকে নিরানন্দ বলা যাবে। বরং এর মধ্যেই তারা খুঁজে নিয়েছে আনন্দের অনেক খোরাক; আর যাযাবর জীবনটাকেও কিছুটা রাশ টেনে ধরেছে সুন্দর গ্রাম রচনা করে; অন্তত যতদিন পারা যায় এক জায়গায় বাস করে জীবন গড়ে তুলতে।

জায়গাটিকে বলা যায় তুন্দ্রা জাতীয়। তুলনামূলক গরমের অল্প কিছুদিন যেখানে বরফ থাকেনা সেখানে বরফ গলা পানির মধ্যেই দেখা যায় মাটির সঙ্গে লেপটে থাকা ছোট ছোট গুল্ম যা এখানকার বড় বড় কিছু তৃণভোজীর খাদ্য। এসবের মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রাণী এখানকার ম্যামথরা (হাতির মত কিন্তু তার চেয়ে অনেক গুণ বড় এখন বিলুপ্ত প্রাণী)। বিশাল হলে কী হবে ওদেরকেও দলবদ্ধ ভাবে শিকার করার সব কলাকৌশল এখানকার মানুষের জানা। তাছাড়া

নিজ থেকে মরা ম্যামথের বিশাল বিশাল হাড়ের কঙ্কাল সর্বত্র প্রচুর পাওয়া পাওয়া যায়। সদ্য মরা ম্যামথের সন্ধান পেল তার চামড়াটা ছিলে নিয়ে সুন্দর শুকানো চামড়া নানা কাজে লাগায় এরা। এসব হাড় আর চামড়ার সব চেয়ে বড় ব্যবহার হলো বাড়ি তৈরিতে।

যে ছোট্ট গ্রামটিতে বোরিস থাকে সেখানে মাত্র পাঁচটি বাড়ি কিছুটা অর্ধ চন্দ্রাকৃতিতে আকারে রয়েছে যেন পাঁচ বাড়ি, এক উঠান। ওরই একটি বাড়ির কর্তা বোরিস। বছর তিরিশেক বয়স হলেও ইতোমধ্যেই সে একজন বহু পোড় খাওয়া গৃহকর্তা— তার বাড়িতে বৌ, এক মেয়ে ও দুই ছেলে। পাশের দুটি বাড়ি তার দুই ভাইয়ের। বাড়িগুলো যত্ন করে তৈরি; তবে এর সকল সরঞ্জামের জন্য ওরা ওই শুধু ম্যামথের ওপরই নির্ভরশীল। এই তুন্দ্রা অঞ্চলে পাথর, হাড় আর প্রাণীদেহের অন্যান্য কিছু অংশ যেমন চামড়া, রগ ইত্যাদি ছাড়া আর কীই বা উপকরণ আছে?

প্রত্যেকটি বাড়ি এটি গম্বুজের মত— অথবা বলা যায় একটি বিশাল বাটি উল্টানো আছে। এ বাড়ি আগাগোড়া ম্যামথের হাড় আর চামড়া দিয়ে তৈরি। বৃত্তাকার দেয়ালটি তৈরি হয়েছে অল্প কিছু দূরে দূরে বিশাল মোটা স্তম্ভের মত ম্যামথের পায়ের হাড় দিয়ে। আর এই থামগুলোর মাঝখানের ফাঁকটি ভরানো হয়েছে অনেকগুলো ম্যামথের চোয়ালের হাড় পরস্পরের গায়ে গায়ে লাগানো ঘন সন্নিবেশে— যাতে বাইরের ঠাণ্ডা ভেতরে একেবারে ঢুকতে না পারে। ঘরের দরজাটি রীতিমত দেখার মত— কিছুটা রাজকীয়ই বলা যায়। দরজাতে দুপাশে দুটি বিশাল ম্যামথের দাঁত (হাতির দাঁতের আকৃতি কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড়) বাঁকা হয়ে ওপরে ওঠে পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে। এরকম ম্যামথ দাঁতের আরো ব্যবহার হয়েছে গম্বুজের মত গোল হয়ে আসা ছাদের কাঠামোটি তৈরি করতে। ছাদ নিজে কিন্তু তৈরি চামড়া আর শুকনা ঘাসগুল্মের চাপড়া জমিয়ে জমিয়ে। এগুলোকে ধরে রাখার জন্য বিস্তারিত কাঠামোটি তৈরি হয়েছে ম্যামথ দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে হাড়ের ও কিছু ডাল-পালার (যা খুব সহজলভ্য নয়) তৈরি বেড়ার মত বুনোনির দ্বারা। ওই ম্যামথের দাঁতগুলো ছাদের চামড়া আর ঘাস চাপড়াগুলোকে চেপে রাখে।

ম্যামথ এবং এরকম আরো সব বড় বড় পশুর হাড়গুলো ওরা প্রচুর পরিমাণে পায় আরো উত্তরে আরো প্রচণ্ড শীতের অঞ্চলে এসব পশু ব্যাপক হারে মারা পড়ে বলে। সেখান থেকে হাড়গুলো নদীর পানিতে ভেসে আসে— যে অল্প সময়টুকু নদীর পানি পানিই থাকে, জমে বরফ হয়ে যায়না। এখন অবশ্য নদী জমাট বেঁধে বরফ হয়ে আছে। ওখানে যে হাড় আটকে আটকে রয়েছে সেগুলো কুড়িয়ে বরফের ওপর তর তর করে চলা শ্লেজে সেগুলো তোলা হয়েছে— সেই শ্লেজকে এখন গ্রামে আনার পালা। ওই হাড় দিয়ে বাড়িগুলো প্রায়ই মেরামত করতে হয়, তাছাড়া আরো নানা রকম নির্মাণ কাজের জন্য হাড়ের ওপরই নির্ভর করতে হয়।

যে ক'জন লোক শ্লেজটাকে টেনে আনছে বোরিস ও তার দুই ভাই তার মধ্যে রয়েছে। অবশ্য পোষাকের মধ্য থেকে তাদেরকে চেনা বড় মুশকিল। পশম সহ চামড়ার তৈরি এই পোষাকই এমন শীতে তাদেরকে বাড়ির বাইরে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। এটি কোন রকমে চামড়া দিয়ে গা ঢাকা নয়— রীতিমত চারিদিকে টাইট আবদ্ধ করা সেলাই করা পোষাক। এ পোষাক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ডিজাইন ও সেলাই করতে হয়েছে। শুধু মুখের সামনে সামান্য জায়গায় কোন পোষাক নেই— সেটুকুও বোরিসের লম্বা দাঁড়ি ও লম্বা চুলে প্রায় ঢাকা বললেই চলে। ওরা শ্লেজ টেনে এনে তাদের বাড়ির পাশের এক জায়গায় হাড়গুলো জমা করলো।

এদিকে খুবই স্বল্প দৈর্ঘ দিনের আলোও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। দেখা গেলো দূর থেকে চার পাঁচজনের একটি দল হেঁটে আসছে— ওরা গিয়েছিলো কাছাকাছি একটি পাথুরে জায়গা থেকে কিছু পাথর ভেঙ্গে আনতে। ওদের মধ্যে বোরিসের বড় ছেলেটিও রয়েছে। হঠাৎ ওসময় একটি বল্গা হরিণ তাদের নজরে পড়ে গিয়েছিলো খুব সম্ভব দলছুট হয়ে পথ হারিয়ে ওখানে এসে পড়েছিলো। যেই না দেখা অমনি ওই চার পাঁচজন এটিকে ঘিরে হাতের পাথরের অস্ত্রের আঘাতে কাবু করে ফেললো। একটি গাছের ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে কাঁধে করে এই হরিণকে বয়ে নিয়ে আসতে দেখে বাদবাকি সবার কী আনন্দ! বোরিসের বৌয়ের আজকের খাবার তৈরির পরিকল্পনা ছিল তাদের মাটির গর্তের ফ্রিজ থেকে আগের জমানো কিছু মাংস রান্না করে খাওয়া। প্রত্যেকের বাড়ির বাইরে এ রকম গর্ত করা আছে বাড়তি মাংস রাখার জন্য— যার মুখ সব সময় জমা বরফে ঢাকা রয়েছে। বোঝা গেল আজ ভাগ্যক্রমে বাড়তি শিকার এসে যাওয়ায় খাওয়াটি টাটকা মাংস দিয়েই হবে।

সন্ধ্যার পরের বাদবাকি কাজ বরাবরের মতই হবে। দুটি বাড়ির ফাঁকে একটু আড়ালের জায়গায় সাত আটজন স্ত্রী-পুরুষ বেশ আসর জমিয়ে বসেছে। বড় একটি গাছের গুড়ি জ্বালিয়ে ওখানে আগুন আগে থেকেই জ্বলছিলো। ওরা আগুনটিকে ঘিরেই বসেছে। ওদের মধ্যে বোরিস ও তার বড় ছেলে আছে, এক ভাই ও ভাইয়ের বৌও আছে। অন্যান্য বাড়ি থেকেও কেউ কেউ আছে। শীতের থেকে বাঁচার জন্য সবাই গুটিসুটি হয়ে বসেছিলো— সারা দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা, গল্প বলা, এসব আড্ডার ঢঙে চলছে; আর চলছে খানার আয়োজন। বোরিসের নেতৃত্বটি বেশ স্পষ্ট। যদিও দলের তরুণতররা চেষ্টা করছে নিজেরা সব সামাল দিতে বোরিস কিন্তু প্রায়ই বাগড়া দিচ্ছে— এটি এভাবে কর, ওটি ওভাবে করো ইত্যাদি বলে। হরিণটির চামড়া ছিলে মাংস আলাদা করে ভাগ বাটোয়ারা করতে বৌরাও কম ব্যস্ত নয়। মনে হয় বোরিসের এই ভাইয়ের বৌকে সবাই একটু সমীহের চোঁখে দেখে তার বুদ্ধিমত্তা ও কাজের দক্ষতার জন্য। গ্রামে কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ আছে গল্পের আসরে সব চেয়ে বেশ সক্রিয়। তবে আজকের এই ব্যস্ত আসরে তারা অনুপস্থিত।

এই যে পাঁচটি পরিবার পুশকারিতে এখন আছে, তাদের কেউ কেউ পরস্পর আত্মীয়তায় সম্পর্কিত, কেউ কেউ নয়। আগামী গ্রীষ্মের আগে পর্যন্ত ওরা এক সঙ্গেই থাকবে, এক সঙ্গেই সব কিছু ভাগ করে নেবে, এক সঙ্গেই সব কাজ করবে। গরম কাল এসে গেলে অবশ্য এ জায়গা ছেড়ে ওরা অন্যত্র যাবে, শিকার ও কাজের ধরণ বদলে। তখনো হয়তো দু'একটি পরিবার এক সঙ্গে থাকবে, সবাই নাও থাকতে পারে। আপাতত এ রাতের কাজ হলো অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া হরিণের মাংসের ভোজকে উপভোগ করা। যে আগুনটি এখানে তারা জ্বেলেছে তাতে ঝলসে ঝলসে বল্গা হরিণের মাংস খাওয়া চলছিলো। অন্যরা যারা নিজেদের ঘরের মধ্যে থেকে গেছে তাদের কাছে মাংস পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে— বা তারা নিয়ে গেছে। প্রত্যেক বাড়িতেই রয়েছে উনুনের আগুন যেখানেও মাংস ঝলসানো যায়। আনুষঙ্গিক কাজগুলো হলো পশুটির দেহ থেকে দরকারী সব জিনিসের সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু করা। তার শিংটি খুব কাজে আসবে— এর থেকে পাথরের বিভিন্ন ছুরি, করাত ইত্যাদির হাতল তৈরি হবে, আবার হারপুন হিসেবে এটি নিজেও শিকারের হাতিয়ার হবে। চামড়া আর রগের সংরক্ষণটি যত্নের সঙ্গে করতে হবে। এই চামড়া দিয়েই পোষাক, থলে, আচ্ছাদন সব তৈরি হবে আর সরু রগ করবে সেলাইয়ের সুতার কাজ, আবার বাঁধাছাঁদার শক্ত সুতারও কাজ। হাড় থেকেও দাঁত থেকে অন্য নানা কাজের সঙ্গে গলায় পরার লকেট অলঙ্কারও তৈরি হবে; এই দিকটিও ওরা ভোলেনা। আপাতত সব কিছু যত্ন করে সংরক্ষণে রাখছে এগুলো দিয়ে পরবর্তী কাজের জন্য। এই যে পাঁচ ঘর মানুষ আছে এ ধরনের শিকারের মাংস তাদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করা হয়। রাতের খাবারের পর সবাই যার যার বাড়তিটুকু বরফের গর্তের মধ্যে জমিয়ে রাখলো। এটা সেটা তৈরি বা প্রক্রিয়াকরণের জন্য বাছাই করা জিনিসগুলোর মধ্যে যেগুলোর নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে তাও এরপর গর্তে রাখা হলো।

এসব কাজ শেষ হলে, খাওয়ার পরের আড্ডা আস্তে আস্তে থেমে আসে— ওখানে যে কাঠে আগুন জ্বলছিল সেটিও স্তিমিত হয়ে আসে। পরিবারগুলো যার যার ঘরে চলে যায়। যাদের হাতে অন্য কাজ ছিলো, তারা বাইরে আসেনি নিজ নিজ ঘরেই খাওয়ার কাজ সেরে নিয়েছে। বোরিসের ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটি হবার যো নেই, এক ধরনের নেতৃত্ব তাকে দিতে হয়। তাই তাকে শেষ পর্যন্ত মূল আসরেই থেকে যেতে হয়, সবার খোঁজ খবর করতে হয়। অবশেষে বোরিসও তার ঘরে ফেরে— ওখানে বোরিসের বৌ আর ছোট ছেলে ও মেয়ে ওখানেই খাবার সেরে এখন দরজার বাইরে কাজে ব্যস্ত, যে কাজ তারা আগে থেকেই করছিলো। কাজটি হলো পাথরের হাতিয়ার তৈরি। এ কাজে বিশেষ দক্ষতার জন্য বোরিসের বৌকে পাঁচ বাড়িতেই সবাই শ্রদ্ধা করে; বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনেকটা শিক্ষকের মতো। নিজের ছেলেমেয়েদেরকেও সে ভাল শিখিয়েছে এটি। বোরিস ঘরে ঢুকে ভেতরটায় একটু চোখ বুলিয়ে নেয়— বৌ বাচ্চাকে

শুনিয়ে শুনিয়ে আজকের আসরের দু'একটি মজার ঘটনা বলতে বলতে। বাইরের ঠান্ডার ও রুক্ষতার মধ্যে ঘরের ভেতরটা বেশ আরামদায়কই বলতে হবে। ঘরের ঠিক মাঝখানটাতে ছাই ভর্তি উনুনে এখানে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলাতে ঘরটি বেশ উষ্ণ। ওই উনুনের চারিদিকে ঘরের পুরো মেঝটা জুড়ে পশু চামড়া পশম বিছানো বলে এটি বেশ নরম ও আরামদায়ক।

ঘরে আসবাবের মত যা রয়েছে তা হলো ম্যামথের মোটা পায়ের হাড় আর ম্যমথের বিশাল মাথার খুলির হাড়। একটু আরামে বসা, পোষাক ইত্যাদি জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, তৈরি হাতিয়ারকে গুছিয়ে রাখা— এসব কাজ কোন রকমে চলে সে রকম মামুলি কিছু আসবাব। তবে ঘরটিতে অগোছালো ভাবটিই বেশি। চুলার আগুনের আধো আলোতে তাই একটু খুঁজে নিলে আরো নানা জিনিস চোখে পড়ে— কাঠ খোদাই করে বাটির মত জিনিস তৈরি করা হয়েছে যার থেকে খাওয়া দাওয়া করা হয়, অন্যান্য কাজও করা হয়। হাড় ও হরিণের শিং দিয়ে নানা রকম দরকারী জিনিস তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে হাতিয়ারের অংশ বা হাতল, অথবা পুরা দস্তুর হাতিয়ার। পরে ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু হরিণের শিং রাখা আছে— সেগুলো এক রকম আসবাব হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। নানা কিছু কাটাকুটির জন্য পাথরের সে হাতিয়ার ওরা বানিয়ে রেখেছে সেও দেখার মত— এসব হাতিয়ার ও শিকারের অস্ত্র এক পাশে গুছিয়ে রেখেছে বটে, তবে হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে এমন অনেক পাথরখণ্ড ঘরের দেয়ালের দিকে ছড়ানো ছিটানোও রয়েছে। চামড়া সেলাই করে তৈরি ছোট বড় থলে ও বস্তার মত জিনিস রয়েছে বেশ কিছু— কোন কোনটি ঝোলানো, কোন কোনটি মেঝের ওপর। দরকারী জিনিসপত্র আনতে নিতে এদের ব্যবহার হয়।

বাইরে এসে বোরিস কিছুক্ষণ ধরে তার বৌ-বাচ্চার হাতিয়ার তৈরির কাজ দেখলো। ছোট ছোট অনেক ফ্লিন্ট পাথরের খন্ড আগে থেকেই এনে রাখা ছিল। সেগুলো নিয়েই কাজ করছে ওরা— এদের এক একটিকে হাতের ওপর বা কখনো হাঁটুর ওপর রেখে অন্য পাথর দিয়ে টুক টুক টুক এর ওপর আঘাত করে যাচেছ, পাথর থেকে উঠে আসছে তার পাতলা অংশ। এগুলোর মধ্যে যেগুলো বড় ও যুৎসই সেগুলোকে কাছে রাখা হচ্ছে এবং এর আকৃতি অনুযায়ী কাজ করে গড়ে তোলা হচ্ছে সুন্দর ছুরি, ব্লেড, বর্শাগ্র ইত্যাদি। আরো যে সব ছোট ছোট টুকরা ওভাবে পাথর থেকে উঠে আসছে সেগুলো কোন কাজে লাগবেনা— সেগুলো ওরা দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে কথাবার্তা চলছে, হাসাহাসি চলছে, বোরিস এসে পড়ার পর সেও কিছুক্ষণ ওই হাতিয়ার তৈরির দলের সঙ্গে যোগ দিল— যতটা না দ্রুত পাথরের ওপর পাথর ঠোকার কাজ করতে, তার চেয়ে বেশি সারা দিনের পরিশ্রমের পর বৌ-বাচ্চার সঙ্গে আড্ডা দিতে।

সব কিছুর পটভূমিতে অবশ্য চলছিল টুক টুক টুক পাথরের আওয়াজ, আর মাঝে মাঝে হাতুড়ি পাথরটি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে অন্য পাথরের ওপর না পড়ে আঙ্গুলের ওপর

এসে পড়লে যাতনায় উহ করে ওঠা অথবা পাথরের ভাল একটি টুকরা ওঠে আসতে আসতে যদি ভেঙ্গে যায় তা হলে 'দুশ শালা' বলে গাল দিয়ে ওঠা। রাত আরো ভাল ভাবে নামলে এ কাজ আর বেশিক্ষণ চালানা সম্ভব হয়না। রাতের উত্তাপ অসম্ভব রকমে নেমে আসায় ঘরের দাওয়ায় জ্বালানো আগুনের শিখা আর চামড়া-পশমের পোষাকের মধ্যেও শীত আর সহ্যের মধ্যে থাকেনা। অত্যন্ত শীতল তীব্র বাতাস হুহু করে হাতেমুখে লাগে। দূরে নেকড়ের সমস্বর ডাক আর্তনাদের মত ভেসে এসে গা ছম ছম করে ওঠে। ওরা ভাল করে দোর দিয়ে ঘরের মধ্যের একটু উষ্ণতার মধ্যে চলে গিয়ে ওখানে প্রচুর পশমের লেপের নিচে ঘুমের জগতে চলে যায়।

পুশকারির এই গ্রাম পাঁচ বাড়ি এক উঠানে গঠিত হলেও অর্ধ চন্দ্রাকারে সাজানো পাঁচ বাড়ির ঠিক মাঝখানটিতে আর একটি ঘর আছে যা কোন বিশেষ পরিবারের নয়, পুরো গ্রামের মিলন স্থল হবার জন্যই এটি তৈরি হয়েছে। এটিও ম্যামথের পায়ের হাড়, বিশাল দাঁত এ সবের কাঠামোর ফাঁকে ফাঁকে ম্যামথ চোয়াল ইত্যাদির ঠাসা দেয়াল আর পশু চামড়াও ঘাসের চাপড়ার ছাদ দিয়ে তৈরি— অন্য বাড়িগুলোর মত। তবে এটি একটু লম্বাটে উপবৃত্তাকার আর অপেক্ষাকৃত বেশ বড়। বোরিসের বাড়ি বা এরকম অন্যান্যদের বাড়ির ভেতরটা যেমন দেখলাম সে রকম নানা হাড়ের আসবাব, হাতিয়ার, পাথরকুচি ইত্যাদি নানান আগোছালো জিনিসের ভিড়ে বসবাসের চিহ্ন এখানে নেই। আপাতত ঘরটি একেবারে খালি— মানুষ জন কেউ নেই। মেঝটি চামড়া ও পশম ঢাকা হওয়া ছাড়া অন্য কিছু তেমন নেই। ঘরটির এক প্রান্ত একটি বিশাল ম্যামথের মাথার অর্থাৎ চোয়াল ও খুলির হাড় রাখা আছে যা ঘরে ঢুকলেই নজর কাড়ে। সাধারণ ম্যামথের মাথার চেয়েও এটি খানিকটা বেশি বড়। এর সাদা অবয়বের ওপর টকটকে লাল রঙ দিয়ে ওপর-নিচ বেশ কটি মোটা রেখা টেনে একে আরো দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হয়েছে।

ওই জায়গাটি যেন একটি বেদীর মত করে তৈরি। এর পাশে রাখা আছে সরু সুন্দর কিছু পাখির হাড়। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় এরা আসলে সঙ্গীতের উপকরণ। কোন কোনটি ড্রাম বাজানোর কাঠির মত, কাঠ-পাথর নানা জিনিসের ওপর তালে তালে ঠোকার উপযোগী। আর কয়েকটি পাখির হাড় রয়েছে যেগুলো ফাঁপা এবং তার দেয়ালে পর পর কয়েকটা ছিদ্র করা আছে— দেখলেই বোঝা যায় এগুলো বাঁশির মত ব্যবহৃত হয়। ওই মূল চিত্রিত বড় ম্যামথের মাথার কাছে রাখা আছে খুব ছোট ছোট কয়েকটি ক্ষুদ্র মূর্তি— পাথর খোদাই করে তৈরি। এর কোনটিই চার-পাঁচ সেন্টিমিটারের বড় নয়, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলে বোঝা যায় কত যত্ন সহকারে এদের তৈরি করা হয়েছে। কোন মানুষের বা পশুর হুবহু চিত্রায়িত মূর্তি এগুলো নয়, বরং কোন কোন দিক থেকে বেশ অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, যেমন চোখটাকে খুব বড় করে দেখানো হয়েছে।

পুশকারির ওই গ্রামের এই সার্বজনীন ঘরটি দেখলে বোঝা যায় এটি গ্রামের সকল বাসিন্দার এক সঙ্গে বসার উপযোগী করে তৈরি। মাঝে মাঝেই এখানে গা

ঘেঁষাঘেষি করে বসে একটু উষ্ণতার মধ্যে নানা বিষয়ে আলাপ-পরামর্শ করে ওরা। বিশেষ বিশেষ দিন বেশ কিছু আমোদ ফুর্তির ব্যবস্থা হয় এখানে— এক সঙ্গে গান গাওয়া, উপহার সামগ্রী বিনিময় করা ইত্যাদি। ওই সময়েই বাঁশি বাজানো, তালে তালে ড্রাম বাজানোর প্রয়োজন হয়। এসবের একটি আনুষ্ঠানিকতার, আচার পালনের দিকও আছে। ওই বেদী, চিত্রিত ম্যামথ মাথা, অতিরঞ্জিত ছোট মূর্তি— সেগুলোর একটি ভূমিকা রয়েছে এই আনুষ্ঠানিকতায়। অনেক ভক্তি, অনেক ভয়, অনেক আশঙ্কা ওদের জীবনের মধ্যে যে রয়েছে সেখানে উত্তরণের জন্যই এই সব আচার অনুষ্ঠান।

সাধারণ আটপৌরে জীবনের বাইরে গিয়ে তারা যা সৃষ্টি করছে তাতেও তাদের ওই ভক্তি, ভয়, আশঙ্কা ইত্যাদির ছাপ পড়ছে। ওই মিলন-ঘরে রাখা ছোট মূর্তিগুলোর সৃষ্টির পেছনে শিল্পী-মনটিও এসবের দ্বারা প্রভাবিত। এই শিল্পীমনের দেখা এখানে পাই বাঁশি তৈরি করে তা বাজানোর মধ্যে, এবং লাল মাটি, হলুদ মাটি, কাঠ কয়লা এসব গুড়ো করে রঙ বানিয়ে তা দিয়ে ছবি আঁকার মধ্যে। এখানে ম্যামথের মাথা, হাড়ের আসবাব, হাতিয়ারের হাতল ইত্যাদির ওপর চিত্রায়নে ও আঁচড় কেটে তারা এ শিল্পী মনের প্রকাশ ঘটাচ্ছে। গ্রামটি থেকে খানিকটা দূরে যে পাথুরে জায়গা রয়েছে সেখানে ওদের কেউ কেউ বড় বড় ছবিও এঁকে রেখেছে। তারা শিল্পী হিসেবে বিশেষ ভাবে পরিচিত। যেমন বোরিসের এক চাচা এখন যথেষ্ট বয়স্ক— শিকার ইত্যাদি কাজে অসমর্থ; কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা যখন তাঁকে ওই পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে বড় চিত্রের আয়োজন করতে দেয় তখন সেই কাজে তাঁর কোন ক্লান্তি নেই, পারদর্শিতার অভাবও নেই। পশম ও গাছের আঁশ দিয়ে তৈরি করা ব্রাশ রঙে ডুবিয়ে চলে তাঁর আঁকা। তবে ব্রাশ ছাড়াও আরো নানা কায়দায়ও এটি চলে। মুখের মধ্যে জলো রঙ নিয়ে চামড়ায় কাটা ষ্টেনসিলের মধ্যে দিয়ে তা চিত্রের উপর কুলি করে ছিটিয়ে একই ডিজাইন তিনি চিত্রে বার বার ফুটিয়ে তুলতে পারেন, যেমন ছোট বড় নানা বৃত্ত। তিনি বেশি আঁকেন শিকারের বড় বড় পশুর ছবি— কিন্তু হুবহু সেই পশুর ছবিও আবার নয়, অনেক কিছু যেন অতি-প্রাকৃত। এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি একটি ঘোরের মধ্যে আঁকতে থাকেন খুবই প্রতিকূল একটি আবহাওয়ার পরিবেশের মধ্যেও।

গ্রামের মানুষদেরকে প্রায় সব সময়েই চামড়ার ও পশমের পোষাক পরে থাকতে হয় বটে কিন্তু কখনো কখনো ঘরের উষ্ণতার মধ্যে সে পোষাক কিছু উম্মুক্ত করলে দেখা যায় তারা সাজতে কত ভালবাসে। গায়ে অনেকরই রঙ মাখা, উলকি আঁকা; গলায় ঝিনুকের মালা, কারো কারো গলায় পাথরের বা হাড়ের অথবা ঝিনুকের একটি মাত্র লকেট পরা— সুন্দর চিত্রিত ও খোদাই করা। এগুলো ওরা বিশেষ ভাবে পরে যখন উৎসবের দিনগুলোতে ওই সার্বজনীন ঘরটিতে একত্র হয়, মানুষের ভীড়ে আগুনের আঁচে সবাই ওরা প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার জবাব দেয়। প্রায় বরফের দেশে বাস করেও, প্রাকৃতিক ভাবে সে পরিবেশের উপযুক্ত শরীর না

থাকা সত্ত্বেও, ওরা প্রতিকূলতাকে জয় করেছে তাদের প্রযুক্তি, সংস্কৃতি আর ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে।

গত কিছুদিন ধরে ওই বড় ঘরে তাদের মিলন মেলায় একটি কথা খুব বেশি বেশি আলোচিত হচ্ছে। বছর বছর শীত বেড়ে এখন এটি প্রায় সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। বরফ গলা গরমের মৌসুমের দৈর্ঘ ক্রমে কমে যাচ্ছে। আগে চিরস্থায়ী বরফ রয়েছে এমন জায়গা পুশকারি থেকে অনেক দূরে ছিল, এখানকার কেউ নিজেরা এটি দেখেছে এমন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এখন পুশকারির কাছেই অল্প দূর গিয়েই নাকি কেউ কেউ এটি দেখে এসেছে। ওভাবে পুশকারিও চির বরফের জায়গা হয়ে গেলে এখানে টেকা মুশকিল হবে। হয়তো ওদেরকে চলে যেতে হবে অনেক দক্ষিণে কম শীতের জায়গায়। এমন দিন যে ভবিষ্যতে আসবে তা তারা আঁচ করছিলো— কিন্তু এত শিগ্গির যে এ অঞ্চল ছেড়ে যেতে হবে তা আগে ভাবেনি।

* * *

প্রায় এক লক্ষ বছর আগে শুরু হওয়া একটি বরফের যুগ (আইস এইজ) পৃথিবীর উত্তর অঞ্চলকে ক্রমে শীতের তীব্রতার দিকে নিয়ে গিয়েছিলো। ফলে উত্তর মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলের যে জমা বরফের নিচে সব জায়গা স্থায়ী ভাবে ঢাকা থাকে তার পরিসর অনেক দক্ষিণ দিকে নেমে এসেছিল। সাম্প্রতিক তত্ত্ব অনুযায়ী প্রায় লাখ খানেক বছর পর পর পৃথিবীর কক্ষপথ বৃত্তাকার আকৃতি থেকে ক্রমে বেশি উপবৃত্তাকার আকৃতিতে চলে যায় বলেই এমনটি ঘটে। এর মধ্যে আবার প্রতি ৪১,০০০ বছর পর পর পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ অক্ষটির ঝুঁকে থাকার কোণটি একবার কিছু কমে গিয়ে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে বলে শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপও সে অনুযায়ী বাড়ে কমে। প্রতি ২১,৭০০ বছর পর পর আবার পৃথিবীর ওই অক্ষের একটি হেলেদুলে ঘোরার প্রবণতা বাড়ে কমে বলে উত্তর গোলার্ধে শীতের স্থায়ীত্ব এজন্যও বাড়ে কমে। এ সবের মিলিত ফলেই বিভিন্ন সময়ে এখানে বরফের যুগের সৃষ্টি হয়েছে, আবার এটি কেটে গিয়ে অঞ্চলগুলো অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর হয়েছে। একই কারণে বরফের যুগের মধ্যেও কখনো কখনো শীতের তীব্রতা চরমে গিয়ে আবার কমে গেছে। এমনি ভাবে ২২ হাজার বছর আগে আমাদের সর্বশেষ বরফের যুগটি চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল। এর মধ্যেও বরফাবৃত্ত স্থানের কাছাকাছি কিছু জায়গাতেও চরম অবস্থার ভেতরেই কিছু কিছু মানুষ জীবন যাপন করেছে। পুরাতত্ত্ববিদরা ইউক্রেনের পুশকারি অঞ্চলে এমনি কিছু বসবাসের নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। সেখানে সেদিনের মানুষের একটি ছোট গ্রামে বাড়িঘর ও সে সঙ্গে জীবনের নানা টুকিটাকি উদ্ঘাটিত হয়েছে। বাড়িগুলোর কাঠামো ও দেয়ালে ম্যামথ হাড় ও দাঁতের প্রচুর ব্যবহারের কারণে এগুলো সংরক্ষিত হতে পেরেছে; পাথরের ও হাড়ের হাতিয়ার ও আসবাবের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য এসব প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্ঘাটন থেকে তাদের জীবনযাত্রার একটি ছবি আমরা খাড়া করতে পেরেছি তখনকার আবহাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে।

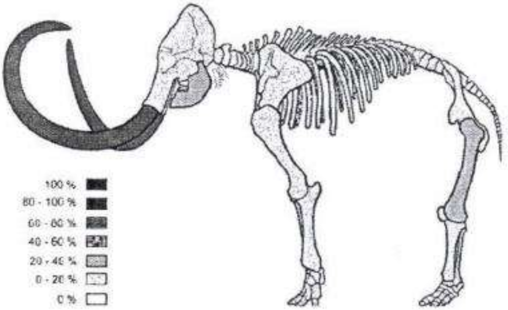

ম্যামথ কঙ্কাল

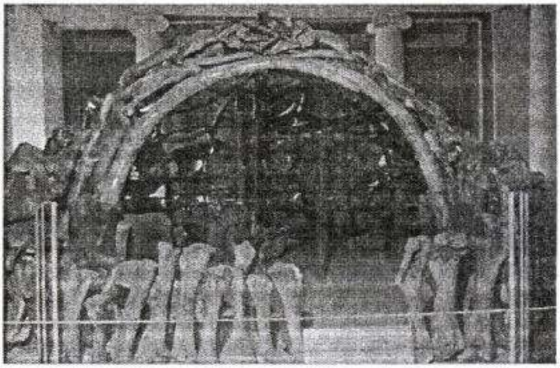

ম্যামথ হাড়ে তৈরি বাড়ির দরজা (পুনর্নির্মিত)

হ্রদের পারের তাঁবু বাড়ি (পুনর্নির্মিত)

প্যালেষ্টাইনের ওহালোর কামরান ঃ

২২ হাজার বছর আগে

উত্তরে যখন বরফ যুগের প্রচন্ড শীত মধ্যপ্রাচ্যে তখন শীত নেই; আছে বন, জলাভূমি, হ্রদ আর চমৎকার আবহাওয়া। এটি মাছ ধরা, পশু শিকার আর ফলমূল-শস্য সংগ্রহের স্বর্গরাজ্য। কামরান ও তার পুরো পরিবার এ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু এর মধ্যে মাথায় ঘুরছে মেয়ের হবু শ্বশুর-শ্বাশুড়ি যথেষ্ট দূরের অঞ্চল আজরাক থেকে সওদাগর কাফেলার সঙ্গে আসবে। তাদেরকে কী ব্যতিক্রমী খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করবে ওরা ?

প্যালেষ্টাইন অঞ্চলের একমাত্র সুপেয় পানির হ্রদ গ্যালিলি সাগর। এর পশ্চিম পারের একটি জায়গা ওহালো। এখানে ২২ হাজার বছর আগের ওই সময়ে সাময়িক আশ্রয়ের ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছে কামরান পরিবার সহ আরো কয়েকটি পরিবার। ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি এই জায়গাটি বেশ সুজলা সুফলা বলতে হবে। ওহালোর কাছেই রয়েছে ওক গাছের বনাঞ্চল, যদিও ওহালো জায়গাটি নিজে অবশ্য প্রধানত তৃণভূমি। কিছুটা অস্থায়ী ভিত্তিতে তৈরি এই ক্যাম্পটিতে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি কুটির রয়েছে যা প্রধানত গাছের কা ও ডালপালা দিয়ে তৈরি। আরো একটি কুটির এখন তৈরি হচ্ছে। অল্প বয়সী গাছের সরু কাণ্ড কেটে এনে পাশাপাশি মাটিতে গেড়ে দেয়া হয়েছে কুটিরের দেয়াল গড়ার জন্য। আড়াআড়ি এমনি সরু আরো কাণ্ড বা ডাল বেড়ার মত বুনে দেয়ালটি সম্পূর্ণ হচ্ছে এবং ওপরের দিকে গম্বুজ আকারের ছাদ তৈরি হচ্ছে। খাড়া কাণ্ডগুলোকে ওপরে বাঁকা করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে এই ছাদের কাঠামো তৈরি হয়েছে। ছাদটি হবে শুকনা পাতা সহ ডালপালা এবং পশু চামড়া দিয়ে কাঠামোটিকে ছেয়ে দিয়ে। কাছেই বনাঞ্চলে এরকম গাছ ও ডালপালার অভাব না থাকায় খুব দ্রুত কুটিরটি তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

রৌদ্রোজ্জ্বল এই দিনে এসব কুটিরের বাসিন্দাদেরকে অবশ্য কুটিরে নয় বরং হ্রদের ধার দিয়ে আনাগোনায় দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে রয়েছে কামরানের

পরিবার। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কামরান পরিবারের সব চেয়ে কর্মক্ষম লোক হলেও সে সব চেয়ে বয়োজৈষ্ঠ নয়, পরিবারের কর্তাও নয়। এই সম্মান রয়েছে কামরানের বাবার— প্রধানত যাঁর পরামর্শে পরিবার চলে। কামরানের মা'ও কিছুটা এই ভূমিকা পালন করেন। নিজে ছাড়াও কামরানের দুই ছোট ভাই বিবাহিত— তাদের তিন জনেরই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে। তার এক ভাই ও এক বোন এখনো বিয়ে করেনি। আজ সকালে পরিবারটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে কাজে গেছে। কামরানের বাবা-মা সব নাতি-নাতনিদের নিয়ে হ্রদের পারে বেড়াতে গেছেন। সেখানে কিছুক্ষণ নাতি নাতনিদের সঙ্গে খেলা করার পর হ্রদে বড়শি ফেলে মাছের জন্য অপেক্ষা করেছেন অন্য অনেকের সঙ্গে। ধরা মাছগুলো রাখার জন্য তাঁরা একটি ঝুড়িও নিয়ে গেছেন— যে ঝুড়ি বনের থেকে আনা লতা দিয়ে বাবা নিজের হাতে তৈরি করেছেন। লতাগুলোকে বেড়ার মত বুনে থলে আকারের এই ঝুড়ি তৈরির কাজে তিনি বেশ দক্ষই। পরিবারের বাকি সবাই যারা বনের দিকে গেছে তারাও এরকম ঝুড়ি বেশ কয়েকটা হাতে করে নিয়েগেছে।

কামরান, তার ভাইবোনেরা, ও ভাইয়ের স্ত্রীরা ওভাবে বনের দিকে চলে গেছে শিকার ও সংগ্রহের জন্য। প্রায় সারা দিন ওরা সেখানে। ওহালোর বাকি বাসিন্দাদের একটি বড় অংশও ওভাবে দিন কাটায় বনেবাদাড়ে ছোট শিকারের খোঁজে এবং ফলমূল সংগ্রহের কাজে। তাদেরো হাতে বর্শা, হারপুন ইত্যাদি অস্ত্র তো রয়েছেই, আরো রয়েছে নানা আকার আকৃতির ঝুড়ি ও থলে। থলেগুলো অধিকাংশ চামড়া সেলাই করে তৈরি। ওহালোর ওই ক্যাম্প থেকে বনে যাওয়ার পথটি শুরুতেই হ্রদের পার হয়ে গেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে মানুষের আনাগোনা দেখলে বোঝা যায় কী ভাবে বনের কাছে থাকাতে ওদের সবার রুটিরুজি নিয়মিত বন থেকেই আসতে পারছে।

যারা বনে গেল তারা জানে শেয়ালের গর্ত কোথায়, খরগোসগুলো কোথায় লুকিয়ে। ওগুলোকে বের করে, ঘিরে কাবু করে, শিকার করার অন্ধিসন্ধি তাদের জানা দীর্ঘদিনের চর্চার ফলে। তবে একটু বড় শিকারের মধ্যে তাদের নজর থাকে গাজেলের ওপর। গাজেল এই অঞ্চলের হরিণ গোষ্ঠির প্রাণী— ঠিক বনভূমিতে নয় বরং তার কিনারার তৃণভূমি ও মরুভূমিতেই বিচরণ করে বেশি। অত্যন্ত দ্রুতগতির এই গাজেল শিকার করা সহজ কাজ নয়— দল বেঁধে বেশ পরিকল্পনা করে এগোতে হয় এদের কাবু করতে।

বিকেল হবার আগেই কামরানের বাবা-মা তাঁদের নাতি-নাতনিদের নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। এর মধ্যে হ্রদের পাড়ে থাকতেই বাড়ি থেকে থলেতে নিয়ে যাওয়া দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েছেন। দুটো ঝুড়ি ভর্তি করে নিয়ে এসেছেন হ্রদ থেকে বড়শি দিয়ে তোলা মাছ। বড়শিগুলো তৈরি হয়েছে উপর্যুক্ত আকৃতির হাড় দিয়ে। এই মাছগুলো রোদে শুকিয়ে শুটকি করা হবে। শিশুরা এ কাজে দাদা-দাদীকে সাহায্য করলো। পাথরের ছুরি দিয়ে মাছগুলোর পেট কেটে

নাড়িভুড়ি বের করে ফেলা হলো। নাড়িভুড়ির অনেকখানি আজ রান্না করে খাওয়া যাবে। তাঁরা এবার হাড়ের তৈরি সুচ দিয়ে মাছগুলোকে চিকন লতার চিকন আঁশের শক্ত সূতাতে মালার মত গেঁথে গেঁথে বাইরে লটকিয়ে দিচ্ছেন আগামি কয়েকদিন ধরে রোদে শুকাতে। ভাল করে শুকিয়ে গেলে চমৎকার শুটকি হবে— যখনই ইচ্ছে একটু একটু ভেঙ্গে এমনিতেই খাওয়া যাবে।

বিকেলের দিকে পরিবারের বাকি সবাই দল বেঁধে ফিরে এলে বাচ্চারা হৈচৈ করে তাদের অভ্যর্থনা জানালো। যেভাবে পরিশ্রান্ত হয়ে অথচ রাজ্য জয়ের আনন্দ নিয়ে ওরা ফিরলো তা ব্যতিক্রমী— কারণ আজ শিকার ও সংগ্রহটি বেজায় রকম হয়েছে। কামরানের বৌয়ের কাঁধে একটি শিকার করা শেয়াল ঝুলানো আর তার হাতে একটি খরগোস। কাঁধের শেয়ালটি যেন তার শরীরেরই একটি অংশ হয়ে আছে। আর এক ভাইয়ের বৌয়েরও কাঁধে হাতে সেই একই দৃশ্য। এমনি ভাবে তিনটা শেয়াল আর বেশ ক'টা খরগোস মেরে এনেছে ওরা। একটু পর আসলো কামরান ও তার এক ভাই মাঝারি সাইজের একটি গাজেলের দেহ লাঠিতে বেঁধে দুজনে দুই প্রান্তে কাঁধে বহন করে— এটিই আজকের দিনে তাদের সব চেয়ে বড় পুরস্কার। বাদবাকি যারা গিয়েছিলো তাদের সবাই বহন করছে এখন যথেষ্ট ওজন হয়ে যাওয়া নানা ঝুড়ি আর থলে— কেউ তা নিয়েছে হাতে, কেউ নিয়েছে মাথায়, কেউ বেঁধে নিয়েছে কোমরে। এক এক করে সব নামানো হলো বাড়ির সামনে। কয়েকটা চামড়া বিছিয়ে সেখানেই ঢালা হলো সব কিছু। এক দিকে রক্তাক্ত শেয়াল, খরগোস, ও গাজেলের মৃতদেহগুলো, আর অন্য দিকে চামড়ার ওপর দেখা গেলো নানা রঙ বেরঙের ফল, বাদাম, বীজ, খাওয়া যায় এমন পাতা, শেকড়, বাকল ইত্যাদি। এখন অনেক কাজ— বিশেষ করে শিকার করা পশুগুলোকে নিয়ে। মাংসের একটি বড় অংশ বিলানো হবে ক্যাম্পের বাকি বাড়িগুলোতে; ফল-বাদাম এ সবেরও একটি বড় অংশ তাই হবে।

ওদের খবর দেয়া হয়েছে যেন বন্টনের কাজে সাহায্য করে যার যার ভাগ নিয়ে যায়। এটিই নিয়ম, শিকার ভাল হলে সবার মধ্যে এভাবে ভাগ করে দিতে হয়। সব শেষে পরিবারে একটি ছোটখাট ভোজ হয়ে যাবে রাতে। এ জন্য কুটিরের বাইরে মাংস ঝলসানো ও আলোর ব্যবস্থার জন্য একটি আগুন জ্বালানো হয়েছে। সব দিন যে এ পরিবারের ভাগ্যে এমন ভোজ জোটে তা নয়। অনেক দিনই বড় মাপের কোন শিকারে যাওয়াই যায়না— তা ছাড়া পরিবারে অসুখ বিসুখ তো লেগেই থাকে। সে রকম দিনে কাছাকাছি জায়গা থেকে দু'একটি খরগোস মেরে আনতে পারলে ভাল, নইলে বাসায় সংরক্ষিত শুটকি মাছ, শুকনা ফলমূলের সঙ্গে কাছাকাছি তৃণভূমি ঝোপ ঝাড় থেকে কুড়ানো বীজ, বাদাম, শস্য দিয়ে খাবার সারতে হয়। অবশ্য ভাগ্য ভাল হলে পাড়ার অন্যদের ভাল মন্দ শিকার কিছু সেদিন হয়ে থাকলে তার ভাগ পাওয়া যায়। আজকের ভোজের মত আনন্দের সুযোগ যখন আসে, তখন অবশ্য শুধু ভোজই হয়না— এক দফা গান বাজনাও

হয়ে যায় ওই আসরে। সমস্বরে গান ধরা, নাচা, বাঁশি বাজানো এ সবের জন্য কামরানের পরিবার বেশ সুপরিচিত। এর সুরে সুরে অন্য বাড়ি থেকেও অনেকে এসে জোটে। তাছাড়া বিশেষ করে কামরানের সুনাম আছে গল্প বলিয়ে হিসেবে। সে একবার গল্প বলা শুরু করলে অন্যরা তাকে থামতে দিতে চায়না। তার গল্পের অধিকাংশ শিকার নিয়ে— যদিও এটি নিত্যকার কাজ তবুও এই শিকারের গল্পে থাকে প্রচুর অ্যাডভেঞ্চার, অনেক লোমহর্ষক কাহিনী। এমন সব গল্পে ওই শিকার করা পশুগুলোই যেন রীতিমত এক একটি দুর্ধষ চরিত্র যারা ভাবতে পারে, ফন্দি আঁটতে পারে।

তবে গল্পের কথা যদি বলতে হয় কামরানের বাবার তাতে জুড়ি নেই। তাঁর গল্প কিন্তু সব অশরীরি আত্মা নিয়ে। তিনি এগুলো তাঁর গুরুজনদের কাছে এক সময় শুনেছিলেন— বন দেবতা, অগ্নি দেবতার গল্প, তাদের কাছে এখানকার মানুষগুলো কত অসহায় আবার কত নির্ভরশীল সে সব গল্প। তবে তাঁর গল্পগুলো সবই এসব দেবদেবীর উচ্চ মার্গের কথা নিয়ে নয়। এ অঞ্চলের বীর যোদ্ধাদের নিয়েও তাঁর অনেক গল্প; তাদের বেশির ভাগকে তিনি দেখেননি কিন্তু লোকের মুখে মুখে তাদের নাম শুনেছেন, গল্প শুনেছেন। অন্যদেশ থেকে আসা অত্যন্ত পরাক্রমশালী, গায়ে গতরেও খুবই দশাসই এমন আক্রমণকারীকে তাঁরা পরাভূত করেছেন যুদ্ধে, রক্ষা করেছেন এখানকার সব জনপদকে। অতীতে যে এরকম যুদ্ধ হয়েছিলো সে সম্পর্কে এসব গল্প থেকেই সবাই সচেতন; তবে অত বড় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কারো নেই।

যে অভিজ্ঞতা আছে তা হলো পূর্ব দিকে কয়েক শ'মাইল দূরের আজরাক (বর্তমানে জর্দানে) অঞ্চল থেকে নানা গোত্রের লোক মাঝে মাঝে এখানে আসে। তাদের বেশির ভাগ বেশ শান্তিমতেই আসে, দেখে মনে হয় যথেষ্ট বিত্ত-বৈভবের অধিকারী তারা। ওরা এদিকে আসে প্রধানত ব্যবসা করতে, নানা ধরনের লোভনীয় পসরা তারা আনে। পাথরের ও হাড়ের তৈরি অলঙ্কারের কাজ করা নানা দৃষ্টি নন্দন হাতিয়ার যেমন এতে রয়েছে, তেমনি রয়েছে নানা প্রসাধনী ও গায়ের অলঙ্কার, খুব ফ্যাশন সম্মত পোষাক। তাদের তৈরি বাঁশিগুলোতে সুর ওঠে চমৎকার। আবার এই পূর্ব দিক থেকেই এমন সব মারকুটে মানুষও আসে যেন সুযোগ পেলে কামরানদের গ্রামের সব কিছু লুটে নিয়ে যাওয়াটাই তাদের উদ্দেশ্য। কামরান ও তার আত্মীয় স্বজনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে এই মারকুটেদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য যুদ্ধ করার। ওহালোর শান্তিপ্রিয় মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে এই বর্গীদের আক্রমণ একদিকে এখানে সবাইকে অকারণ আতঙ্কের মধ্যে রাখে, অন্য দিকে তাদেরকে অস্ত্র- শস্ত্রের উন্নতি করে নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য সব সময় তৈরি রাখে। আর ওই যে বায়োবৃদ্ধদের গল্প অন্যদেশের দুর্ধর্ষ আক্রমণকারীদের নিয়ে, সে সবকেও তাই অনেক বেশি জ্বলজ্যান্ত মনে হয় তাদের সবার কাছে।

কামরানের কাছে কিন্তু আজরাকের সওদাগরদেরকে খুব ভালই লাগে— তারা শুধু সম্পদশালীই নয়, আচার ব্যবহারও তাদের অনেক বেশি মার্জিত, ওহালোর মানুষদের চেয়ে। যখনই ওরা সওদা নিয়ে আসে, সে ওদের সঙ্গে আলাপ করে, ওদের জীবন যাপনের কথা শোনে। তার মনে একটি স্বপ্ন আছে ওই আজরাকে এমনি সওদাগর পরিবারের একটি ভাল ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবে। মেয়েটি তো দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেলো— এমনিতে হয়তো ওহালোর কাছে ধারেই কারো বাড়ির বৌ হয়ে চলে যাবে একদিন। কামরানের কাছে তার নিজের অঞ্চলের মানুষদেরকে মামুলি ধরনের লোক মনে হয়, যদিও এরাও এখন যথেষ্ট দূরে দূরে ওরা ছড়িয়েছে পশ্চিম দিকে ভূমধ্যসাগরের পার পর্যন্ত। সেখানে সাগর তীরে যারা মাছ ধরার কাজে রয়েছে তাদের মধ্যে খাওয়াপরার কষ্ট ওহালোর চেয়ে অনেক কম। কিন্তু কামরানের রঙীন চোখে মেয়েকে সওদাগর বাড়ির বৌ হিসেবে দেখতে বেশি ভাল লাগে। ওই সওদাগরদের বাসস্থান আজরাক জায়গাটির দূরত্ব বেশি, পথটিও সহজ নয় মাঝখানে বন, জলা ইত্যাদি থাকার কারণে; তা সত্ত্বেও একবার সওদাগরের কাফেলার সঙ্গে গিয়ে জায়গাটি দেখে এসেছে সে। ওদের সঙ্গে কামরান পরিবার এতো মিশেছে যে তাদের একটু ভিন্ ভাষাটি এখন আয়ত্ব হয়ে গেছে। মনের আকাঙ্খাও সে আর মনে চেপে রাখেনি, খোলাখুলি বলেই ফেলেছে। আর ওখানে ওদের মতই একটি দিলখোলা পারিবারিক গোষ্ঠিতে একটি বিয়ের সম্বন্ধও পাকা করে ফেলেছে ওরা। যদিও ওদের স্বচ্ছলতা বেশি, উভয়ে মোটের ওপর একই রকম পরিবার— বনে, জলায় শিকার করা ও মাছ ধরা এটিই প্রধান কাজ; সেই সঙ্গে ব্যবসা। তবে শৈল্পিক সক্ষমতা, নান্দনিকতা এদের ক্ষেত্রে কামরানের নিজের মানুষদের চেয়ে বেশি। ওদের মেয়েরা যে প্রসাধনী ও অলঙ্কার তৈরি করে তার চাহিদা বেশ দূর দূরান্তেও রয়েছে। কামরান, তার স্ত্রী ও মেয়ের আনন্দটি এটি নিয়েই— নতুন আত্মীয় হতে যাওয়া মানুষগুলো নিয়ে তাই তাদের উচ্ছাসের শেষ নেই।

আর এজন্যেই আজকাল কামরান পরিবারে নিয়মিত শিকার হয়না, বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় ঘরটার উন্নতি সাধনে; আরো একটি বাড়তি ঘর তৈরির কাজে; যাতে দূরের নতুন আত্মীয়দের ওখানে অভ্যর্থনা জানাতে পারে শিগ্গীর। সাম্প্রতিক একটি দুর্ঘটনা কামরানদের পুরো পরিকল্পনাটি বেশ একটু পিছিয়ে দিয়েছে। মাস দুয়েক আগে বনের একটি দাবানল কেমন করে জানি ওদের বাড়ির একেবারে কাছে চলে এসেছিলো। ভোরে ঘুম থেকে উঠে কোন কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে গ্রামের অর্ধেকেরও বেশি বাড়ি। মূল দাবানলটি এদিকে আসেনি— এসেছিলো তার একটি ছিটেফোটা। কিন্তু তাতেই অনেক ক্ষতি হয়ে গেলো। কামরানদের পরিবারের সরাসরি কোন ক্ষতি হয়নি, ওদের বাড়ি অক্ষত ছিল। কিন্তু গ্রামের সবার মধ্যে এমন সংহতি যে গ্রামের অন্যদের ক্ষতি মানে ওদেরও ক্ষতি। বাড়িগুলো গাছের কান্ড, ডাল-পাতা ইত্যাদিতে এমন ভাবে

তৈরি যে আগুন লাগলে বাড়িকে বাঁচানো অসম্ভব। তেমনি অবশ্য আবার এমন বাড়ি বানাতে তুলনামূলকভাবে কষ্টও কম, সময়ও লাগে কম। শুধু যাদের বাড়ি তারাই নয়, পাড়ার সবাইকেই হাত লাগাতে হয়েছে ওই কাজে। আগের বাড়ি যেখানে ছিল সে জায়গা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে একটু দূরে গিয়ে নতুন বাড়িগুলো তৈরি করা হয়েছে— এখনো সবগুলোর কাজ পুরাপুরি শেষও হয়নি। এরই সঙ্গে কামরানরা চেয়েছিলো তাদের নিজেদের বাড়তি ঘরটিও এবার সম্পূর্ণ করে ফেলবে।

এসব শিকারি-সংগ্রাহক পরিবারের সুবিধা হলো ঘরবাড়ি পুড়ে গেলে বা এমনিতেও একে ছেড়ে যেতে হলে খুব বেশি জিনিসের মায়া করতে হয়না। এদিক থেকে একে খুব স্থায়ী কোন বসত বলাও জায়না, বরং মৌসুমের এ সময়ের একটি অস্থায়ী ক্যাম্প মাত্র। পাথরের বা হাড়ের একটু মূল্যবান হাতিয়ারগুলো অক্ষত থাকলে ভাল হয়। তা ছাড়া কিছু চামড়া, মাদুর, থলে, ইত্যাদি যেগুলো পুরাপুরি নষ্ট হয়নি সেখান থেকে বেছে বেশ কিছু পুনরূদ্ধার করা গেলো— এইই যথেষ্ট। বাকি জিনিস নতুন বাড়িতে গিয়ে আবার তৈরি করা যাবে, যোগাড়ও করা যাবে। তবে ওই আগুনে আর একটি দিক থেকে কিছু ক্ষতি হয়েছে যার ফলে ক'টা দিন খাবারদাবারে একটু বৈচিত্রের অভাব হয়েছিলো।

ওহালোর সব বাড়িতেই সাম্প্রতিক সময়ে সংগ্রহ করা কিছু কিছু শস্য জমা থাকে। বনের কিনারার ওই যে তৃণভূমি এবং ঝোপঝাড় সেখানেই কয়েক রকমের এরকম বন্য শস্য পাওয়া যায়। এই বন্য শস্যগুলোর একটি বড় সমস্যা হলো পাকা মাত্রই এগুলোর খোসা খুব ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। ঠিক ওই সময় একে স্পর্শ করলে নিজে নিজে খোসা ফেটে গিয়ে শস্য চারিদিকে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। বেশি পেকে গেলে স্পর্শেরও দরকার হয়না এমনিতই ফেটে ছড়িয়ে যায়। ওখানকার মহিলাদের এবং তারো চেয়ে বেশি অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের একটি নিত্য কাজ হলো ওই তৃণভূমিতে গিয়ে সঠিক প্রকার ঘাসের শস্যগুলো বের করা, আর যেগুলোকে পেকেছে মনে হবে তার নিচে একটি ঝুড়ি ধরে একটি কাঠি দিয়ে আস্তে তাতে মৃদু বাড়ি দেয়া— যাতে খোসা ফেটে গিয়ে শস্য ঝর ঝর করে ঝুড়িতে পড়ে। ঠিক সময়ে সংগ্রহ করতে না পারলে এই শস্য মাটিতে পড়ে হয়তো পরে আবার চারা গজাবে অথবা পাখির বা ইঁদুরের পেটে যাবে। তাই সাবধানের মার নেই। ছেলে-মেয়েরা ঝুড়ি নিয়ে সব সময় ঘুর ঘুর করছে কখন খাওয়ার মত শস্য কোথায় পাওয়া যায়। জমিয়ে জমিয়ে রাখা এ সব শস্য উত্তপ্ত পাথরে রেখে গরম করে খেতে যে কী মজা তা তারা ভালই জানে। মাংস ঝলসিয়ে খেতে যতই ভাল লাগুক সঙ্গে এই শস্য ভাজা না খেতে পারলে যেন খাবার সম্পূর্ণ হয়না। দাবানলের আগুনে এবার এরকম জমা বেশ কিছু শস্যই নষ্ট হয়েছে।

মেয়ের বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসাতে কামরানের পরিবারের আর একটি দুশ্চিন্তা বাড়ছে। এটি অবশ্য একটি অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা। তার হবু বেয়াই-বেয়ান এবার

সপরিবারে আজরাকের সওদাগর কাফেলার সঙ্গে ওহালোতে আসছে, তাদের আশা আছে অনুষ্ঠানাদি শেষে ছেলের বৌ নিয়ে যাবে এখান থেকে। কয়েক দিন তারা থাকবে এখানে, এ জন্য বাড়তি ঘরটিও প্রায় তৈরি। কামরানরা দলেবলে যে কোন দিন বেরুলে কাছের বনেই হৃষ্টপুষ্ট দু'একটি গাজেল হরিণ অনায়াসে শিকার করে আনতে পারবে বিয়ের ভোজে এই ভরসা কামরানের আছে। কিন্তু তার আবার একটু বেশি উচ্চ আশা। একটু গহীন বনের দিকে গেলে আরো সম্মানজনক কিছু শিকার পাওয়া যেতে পারে। এখানে এমন দক্ষ মানুষ আছে যারা এসবের অন্ধিসন্ধি জানে, সময় মত আরো যুৎসই দু'একটি শিকার করেও ফেলতে পারে। বন্য গাধা, বন্য গরু, এবং বড় আকারের বন্য শূয়োর এগুলোই ছিল তার লক্ষ্যে। এর একটি দু'টি যদি ওই সময় মিলে যায়, তা হলে বিয়ের ওই ভোজে সবাই ধন্য ধন্য করবে, বিশেষ করে আজরাক থেকে আসা বরযাত্রীরা। তাই গ্রামের সবাইকে তো বটে, গ্রামের বাইরেও বড় পশু শিকারে বিশেষ দক্ষ কিছু বন্ধুবান্ধবকে সে আগে থেকে অনুরোধ করে রেখেছিলো খবর দিলেই যেন একটি চৌকষ শিকারী দল বনের গহীনে অভিযান চালাতে পারে।

* * *

ইউক্রেনের পুশকারিতে যখন বরফ যুগের চরম অত্যাচার চলছে সে সময় মধ্যপ্রাচ্যে আবহাওয়া অনেক মৃদু। শীতের মৌসুমেও বরফ আচ্ছাদনের প্রশ্ন নেই। তাই সেই ২২ হাজার বছর আগের পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের সর্বশেষ বরফ যুগের চরম শৈত্যের সময়ও প্যালেষ্টাইনের ওহালোতে কামরান পরিবারের জীবনযাত্রা বেশ সহজই ছিল বলতে হবে। ওই যে তাদের পাড়ায় আগুন লেগেছিলো, মাত্র কয়েক মিনিটে তাতে বেশ কিছু বাড়ি জ্বলে গেলেও, এবং কয়েক মাসের মধ্যে কাছেই নতুন বাড়ি গড়ে ওঠলেও, এর একটি স্থায়ী উপকার ২২ হাজার বছর পরের প্রত্নতত্ত্ববিদদের জন্য হয়ে গিয়েছিলো। ওই আগুন লাগার কয়েক বছর পর একেবারে সংলগ্ন গ্যালিলি হ্রদের পানির উচ্চতা এত বেড়ে গিয়েছিলো যে ওহালোর ওই গ্রামটি হ্রদের গর্ভে চলে গিয়েছিলো। আর তাই হয়েছে শাপে বর; কারণ পানির মধ্যে থাকাতে আগুনে আধপোড়া কিছু নিদর্শন, কয়লা হয়ে যাওয়া ঘর বাড়ি, ইত্যাদি প্রকৃতির অবক্ষয় ক্রিয়ার হাত থেকে যেমন রক্ষা পেয়েছে, তেমনি মানুষের হাত থেকেও রক্ষা পেয়েছে, এর ওপর অন্য কোন ক্রিয়াকলাপের সুযোগ না থাকাতে। অবশেষে অগ্নিকান্ডের ২২ হাজার বছর পর ১৯৮৯ সালে গ্যালিলি হ্রদের পানি খরার কারণে নয় ফুটের মত নেমে গেলে কাঠকয়লার অবয়বে একটি প্রাচীন বসতের আলামত ফুটে ওঠেছে স্থানীয় প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে। পরবর্তী দশ বছরের দফায় দফায় খুব সাবধানী খনন কার্যক্রমে সেই সব অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে। আসলে কাঠকয়লার কাঠামোর আদলে কামরানদের ওই গ্রামের পুড়ে যাওয়া অংশটির সুন্দর উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে। পুড়ে কয়লা না হলে ডালপালায় তৈরি এসব পচে যেতো সেই কবে। এভাবে উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে আমরা কল্পনা করতে পেরেছি কামরানদের জীবনযাত্রার একটি প্রায় বাস্তব চিত্র।

খননের ফলে ওখানে স্পষ্ট পাওয়া গেছে ওই পুড়ে যাওয়া বাড়িগুলোর কাঠের থামগুলো যে কাঠ কয়লার বৃত্ত রচনা করে আছে তা। বৃত্তের মধ্যে ও বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা পোড়া ও আধ পোড়া নিদর্শন— হাতিয়ার, পোষাক, মাদুর, নানা প্রাণীর হাড়, বীজ, শস্য ইত্যাদি। গ্যালিলি হ্রদের মধ্যের এই শুকিয়ে যাওয়া অংশে ওই খনন ছাড়াও আশপাশে আরো অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্ঘাটন ঘটেছে ওই ২২ হাজার বছর আগের যেমন, তেমনি তার কিছু আগে-পরেরও বটে। একটি জিনিস আজকের বিজ্ঞানীদের খুব অবাক করেছে— তা হলো মধ্যপ্রাচ্যের ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন এই অঞ্চলে যা এখন ইসরায়েল, পালেষ্টাইন, লেবানন, সিরিয়ার গোলান হাইট নামক পাহাড়ি অঞ্চলের অন্তর্গত, সেখানে বন্য প্রাণীর ও শস্য উদ্ভিদের কী দারুণ বৈচিত্র ছিল। কামরান পরিবারের মত শিকারি-সংগ্রাহক মানুষদের কাছে তাই শিকারের ও সংগ্রহের বহু বিকল্প ছিল। এর মধ্যে অধিক প্রাচুর্যের বিচিত্র গাজেল, শেয়াল, খরগোস ইত্যাদি তো ছিলই বন্য গাধা, বন্য গরু, বন্য শূয়োর ইত্যাদিও ছিল— এসবের ছড়ানো ছিটানো হাড় উদ্ঘাটন থেকেই তা বোঝা গেছে। আজ এসব প্রাণীর অধিকাংশই আর সেখানে পাওয়া যায়না।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আরো চমকপ্রদ। উদ্ভিদের অস্থিত্বের ও প্রাচুর্যের সব চেয়ে ভাল প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রাচীন পরাগ রেণুর বিশ্লেষণে। বংশ বিস্তারের জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদের পরাগরেণুগুলো ফুল থেকে ফুলে নানা ভাবে সঞ্চালিত হয়। এর অনেকগুলো সঠিক জায়গায় অর্থাৎ অন্য ফুলে যাবার বদলে মাটিতে পড়ে গিয়ে কাদায় আটকে যায়। ওই কাদার ওপর আরো পলি পড়তে পড়তে কাদার পরতে পরতে এক এক যুগের বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষুদ্র পরাগরেণু ভবিষ্যতের জন্য অক্ষত থেকে যায়। প্রত্যেকটি উদ্ভিদের পরাগরেণুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে যা শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ধরা পড়ে। এখন বিজ্ঞানীরা কাদার একাধিক দীর্ঘ কলাম বা সরু স্তম্ভ খনন করে তুলে আনছেন অনেকটা নলকূপ খননের সময় নিরেট নলাকৃতি মাটি তুলে আনার মত। এই কলামকে পাউরুটির মত খুব পাতলা স্লাইজের আকৃতিতে কেটে নিলে যে স্লাইজ যত নলের নিচের দিকের হবে তা তত প্রাচীন হবে। এভাবে স্লাইজগুলোর বয়স থেকে ওই স্লাইজের মধ্যে পাওয়া পরাগ রেণুর বয়স নির্ণয় করা যায়, সেই পরাগ রেণুগুলো পরীক্ষা করে তখন কী কী উদ্ভিদ পরিবেশে ছিল তা জানা যায়। এভাবে প্রাচীন পরাগরেণু পরীক্ষা এবং অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে মধ্যপ্রাচ্যের ওই অঞ্চলে উত্তরের শৈত্যযুগের সেই সময়েও বেশ সুফলা তৃণভূমি বিরাজ করছিলো যাতে পরবর্তীকালের কৃষিতে ব্যবহৃত প্রধান শস্যগুলোর প্রায় সবগুলোরই বন্য রূপ ভাল রকমই ছিলো। আমাদের সেই শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ ওসব শস্য খুব সম্ভব যথেষ্ট ব্যবহার করছিলো। এর মধ্যে বন্য গম, বার্লি, ডাল, মটরশুঁটি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কাজেই এদিক থেকেও সেযুগের মধ্যপ্রাচ্যে মানুষের খাদ্যের বেশ বৈচিত্র ছিল বলতে হবে।

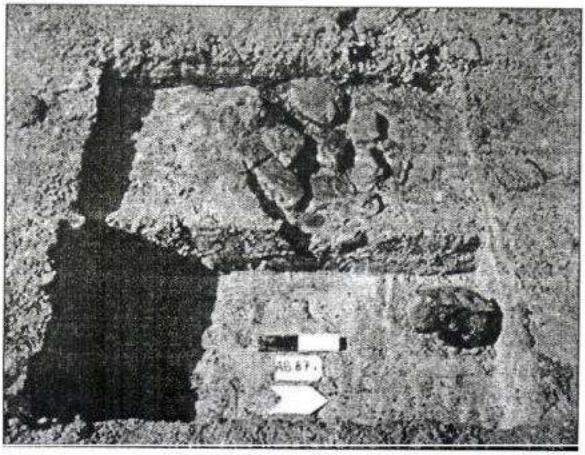

ওহালোর খনন

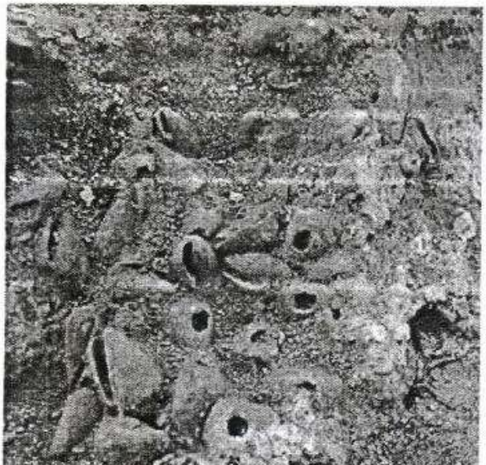

ওহালোর পাথুরে তৈজস

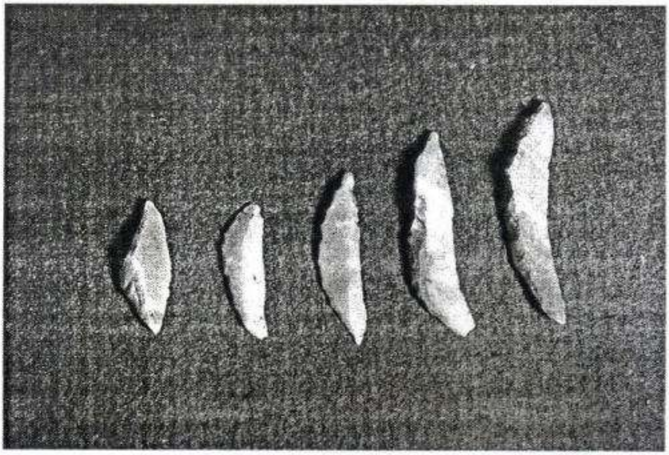

ওহালোর পাথুরে হাতিয়ার

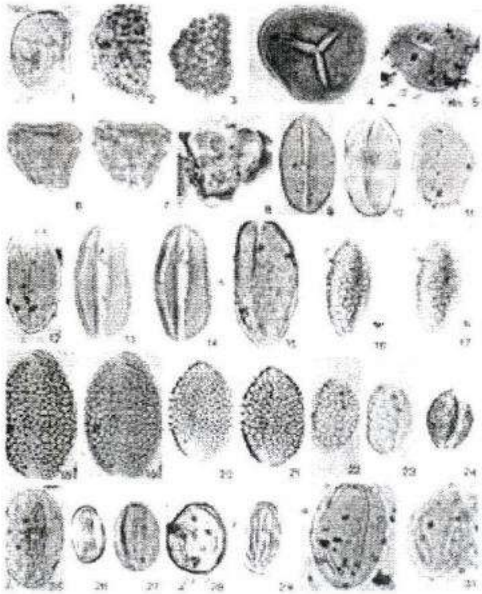

পরাগরেণুর আণুবীক্ষনীক ছবি

প্যালেষ্টাইনের আইন মাল্লাহার কাস্তে ও হাতুড়ি ঃ ১৪ হাজার বছর আগে

কাস্তে আর হাতুড়ি দুই ভাইবোন— গেরস্ত পরিবারে আদর করে দেয়া নাম। আর গেরস্থালির একটি বড় অংশ হচ্ছে বাড়ির বাগান যেখানে বন্য শস্য এনে লাগানো হয়েছে। ওরা যখন বাবা মা'র সঙ্গে এ বাগানে কাজ করে তখন প্রায়ই সঙ্গে থাকে তাদের পোষা কুকুর বাঘা।

জায়গাটা পাহাড়ের ঢালে ওক গাছের বনে ঢাকা। ঢালটি পূর্বমুখী, এখান থেকে পশ্চিমে একটু গেলেই ভূমধ্যসাগর। ওই বনের সঙ্গে এমন ভাবে এখানকার পাঁচ ছয়টি বাড়ি একাকার হয়ে রয়েছে যেন কিছুটা লুকানোই আছে। আসলে এ বাড়িগুলোকে দেখলে সত্যিকার স্থায়ী বাড়িই মনে হয়— যাযাবর জীবনে এখানে ওখানে অস্থায়ী ভাবে গড়ে তোলা গাছের খুঁটি আর ডালপাতা দিয়ে গড়ে তোলা আপাত আশ্রয় মাত্র নয়। পাহাড়ের ঢালে হওয়াতে ঘরের মেঝ আসলে কিছুটা গর্তের মত দেবে নিচে মাটির মধ্যে বসানো, আর তার ওপর থেকে সবদিকে পাথরে দেয়াল গাঁথা। ওই দেয়ালের ওপর ভর করেই ডাল পাতা ও পশু চামড়া দিয়ে ছাদটি ছাওয়া। বন আর তা ছাড়িয়ে পাহাড়ী তৃণভূমি নিয়ে এই আইন মাল্লাহার যে গ্রাম তার মধ্যে গেরস্থালির বেশ একটু ভাব আছে— যদিও জীবনযাত্রাটি এখনো পুরাপুরি শিকারি-সংগ্রাহকের।

যে পাঁচ ছয়টি বাড়ি আইন মাল্লাহায় প্রায় সারিবদ্ধ ভাবে খাড়া হয়ে আছে তাদের মধ্যে একটিতে থাকে কাস্তে আর হাতুড়ির পরিবার। ওরা ভাইবোন— ভাই হাতুড়ি বড় হলেও পরিবারে আদর বেশি বোন কাস্তের— পিঠাপিঠি দু'জনের বয়স ১৪ আর ১৩। ছোট বেলায় এক সঙ্গেই নাম রেখেছিলো বাবা-মা হাতুড়ি আর কাস্তে। কারণটি হলো পরিবারটি গেরস্থালি অন্ত প্রাণ— আশেপাশে অন্য সব পরিবারগুলোও তাই হলেও ওদের তুলনায় যেন একটু বেশিই। কাস্তের যখন জন্ম তখন হাতুড়ির প্রায় দাঁড়ানোর ও একটু একটু হাঁটার বয়স। বাড়ির মধ্যে বেশ একটু জায়গা দখল করে আছে পাথরের একটি বিশাল হামানদিস্তা। আসলে বড় একটি পাথর খণ্ডের মাঝখানটি বেশ গর্ত হয়ে আছে বলেই একে হামানদিস্তা হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে আছে তারই উপযুক্ত একটি পাথরের ভারী মুগুর যাকে হাতুড়িও বলা যায়।

হামানদিস্তার মধ্যে রেখে এই হাতুড়ি চালিয়ে যাবতীয় শস্য ও উদ্ভিদজাত জিনিসকে সুন্দর খাদ্যে পরিণত করার প্রক্রিয়া চলছে— গুড়ো করা, পেষা, খোসা ছাড়ানো, ভাঙ্গা সব কিছু। এর মধ্যে নেই কী— শস্য, বাদাম, ডাল, সবজি, শেকড়, বাকল সবই আছে। এগুলোর অনেকখানি বন থেকে আসে, বনের ওপারের তৃণভূমি থেকেও আসে। বন্য উদ্ভিদকে এমন চমৎকার খাদ্যে পরিণত করাটাই যেন এদের বড় একটি কাজ। ওই সময় শিশু হাতুড়ি সারক্ষণ ওই হামানদিস্তার কাছে কাছে ঘুর ঘুর করতো— ওর ভেতর হাতুড়ির ওঠানামা তার ভারি মজা লাগতো। যখন কাজ হতোনা তখন দিব্যি সে ওই পাথরের গর্তে চড়ে ওঠে সেখানে দাঁড়িয়ে লাফালাফি করতো— যেন সেও একটি হাতুড়ি। সেই থেকেই তার নাম হয়েছে হাতুড়ি। আর তার নবজাত বোনের নাম কাস্তে— কারণ ওই গেরস্থালির কারণে কাস্তেটি হয়ে ওঠেছিলো পরিবারের খুবই আদরের ও গর্বের হাতিয়ার। কাস্তে জিনিসটাকে এ অঞ্চলের মানুষরা বেশ একটি বড় সৌকর্যে নিয়ে গেছে— কাস্তে দিয়ে বন্য শস্যের ছড়াকে খসাখস কেটে ঘরে আনাটি তাদের খুব আনন্দের কাজ।

আইন মাল্লাহার পরিবারগুলোর কাজকর্ম দেখলে মনে হয় তারা যেন দৈনন্দিন প্রয়োজন মত অল্পসল্প ফলমূল সংগ্রহে সন্তুষ্ট থাকার মানুষ নয়, সব কিছু তারা একটু বড় আয়োজনে করতে চায়। তাই তাদের হামানদিস্তায় কাজের বহর যেমন বড় আকারের, তেমনি যখন কাস্তে দিয়ে শস্য কেটে এনে ঘরে তোলে তখন অনেক বড় বড় আঁটি করে তারা তা আনে। মনে হয় এক সঙ্গে সবাই মিলে এসব আনবে, প্রক্রিয়াকরণ করবে, জমিয়ে রাখবে, তারপর ধীরে ধীরে খাবে। বাড়িতে বেশ ক'টি কাস্তে ঝুলানো আছে এ কাজের জন্য। এক একটি কাস্তে দেখতেও বেশ— কারণ এটি হাত-কুঠার, ছুরি বা কোরানির মত একটি ব্লেডে তৈরি সরল হাতিয়ার নয়, বলা যায় একটি যৌগিক হাতিয়ার। প্রথমত যে পাতলা করা পাথরে এটি তৈরি তার এক প্রান্তে মুঠ করে হাতে ব্যবস্থা আর অন্য প্রান্তটি সুন্দর বেঁকে গেছে অর্ধ চন্দ্রাকারে। আর ওখানে খাঁজ কেটে কেটে তাতে বসিয়ে দেয়া হয়েছে ছোট ছোট পাঁচ ছ'টি পাথরের ব্লেড— একটির পর একটি ওই বক্রতাকে অনুসরণ করে। ফ্লিন্ট পাথরের চলতাকে বেশ ধারালো করে তৈরি এই ব্লেডগুলো। ওখানে শস্য চারার হাজার হাজার বার ঘষাঘষিতে এখন খুবই চকচকে রূপ ধারণ করেছে এগুলো। খাঁজের মধ্যে ব্লেডগুলো শক্ত করে সেঁটে দিতে সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে গাছের কষের রেজিনের আঠা যা ওই বনেই প্রচুর পাওয়া যায়। এত যত্নে তৈরি করা এত সুন্দর যে কাস্তে তার নামে আদরের মেয়ের নাম হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

কাস্তে-হাতুড়ি বড় হয়েছে এখানকার সব গ্রামবাসীর চোখের সামনেই। এখানে ওদের বসত রীতিমত স্থায়ী বসত— বংশ পরম্পরায় থাকছে। আর এ জন্যইতো পাথর দিয়ে এত মজবুত করে এখানকার বাড়ি তৈরি। ওরা দেখেছে অন্যত্র মানুষরা যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ায়— যেখানে যায় গাছ-পাতা দিয়ে কিছুদিনের জন্য একটি ডেরা বানিয়ে নেয়। ওটার কিছু হলে কাছেই আর একটা বানায়। এদিককার শিকারে

টান পড়লে বা মৌসুমের বদল হলে এখানকার বাস তুলে ভিন্ জায়গায় চলে যায়। কিন্তু আইন মাল্লাহা এবং এ অঞ্চলের অন্যান্য জায়গার অনেক মানুষ কিন্তু কিছুটা নতুন ধরনের জীবনযাত্রা খুঁজে পেয়েছে। শিকারি-সংগ্রাহক থেকেও তারা এক রকম স্থায়ী গেরস্থালি শুরু করেছে— আর এজন্য শুধু মজবুত বাড়ি নয়, আরো নানা আয়োজন তারা করেছে। এই আইন মাল্লাহার প্রকৃতিতে রয়েছে দীর্ঘ বসন্ত ও গ্রীষ্ম, আর খুবই মৃদু শীত। কি উদ্ভিদের সমারোহ, কি শিকার উপযোগী তৃণভোজীদের সমারোহ এর কোনটারই অভাব নেই এখানে। এমন পরিবেশেই একটানা বংশানুক্রমিক গেরস্থালি সম্ভব হয়েছে।

হাতুড়ি-কাস্তে এই দুই ভাইবোন এখন টগবগে কিশোর-কিশোরী। গেরস্থালির নানা কাজে ওদেরকে এক সঙ্গে দেখা যায়— বাড়ির উঠানে, পাহাড়ের ঢালে, কাছেই বন পরিস্কার করে গড়ে তোলা নিজেদের উদ্ভিদ বাগানে, কখনো বা পাহাড়ের অন্য দিকের তৃণভূমিতে। যেখানেই তারা যায় সঙ্গে থাকে তাদের পোষা কুকুর বাঘা। এই বাঘার মা'ও তাদের বাড়িতে পোষা ছিল। বাঘার সঙ্গে ভাইবোনকে দেখলে মনে হয় এও যেন তাদের এক ভাই— এতো খাতির এত মায়া মমতা এই কুকুরের সঙ্গে তাদের। বনে-বাদাড়ে কিংবা তৃণভূমিতে ছোটখাট শিকারের পেছনে যখন ভাইবোন দু'জন ছোটে বাঘা তখন খুবই কাছে থাকে— ঘেউ ঘেউ করে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায় শিকারের দিকে। তাছাড়া অবাঞ্ছিত জীব জানোয়ারকে দূরে রাখতে বাড়িতে পাহারাদারীও করে এই বাঘা। পুরো গ্রামে বাঘার মত পোষা কুকুর আরো দু'একটি আছে। গ্রামের সবাই গল্প শুনেছে এই কুকুরগুলোর আদি পুরুষের কাহিনী— কারণ সেটি খুব বেশি প্রজন্ম আগের কথা নয়। বনের মধ্যে যে বেশ কিছু নেকড়ে থাকে তাদেরই মধ্যে একটু বন্ধু ভাবাপন্ন কয়েকটি গ্রামে এসে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছে, তাদের দেয়া খাবার খেয়েছে। ওদের মধ্যে আরো বেশি বন্ধু ভাবাপন্নরা গ্রামেই থেকে গেছে; নেকড়ে থেকে পোষা কুকুরের রূপ নিয়ে; যদিও এখনো কিছুটা নেকড়ের চেহারা ও স্বভাব রয়ে গেছে। বন্য প্রাণীকে এই পোষ মানানোর ব্যাপারটি কুকুরের ক্ষেত্রেই সবার আগে ঘটেছে; আর তা ঘটেছে আইন মাল্লাহায় সবার আগে না হলেও এ অঞ্চলের আশে পাশেই। মানুষের কাছে পোষ মানার ফলে এক কালের এই বন্য হিংস্র নেকড়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মে ধীরে ধীরে অদ্ভুত ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন মানুষের দেয়া খাবারই সে খায়, মানুষের আশ্রয়ে সে থাকে, মানুষের সান্নিধ্য সে পছন্দ করে। মানুষ তাকে যা করার প্রশিক্ষণ দেয় তাই সে করে। মানুষও তাদের মধ্যে পোষ মানাবার জন্য বেছে নিয়েছে যেগুলোর মধ্যে এসব গুণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি আছে তাদেরকেই।

কাস্তে-হাতুড়ির অনেকটা শখের শিকারে বাঘা যথেষ্ট সহায়তা দেয় বটে তবে গোটা পরিবার যখন দলেবলে বড় শিকারে যায় তখন বাঘার দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। এরকম শিকার বলতে প্রধানত গাজেল হরিণ শিকার, তবে বন্য গরু এবং এরকম বড় বড় শিকারও কম হতো না। আগুনে ঝলসিয়ে এ সবের মাংস খাওয়া

এখানকার মানুষের বড় সুখ বটে কিন্তু তার সঙ্গে গরম রুটি না হলে যুৎ হয় না। আসলে বন্য বার্লি আর বন্য গম আইন মাল্লাহার খাবার- দাবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন বিষয়টি হলো ওই বন্য শস্যগুলো এখন আর সব সময় বন থেকে আসছেনা, আসছে যার যার বাড়ির বাগান থেকে। এই সেই বাগান যেখানে ছোট বেলায় হাতুড়ি আর কাস্তে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে খেলা করেছে, আর এখন বড় হয়ে সারাক্ষণ বাগানের কাজে হাত লাগাচ্ছে।

বাড়ির কাছেই কিছু তৃণভূমি ও খানিকটা বনভূমি কেটে পরিস্কার করে তৈরি হয়েছে এই বাগান। খুব সহজ হয়নি এ কাজ, যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ। তবে এদিকটায় বেশ খানিকটা খোলা জায়গা থাকায় এটি সম্ভব হয়েছে। গাছ-পালা এখানে যথেষ্ট বিরল, তৃণভূমিও তেমন ঘন নয়। তাই কাস্তে হাতুড়ির পরিবারের এবং অন্যান্য পরিবারগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়েছে বন্য ফসলের সুন্দর বাগান গড়ে তোলার। বন থেকে শস্য সংগ্রহ না করে নিজের গড়া বাগান থেকে করার সুবিধে অনেক। যে বন্য বার্লি ও বন্য গম বনের ফাঁকে তৃণভূমিতে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঘুরে ঘুরে সেখান থেকে শস্য সংগ্রহ করা খুবই দুরূহ কাজ। তা ছাড়া ঠিক পাকার মুহূর্তে সংগ্রহ করতে না পারলে এ শস্য কোন কাজে আসেনা— আগে সংগ্রহ করলে খাওয়া যায়না, শুধু ছোবড়া পাওয়া যায়; দেরি হলে ফেটে গিয়ে মাটিতে নানা দিকে ছিটকে গিয়ে হারিয়ে যায়। এভাবে এখানে ওখানে ঘুরে ঠিক পাকার মুহূর্তে সামান্য পরিমাণ যে শস্য পাওয়া যায় তাতে তাদের চাহিদা মেটেনা। অথচ ইতোমধ্যে ওরা নানা ভাবে শস্য খেতে অভ্যস্ত, বিশেষ বিশেষ করে গরম গরম রুটি হিসেবে।

ওদের শস্য সংগ্রহ পদ্ধতিও তো এ জন্যই বদলে নিয়েছে ওরা— কাঠি দিয়ে ছুয়ে শস্য ফাটিয়ে ঝুড়িতে না ফেলে ওই কাস্তে দিয়ে গোছাশুদ্ধ শস্য খসাখস কেটে আঁটি বেঁধে নিয়ে আসা। বন থেকে ওভাবে আনা শস্যের কিছু কিছু বাগানে ছিটিয়েই ওখানে এখন চারিয়ে তুলেছে শস্যের গাছ— একদিকে সব গমের চারা, অন্যদিকে বার্লির। এক জায়গারগুলো সব এক সঙ্গে লাগানো বলে এক সঙ্গে পাকছে; বাড়ির কাছে একই জায়গায় ঘন হয়ে জন্মাচ্ছে বলে খুব সহজেই দৈনন্দিন নজর রাখা যাচ্ছে ঠিক কখন শস্য পাকছে, যাতে সঠিক সময়ে কাস্তে দিয়ে কেটে আনা যায়। একবার বন থেকে আনা শস্য ছিটিয়ে গজাবার পর আর খুব একটা লাগাতে হয়না। কাটার সময় বা তার আগে কিছু কিছু দ্রুত পেকে ফেটে গিয়ে জমিতে এমনিতেই পড়ে যায় যেখান থেকে তা আবার গজাচ্ছে।

আইন মাল্লাহার ওই বাগানের শস্যকে অবশ্য কৃষির শস্য বলা যাবেনা— কারণ বন্য শস্যের সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই। এ শস্য মোটেই মানুষের কাছে পোষ মেনে মানুষের পছন্দসই পুষ্ট আকার আয়তন পায়নি, পাকার পরও না ফেটে স্থায়ী হয়নি, এক এক গাছে খুব অল্প শস্য ছরা ভর্তি থোকা থোকা শস্য ধরে ফলনশীল হয়নি, অল্প সময়ে পাকার উপযোগী হয়নি; বরং প্রকৃতিতে চিরকাল যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে। পার্থক্য শুধু একটিই— বনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

থাকা অবস্থায় নয়, এদেরকে বাগানে এক সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। আসলে এখানকার মানুষ যদি শস্যকে একটু বেছে বেছে এনে তাদের বাগানে লাগাতো তা হলে এখানেই এ সময়েই কৃষির প্রক্রিয়া শুরু হতে পারতো, কিন্তু তা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ বন থেকে যে শস্য কেটে এনেছিলো তার মধ্যে অল্প কিছু ছিল যেগুলো পাকলে ফেটে যায়না, গোটা থেকে যায়। ওরা যদি শুধু ওগুলোই বেছে বেছে বাগানে লাগাতো তা হলে এর পর থেকে শুধু ওমনি শস্যই পেতো, তাদের জন্য যুৎসই রকমের শস্য। কিন্তু তা তা তারা করেনি। কাস্তে-হাতুড়িদের বাড়ির বাগানটির অধিকাংশ জায়গা যদিও শস্য চারাগুলো দখল করে আছে, তার বাকি অংশে কিন্তু অন্যান্য বন্য উদ্ভিদও লাগিয়েছে ওরা। এর মধ্যে আছে বন থেকে সংগ্রহ করে আনা নানা কন্দ, মূল, শাক যা সবজি হিসেবে ওরা পছন্দ করে। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে রয়েছে বন্য মটরশুটি, যার শুটিগুলো কেমন যেন পেচানো একের সঙ্গে এক জড়িয়ে যাওয়া, মটরগুলো ছোট হলেও খেতে মন্দ নয়, কাঁচা খেতেও বেশ। এগুলোও বন্য, কিন্তু এখন সবই হাতের নাগালের মধ্যে রয়েছে বাগানে। বিশেষ করে যে ক'টা ভেষজ উদ্ভিদের ওপর ওরা অসুখ-বিসুখে নির্ভর করে অনেক খুঁজে বন থেকে নিয়ে এসে এখন বাগানেই লাগিয়েছে; জরুরী প্রয়োজনে হাত বাড়ালেই পেতে পারে।

আইন মাল্লাহা গ্রামের বড় বৈশিষ্ট হলো এর শস্য সংরক্ষণ, শস্য প্রক্রিয়াকরণ আর তা দিয়ে খাবার তৈরির ব্যাপক আয়োজন। বলা যায় এ যেন এক একটি রীতিমত রুটির কারখানার আয়োজন বাড়িতে বাড়িতে। পাথরের হামানদিস্তা, আটা মাখার ব্যবস্থা, রুটি সেকার উপযুক্ত পাথর যা আগুনে উত্তপ্ত করে নেয়া হয়। এ জন্য বাড়ির ভেতরে বাইরে যে ক'টা চুলা জ্বলে তাও বেশ কায়দা করে তৈরি।

কাস্তে-হাতুড়ির অবশ্য বেশি পছন্দ অন্য রকম একটি 'কারখানা'— সেটি নানা রকম হাতিয়ার আর অলঙ্কার তৈরির কারখানা। আসলে এটি ওদের বাড়ির একটি ছোট বাড়তি ঘর মাত্র, অধিকাংশ সময় খালি থাকে, কিন্তু যখন কাজ হয় তখন খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে কেউ কেউ দিনরাত কাজ করে এখানে। এসব তৈরির জন্য উপযুক্ত পাথর, হাড়, ঝিনুক ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ছড়ানো দেখা যাচ্ছে। একটি জিনিসের কিছু আধিক্য দেখা যাচ্ছে অলঙ্কার তৈরির কাজে— গাজেলের পায়ের আঙ্গুলের হাড়ের প্রচুর ব্যবহার। ফ্লিন্টের ব্যবহারে পাতলা ধারালো হাতিয়ার আর তার হাড়ের হাতল এসবের সৌকর্য রীতিমত দেখে থাকার মত। এর সব চেয়ে চমৎকার উদাহরণ হলো শস্য কেটে আনার কাস্তে। হাতলের ওপর খোদাই করা নক্সাগুলোর অলঙ্করণ বেশ দৃষ্টি গোচর। কিন্তু ওই তরুণ তরুণীর নজর বেশি কাড়ছে দেহের অলঙ্করণ— ঝিনুক, ঝিনুক কাটা টুকরো, হাড় কাটা টুকরো, গাজেলের পায়ের আঙ্গুলের ছোট ছোট হাড়— এসবকে ফুটো করে চমৎকার সব মালা তৈরি হচ্ছে এখানে। এখানে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই নিজের দেহকে সাজাতে পছন্দ করে। আইন মাল্লাহার বাসিন্দারা যে গোষ্ঠির তারা বেশ একটু দীর্ঘাঙ্গী; গায়ে লাল পাউডার মেখে গলায়, হাতে,

কোমরে চমৎকার মালা পরে তারা যখন দেখা দেয় চমৎকার লাগে। ওদের মধ্যে তরুণ দুই ভাই-বোনকে তো যথেষ্ট বিশিষ্ট মনে হয়।

এই দেহের সৌন্দর্য চর্চার ব্যাপারটিকে এখানকার মানুষ যেন আরো একটি বেশি এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তা পারলৌকিক যাত্রায়ও অন্তর্ভুক্ত করেছে। যে রকম ভক্তি ও যত্নের সঙ্গে ওখানকার মানুষ তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনকে কবর দেয় তা অবাক করার মত। মৃতকে প্রসাধনে ও অলঙ্কারে সাজিয়ে বিশেষ দেহ ভঙ্গিমায় রেখে কবর দেয়া হয়— আর তা করা হয় বাড়ির কাছে রীতিমত একটি বাড়ির মতই সমাধি স্থলের ভেতরের কবরে। ওই যে দেহ অলঙ্কার তা যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন অনেক পরিশ্রম ও সৌকর্যে তাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয় বলে এগুলোকে বেশ মূল্যবান মনে করা হয়। আর মৃতকে এ দিয়ে সাজানোটিও তাই মৃতের প্রতি যে শ্রদ্ধার পরিচয় তা বেশ স্পষ্ট। কাস্তে-হাতুড়ির দাদী যখন মারা গেল তার মৃতদেহের প্রস্তুতির কথাই ধরা যাক। ওটা ছিল ওই দুই বালক-বালিকার জন্য খুবই বিমর্ষ একটি সময়— কারণ তারা ছিল দাদীর নয়নমণি। কিন্তু কবর দেয়ার আগে দাদীকে যেভাবে সাজানো হয়েছে সারাক্ষণ পাশে বসে তারা মনোযোগ দিয়ে দেখেছে। ঝিনুক ও শাঁখ কেটে কেটে ছোট ছোট অংশ নিয়ে এবং ছোট ছোট শামুক অথবা গাজেলের আঙ্গুলের ছোট টুকরাগুলো সুতায় গেঁথে গেঁথে তৈরি করা মালা, নেকলেইস, ব্রেসলেট ইত্যাদি গলায় হাতে সুন্দর করে পরিয়ে দেয়া হয়েছে মৃতদেহকে। গলা আর হাতের অনেকখানি এভাবে অলঙ্কারে ঢাকা পড়েছে। একই রকম ছোট ছোট শামুক ঝিনুকের মালায় গড়া মুকুটের মত একটি জিনিসে দাদীর মাথাটির প্রায় পুরোটা ঢেকে দেয়া হয়েছে।

হাতিয়ার আর অলঙ্কারের একটি বড় অংশই আইন মাল্লাহার বাড়িতে বাড়িতে এখানকার গ্রামবাসীরাই তৈরি করছে। তবে ওই যে শাঁখ, ঝিনুক, শামুক ভিত্তিক অলঙ্কার এগুলো ওরা দূরের কিছু গ্রামবাসীর কাছ থেকেও পায় বিনিময় ব্যবসার মাধ্যমে। ওদিকে খোলা তৃণভূমি অঞ্চলের অনেকখানি কিছুটা মরুময়— শিকার, শস্য, বাদাম সবই বেশ দুর্লভ। ওরা কষ্ট করে ভূমধ্যসাগর আর স্থানীয় কিছু হ্রদ থেকে শামুক-ঝিনুক ইত্যাদি সংগ্রহ করে এবং এগুলোর বিনিময়ে আইন মাল্লাহার ও কাছাকাছি সুফলা জায়গাগুলোর মানুষের কাছ থেকে শস্য ইত্যাদি পায়।

দূরের গ্রামবাসীদের সঙ্গে আইন মাল্লাহাবাসীদের যোগাযোগ রয়েছে বটে, কিন্তু ওদের সবার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এক রকম নয়। তাছাড়া তুলনামূলক ভাবে অল্প দূরত্বে থেকেও এদের কোন কোন গোষ্ঠির সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য বেশ প্রকট। এই সবগুলো গ্রামের মধ্যে বেশ কিছু মিল রয়েছে। ঘন বন ও তৃণভূমি সমৃদ্ধ বনের মাঝামাঝি জায়গাতেই এসব গ্রাম, সবগুলোর কাছে ভাল পানির উৎস আছে যেখানে হরিণ প্রভৃতি শিকারের পশুর সমাবেশ ঘটতে পারে। গ্রামবাসী নিজেদের জন্যও পানির উৎস জরুরি।

যেমন আইন মাল্লাহা থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ২০ কিলোমিটার দূরে হেয়োলিম গুহা এলাকায় রয়েছে বেশ বর্ধিষ্ণু একটি গ্রাম। কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে আইন

মাল্লাহার মানুষের সাংস্কৃতিক পার্থক্য রয়েছে, যদিও উভয়ের জীবনযাত্রা প্রায় একই রকম। প্রধান পার্থক্যটি তাদের অলঙ্কার আর কিছু কিছু হাতিয়ার তৈরির কাঁচামালে। বন্য গরুর পাঁজরের হাড় দিয়ে এরা সুন্দর কাস্তে তৈরি করে। শেয়ালের দাঁত আর ছোট চড়ুইয়ের পায়ের হাড় দিয়ে এরা চমৎকার সব অলঙ্কার তৈরি করে। আইন মাল্লাহায় এমনটি দেখা যায়না। আবার আইন মাল্লাহার জনপ্রিয় অলঙ্কারের পুঁতি গাজেলের আঙ্গুলের হাড় হেয়োলিম গুহার মানুষদের মধ্যে দেখা যায়না বললেই চলে। শুধু তাই নয় এমন কাছাকাছি বাস করা দুটি গোষ্ঠির মধ্যে বিয়েশাদির প্রচলনও নেই। উদাহরণ স্বরূপ কাস্তের বিয়ের কথা যখন ওঠলো তখন যোগাযোগ করা হলো অন্য কিছু গ্রামের সঙ্গে, কিন্তু হেয়োলিম গুহা অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে নয়, কারণ তাদেরকে আত্মীয়তা করার ক্ষেত্রে ভিনদেশী মনে করা হয়। তবে আইন মাল্লাহার কাছাকাছি আরো নানা গ্রাম রয়েছে যাদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা চলে। তাই ঘটকের আসা যাওয়া চলছে। এর মধ্যে একদিন হয়তো কাস্তের বিয়ে হয়ে যাবে এরকম কাছের কোন গ্রামে। তার ভাই হাতুড়িও ইতোমধ্যে বোনের অভাব মিটিয়ে উঠবে— নিজেও বিয়ে করবে হয়তো ওই গ্রাম অথবা এমনি অন্য কোন গ্রাম থেকে।

* * *

১৯৫৪ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আইন মাল্লাহার গ্রামটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। সেখানে ধসে পড়া পাথরের যে দেয়ালগুলো পাওয়া গেছে তাতে ওখানকার বাড়িগুলোর নির্মাণ পদ্ধতিটি বেশ বোঝা গেছে। সেই সঙ্গে বড় পাথরের হামানদিস্তা সহ আবিষ্কৃত হয়েছে নানা হাতিয়ার যার মধ্যে কাস্তের বৈচিত্র চমকে দেয়ার মত। বাড়ির নির্মাণ শৈলী বলে দিয়েছে যে বেশ স্থায়ী প্রকৃতির করেই এগুলো তৈরি। তাছাড়া যে বিচিত্র পশু হাড় ওখানে পাওয়া গিয়েছে তার বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে যে এগুলো মারা পড়েছে বছরের বিভিন্ন মৌসুমে— অর্থাৎ কিনা সব মৌসুমেই গ্রামের বাসিন্দারা এখানকার এই বাড়িগুলোতেই ছিল, ওরা যাযাবর ছিলনা।

বসবাসের বাড়ির পাশেই আবিষ্কৃত হয়েছে কবরখানার বাড়ি। শুধু একটি কবরখানা থেকেই ১১ জন মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের দেহের অলঙ্কারগুলো এখনো চমৎকার রয়েছে। প্রচুর অলঙ্কারে সজ্জিত করে খুব সযত্নে তাদের কবর দেয়া হয়েছে। অলঙ্কারের বস্তুগুলোও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে— গাজেলের আঙ্গুলের হাড়, ঝিনুক, শামুক, শাঁখ ইত্যাদি দিয়ে বেশ সৌকর্যের সঙ্গে তৈরি হয়েছে এগুলো। দেখে বোঝা যায় শুধু মৃতদেহ সাজিয়ে দেবার জন্য নয়, জীবদ্দশায়ও দেহের জৌলুশের জন্য ব্যবহৃত হতো এমনি অলঙ্কার। কবরের মধ্যে মানুষের সঙ্গেই সাজিয়ে কবর দেয়া হয়েছে কুকুরকেও। এতে আন্দাজ করা হচ্ছে যে ইতোমধ্যে কুকুর মানুষের প্রিয় পোষা প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। অন্তত এই একটি প্রাণীকে পোষ মানাবার ক্ষেত্রে মানুষ বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে।

কিন্তু খাওয়ার শস্যের যে নমুনা ওই বসতে পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যায় যে উদ্ভিদকে পোষ মানাবার ব্যাপারটি এখনো বাকি। এখনো বন্য শস্যই সংগ্রহ করছিলো তারা। তবে এর জন্য একটি নতুন হাতিয়ার কাস্তের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেছে যার ব্লেড পরীক্ষা করে বোঝা

গেছে এটি হাজার হাজার বার শস্যের গোছাকে কেটেছে। এই ব্যাপারটি এবং শস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপক আয়োজনের নিদর্শনগুলো বলে দেয় যে শস্য সংগ্রহ করা হয়েছে কেন্দ্রীভূত কোন জায়গা থেকে এখানে ওখানে খুঁজে খুঁজে নয়। সেভাবেই মনে করা হয়েছে যে স্থায়ী বসতের মত স্থায়ী বাগানও গড়ে ওঠেছিল সে সময়। এ বাগান করাটি কৃষি না হলেও কৃষির দিকে অগ্রগতি তো বটেই। এ ভাবে উত্তরাঞ্চলে সর্বশেষ বরফ যুগের অবসানে জলবায়ু যখন ক্রমে উষ্ণতার দিকে যাচ্ছে তখন মধ্যপ্রাচ্যের শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ নতুন রকম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হচ্ছে স্থায়ী শস্যের বাগান সহ বসতের গ্রাম গড়ে তুলে।

আইন মাল্লাহার আশপাশে সমসাময়িক আরো কিছু বসতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে। সেগুলোর একটি হচ্ছে ওখান থেকে ২০ মাইল দূরের হোয়োলিম গুহার গ্রাম। অনেক দিক থেকে এরা একই ধরনের গ্রাম। কিন্তু মানুষের যে ফসিল এখানকার কবরখানায় আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে আইন মাল্লাহার মানুষের সঙ্গে তাদের বিয়ে শাদি বেশি হয়নি বলেই মনে হয়েছে। এটি বোঝা যাচ্ছে যে হোয়োলিমের মানুষদের গড়পড়তা উচ্চতা কিছু কম আর তাদের অধিকাংশরেই তৃতীয় পেষণ দন্তটির উদ্গাত না হবার এক রকম রোগ ছিল যা আইন মাল্লাহার মোটেই দেখা যায়নি। মাত্র ২০ মাইল দূরের এই দুই গ্রামের মধ্যে যদি নিয়মিত বিয়েশাদি হতো তা হলে এই পার্থক্যগুলো থাকতোনা— তৃতীয় পেষন দন্তের ব্যাপারটি সমান ভাবে দুই গ্রামেই বংশ পরম্পরায়ে দেখা যেতো। উভয়ের সাংস্কৃতিক পার্থক্যটি উদ্ঘাটিত হয়েছে কবরের মৃতদেহগুলোর সাজে— এখানেও অলঙ্কারের মালায় আচ্ছাদিত দেহ, কিন্তু ভিন্ন জিনিস দিয়ে তৈরি হয়েছে এই অলঙ্কার। এ যেন দুটি গ্রামের দুই গোষ্ঠির মানুষ নিজের নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য পৃথক সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে।

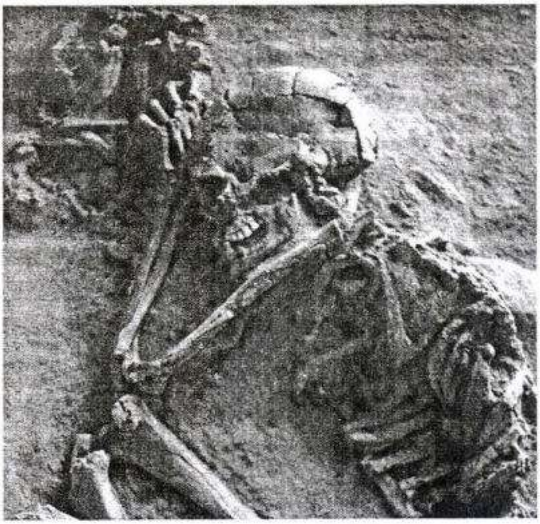

কবরে মানুষের সঙ্গে দেয়া কুকুরের কঙ্কাল

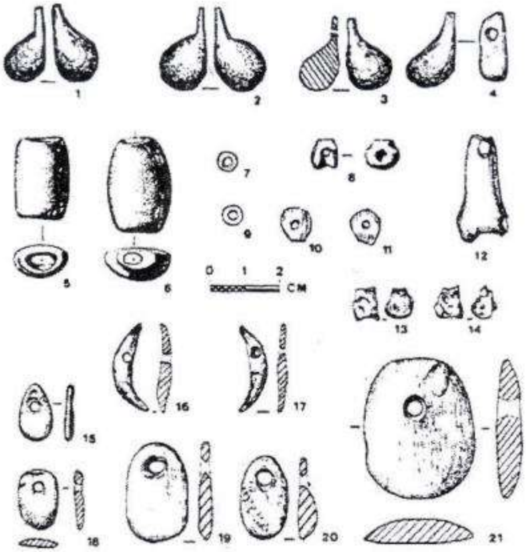

আইন মাল্লাহার অলঙ্কার

বন্য গম

যুক্তরাষ্ট্রের বার্নেট গুহার মাইয়ারা ঃ
১৩ হাজার বছর আগে

বর্শার আগায় পাথরের এই ধারালো অস্ত্র কিনারার ধার আর অগ্রভাগের তীক্ষ্ণতার কারণে তা অতিকায় সব পশুর জন্য মারাত্মক। এই অস্ত্রটি ওদের সংস্কৃতির বড় পরিচয়। ওদেরই যাযাবর একটি পরিবারের গুরুজন মাইয়ারা। পরিবারটিকে ঘরমুখো করার চেষ্টায় তিনি ব্যর্থ।

আজকের যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অঙ্গরাজ্য নিউ মেক্সিকোতে রয়েছে গুয়া দালাপু নামের একটি পার্বত্য এলাকা। আজ থেকে ১৩ হাজার বছর আগের দিনগুলোতে এখানে পর পর কয়েকটি গুহাতে দশ বারো জন মানুষের একটি বৃহত্তর পরিবার থাকে। এর নাম বার্নেট গুহা। ওরা সব সময় থাকে না, অনেক দিন পর পর এই গুহায় ফিরে এসে হয়তো কিছুদিন থাকে, তারপর আবার তাদের যাযাবর জীবনে বেরিয়ে পড়ে। একেবারেই শিকারি-সংগ্রাহক জীবন যাপনকারী এ মানুষগুলো অধিকাংশ সময় জীবিকার উদ্দেশ্যেই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে গ্রীষ্মের ও শরতের সময় বড় শিকারের কাজ যখন তুঙ্গে থাকে তখন এই ঘুরে বেড়াবার জন্য পরিবারটি বেশ কয়েকটি জানাশোনা পরিবারের সমন্বয়ে ৩০-৪০ জনের একটু বড় দল গড়ে, আবার শীতের সময় নিজ নিজ বৃহত্তর পরিবারে নিজেদের মত করে থাকে।

এমনি একটি বৃহত্তর পরিবারের মধ্যমণি হলেন মাইয়ারা— যে নামের অর্থ হলো বিচক্ষণ মানুষ। এই মহিলার এখন বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। এত বয়সী মানুষ আশপাশে খুব বেশি নেই; স্বামী মারা গেছে তাও বেশ কিছুদিন হলো। তাঁর দুই ছেলে আর দুই মেয়ে তাদের স্ত্রী ও স্বামী সহ এই একান্নবর্তী পরিবারে থাকে— আর তাদের ছেলেমেয়ে জনা চারেক এখনো শৈশবের অথবা কৈশোরে। মহিলাকে বিচক্ষণ নাম দেয়া হলেও তাঁর কথা যে ছেলেমেয়ে বা জামাই বৌরা খুব একটি শোনে তা বলা যাবে না। কারণ জীবনযাত্রার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মাইয়ারার সঙ্গে

পরিবারের অধিকাংশের মতের মিল হয়না। তারপরও মাইয়ারা সবার খুব শ্রদ্ধার পাত্রী। তাঁর সঙ্গে অন্যদের মতান্তরের বিষয়গুলোতে পরে আসছি।

বার্নেট গুহার বাসস্থানটিতেই তাদের তুলনামূলকভাবে বেশি দিন থাকা হয়েছে— ঘন ঘন বেশ কয়েকবার এখানে ফিরে এসেছে বলে। তাই স্থায়ী বলে তাদের কোন সম্পত্তি যদি থাকে তবে তা এখানেই আছে— সুন্দর করে তৈরি একটি চুলা, পাথরের কিছু বাড়তি অস্ত্র, হাতিয়ার, পশু চামড়ার তৈরি কিছু পোষাক এবং কিছু বহনের থলে ইত্যাদি। কিছু বাড়তি তাঁবু ও তাঁবু সরঞ্জামও রয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ সময় পরিবারটি যখন পথে পথে থাকে তখন সঙ্গে বেশি জিনিস থাকেনা, প্রয়োজনীয় কিছু অস্ত্র ও হাতিয়ার ছাড়া। যদি যুৎসই কোন গুহা বা পাথুরে আশ্রয় পাওয়া যায় সেখানে হয়তো কয়েক দিনের রাত্রিবাস চলে, নইলে পশু চামড়ার তাঁবু খাটতে হয়। অবাক হবার মত ব্যাপার হলো যে বিশাল জায়গা জুড়ে এরা এভাবে যাযাবর জীবন কাটায় তাদের হয়তো তা না করলেও চলতো— যদি তারা তাদের খাদ্যাভ্যাস একটু বদলাতো। কিন্তু উত্তর আমেরিকার প্রায় সব মানুষের মত তারা সেটি কেন জানি করতে রাজি নয়। আমাদের এই বিশেষ পরিবারে সবার গুরুজন মাইয়ারা অবশ্য একটু অন্য ভাবে চিন্তা করে এই খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে। অনেক উদ্ভিজ খাবার এবং শিকার করে বা ধরে খাবার মত অনেক ছোট ছোট পশুপাখি চারধারে থাকা সত্ত্বেও এ মানুষদের পেশা ও নেশা হলো সে সময় সারা আমেরিকা জুড়ে থাকা অতিকায় জন্তুগুলোকে শিকার করা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হাতির মত কিন্তু তার চেয়েও বড় ম্যামথ ও ম্যাষ্টাডন; বিশালকায় বন্য গরুর মত প্রাচীন বাইসন (বাফেলো), আর কিছু কিছু প্রাচীন উট, ঘোড়া, ভালুক ইত্যাদি। এই শিকার এত ব্যাপক ও দক্ষ ভাবে তারা করছে যে এক এক জায়গায় পশুগুলো যে নির্বংশ হয়ে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই।

আমেরিকা জুড়ে এখন একটি শুষ্কতার আবহাওয়া চলছে— বিশেষ করে নিউ মেক্সিকো এবং আশ পাশের ওই অঞ্চলে তো বটেই। দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া কিছু বড় গাছ রয়েছে— বার্চ, হিকোরি ইত্যাদি তবে আগেকার দিনের মত এদের ঘন বন নয়। বাদবাকি জায়গাতে ঘাস আর ঝোপঝাড়ের রাজত্ব। রসালো বড় ফল খুব বেশি পাওয়া না গেলেও যথেষ্ট খোঁজ করলে এবং জায়গাগুলোর সঙ্গে ভাল পরিচয় থাকলে খাওয়ার মত ভাল বাদাম, ছোট বেরি ফল, পুষ্ট শিকড় ইত্যাদি পাওয়া যায়। আর পাখি, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ যাই বলা হোক বেশ বিচিত্র রকমের প্রাণী এখানে প্রচুর রয়েছে। পাখির মধ্যে বেশ তৎপর ও শক্তিশালী কিছু হলো মরা পশু ইত্যাদি খাওয়া শকুন জাতীয় এবং চিল-ঈগল-বাজ জাতীয় প্রচুর শিকারি পাখি, যার মধ্যে রয়েছে টার্কি শকুন, কালো শকুন, কালিফোর্নিয়া কনডোর শকুন; প্রেইরি বাজ, স্প্যানো চিল ইত্যাদি। এগুলো খাওয়ার জন্য বেশি মুখরোচক না হলেও

অন্যগুলো— পশ্চিমা গ্রেব হাঁস (রাজহাঁস জাতীয়), প্রেইরি বন্য মুরগি, পার্বত্য কোয়েল এবং সবার চেয়ে দৃষ্টি কাড়া বেশ বড়সড় ও অদ্ভুত চেহারা ও পালকের বেশভূষার বন্য টার্কি (মুরগি জাতীয়) ইত্যাদি কিন্তু খেতে দারুণ। বৃক্ষবাসী নানা রকমের কাঠ- ঠোকরা আর প্যাঁচার কথা না হয় বাদই দিলাম।

স্তন্যপায়ীদের দলে কিছু আছে যেগুলো নেহাতই স্থানীয় আমেরিকান প্রাণী। তাদের কিছু কিছু ছোট হলেও মাংসাশী যেমন র‍্যাকুন (রিংটেইল ক্যাট), কায়োট (আমেরিকান নেকড়ে), স্কাঙ্ক যার গায়ে বাজে গন্ধ, গাছের শিকড় ইত্যাদি ওপড়ে ফেলতে ওস্তাদ; মাউন্টেন লায়ন; আমেরিকান ব্যাজার, শেয়াল ইত্যাদি; আবার নানা রকম বন্য বিড়াল— বব ক্যাট, পোল ক্যাট ইত্যাদি।

খাওয়ার জন্য বেশি উপযুক্তদের মধ্যে রয়েছে আমেরিকান হরিণ, পার্বত্য হরিণ, মিউল ডিয়ার হরিণ, বিগ হর্ন বন্য ভেড়া, খরগোস, পঙ হর্ন (হরিণ, গরু ও জিরাফের একটি সমন্বয়ের মত); আর আছে নানা রকম ইঁদুর জাতীয়রা— ক্যাঙ্গারু র‍্যাট, প্রেইরি ডগ, শ্রু এবং বিচিত্র কাঠবিড়ালী। টিকটিকি-গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপের বাহার দেখতে চাইলে এ জায়গার কোন তুলনা নেই। নানা সাইজ, রঙ, দেহের বিচিত্র অলঙ্কারে এরা আছে— পিগমি টিকটিকি, টেক্সাস 'শিঙওয়ালা' টিকটিকি, কলারওয়ালা টিকটিকি, গায়ে কাঁটা ওঠা টিকটিকি, আরো কত কি— নামেই শুধু টিকটিকি আসলে বেশ বড়সড়, রসালো, খেতে চাইলে মানা নেই। অন্য রকম সরীসৃপের মধ্যে কচ্ছপই প্রধান— পানির কাছিম, আর ডাঙার কচ্ছপ উভয়েই।

তবে এখানকার মানুষের কাছে এত সবের কোনটিই যেন চোখে লাগেনা। ওদের কাছে সত্যিকার চোখে লাগার মত প্রাণী হলো অতিকায় প্রাচীন স্তন্যপায়ীগুলো (যাদের প্রায় সবগুলোই এর পরে-পরেই বিলুপ্ত হয়েছে)। এদের মধ্যে অতিকায় ম্যামথ (বিশেষ ভাবে সারা গা পশমে ঢাকা ম্যামথ), বাইসন ইত্যাদির কথাতো বলাই হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে যোগ করতে হবে ঝোপের গরু নামে এক রকম বন্য গরু, মাস্ক অক্স বা কস্তুরি গরু নামের প্রচুর লোমধারী পশু যা গরু নাম হলেও আসলে অতিকায় ভেড়া বা ছাগলের গোষ্ঠির। আর রয়েছে প্রাচীন উট, অতিকায় ভালুক, এবং ম্যাক্সিকান ঘোড়া নামে অন্য রকম এক প্রাচীন ঘোড়া। আমাদের ওই মানুষগুলোর নজরে এই অতিকায় পশুগুলোর সব কটিই থাকলেও তাদের দিনকালের অধিকাংশ কাটে অতিকায়ের মধ্যেও অতিকায় ওই ম্যামথ-ম্যাষ্টাডোন, আর কখনো কখনো বাইসনের পেছনে। এগুলো সাধারণত দল বেঁধে ওই বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে ঘুরে বেড়ায়, আর এই মানুষগুলোরও ঘুরে বেড়াবার একটি বড় কারণ হলো এদেরকে খুঁজে বের করা এবং একবারে যতগুলো সম্ভব শিকার করা, যতখানি পারে মাংস-চর্বি খাওয়া, প্রয়োজনে শীতের জন্য শুকিয়ে রাখা, আর এদের মৃতদেহ থেকে যতখানি পারে চামড়া, হাড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা।

ওরা যখন পথে পথে তাঁবুতে শিকারের ক্যাম্পে থাকে তখন এই অতিকায়দের মাংস ছাড়া তাদের চলেনা। সে সময় যে অল্প কিছু অস্ত্র তারা সঙ্গে বহন করে বেড়ায় তার মধ্যে প্রধান অস্ত্রটি দেখলেই বুঝবো কেন তারা এই সব বিশাল জন্তুদের ঘায়েল করতে একেবারেই পিছপা হয়না। এই মোক্ষম অস্ত্রটি হলো তাদের বর্শার আগায় আটকানো পাথরের ধারালো অংশটি। এ এক দেখার মত জিনিস— খুবই যত্ন করে তৈরি। এটির ডিজাইন, এটি তৈরি করার পেছনে তাদের কুশলতা ও পরিশ্রম না দেখলে এদের মূল সংস্কৃতিটিই বোঝা যাবেনা। নানা জায়গার এই যাযাবরদের দেখলে মনে হয় পুরো আমেরিকা জুড়ে এই একই সংস্কৃতি চলছে— এরকম বিশেষ বর্শাগ্র তৈরি করা; একে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে ম্যামথ, বাইসন ইত্যাদি ঝাঁকে ঝাঁকে শিকার; আর এই শিকারকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন আবর্তিত হওয়া। এই জীবন ক্রমাগত ঘুরে বেড়াবার জীবন, কিছুটা বিপজ্জনক জীবনও বটে। ওই মারাত্মক বর্শাগ্রটি তার বিশেষ ডিজাইনের ও কার্যকারিতার কারণে এই পুরো সংস্কৃতির একটি বড় নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে যে সব অতিকায় প্রাণীর কথা বলছি মানুষের এই শিকার-মারণোৎসব ছাড়াও এমনিতেও তাদের খুব সুদিন যাচ্ছেনা। আবহাওয়ায় সাম্প্রতিক যে পরিবর্তন এসেছে তাতে তাদের জীবনযাত্রায় এখন ভাটা নেমেছে— শুষ্কতার কারণে ওদের তৃণ ও উদ্ভিজ অন্যান্য খাবারের সরবরাহ দারুণ কমে গেছে, আর বিশাল দেহের কারণে দৈনন্দিন তাদের এই খাবারের চাহিদাও কম নয়; তাছাড়া ডোবা, জলা, নদী যে সব পানির উৎস আগে সমৃদ্ধ ছিল তার বেশির ভাগ শুকিয়ে গেছে। পানির ভাল উৎস যে কটি আছে সেগুলো কষ্ট করে খুঁজে নিতে হয়। খাদ্যকষ্ট ও জলকষ্টের কারণে ওদের দেহ হয়ে পড়েছে রোগা। এ সব কারণে নিজ থেকেই দলে দলে মরনের ঘটনাও ক্রমে বেড়ে গেছে। অবশ্য আগে থেকেই সংখ্যায় তারা অনেক, মানুষের সংখ্যার তুলনায় তো অনেক বেশি বটেই। সবকিছু এই বড় বড় জন্তুগুলোকে শিকারের কাজটিকে কিছুটা সুবিধা করে দিয়েছে— কারণ সংখ্যায় ওরা অনেক, এবং স্বাস্থ্যগত দিক থেকে বেশ অসহায়। তার ওপর সেই অব্যর্থ অস্ত্র পাথরের বর্শাগ্র ওদের জন্য মারাত্মক।

মাইয়ারার স্বামী বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর তিন জোয়ান ছেলে, দুই মেয়ে-জামাই মেয়েদের সহ এই পরিবারেই থাকে। ওদের নিয়ে তিনি সব সময় সন্ত্রস্ত থাকেন, কারণ ওই বিপজ্জনক জীবন যাত্রা তাঁর পছন্দ নয়। ওদের বাবা মারা গেছে বাইসনের হাতে। সেই স্মৃতি তাঁকে তাড়া করে বেড়ায়, বাবা যেভাবে ওই মারাত্মক অস্ত্রটিকে ছাড়া আর কিছু চিনতনা ছেলেরাও হয়েছে তাই। বাড়িতে যে ক'দিন আছে নতুন করে এ অস্ত্র বানাচ্ছে। আর বহুদিনের জন্য সপরিবারে বেরিয়ে পড়লে তখন সারাক্ষণ এটি ব্যবহার করছে। এই অস্ত্রটিই যেন যেন মাইয়ারার শত্রু।

বার্নেট গুহায় থাকাকালে মাইয়ারার পরিবারের সদস্যরা যত্ন সহকারে তৈরি করেছে তাদের এই অস্ত্রটিকে। আকারে আকৃতিতে এটি একটি লম্বাটে পাতার মত— অনেকটা একটি আম পাতার মত, এত পাতলা না হলেও সাইজ করা পাথরকে দু'পাশ থেকে চলতা তুলতে তুলতে তাকে বেশ পাতলা করেই তোলা হয়েছে যার দুটি পিঠই সমান যত্ন নিয়ে মোটামুটি সমতল করে তোলা হয়েছে। অবশ্য পিঠ দুটি একেবারে সমতল বা মসৃণ নয়, কারণ টুকরা টুকরা চলতা পাথর এখান থেকে তুলে ফেলতে গায়ের ওপর একটি সুন্দর ঢেউ খেলানো ভাব সৃষ্টি হয়েছে; দেখতেও সে রকম, আর দুই পিঠে হাত বুলালেও সে রকমই বোধ হয়।

দুই পিঠে চলতা উঠিয়ে নেবার প্রক্রিয়াতেই দুই পাশের কিনারাগুলোকে অত্যন্ত ধারালো করে তোলা হয় আর অগ্রভাগকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ করে। বর্শার আগায় বাঁধার জন্য তৈরি করা এই পাথরের অস্ত্রের গোড়ার দিকটায় একটা খাঁজ কেটে নেয়া হয় যাতে বর্শার লাঠিটি ওখানে সুন্দর ভাবে ফিট করা যায়। খাঁজটি যথেষ্ট চওড়া ও গভীর— অন্তত এক ইঞ্চি গভীর তো বটেই। এই হাতিয়ারের উপযুক্ত ধার সৃষ্টি হতে পারে এমন চেরট, জ্যাসপার, কোয়ার্টজাইট, ওবসিডিয়ান, ক্যালসেডোনি ইত্যাদি খানিকটা বিরল পাথর খুঁজে নিতে হয়েছে। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াবার ফলে যুৎসই এ পাথর খুঁজে নিতে ওদের অসুবিধা হয়না। শুধু আমাদের ওই বার্নেট গুহার মানুষরা নয় সারা আমেরিকা জুড়ে মানুষ এই কাজটি করছে, এবং অস্ত্রটি তৈরি করছে, ওই পাথরগুলো দেখতেও ভারি সুন্দর। প্রায় সবগুলোর রয়েছে সুন্দর রঙের ঈষদচ্ছ আভা।

বর্শাগ্র হিসেবে অস্ত্রটি তৈরি হলেও যে কোন সময় এটি বর্শা থেকে খুলে ছুরি, কোরানি বা এরকম যে কোন ধারালো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় প্রয়োজনে অন্য রকম হাতলের সঙ্গে লাগিয়ে। এদিক থেকে এটি একের মধ্যে অনেক। তবে শক্ত বর্শা দণ্ডের মাথায় লাগিয়ে যখন শিকারের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হয়, অথবা কাছে এসে এর খোঁচা দিয়ে শিকারের দফা রফা করা হয় এখন এটি একটি মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। আসলে ম্যামথ বা বাইসনের মতো বিশাল ভয়ঙ্কর জন্তুকেও যে এটি কাবু করতে পারে তার কারণ এটি তাদের দেহে যে কোন অংশে বিদ্ধ হয়ে বড় ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে চারিদিক থেকে বর্শার আঘাতে আহত হয়ে ওরা রক্ত ক্ষরণেই দ্রুত কাহিল হয়ে পড়ে। এসব বিশালদেহী পশুর মত এত বড় একটি টার্গেটের যে কোন জায়গায় এটি লাগলেই হলো, কোন বিশেষ নাজুক অঙ্গে লক্ষ্যভেদের প্রয়োজন হয়না। তারপরও বর্শা নিক্ষেপটি সজোরে হওয়া দরকার— কারণ ম্যামথ বাইসনের মত মোটা চামড়া ভেদ করা সহজ কাজ নয়। এজন্য ওরা বর্শা নিক্ষেপকের ওপর নির্ভর করে। লম্বা লাঠির মত এই নিক্ষেপকের সঙ্গে আটকিয়ে দীর্ঘতর বক্র রেখায় ছুঁড়তে পারলে বর্শার গতি ও দূরত্ব অতিক্রমের ক্ষমতা বেড়ে যায় অনেক।

যতই এ অঞ্চলের সাধারণ সংস্কৃতির অংশ হোক এই শিকার আমাদের ওই পরিবারের কর্ত্রী বিচক্ষণ মাইয়ারা কিন্তু এ নিয়ে এতো মাতামাতি পছন্দ করেন না। তাঁর কথা হলো আমরা নিজেরা এই বার্নেট গুহায় স্থায়ী ভাবে থাকলেই পারি। ম্যামথ বা বাইসনের পেছনে ছুটে আজ এখানে কাল ওখানে এভাবে ছন্নছাড়া জীবনের কী প্রয়োজন আমাদের? বার্নেট গুহার আশপাশেই তো পাওয়া যায় কত নির্বিঘ্ন খাবার— পাখি, খরগোস, গিরগিটি, কচ্ছপ এসব ঝামেলাহীন ছোট প্রাণী শিকার করতে পারি বা ফাঁদে ধরতে পারি; কাছের নদীতে বা ডোবায় মাছ ধরতে পারি; বেরি ফল, বাদাম প্রচুর ঝোপ থেকে আনতে পারি; আর নিদেন বড় কিছু প্রয়োজন হলে এদিকে হরিণের কি কোন অভাব আছে? অথচ তা না, সবার শুধু ম্যামথ-বাইসন-ভালুক-ঘোড়ার মাংস চাই। হরদম মানুষ এই বড় শিকার করতে গিয়ে আহত হচ্ছে। এই বিশাল বিকট জন্তুগুলোর দল যখন দৌড় দেয় তখন এমনিতেই তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড়। কী দরকার এসব ঝুঁকি নেবার? ম্যামথের খোঁজে ওই জন্তু দলের চলাচলের পথের কাছে যেনতেন জায়গাতে তাঁবু খাটিয়ে থাকা, আর এই বার্নেট গুহার নিজের বাড়িতে থাকার মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাত সেটি পরিবারের অন্যরা বুঝতে চাচ্ছেনা।

মেয়েরা, ছেলের বৌয়েরা যদিও বা বোঝে ছেলেরা একেবারেই বুঝতে চায়না। তাদের কথা হলো এই নতুন নতুন জায়গায় খোলা মাঠে ম্যামথ-বাইসনের মতো দুর্দান্ত প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার যে আনন্দ তার তুলনা নেই। ওই পাখি-খরগোসের মত চুনোপুটি শিকার দু'একদিন করা যায়, ওতে পেটও ভরেনা, মনও ভরেনা। অথচ কয়েকটি ম্যামথকে আমরা বুদ্ধি দিয়ে অনায়াসে এক সঙ্গে কুপোকাৎ করতে পারি— তার একটির একাংশের মাংস খেয়েও শেষ করতে পারিনা সবাই মিলে। এভাবে সবাই মিলে শিকার করতে, আর ভোজ খেতেই তো মজা।

আসলে যে কথাটি ওরা বেশি বলেনা তা হলো ওই হরিণ, পাখি, খরগোস, গিরগিটি এরা ছোট হলেও ভীষণ চালাক আর ক্ষিপ্র, ওদেরকে সহজে ধরা যায়না। চালাক হবার কারণ হলো এখানে ওদের অনেক শত্রু— ঈগল, বাজপাখি, বেজি, শকুন, হিংস্র প্রাণী প্রচুর; বেঁচে থাকার চেষ্টাতেই ওরা ওই রকম চালাক আর ক্ষিপ্র হয়েছে। যখন দরকার তখন এদেরকে খুঁজে পাওয়া, আর খুঁজে পেলেও সহজে মেরে আনা, খুবই ধৈর্যের ও পরিশ্রমের কাজ। একমাত্র কচ্ছপটিই সহজলভ্য কারণ এরা দৌড়ে পালাতে পারেনা। কাজেই মাইয়ারা বুঝতে পারছেননা যে ওই চুনোপুটিগুলোর ওপর নির্ভর করতে যে কষ্ট করতে হবে, খাবার নিয়ে যত অনিশ্চয়তায় থাকতে হবে, তার চেয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলে ম্যামথ শিকার ঢের ভাল। গায়ে গতরে বিশাল হলে কী হবে এদের মাথায় বুদ্ধি খুব কম হওয়াতে বা এমন প্রতিকূল পরিবেশে মধ্যে এরকম বিশাল দেহ পোষণ করতে গিয়েই ওরা লেজে গোবরে হয়ে গেছে— সুযোগ সন্ধানী মানুষের কাছে বলতে গেলে অসহায় তারা। আর ওই যে পাথরের ধারালো বর্শাগ্র, মানুষের মারণাস্ত্র অসহায় এই

প্রাণীগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিলেই হলো। আসলে এখানকার সব মানুষরাই যেন এমনি হুজুগে অভ্যস্ত। এরকম জীবনযাত্রাই তাদের পছন্দ। মাইয়ারার মত কয়েকজন ব্যতিক্রমী মানুষই শুধু এ নিয়ে মাঝে মাঝে কথা তোলে, তাও শুধু নিজেদের আপনা মানুষদের মধ্যেই। স্বামীর মৃত্যু তিনি ভুলতে পারেননা। ছেলেরা অবশ্য একে একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনাই মনে করে।

তবে মাইয়ারার এমন চিন্তা, এমন চেষ্টা একেবারে বৃথা যায় না। তিনি কিছু দিন পরপরই পরিবারকে বার্নেট গুহায় এবং এরকম আরো কিছু গুহার শান্তির জায়গায় ফিরিয়ে আনেন। সেখানে বেশ ক'টা দিন পরিবার একটু অন্য ভাবে চলে— ছেলেমেয়ে সবাই মিলে লেগে যায় ছোট ছোট শিকার আর সংগ্রহের কাজে। খরগোস আর কচ্ছপ ভালই খাওয়া হয়, আর চলে মাছ ধরা। তখন একটু অবকাশও হয় সবাই শান্তিতে কথা বলার ও ফুর্তি করার; আর পোষাক সেলাই, তৈজস, ও হাতিয়ার তৈরি ইত্যাদি কাজ করার; এমনকি সুন্দর সুন্দর পাথর ও হাড়ের টুকরা দিয়ে অলঙ্কার তৈরির। তাছাড়া শীতের দিনগুলোতে তো এমনিতেও এখানে এসে থাকতেই হয়। কিন্তু আপাতত: তাঁর পরিবারের সবাই যা করছে— ম্যামথ বা বাইসন শিকারের পরবর্তী অভিযানে চলছে— এই বৃদ্ধ বয়সেও নাতি-নাতনীদের সামলে রেখে তিনিও তাই করছেন। কয়েকটি পরিবারের জনা তিরেশেক মানুষ চলেছে এই কাজে।

আগে যেখানে তাঁবু গেড়েছিলো সে তাঁবু তুলে তখন ওরা ওখান থেকে বেশ দূরে চলে এসেছে। এভাবে তিন চারদিনের বেশি এক জায়গায় থেকে কোন লাভ হয়না; ম্যামথ বা বাইসন, বা এমনি বড় পশুর দলকে খুঁজে বের করতে নিত্য নতুন জায়গাতে যেতে হয়। বিশেষ ভাবে লক্ষ্যটি হলো ম্যামথ— আকারে ও সংখ্যায় এরাই সুবিধাজনক। পুরো অঞ্চল জুড়ে খাদ্যাভাব আর জলাভাবে এরা ভুগছে বলে এরাও ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রধানত কোন জলা বা ডোবার সন্ধানে। তাই এমনি নতুন কোন পানির উৎসই শিকারিদের আপাত গন্তব্য ম্যামথদেরকে ওখানে পাওয়ার আশায়। ম্যামথ খোঁজার একটি সুবিধা হলো ওরা পরিস্কার চিহ্ন কিছু রেখে যায়, চলাচলের পথে ঝোপঝাড় সব দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে যায় যা স্পষ্ট চোখে পড়ে। আর একটি চিহ্ন হলো তাদের প্রচুর মল; বিপুল পরিমাণ উদ্ভিজ খেতে হয় বলে ম্যামথ, ম্যাষ্টাডন (এবং পরবর্তী কালের হাতিরও) এদের মল পরিমাণে প্রকারে সহজে চোখে পড়ে।

সেভাবেই ওরা আন্দাজ করে নেয় কোথায় কতদূরে গেলে শিকারগুলোকে পাওয়ার সম্ভাবনা। আর ওদের শিকারে মূল কৌশলটিই হলো সুযোগ সন্ধানীর কৌশল। সরাসরি ম্যামথের, বাইসনের, বন্য ঘোড়ার বা এখানকার বিশাল বল্গা হরিণ কারিবুর মুখোমুখি হবার বা তাদের দৌড়ে যাওয়া ঝাঁকের সামনে পড়ার কোন ইচ্ছেই তাদের নেই। তারা চেষ্টা করে শিকার প্রাণী যখন বেকায়দায় থাকে, তখন তাদেরকে আরো বেকায়দায় ফেলে তারপর ওদের সেই মারণাস্ত্র প্রয়োগ

করা। এখন ডোবাগুলোতে পানির পরিমাণ খুব কম— সবই কাদা। ওই কাদার মধ্যে নেমে বিপুলদেহী ম্যামথগুলো যখন পানি খেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে তখনই এক মোক্ষম সময় অমনি বেকায়দায় তাদেরকে পাওয়ার। অথবা দৌড়তে দৌড়তে যখন তারা উঁচু জায়গার কিনারা দিয়ে চলছে তখন যদি এক পাশ থেকে আক্রমণে হতভম্ব করে তাদের ব্যালেন্স নষ্ট করে দেয়া যায় তখন ওখান থেকে গড়িয়ে একের ওপর আরেকটা আছড়ে পড়ে তখনো এমনি মোক্ষম সময় আসে। ওই বিশাল দেহ নিয়ে এমন অবস্থা থেকে সামলে ওঠা ম্যামথের পক্ষে কঠিন হয়।

বাইসনগুলো কেন জানি প্রায়ই শত শত সংখ্যায় যেন দৌড় প্রতিযোগিতায় দৌড়তেই থাকে কোন একদিকে। ওসময় সুকৌশলে তাদের দৌড়ের দিকটি ঘুরিয়ে দিয়ে খাড়া পাহাড়ের কিনারা থেকে একেবারে নিচে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থাও করে থাকে আমাদের শিকারিরা। সে ক্ষেত্রে আর তাদেরকে আক্রমণ করে মারার বেশি কিছু থাকেনা। মাইয়ারা এই ব্যাপারগুলোকেই খুব অপছন্দ করে। কারণ এরকম পরিস্থিতিতে প্রায়ই ম্যামথ বা বাইসন শিকারটি প্রয়োজনের শিকার থেকে বেশি অপচয়ের শিকারে পরিণত হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় এতগুলো বিশাল প্রাণী মারা গেলো, তার একটিকেও ওই জনা তিরিশেকের শিকারি দল তেমন উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারলোনা। বড় জোর দু'একটির চামড়া ছিলে নেয়, ম্যামথের দাঁতগুলো সংগ্রহ করে। বিশাল মাংসল জায়গাগুলো থেকে সহজে কেটে নেয়া যায় এমন কিছু মাংস শুধু কেটে নেয় আগুনে ঝলসে খাওয়ার জন্য। আরো বেশি আগ্রহের সঙ্গে নিয়ে খায় পেটের চর্বি এবং এখানটা থেকে কলজে ইত্যাদি নরম অঙ্গ। ম্যামথ এখন অভুক্ত থেকে যতই চিমসে হোক না কেন পেটে চর্বি কিছু থাকবেই আর এটিই আমাদের শিকারিদের জন্য প্রয়োজনীয় চর্বির যোগান দিতে যথেষ্ট। বলতে গেলে পুরো মৃত দেহটা আধ খাওয়া থাকতেই কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা চলে যায় অন্য দিকে নতুন ম্যামথের সন্ধানে— একে হায়েনা-শকুনের হাতে ছেড়ে দিয়ে।

এভাবে অতিমাত্রায় যাযাবর শিকারি জীবন আশ্রয়ী বলে বার্নেট গুহার বাসিন্দাদের মধ্যে জীবনযাত্রার অন্যান্য উপাদানগুলো কমই লক্ষ্য করা যায়। যেমন গুহার বাসা বাড়িতে। দীর্ঘ মেয়াদী গার্হস্থ্যের হাতিয়ার বা তৈজস দেখা যায় না। এখানেও যেন কিছুটা ক্যাম্পিঙের ভাব রয়ে গেছে। বিশেষ করে শস্য প্রক্রিয়া-করণের ব্যাপারটি চোখেই পড়েনা— শস্য, বীজ, বাদাম এগুলো পেষার যাঁতা, হামানদিস্তা, শিল-পাটা এমন জিনিস ওদের লাগে বলে মনে হয়না। মাইয়ারা যখন তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে উচ্চস্বরে তর্ক করেন তখন একটি কথা সব সময় বলেন— 'তোদের যাযাবর জীবন তোদেরকে পূর্বপুরুষের হাড় সংরক্ষণ করতে দেয়নি, এদিক থেকে আমাদের বংশ দারুণ হতভাগা।' সত্যিই তো নিজেদের মৃতদেহকে আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে কবর দেবার ব্যাপারটাকে, এবং সেই কবরকে চিহ্নিত করে রাখাটাকে এরা খুব জরুরি কাজ হিসেবে নেয় বলে মনে হয়না।

আসলে শুধু এই ব্যাপারটিই নয়, যদিও পরিবারের পর্যায়ে মাইয়ারা ও তার ছেলে মেয়ে বৌ জামাই সবাই খুব ঘনিষ্ঠ, এদের বৃহত্তর কোন সমাজ তেমন গড়ে ওঠেছে বলে মনে হয়না। শিকারের জন্য ওরা ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের দলে বড় জোর কিছু সময়ের জন্য একত্রে থাকে, এক সঙ্গে শিকার করে— খায় দায় ঘোরে। কিন্তু সেও যেন একটি শুধু সুবিধাবাদী একত্র বাস, সে রকম কোন সামাজিক বন্ধন এর মধ্যে নেই। যেই শরতের মৌসুম শেষ হয়ে গেলো আবার সেই নানা পরিবার নানা দিকে গুহা খুঁজে নিয়ে শীত কাটাতে চলে গেল। আগামী বছর হয়তো এরা সবাই একত্র হবে, হয়তো ওর মধ্যে অনেকে দলে থাকবেনা, নতুনরা আসবে। শিকারের সময় তিন চারদিন পর পর যে ভাবে ঠাঁই বদলায় তাতে ওরা এক মাসেই দু'তিনশ মাইল দূরে নিয়ে যেতে পারে তাদের আস্তানা— নতুন নতুন পরিবেশের সঙ্গেই তাদের দেখা হচ্ছে সব সময়। উৎসব ফুর্তি করে বটে কিন্তু কোন বিশেষ আচার, বিশ্বাস বা সেই বর্শাগ্র আর ম্যামথ শিকার ছাড়া অন্য কোন সাংস্কৃতিক ধারাও গড়ে ওঠেছে বলে মনে হচ্ছেনা। যদি গড়ে উঠতো তা হলে অন্তত কবরগুলো চিহ্নিত করতো, বার্নেট গুহার আশপাশে তাদের অবস্থানকে আরো জানান দিতো। তবে এর মধ্যেও তারা সেই বর্শাগ্রের জন্য সুন্দর রঙীন ঈষদচ্ছ আভার পাথর বেছে নিতে পছন্দ করে, এর মধ্যেও মাইয়ারার মত ব্যতিক্রমী মানুষ ভিন্ন ধরনের টেকসই জীবনের স্বপ্ন দেখে।

* * *

আমেরিকা মহাদেশের মানব বসতের প্রাচীনতম প্রমাণ প্রায় ১৫ হাজার বছর পুরানো। ও সময় উত্তরাঞ্চলে শেষ বরফ যুগের কারণে সমুদ্রের পানির তল অনেক নিচে নেমে গিয়েছিলো তাই এখন যেটি বেরিং প্রণালীর সমুদ্র সেখানে তখন স্থল জেগে ওঠেছিলো এবং সেখানে দিয়ে এশিয়ার উত্তরাংশ আমেরিকার উত্তরাংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলো। অধিকাংশ সাক্ষ্য প্রমাণ বলছে এই পথ দিয়ে সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে মানুষ প্রথম আমেরিকায় এসেছিলো। অবশ্য আর একটি তত্ত্ব মতে এখানে প্রথম মানুষ আরো আগে এসেছে ২০ হাজার বছর আগের দিকে। সে যাই হোক পৃথিবীর অন্য সব মহাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ার বহু পরেই মানুষ আমেরিকা মহাদেশে এসেছে সেটি প্রায় নিশ্চিত।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমের নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের বার্নেট গুহার খনন কাজ শুরু হয়েছিলো ১৯২৯ সালে এবং এটি চলে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। এ ছাড়াও ওই দক্ষিণ পশ্চিমেই নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা ইত্যাদি অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে অনেকগুলো সমসাময়িক মানব বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে যাতে প্রায় ১৩ হাজার বছর এবং তার কিছু আগের ও কিছু পরের সময়ের মানুষের জীবন ও জীবিকায় একই রকম কিছু প্রভাবের আলামত লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে খুব স্পষ্ট মিল হলো সেই বিশেষ ধরনের বর্শাগ্রের ধরনে- যা আধুনিক একটি সাধারণ মোবাইল ফোনের আকার আকৃতির পাথরের পাতলা ধারালো ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র। শুধু এই দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলেই নয় সারা উত্তর

আমেরিকার বহু স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননেও অস্ত্রের ঠিক এই রীতিটির সন্ধান মিলেছে মোটামুটি ওই সময়টি জুড়ে। অস্ত্রের মূল ডিজাইনটি ঠিক রেখে কিছু কিছু স্থানীয় বৈচিত্র দেখা গেছে বটে কিন্তু স্পষ্টত ওরা সবাই অন্তত এই একটি ব্যাপারে একই সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার নানা জায়গার খননেও এটি দেখা গেছে। সেই সঙ্গে দেখা গেছে আমেরিকার এই আদি বাসিন্দাদের মধ্যে অদ্ভুত দ্রুত নানা জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা— হয়তো ওভাবেই এই হাতিয়ার নির্মাণের বিশেষ কায়দাটিও ছড়িয়েছে। তবে ওই ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতাটি এই মহাদেশে মানুষের পা রাখার পর থেকেই দেখা গেছে কারণ প্রথম আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যে একেবারে উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত মানুষ চলে গিয়েছিলো এমন প্রমাণ আছে। পরে হয়তো বেশ কিছু দিন নতুন নতুন আরো মানুষ উত্তর পূর্ব এশিয়া থেকে এখানে এসেছে।

বর্শাগ্রের বিশেষ ডিজাইনের পাথুরে হাতিয়ারটি এভাবে পুরো উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা জায়গায় ওই সময়ে চালু থাকলেও প্রত্নতত্ত্ববিদরা এর নাম দিয়েছেন নিউ মেক্সিকোর একটি ছোট্ট জায়গা ক্লোভিসের নামে, কারণ ওখানেই প্রথম তাঁরা এটি আবিষ্কার করেছেন। এজন্য হাতিয়ারটিকে বলা হয় ক্লোভিস পয়েন্ট, ওই সংস্কৃতিটিকে বলা হয় ক্লোভিস সংস্কৃতি, আর ওই সংস্কৃতির মানুষগুলোকে বলা হয় ক্লোভিস মানুষ।

বার্নেট গুহায় ক্লোভিস পয়েন্ট হাতিয়ারের সঙ্গে পাথরের ও হাড়ের আরো কিছু হাতিয়ার পাওয়া গেছে। তার চেয়ে বড় কথা পাওয়া গেছে ম্যামথের ও অন্যান্য দু'একটি অতিকায় প্রাণীর হাড়; অবশ্য খরগোস, হরিণ ইত্যাদি ছোট প্রাণীর হাড়ও। কাজেই এর থেকে প্রমাণ হয়না যে গুহায় থাকা কালে ওরা শুধু ম্যামথ ইত্যাদি বড় প্রাণী শিকার করতো। তবে সাধারণভাবে অন্যান্য বহু প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ম্যামথ, বাইসন ইত্যাদির প্রচুর হাড়ের সঙ্গে পাওয়া গেছে কিছু হলেও ক্লোভিস পয়েন্ট হাতিয়ার। এসব খনন স্থানকে মানব বসতির মত মনে না হয়ে বরং মনে হয়েছে শিকার ক্ষেত্র, অথবা ম্যামথের মরণ-স্থান অথবা দুর্ঘটনা-স্থল হিসেবে— যেমন জলার মধ্যে বা পাহাড়ের কিনারায়। হয়তো কাছেই মানুষের শিকারকালীন ক্যাম্পিং স্থল ছিল যার নিদর্শন টিকে থাকেনি।

ক্লোভিস যুগে স্থায়ী বসতের খুব বেশি নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি, পাওয়া যায়নি তেমন কোন আনুষ্ঠানিক কবরের নমুনা। একই ভাবে আচার, অনুষ্ঠান, বিশ্বাসের পরিচয় বহন করার মত নিদর্শনও তেমন পাওয়া যায়নি। এ কারণেই অনেকের মতে এ সময় মানুষ অনেক বেশি যাযাবর ও কম সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।

খুব ব্যাপক ভাবে প্রাচীন অতিকায় প্রাণী ধ্বংসের জন্য ক্লোভিস সংস্কৃতির মানুষদেরকে দায়ী করা হয়ে আসছে এ সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা শুরু হবার পর থেকেই। এ ধ্বংসযজ্ঞটি এত ব্যাপক ছিল বলে মনে করা হয় যে ওই তের হাজার বছর আগে তুঙ্গে ওঠা এরকম শিকারের ফলে আর মাত্র দু'এক হাজার বছরের মধ্যে ওই সবগুলো প্রাণী চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এভাবে সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হয়েছে ম্যাস্টাডন, ম্যামথ, প্রাচীন বাইসন (বাফেলো), অতিকায় ভালুক, ম্যাক্সিকান ঘোড়া, কয়েক রকম বিশালকায় বন্য গরু, আর উত্তর আমেরিকা থেকে উট। অবশ্য এই বিলুপ্তির আগেই উট উত্তর আমেরিকা থেকে একদিকে এশিয়ায় ও আর অন্যদিকে দক্ষিণ আমেরিকাতে ছড়িয়ে

গিয়েছিলো। উত্তর আমেরিকা উটের উৎপত্তি স্থল হলেও অবশেষে এই শেষোক্ত জায়গাগুলোতে এরা টিকে আছে— এশিয়ায় কিছু কিছু বদলে গিয়ে আর দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক বেশি বদলে ছোট লামা আর আলপাকা হিসেবে।

ঘটনা দুটি প্রায় এক সঙ্গে ঘটেছে— ক্লোভিস সংস্কৃতির ব্যাপকতা আর ওই অতিকায় পশুদের বিলুপ্তি। তাছাড়া এমন অনেক জায়গার সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে প্রচুর ম্যামথ বা বাইসনের হাড়ের সঙ্গে ক্লোভিস হাতিয়ার এক সঙ্গে পাওয়া গেছে। এসব কারণেই অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদ মনে করেন ওই বিলুপ্তির জন্য ক্লোভিস মানুষরা হয় পুরোপুরি নইলে অংশত দায়ী। তবে অনেকে আবার ওই এক সঙ্গে ঘটার বা এক সঙ্গে নমুনা থাকার ব্যাপারটিকে কাকতালীয় মনে করেন। তাঁদের যুক্তি হলো বার্নেট গুহার মতো অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে তো ম্যামথের হাড়ের চেয়ে ছোট ছোট প্রাণীর হাড়ই বেশি পাওয়া গেছে। কাজেই ক্লোভিস মানুষরা শুধু বিশাল প্রাণী শিকারের ওপর নির্ভর করতো একথা ঠিক নয়, বড় জোর তারা ওই বিশাল প্রাণীগুলোর অতিরিক্ত পুষ্টিহীনতা ও দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর সুযোগ নিতো। এমন ভাবার একটি কারণ হলো ১৩ হাজার থেকে ১১ হাজার বছর আগে পর্যন্ত সময়ে আমরিকায় গুরুতর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিকায় পশুদের অবস্থা খুবই কাহিল হয়েছিলো যাও মূলত তাদের বিলুপ্তির জন্য দায়ী। তবে সর্বশেষ গবেষণা থেকে, বিশেষ করে কম্পিউটার সিমুলেশনের সাহায্য নিয়ে উন্নততর গবেষণায় মনে হচ্ছে ক্লোভিস শিকারিরা এবং জলবায়ু পরিবর্তন উভয়ের মিলিত প্রভাবই এই মহাবিলুপ্তির জন্য দায়ী। শুধু একা এই দুইয়ের যে কোন একটি কারণ এত বড় বিলুপ্তি ঘটাতে পারতোনা।

ক্লোভিস সংস্কৃতির আগে আমেরিকার মানুষ বড় প্রাণী শিকারের ওপর এত বেশি নির্ভর করতোনা; বরং ওরা ছোট বড় বিভিন্ন প্রাণী ও বন্য উদ্ভিদের ওপর মিশ্র ভাবে নির্ভর করতো। ক্লোভিস যুগের পরও আবার সেই ধারাটি ফিরে আসে। উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা উভয় জায়গায় মানুষ ক্রমে বেশি সমাজবদ্ধ ও অধিক স্থায়ী বসবাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে— প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারের আলোকে আমরা সে কাহিনী জানতে পেরেছি।

বার্নেট গুহা

ক্লোভিস বর্শাগ্র

কাল্পনিক চিত্রে ক্লোভিস সংস্কৃতির যুগে আমেরিকার অতিকায় সব পশু (এর পর-পর বিলুপ্ত)

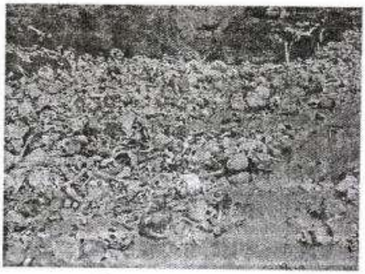

বড় প্রাণীদের মরণক্ষেত্রের একটি

আজকের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ম্যামথের বধ্যভূমি উদ্ঘাটন

ফ্রান্সের মনট্রাসটুকের ভাস্কর ঃ
১৩ হাজার বছর আগে

ইউরোপে বরফ যুগের জীবন খুবই কঠিন জীবন। গুহাবাসী শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ এখানে শীতের সময় গুহায় থেকে কাছাকাছি বড় পশুগুলো শিকারে ব্যস্ত থাকে। ভাস্কর নামে তাদের একজন এসব পশুকে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনেছে যে তার অসাধারণ খোদাই কাজে পশু যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ পশ্চিম ফ্রান্সের মনট্রাসটুকের পাথুরে জায়গায় অল্প কিছু মানুষের এই বসতিটি। তের হাজার বছর আগের এই সময়টিতে এখানে বরফের যুগের শীত সামান্য কমলেও এখনো শীতের ভয়ঙ্কর রূপ অনেকখানিই রয়ে গেছে। কাজেই অধিকাংশ সময় এখানকার মানুষের বাস গুহার ভেতরে। তবে হ্যাঁ, ওরা চেষ্টা করে গুহার একেবারে অভ্যন্তরে বদ্ধ অন্ধকারে নয়, বরং গুহার মুখের দিকটায় থাকতে। গুহার সামনে পাথরের দেয়ালের মত কিছু থাকলে, অথবা মাথার ওপরে ছাদের মত কোন বড় পাথর খণ্ড প্রসারিত থাকলে সেখানে পশু চামড়ার দু'একটি পর্দার মত টানিয়ে রাখে যাতে গুহা-বাড়িটিতে কিছু আবরু তৈরি হয়। ভাস্কর নামের যার কথা বলছি তার বাড়িটিও আশেপাশের এমনি আরো চার পাঁচটি বাড়ির মত— যেগুলোর বাসিন্দারা পরস্পর খুব নিকটাত্মীয়।

ভাস্করকে এখন আর যুবক বলা যাবেনা। পঁয়ত্রিশ ছুঁই ছুঁই বয়সটা ওই কাল এবং ওই জায়গার জন্য অনেকটাই পরিণত বয়স। বাড়িতে শুধু নিজের বৌ-ছেলে-মেয়েই নয় এখন ছেলের বৌও রয়েছে। পাড়ার অন্য পরিবারগুলোর সঙ্গে মিলে ওদের দলের যে দশ বারো জন বয়স্ক পুরুষ রয়েছে তারাই এ পাড়ার মূল শিকারি দল। বছরের সিংহ ভাগই শীতের প্রকোপে থাকা এই মানুষগুলোর জীবনে শিকারই হলো সব। যে পশুদেরকে শিকার ওরা করে তারা কিন্তু আকারে, গায়ের জোরে, ক্ষিপ্রতায় তাদের চেয়ে অনেক পটু। কাজেই ওদেরকে কাবু করার জন্য এই মানুষগুলোকে নির্ভর করতে হয় শুধু কৌশলের ও অস্ত্রের ওপর এবং তাও বেশ কয়েকজন মিলে সম্মিলিত কৌশলের ওপর।

ভাস্করও জীবনে কম শিকার করেনি— বলতে গেলে বড় হবার পর থেকে শিকারই ছিল তার নিত্যদিনের কাজ, এখানকার অন্য সব মানুষের মত। এই শিকার করতে গিয়ে তার সহযাত্রী মানুষগুলোকে সে যেমন চিনেছে মনে হয় তার চেয়েও ঘনিষ্ঠভাবে চিনেছে যাদেরকে সে শিকার করেছে সেই পশুগুলোকে। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি চিনেছে বল্গা হরিণকে। এ অঞ্চলটিতে এখন বল্গা হরিণ প্রচুর— এখানেও স্থায়ীভাবে থাকে, আবার উত্তর দিক থেকে মৌসুম বিশেষে আসা যাওয়াও করে। বল্গা হরিণই তাদের মনোযোগের প্রধান লক্ষ্যবস্তু— ভাস্করেরও। তাদের আনাগোনা, কখন তারা ঝাঁক বাঁধে, কখন প্রজননের মৌসুমে তাদের পুরুষদের মাথায় গাছের শাখা-প্রশাখার মত বেরুনো শিং আরো ঝাঁকালো হয়ে ওঠে, আর শিঙে শিঙ ঠেকিয়ে তাদের লড়াইটাও প্রবল হয়— এগুলো তার নখদর্পনে। শুধু শিকার করে বলেই যে ভাস্কর বল্গা হরিণের সম্মুখীন হয় তা নয়, বরং শিকার করার পর একে নিত্য কাটাচেরা করতে গিয়ে, এর অস্থি-মজ্জা, মাংস-চামড়া, শিং এমনকি পায়ের শক্ত রগ পর্যন্ত সব কিছুর সদ্‌গতি করতে গিয়েও বলা যায় সে এদেরকে 'হাড়ে হাড়ে' চিনেছে— কখনো যেন একজন বৈদ্য বা দেহতত্ত্বে মগ্ন মানুষের ভঙ্গিতে।

বল্গা হরিণ যদিও প্রচুর রয়েছে বলে এবং তার ঝাঁকবাঁধা মৌসুমি আচার আচরণের জন্য একটু বেশি পরিচিত, আরো কিছু বড় বড় শিকারের পশু তার কম দৃষ্টি কাড়ে না। তার মধ্যে সব চেয়ে প্রকাণ্ড হলো ম্যামথ— আধুনিক কালের হাতির গোষ্ঠি, তবে হাতির থেকে বড়, লম্বা পশমে ঢাকা আর ধীরে বাঁকানো দাঁত দুটি বেজায় বড় ও লম্বা। এদের সংখ্যা বেশি নয়, তবে সুযোগ পেলে এদের শিকার করতে পিছপা হয় না এখানকার মানুষ— হোক না যতই বিশাল এবং শক্তিশালী জন্তু। তার চেয়ে বেশি অবশ্য রয়েছে বুনো ঘোড়া, বাইসন, অন্য রকম নানা হরিণ— এর সবই শিকার করা হয়, সবার নাড়ী নক্ষত্র ভাস্করের ও অন্যান্যদের জানা। এই ব্যাপারে ভাস্করের সঙ্গে অন্যদের একটি বড় তফাত হলো বাকিদের জানাটি শিকার করতে সুবিধা ঘটায় মাত্র, কিন্তু ভাস্কর সেই জানাকে কাজে লাগায় তার সৃষ্টিকর্মেও— সে এসব পশুর মূর্তি খোদাই করে।

ছোটবেলা থেকে ভাস্করের মধ্যে কিছুটা অন্য ভাব অনেকে লক্ষ্য করেছে। জীবন্ত কিছু, এমনকি ছোটখাট পশু-পাখি ও সে যখন দেখে কেমন যেন অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখে— এক মনে তাকিয়ে থাকে। এ নিয়ে অন্যরা হাসি ঠাট্টা করতো, বলতো তার মধ্যে এক রকম উদাস ফকিরালি আছে। কিন্তু বড় হয়ে সংসারী হবার পর থেকে এটি কেউ তেমন আর লক্ষ্য করেনি। সে যথারীতি অন্যদের সঙ্গে শিকার করেছে, সংসারে তার সকল কর্তব্য করে গেছে। ইদানীং বেশ কিছু দিন যে এসব কাজে তার মনোযোগ কম, মনোযোগ বেড়েছে তার খোদাই কর্মে। অসম্ভব যত্ন করে সে শিকারের পশুগুলোর একেবারে জীবন্ত-প্রায় ছবি তার খোদাইয়ে ফুটিয়ে তুল্‌ছে। খোদাই করে যে সে আনন্দ পায়, আর সে যে ভাল

খোদাই করে, এসব সেই তার কৈশোর থেকেই পরিচিতরা জানতো। এখানকার মানুষদের অনেকেরই অবসর সময়ের এই সখটি রয়েছে— কাঠে, হরিণের শিঙে, নরম পাথরে নানা কিছু খোদাই করা, প্রায় সবই পশু-পাখি সংক্রান্ত। কিন্তু ভাস্করের ব্যাপারটি আলাদা; এ কাজে তার অসম্ভব নিষ্ঠা।

বহুদিন ধরে এটিই তার আসল আনন্দ। মনে হয় যাদের সে শিকার করে মেরে ফেলছে তাদেরকেই আবার জীবনে ফিরিয়ে আনছে অদ্ভুত জীবন্ত ভাবে খোদাই কর্মে তাদেরকে তুলে ধরে— কাঠের খোদাই, পাথরের খোদাই, হরিণের শিঙের ওপর খোদাই, ম্যামথের দাঁতের খোদাই কোন্‌টি করেনা সে? এক একটি এরকম কাজ নিয়ে যখন সে বসে তখন বাকি সব কথা ভুলে যায়— শিকারের কথা, মৃত পশু কাটাচেরার কথা, অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়ারের কথা সব। তখন তার হাতিয়ার একটাই— পাথরের ধারালো খোদাইয়ের ছুরি যার নিপুণ চালনায় যে ওই সুন্দর ভাস্কর্য সৃষ্টি করে। এই ভাস্কর নামটি তার তখনই পাওয়া। আশপাশে সবাই তখন তার এ নিষ্ঠাকে সমীহ করতে আরম্ভ করলো, এমনকি পরিবারের সদস্যরাও। তাই তাকে শিল্পীর অভিধায় ভাস্কর বলা ছাড়া আর কোনভাবে ডাকার কথা তারা ভাবতে পারতোনা।

মন্ট্রাসটুকের সেই গুহা-বাড়ির আশপাশে ওদের পরিবেশটি তাদের প্রতি খুব সদয় এ কথা বলা যাবেনা। শীতের প্রকোপের মধ্যে এ জায়গা অনেকটা শুষ্ক তৃণ ভূমি, বিরল ঘাসের তুন্দ্রার মতও বলা যায়। গাছপালা এর মধ্যে বিরল। মৌসুম বিশেষে তৃণভূমির হ্রাসবৃদ্ধি পশুদেরকে অধিক সংখ্যায় এদিকে আনে, আবার কোন কোনটিকে সাময়িকভাবে সরিয়েও দেয়। গাছের মধ্যে পাইনের সংখ্যাই বেশি— কোথাও খুবই ফাঁক ফাঁক, কোথাও কিছুটা ঘন হয়ে আছে। গাছপালা ও ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে কিছু ঝোপ ঝাড়ে ছোট ফল, বাদাম, খাওয়ার মত পুষ্ট শিকড় পাওয়া যায় স্বল্পস্থায়ী গরমের দিনে যা ওরা খাওয়ার জন্য সংগ্রহ করে। খাদ্য ছাড়াও শিকারের পশুর শিঙ, হাড়, চামড়া, রগ ইত্যাদি থেকেই তাদের বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে হাতিয়ার, অস্ত্র, পোযাক সব কিছু আসে। শিকার না করেও অন্যের শিকার করা অথবা স্বাভাবিক ভাবে মৃত পশু থেকেও হাড়, শিং, ইত্যাদি সংগ্রহ করে। এভাবে শিকার বা সংগ্রহকাজ যাই হোক ভাস্করদের দলের পক্ষে এক জায়গায় থেকে গেলে চলেনা। শরত কালে বল্গা হরিণের ঝাঁক আসার ও সেগুলোর প্রজননের সময় যখন হয় তাদের পাথুরে গুহা-বাড়ির কাছেই শিকারের অভাব হয়না। দারুণ শীতকালটিও তাদেরকে আবহাওয়ার কারণে এখানেই থাকতে হয়, যেসব পশু কাছে ধারে এখনো পাওয়া যাচ্ছে তাদের ওপর নির্ভর করে।

বসন্তে অবশ্য যত তাড়াতাড়ি পারা যায় নদীর উজান ধরে দূরে চলে যাওয়া ভাল— নদীতে যে মাছ পাওয়া যায় তাদের ভাল ঝাঁকের অনুসন্ধানে। তা ছাড়া তখন ঝাঁকের বল্গা হরিণের বড় অভাব। বিচ্ছিন্ন নানা পশু শিকারে, আর বিরল ঝোপের উদ্ভিজ খাদ্য সংগ্রহে প্রায়ই স্থান বদল করতে করতে ওরা দূরে দূরান্তে

চলে যায়। তাই এ সময় ওদেরকে তাঁবুর মত আবাস বানিয়ে এক জায়গায় দু'চার দিন করে থাকতে হয়, তারপর আবার অন্যত্র চলে যেতে হয়। তাঁবুটি ওরা তৈরি করে খুব সরল ভাবে। অনেকগুলো সরু লাঠি তেরচা করে মাটিতে এমন ভাবে পোঁতে যেন সব লাঠি মাথার ওপর এক জায়গায় একত্র করে সেখানে চামড়ার ফিতা দিয়ে বেঁধে ফেলা যায়, আর এদের গোড়াগুলো একটি বৃত্ত রচনা করে। এখন চামড়া দিয়ে এই লাঠির কাঠামোটি ঢেকে দিয়ে সে চামড়া লাঠির সঙ্গে নানা জায়গায় বেঁধে নেয়া হয়। তাঁবুর ভেতরটায় মাটি সমান ও শক্ত করে অন্তত কিছুদিন থাকার উপযোগী করে নেয় ওরা। এমন তাঁবু খাড়া করতেও সময় লাগেনা, আবার ভেঙ্গে অন্যত্র নিয়ে চলতেও সময় লাগেনা— এমনি যাবাবর জীবন ওদের।

তবে গ্রীষ্মের পর ওই গুহা-বাড়িতে ফেরত আসে ওরা সবাই। শরতে ওখানে বড় ধরনের শিকারের কাজ রয়েছে। যখন দূরে দূরান্তে চলে গিয়েছিলো তখন ওরা ছোট ছোট দলেই ঘুরেছে। মাছ ধরা, বীজ-বাদাম সংগ্রহ করা, বিচ্ছিন্ন শিকার করা— এদিক ওদিক যাওয়া এসব কাজ ছোট দলেই ভাল হয়। ভাস্কর ও তার নিজের পরিবার ও নিকটাত্মীয় কয়েকজনের পরিবার নিয়ে এরকম ছোট দলে থাকে বিশ ত্রিশ জনের মত। মনট্রাসটুকের গুহা-বাড়িতে যখন ফেরে তখন এরকম আরো বেশ কিছু দল ওখানে ফিরে এসেছে। সবাই মিলে ওখানে আপাতত শ-দেড়শ' মানুষের বড় সমাজে ওরা থাকবে; প্রায়ই বড় বড় শিকারের আয়োজন করবে, বল্গা হরিণের ঝাঁকের ওপরতো বটেই, এমনকি ম্যামথ ও বাইসনের মতো আরো বড় প্রাণী র ওপরও শিকার চালাবে।

শীতকালে বাইরে যাওয়া কমে গেলেও গুহার মধ্যে সামনে আগুন জ্বেলে শিকারের সদগতি ছাড়াও কিন্তু তাদের অনেক কাজ। এতদিন ঘোরাঘুরির সময় নতুন হাতিয়ার তৈরির যুৎসই অনেক উপকরণ নানা জায়গা থেকে যোগাড় করা হয়েছে, এখনো যোগাড় হচ্ছে। এর মধ্যে অবশ্যই মূল উপকরণ হলো পাথর। পশু শিকারে মূল অস্ত্র বর্শা। তার মারণ অংশ অগ্রভাগটি তৈরি হয় পাথরে— এতে খুবই কায়দা করে তীক্ষ্ণ অংশ, তার পেছনে কাঠের ডান্ডাটি ফিট করার জন্য খাঁজ ইত্যাদি তৈরি করতে হয়। তাছাড়া কাটাচেরার বাকি বেশির ভাগ হাতিয়ারও পাথরের। আরো বড় কথা এসব হাতিয়ার তৈরির হাতিয়ারও কিন্তু পাথরের— যেগুলো কিনা সব চেয়ে শক্ত পাথরের। পাথরের ছোটবড় বেশির ভাগ হাতিয়ার ফ্লিন্ট পাথরের তৈরি, যে ফ্লিন্টগুলো নানা জায়গা ঘুরে খুঁজে নিতে হয়। হাতিয়ারগুলোর কোনটির কাজ ছুরির মত কাটা, কোনটি করাতের মত, কোনটি ছিদ্র করা, কোনটি আঁচড় দেয়া, কোনটি চাঁছা, কোনটি কোরানো। আরো হাতিয়ার তৈরি হয় হাড় আর শিঙ দিয়ে। এমনকি ম্যামথের বিশাল দাঁতের ব্যবহারও কম যায়না। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সঠিক জিনিসটি তৈরিতে এসব উপকরণের কোন তুলনা নেই। দু'একটি উদাহরণ নিলেই বোঝা যাবে। একটি চওড়া বেঁটে

লাঠি বা ব্যাটনের আকারের হাড়ে পরপর ছোট থেকে বড় ছিদ্র করা জিনিস ওরা ব্যবহার করছে বর্শার বাঁকা জায়গাকে এসব ছিদ্রের মধ্য দিয়ে টেনে সোজা করতে। চেপ্টা হাড় দিয়ে তৈরি করছে চামচ, যেমন পাঁজরের হাড় দিয়ে। গুহার কাছে বা অনেক দূরে, দারুণ শীতে অথবা অপেক্ষাকৃত গরমে এখানকার সবাইকে সব সময় কিন্তু সারা গা ঢেকে পোষাকের মধ্যে থাকতে হচ্ছে— আর পোষাক মানেই চামড়ার পোষাক। এই পোষাক কিন্তু ওরা সুন্দর করে গায়ের সঙ্গে ফিট করিয়ে তৈরি করে তাই প্রচুর সেলাই দিতে হয় তাতে। আর সেলাইয়ের সুচটি তৈরি হচ্ছে হাড়ের সরু অংশ দিয়ে, যার মাথায় সুতা চালনা করার জন্য ছিদ্র রয়েছে। সুতাটি পশুর রগ থেকেও আসে আবার গাছের আঁশ ঠিক মত পাওয়া গেলে তার থেকেও আসে।

নদীতে মাছ ধরার জন্য এরা সাধারণত ব্যবহার করে হারপুন, যা মাছকে বিদ্ধ করে। হারপুনের আগায় বেশ কায়দা করে বেশ কিছু কাঁটা সৃষ্টি করতে হয় এমন ভাবে যেন মাছকে বিদ্ধ করলে ওটি মাছের সঙ্গে আটকে যেতে পারে। বল্গা হরিণের শিং শক্ত জিনিস, অথচ খোদাই করে এই কাঁটার মত আকৃতি সৃষ্টির জন্য সুবিধাজনক। এর কোনটাই তৈরি অবশ্য সহজ কাজ নয়— প্রত্যেকটির জন্য সূক্ষ্ম দক্ষতা লাগে। আর এমনি দক্ষতাকেই ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছে ভাস্কর এবং ভাস্করের মত আরো কয়েকজন যারা এই একই উপকরণগুলোর ওপরেই অনন্য শিল্পকর্ম তৈরি করছে। কেন করছে, কীসের তাড়নায়, তাও একটি প্রশ্ন বটে।

তাই শীত কালে যখন বাইরের কাজের তাড়া যখন কম, অন্যরা ছোটখাট হাতিয়ার তৈরি, মেরামত ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত, তখন আমরা ভাস্করকে দেখি আপন মনে তার পশুমূর্তি খোদাইয়ের কাজে রত। ইতোমধ্যে শেষ হওয়া ওর দু'একটি ভাস্কর্য দেখলে বুঝতে পারবো কেন এত মনোযোগ প্রয়োজন। যেমন দুটি বল্গা হরিণ একটির ঠিক পেছনে আর একটি সাঁতার কেটে যাচ্ছে এমন ছোট্ট মূর্তি সে খোদাই করছে ম্যামথের দাঁতের ওপর। পুরো ভাস্কর্যটিতে সে একটি ম্যামথের দাঁতের আগার দিকের ফুট খানেক দীর্ঘ অংশ কেটে নিয়ে তাকেই এই দুটি বল্গা হরিণে রূপ দিয়েছে। খোদাই করার জন্য পাওয়া ওইটুকু জায়গার মধ্যে পারতপক্ষে ওদের সাঁতার রত দেহের কোন বৈশিষ্টই বাদ সে দেয়নি। আবার ম্যামথের দাঁতটিকেও এমন ভাবে ব্যবহার করেছে যে এর স্বাভাবিক আকৃতির সঙ্গে সব কিছু খাপ খাইয়ে গেছে। দাঁতের প্রান্তটি অপেক্ষাকৃত সরু হয়ে গেছে বলে সামনের হরিণটি অপেক্ষাকৃত ছোট, বোঝাই যাচ্ছে এটি স্ত্রী হরিণ—তার ছোট শিং এবং নিম্নাঙ্গে ছোট্ট চারটি ফোটার মত স্তনের বাট থেকেও তা বোঝা যাচ্ছে। মনে হয় বহু শরতের বহু প্রজনন কাল শেষের অভিবাসনে ভাস্কর ঝাঁকে ঝাঁকে ওদেরকে এভাবে সাঁতরে নদী পার হতে দেখেছে, সেই সব তার মাথার স্মৃতিতে আঁকা রয়েছে, এখন মাথা থেকে বের করে ম্যামথের দাঁতে অপূর্ব নৈপুণ্যে তা খোদাই করে দিচ্ছে। এ স্ত্রী হরিণের ছোট সুচালো মাথা ম্যামথের দাঁতের অগ্রভাগের সরু অংশে অতি সহজাত ভাবেই

খোদাই করা হয়ে গেছে। বিষয়বস্তুর বিন্যাসের সঙ্গে তার হাতে যে খোদাই করার যে পটবস্তু রয়েছে তার চমৎকার বিন্যাস ভাস্কর ঘটিয়েছে। এর উদাহরণ শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, মূর্তির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়।

পেছনের হরিণটি পুরুষ হরিণ, সেটি তার বড় শরীর, লম্বা শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত শিং, এবং সর্বোপরি পেটের নিচে খোদাই করা জননেন্দ্রিয়টি দেখে স্পষ্ট হচ্ছে। উপকরণের সঙ্গে তাল রাখতেই হয়তো এর শিংটি বিস্তৃত হয়েছে পিঠের সঙ্গে প্রায় লেগে থাকার মত করে পেছনের প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। মূর্তিটিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে শুধু শিকা‌রির চোখে হরিণ যে রকম দেখা যায় তাই শুধু আসেনি বরং খুব কাছে থেকে, গায়ে হাত বুলিয়ে, কৌতুহলী চোখে যেভাবে দেখা যায়; এমন কি দেহ ব্যবচ্ছেদ করেছে এমন কারো চোখে যেভাবে দেখা যায়; সে ভাবে এসেছে। স্ত্রী হরিণটির পাঁজরের হাড়গুলো এবং তার নিচে পেটের সঙ্গে বুককে আলাদা করা পাতলা মধ্যচ্ছদার আভাস এত স্পষ্ট হয়ে খোদাই হয়ে এসেছে যে অবাক হতে হয়।

মজার ব্যাপার হলো ভাস্কর্যটি ওই যুগল সাঁতারের সময়টিও বলে দিচ্ছে। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ওটি শরত কাল। ওই সময়েই শুধু স্ত্রী ও পুরুষ উভয় বল্গা হরিণের শিং থাকে, অন্য সময়ে শুধু পুরুষের থাকে। তাছাড়া উভয়ের শরীরে যে সমৃদ্ধ লোমের আভাস ভাস্কর অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে মূর্তির গায়ে ঘন পাতলা আঁচড়ের দাগে ফুটিয়ে তুলেছে সেটি একমাত্র শরত কালেই তাদের শরীরে দেখা যায়। তবে এতে একটি বাড়তি জিনিস আছে সামনের স্ত্রী হরিণটির গায়ে যা সত্যিকার হরিণের থাকার কথা নয়— তা হলো এর দুই পাশেই গায়ের ওপর দশটি খুব স্পষ্ট সমান রেখা সমদূরত্বে পরপর খোদাই করা রয়েছে, যেন কিছু একটি হিসেব রাখা হয়েছে এই এক একটি দাগ দিয়ে। এটি ভাস্কর আপন মনে করেছে, কীসের হিসেব যে রেখেছে সে কথা শুধু সেই জানে।

সাঁতার রত দুটি বল্গা হরিণের এই খোদাই করা মূর্তিটি দেখে মনে হতে পারে আমাদের ভাস্কর খুবই সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা একেবারে বাস্তব প্রতিচ্ছবিটিই ফুটিয়ে তুলতে পারদর্শী। হ্যাঁ এখানে সে এটি চমৎকার ভাবে করেছে বটে কিন্তু যেন এরই ঠিক উল্টো আর একটি খোদাই কাজ সে করেছে যেখানে সে মোটেই বাস্তবতার ধার ধারেনি। ম্যামথের দাঁতের খোদাই করে বল্গা হরিণ যেমন ফুটিয়ে তুলেছে ভাস্কর, প্রায় একই সময়ে বল্গা হরিণের শিং খোদাই করে একটি ম্যামথের আদলে মূর্তি গড়েছে— সেটিও প্রায় একই সাইজের । স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে বটে যে এটি একটি ম্যামথ কিন্তু তাকে হুবহু না এঁকে মনে হয় ম্যামথের একটি কার্টুনের মত বা একটি বিমূর্ত ম্যামথের মত করে এঁকেছে। এভাবে ভাস্করের হাতের কাজগুলো একের পর এক দেখলে এরকম নানা ষ্টাইলের শিল্পকর্ম দেখতে পাব।

মজার ব্যাপার হলো ভাস্কর কিন্তু সাঁতার কাটা বল্গা হরিণের মূর্তি দৃশ্যত কোন বাস্তব ব্যবহারের কথা মনে না রেখে গড়লেও ম্যামথের মূর্তিটি যে কাজে

লাগাবার জন্যই বানিয়েছে তা স্পষ্ট। এটি আসলে একটি বর্শা নিক্ষেপক। বর্শাটি সরাসরি হাতে রেখে নিক্ষেপ না করে এই নিক্ষেপকের এক প্রান্তে একটি আংটা বা কাপের মত জায়গায় বর্শার গোড়াটি ঢুকিয়ে রেখে নিক্ষেপকের অন্য প্রান্ত হাতে রেখে তারপর নিক্ষেপ করাটাই বর্শা নিক্ষেপকের নিয়ম। আসলে বহুকাল ধরেই অনেক জায়গাতেই বর্শা সরাসরি নিক্ষেপ না করে এরকম নিক্ষেপকের মাধ্যমে তা করা হয়। আমাদের ভাস্করের মতো শিল্পী মানুষের কল্যাণে সাদামাটা বর্শা নিক্ষেপকই হয়ে পড়েছে ওই শিকার হওয়া প্রাণীগুলোর আদলে তৈরি ভাস্কর্য। সরাসরি হাতে বর্শা নিক্ষেপ করলে এটি যত দ্রুত যাবে, যত দূরে যাবে, নিক্ষেপকের দ্বারা ছোঁড়ার কারণে লিভার এ্যাকশনের কারণে হাতের জোরটি আরে বর্ধিত ভাবে বর্শার মধ্যে যাবে বলে এর গতি ও দূরত্ব অতিক্রমের সীমা অনেক বৃদ্ধি পায়।

বর্শার লম্বা লাঠিটি যথেষ্ট সোজা না থাকলে পাথরের বা হাড়ের তৈরি ব্যাটনের ছিদ্রের মধ্যে সেটিকে চালনা করে চাপ দিয়ে দিয়ে তাকে সোজা করা হয়। এই ব্যাটনটিও একেবারে নেহাত কাজের জিনিস হবে কেন? এর ওপরও খোদাই হয়েছে চিত্র বিচিত্র জিনিস— প্রধানত নানা প্রাণী । আমাদের ভাস্কর কিন্তু এরকম ব্যবহার করার আরো অনেক জিনিসের মধ্যেই শিল্পের ছোঁয়া এনে দেয়— যেমন পাথরের ছুরির কাঠের হাতলে বা হাড়ের চামচে। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে শুধু কাজ ভাল করলেই হাতিয়ারের ওপর খুশি নয় এখানকার মানুষ, তারা এর মধ্যে নান্দনিকতাও দেখতে চায়। এগুলোকে আমরা অলঙ্কার হিসেবে নিতে পারি কারণ অলঙ্কারের চল এখন প্রচুর। পাথরের হাতিয়ারের মধ্যে লাল মাটি গুড়ো করার এক রকম শিল-পাটা এখানে সব সময় মজুদ যাতে বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় এই লাল পাউডার গায়ে মাখতে পারে। আর পাথরের, হাড়ের, ঝিনুকের, দাঁতের, শাঁখের নানা আকার আকৃতির যে পুঁতি, লকেট ইত্যাদির অলঙ্কারে ভাস্করের মত শিল্পী মানুষ নিত্য নতুন ডিজাইন এনে চমক সৃষ্টি করে।

তারপরও প্রশ্ন ওঠে কোন রকম কার্যকর ব্যবহার ছাড়া ওই সাঁতার কাটা বল্গা হরিণের মত ভাস্কর্য এতো খেটেখুটে মনোযোগ দিয়ে কেন সে তৈরি করেছে। আর এর সমজদার সেই একা এমনও বলা যাচ্ছেনা। সমজদার আসলে অনেকে। শুধু দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস চিত্রিত হলেই সব মানুষের মন ভরছেনা। অনেকে শুধু শিল্পের খাতিরে শিল্পকে দেখতে চায়। সেভাবে অনেক শিল্প সৃষ্টি করার জন্য ভাস্কর এখানে একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। তার পুরো পরিবার এ জন্য গর্বিত। শ'দেড়শ মানুষের দলটি যখন মনট্রাসটুকের এই একই গুহা-বাড়িগুলোতে থাকে তখন ভাস্করদের বাড়ির সামনে প্রায়ই ছোট খাট একটি ভীড় লেগে থাকে। ওরা ওই বাড়িতে আসে ভাস্করের নতুন কাজগুলো দেখতে এবং ভাস্করকে এ কাজ করতে দেখতে। ভাস্কর সম্প্রতি কিছু নতুন ধরনের কাজ করছে, যা এ দিকটায় আগে খুব একটা দেখা যায়নি। এটি হলো গুহার মুখে পাথরের দেয়ালে কাদা

দিয়ে পাথরের সমতল থেকে অল্প উঁচু হয়ে থাকা মূর্তি গড়া— এ হলো রিলিফ মূর্তি, পুরো তিন মাত্রার মূর্তি নয়। এখানেও সেই বড় বড় পশুর রিলিফ মূর্তি গড়তে ভাস্কর পছন্দ করছে— বল্গা হরিণ, বাইসন, বুনো ঘোড়া। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো মূর্তিগুলো দেখলে যেন বোঝা যায় পশুটি কী ভাবছে, কী করতে যাচ্ছে। সবাই বলে ভাস্কর পশুর মন বুঝতে পারে, সেটি আবার মূর্তিতে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

আসলে ওই যে শীতের সময় ওদের পুরো সমাজটি গুহা-বাড়িগুলোতে একত্র হয় তখন তাদের সামাজিকতাটি আবর্তিত হয় কিছু বিশ্বাস, কিছু আচারের চারিদিকে। বড় বড় পশু শিকার তাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হওয়াতে; তাদের ভাগ্য, ভয়, উল্লাস সব ওইসব পশুর সঙ্গে জড়িত হওয়াতে; সেই আচারগুলো এই পশুদেরকে নিয়েই বেশি গড়ে ওঠেছে। ভাস্করের মত কুশলী শিল্পীরা এই সামাজিকতার মধ্যে একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। ওদের গুহা-বাড়ি আর তার আশপাশের খালি গুহাগুলোতে ওই পশুগুলোর ছবি, পশু শিকারের ছবি ইত্যাদি তারা ওখানে এঁকে রেখেছে সাধারণ রঙীন মাটি দিয়ে। এগুলো যে বল্গা হরিণের ভাস্কর্যের মত নিখুঁত বর্ণনার ছবি তা নয়, কিন্তু এসব ছবিতে এখানকার মানুষের ভয়-ভীতি-আনন্দ ও আশাগুলো অন্য এক পরাবাস্তবিক রূপ লাভ করেছে। বরফ যুগের কঠিন জীবন সংগ্রামে থাকা মানুষগুলোর জন্য এটি একটি অদ্ভুত মানসিক আশ্বাসের কাজ করেছে। তাই ওরকম উচ্চমানের একটি ভাস্কর্য যার কাছে আছে সে এর মধ্যে একটি ম্যাজিক অনুভব করে। শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পেরেছে বলেই এর এই সার্থকতা। আর এ জন্যই ভাস্করের আত্মীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে, এমনকি হাতে হাতে নানা বিনিময়ের মাধ্যমে মনট্রাসটুকের বাইরেও এগুলো যেসব মানুষের কাছে গিয়েছে তাদের কাছে অন্য রকম একটি মূল্য পেয়েছে। সেই সঙ্গে তারা স্মরণ করেছে মনট্রাসটুকের নাম। নিজের সমাজে ভাস্করের আদরের এটিও একটি কারণ।

* * *

এখানে বর্ণিত সাঁতার রত বল্গা হরিণের ভাস্কর্যটি মাঝখানে ভাঙ্গা অবস্থায় দুটি পৃথক টুকরায় আবিষ্কৃত হয়েছিলো ১৮৬৬ সালে। একটি টুকরায় ছিল সামনের স্ত্রী হরিণটি এবং আরেকটিতে পেছনের পুরুষ হরিণটি। মনটাসট্রুক নামের অনুচ্চ পাহাড়ের ও আভেরন নদীর সংযোগ স্থলে একটি পাহাড় ঘেরা জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বরফযুগের শেষ দিকের বেশ কিছু নিদর্শনের সঙ্গে এটি পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে বর্শা নিক্ষেপক হিসেবে ব্যবহারযোগ্য ওই ম্যামথের ভাস্কর্যটিও পাওয়া গিয়েছে। প্রথমটি ম্যামথের দাঁতের ওপর খোদাই করা বল্গা হরিণের মূর্তি, আর দ্বিতীয়টি বল্গা হরিণের শিঙের ওপর খোদাই করা ম্যামথের মূর্তি। বৈজ্ঞানিক ভাবে বয়স নির্ণয়ের আগেই শুধু বিষয়বস্তু ও মূর্তি তৈরির উপকরণ থেকেই সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেছে এর প্রাচীনত্ব— কারণ ম্যামথ বরফযুগের পরপর বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। ফ্রান্সে বল্গা হরিণও শেষ পাওয়া গেছে ওই প্রাচীন কালেই।

আবিষ্কৃত হবার কিছুদিন পর উভয় ভাস্কর্য লণ্ডনে বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হয়। সেখানে ধরা পড়ে যে দুটি বল্গা হরিণের দুটি ভাস্কর্য আসলে একটি অন্যটির সঙ্গে সুন্দর ফিট করে যায় এবং স্পষ্টত বোঝা যায় যে এ দুটি একই ভাস্কর্যের দুটি ভাঙ্গা টুকরা। তখন এদেরকে জোড়া দিয়ে নেয়া হয়। সেই থেকে আমরা একে সাঁতার রত বল্গা হরিণের যুগল মূর্তি হিসেবেই জানি।

মনট্রাসটুকের পাহাড়ী পাথুরে আশ্রয়টি সর্বশেষ বরফ যুগের শেষের দিকের নিদর্শন বহন করছে বলে গবেষণায় দেখা গেছে, যা প্রায় ১৩ হাজার বছর আগের সময়। এখান থেকে ওই ভাস্কর্যের মত আরো শিল্পকর্ম; পাথরের, হাড়ের ও হরিণের শিঙের তৈরি হাতিয়ার, পশু-হাড়ের নমুনা ইত্যাদি যা পাওয়া গেছে সেগুলো সেদিনকার জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরেছে। সত্যিকারের ব্যবহার্য জিনিসের নমুনা ও তার ওপর শিল্পকর্ম উভয়ে মিলে সেদিনের গল্পকে সামনে নিয়ে এসেছে। এখানে শিল্পকর্মে ম্যামথের দাঁতের ব্যবহার যেমন দেখছি তেমনি আবার ম্যামথের মূর্তিকে হরিণের শিঙে খোদাই করে তুলতে দেখেছি, সেটিই যে বর্শা নিক্ষেপক হিসেবে ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়েছে তাও বুঝতে পেরেছি।

শুধু তাই নয় ব্যাপকতর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় খননে ও গবেষণায় দেখা গেছে যে মনট্রাসটুকের সেদিনের সেই পরিবেশ ও জীবনধারা এবং মানব সংস্কৃতি ওই ১৩ হাজার বছর আগের দিনেও সীমাবদ্ধ নেই আর দক্ষিণ পশ্চিম ফ্রান্সের ওই মনট্রাসটুক পাহাড়ের গায়েও সীমাবদ্ধ নেই। এটি আসলে শেষ বরফ যুগের মানুষের একটি সাধারণ সংস্কৃতির অংশ যা প্রায় ২০ হাজার থেকে ১৩ হাজার বছর আগের সময় কালে ব্যাপ্ত— আমরা এখানে তার শেষের দিকের যুগটি দেখেছি। বর্তমানে আমাদের কালে সাইবেরিয়ার যে রকম অতি শীতল ও শুষ্ক আবহাওয়া ও পরিবেশ, প্রায় পুরো ফ্রান্সে তখন সে রকম পরিস্থিতিই ছিল। সেখানে এটিকে বল্গা হরিণের যুগ বলেও কেউ কেউ বলেছেন। আর ওখানকার সেদিনের মানব সংস্কৃতির নাম দেয়া হয়েছে ম্যাগডেলেনিয়ান কাল।

এই নাম এসেছে ফ্রান্সেই আব্রি দ্য লা মাডেলাইন নামের আর একটি গুহা থেকে— ওই গুহায় মনট্রাসটুকের ও অনুরূপ সমসাময়িক অন্যান্য জায়গার মত প্রায় একই রকম ঢঙের ভাস্কর্য, গুহা-চিত্র, অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদি পাওয়া গেছে। কালের ব্যাপ্তিতে প্রায় ছয় সাত হাজার বছর ব্যবধানে হলেও এদের মধ্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে। যেমন এখানকার 'হায়েনার প্রাদুর্ভাব', নাম দেয়া ভাস্কর্যটি দেখলে মনে হবে যেন এটিও সেই 'সাঁতার রত বল্গা হরিণের' সৃষ্টিকার শিল্পীর করা— একই আশ্চর্য রকম বাস্তবানুগ ভাবে হায়েনা দেহের খুঁটিনাটি তার আগ্রাসী ভাবসাব সব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অথচ এই দুই মূর্তির স্থান-কালে অনেকখানি তফাত। মিল শুধু একটিই উভয়ে শেষ বরফযুগের পশ্চিম ইউরোপের ম্যাগডেলেনিয়ান সংস্কৃতির অংশ। তাই আমাদের কাহিনী তৈরিতে আমরা শুধু মনট্রাসটুকের আবিস্কৃত তথ্যগুলো ব্যবহারে সীমাবদ্ধ থাকিনি, ম্যাগডেলেনিয়ান সংস্কৃতির একেবারে শেষ যুগের সমসাময়িক অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোকেও ব্যবহার করেছি।

পশ্চিম ইউরোপে ম্যাগডেলেনিয়ান কালটিতে বরফ যুগের জীবন-জীবিকার কাঠিন্য সত্ত্বেও মনে হয় শিকারের জন্য বড় পশুর প্রাপ্তি এক ধরনের সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিলো। ওই

পশুদেরকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেই প্রাচীন মানুষের মস্তিষ্কে যে এক অদ্ভুত শিল্প ভাবের স্ফুরণ সেদিন হয়েছিলো সেটি খুবই স্পষ্ট। শুধু তাই নয় অত্যন্ত মনোযোগ, পরিশ্রম ও ধৈর্য সহকারে সেই পশু দেহ, তাদের জীবন, তাদের আচরণকে ভাস্কর্য অথবা গুহা-চিত্রে ফুটিয়ে তোলার মত মনন ও অবকাশ থাকাটিও এখন খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয়। পুরো এলাকা জুড়ে সেই পাঁচ ছয় হাজার বছর ধরে, বিশেষ করে তার শেষের দিকটায় ভাস্কর্য, নানা মাধ্যমের ওপর রিলিফ খোদাইয়ে, এবং ছোট বড়, সাধারণ, রঙীন, বিশাল পটের অনেকগুলো গুহা-চিত্রে সেগুলো একের পর এক উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর স্পেনের আলতামিরা গুহার চিত্র ও খোদাই কাজ বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

আলতামিরা গুহার চিত্রগুলো ১৮৭৯ সালে বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া আট বছরের এক মেয়ে হঠাৎ দৈবক্রমে আবিষ্কার করে। সে প্রায় অন্ধকার গুহার গায়ে বিশাল বাইসনের ছবি দেখে অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর এ গুহায় ও তার কিছু শাখা গুহায় আশ্চর্যরকম সুন্দর ও বিস্তারিত পশু চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে— প্রধানত লাল ও কালো রঙে আঁকা বিশাল সব চিত্র বেশির ভাগই দৈর্ঘে প্রস্থে ১৮-১৯ মিটারের মত বিশাল। ওই অন্ধকারে আগুনের আলোতে স্বল্প আয়তনের গুহার চাপা পরিসরে চিত্রকরদেরকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে ছবিগুলো যে আঁকতে হয়েছে তা স্পষ্ট— তারপরও এগুলো অনন্য সুন্দর ও শৈল্পিক। নানা ভঙ্গিতে বাইসনের ছবিই প্রধান, আর রয়েছে ঘোড়া আর হরিণ। ছবির কালো অংশ কাঠ কয়লা দিয়ে আঁকা বলে অনায়াসে তার কার্বন-ডেটিং করে ছবির বয়সগুলো জানা গেছে— বড় ছবিগুলো ১৪ থেকে ১৩ হাজার বছর আগের আঁকা বলেই প্রমাণিত হয়েছে। একই সময়ের বেশ কিছু খোদাই করা ছবিও পাওয়া গেছে— যেমন বড় পশুর কাঁধের চওড়া হাড়ের টুকরার ওপর খোদাই করা। আঁকা ছবির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে অনেকগুলো প্রথমে গুহার ছাদ বা দেয়ালের ওপর সহজ বক্র রেখায় তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঁচড়ের টানে আগে অগভীর খোদাই করা হয়েছে। তার ওপর কালো ও লাল রঙ বুলিয়ে আঁকা রয়েছে এবং বিস্তৃত করা হয়েছে।

মাগডেলেনিয়ান সংস্কৃতির মধ্যে অধিকাংশ শিল্প নিদর্শনগুলো এরকম ভাস্কর্য, গুহা-চিত্র, এবং পাথরের ওপর রিলিফ খোদাই করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমী শিল্পকর্মও আশ্চর্যজনক ভাবে গুহার মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে যা স্রেফ কাদামাটি দিয়ে পাথরের গায়ের ওপর রিলিফ মূর্তি গড়া। এমনি একটি উদাহরণ স্পেন-ফ্রান্স সীমান্তে টক দ্য অডুবার্ড গুহায় আলতামিরার প্রায় সমসাময়িক সময়ের কিছু কাজে। এখানে দেড় ফুট উঁচু ও তিন-চার ইঞ্চি পুরু রিলিফে দুটি কাদায় তৈরি বাইসন মূর্তি কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে— এর একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী। এই দুই আশ্চর্যরকম জীবন্ত মূর্তি তাদের প্রজনন কালীন মুড ও আচরণ অতি স্পষ্ট, বাইসনের মাথার ঘাড়ের চুল ও দাড়ির অবিন্যস্ত ভাব আনতে হাতিয়ার ব্যবহারের পরিচয় থাকলেও চোয়ালগুলো ঠিক করা হয়েছে শিল্পীর হাতের নখ দিয়ে— শিল্পীর আঙ্গুলের ছাপও রয়ে গেছে ওতে অস্পষ্ট ভাবে। এসব অতি বাস্তবানুগ মূর্তির তুলনা হয়না। কিন্তু হায়, বরফ যুগের অবসানে এখানে এবং সবখানে শিল্পের এই মান হারিয়ে যায়। শিল্প অনেকখানি আটপৌরে হয়ে পড়ে।

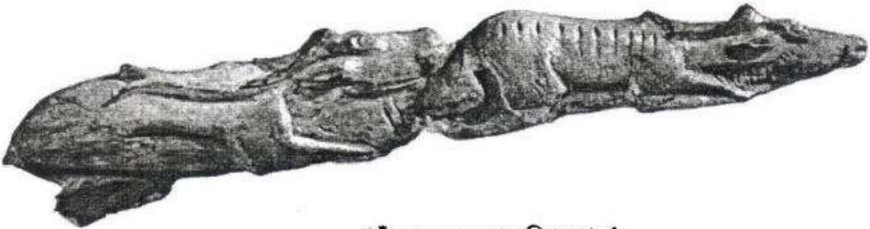

'সাঁতাররত বল্গা হরিণ যুগল'
(ম্যামথের দাঁতের খোদাই কর্ম)

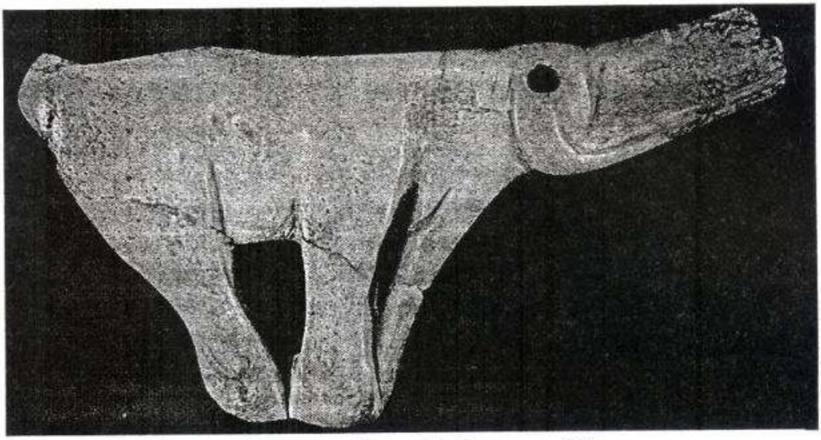

বর্শা-নিক্ষেপক হিসেবে তৈরি ম্যামথ মূর্তি
(বল্গা হরিণের শিঙে খোদাই কর্ম)

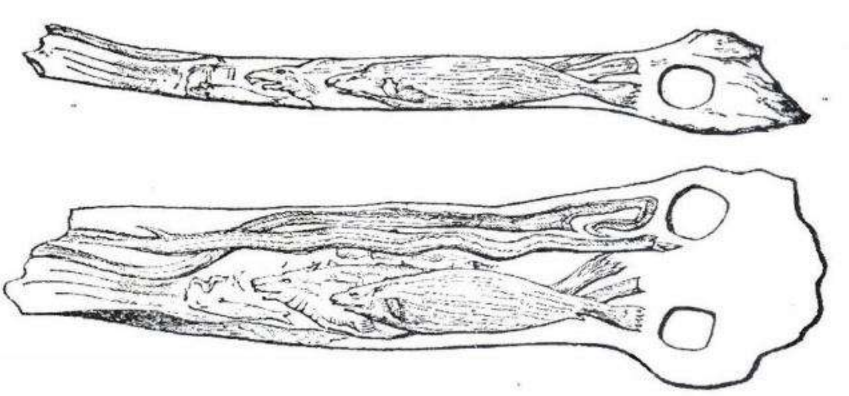

হাড়ের তৈরি চিত্রিত ব্যাটন
(ছিদ্রগুলো বর্শার দন্ড সোজা করার জন্য)

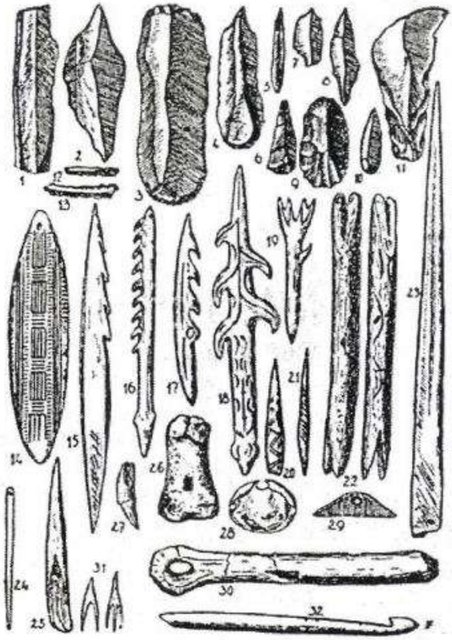

মনষ্ট্রাসটুকের হাতিয়ার

'হায়েনার প্রাদুর্ভাব'
(ম্যামথের দাঁতের খোদাই)

আলতামিরার গুহাচিত্র

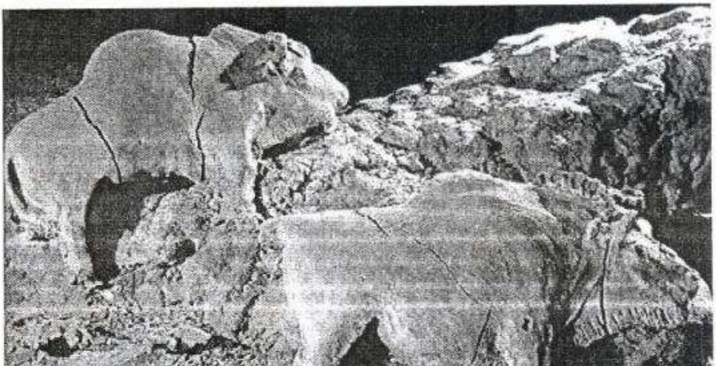

কাদায় গড়া বাইসন মূর্তির রিলিফ (টক দ্য অডুবার্ড গুহা)

উত্তর জার্মানীর আরেন্সবার্গের বর্শাবাজ ঃ ১২ হাজার বছর আগে

শীতক্লিষ্ট জনবিরল এই জায়গায় শুধু শরত কালটাই মাংস খাওয়ার সুযোগের কাল। কারণ এ সময় বল্গা হরিণের পাল দুই হ্রদের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে পার হয় আর শিকারি দলের বর্শার আঘাতে মারা পড়ে। ওদের একজন সেরা শিকারি বর্শাবাজ।

বরফ যুগের চরম শৈত্যের সময় শুধু ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে মানুষ টিকতে পেরেছিলো। তার অবসানের পর উত্তরাঞ্চলেও আবার নতুন করে মানুষের বসত ঘটেছে, খুব কম জনসংখ্যায় হলেও। সেখানে এখনো মানুষ মাত্রই সম্পূর্ণ শিকারি-সংগ্রাহক। উত্তর জার্মানীর আরেন্সবার্গের বর্শাবাজ সেই মানুষদেরই একজন। এই শিকারিদের কয়েকটি পরিবারের এই দলটি বল্গা হরিণের মৌসুমী ঝাঁককে আক্রমণ করে। দলের সেরা শিকারিদের একজন তরুণ বর্শাবাজ। নামটি তার অর্জিতই বলা যায়, কারণ ওই সময় দলে দলে বল্গা হরিণ তাদের বর্শা নিক্ষেপের কুশলতার কারণে কুপোকাৎ হয়। আর সে কাজে সেরাদের একজন বলেই আমাদের নায়কের নাম বর্শাবাজ।

প্রতি বছর শীতের আগে শরতে আগমনে ঝাঁকে ঝাঁকে বল্গা হরিণ উত্তর দিকে অভিবাসী হয় ওখানকার তুন্দ্রাতে নতুন আলগি উদ্ভিদের চারণ ভূমির খোঁজে। আরেন্সবার্গ উপত্যাকার নিচের দিকে দুটি ছোট হ্রদের মাঝে সরু তৃণভূমির মধ্য দিয়েই এঁকেবেঁকে চলে গেছে তাদের চিরন্তন অভিবাসন পথ। আজ এখানেই নানা জায়গায় লুকিয়ে ছিল সেই শিকারিরা, কেউ বড় কোন পাথরের আড়ালে বা কেউ লম্বা ঘাসের আড়ালে, আর কান পেতে ছিল এক ঝাঁক বল্গা হরিণের দৌড়ে আসার খুরের আওয়াজের প্রতি। সামনের হরিণগুলো পার হয়ে গেলেই শিকারিদের একজন উচ্চ খাদের একটি শিষের মত শব্দ করে উঠলো। এটি হলো আক্রমণের সংকেত; সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক থেকে বর্শা নিক্ষেপ চলতে থাকে তাদের ওপর— তারা এক রকম ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হয়ে হতভম্ব হরিণরা জান বাঁচাতে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। কোনটা নেমে পড়েছে হ্রদের

নিচু পারে, কেউ বা পানিতেই ঝাঁপ দিয়েছে। আহত বেশ কিছু হরিণ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে— অন্তত দশ বারোটাতো বটেই। ওই অবস্থায় কয়েকজন শিকারি এগিয়ে গিয়ে বড় পাথর দিয়ে এগুলোর মাথায় মরণ আঘাত করেছে। সাবধানে বর্শাগুলো এদের মৃতদেহ থেকে সযত্নে তুলেও এনেছে। এটি তারা করেছে বর্শার আগায় যে চোখা পাথরের অস্ত্র থাকে সেটার উদ্ধারের জন্য ততটা নয়, যতটা গাছের ডালে তৈরি বর্শার লাঠিটির জন্য। বৃক্ষবিরল এই অঞ্চলে এটিই বেশি মূল্যবান। তাই ওদের একজন তো হ্রদের হিম শীতল পানিতেই নেমে পড়লো হ্রদে পড়ে গিয়ে ডুবে গিয়েছে এমন হরিণের দেহ থেকেও বর্শাটি খুলে আনার জন্য, যদিও এত মৃত হরিণের মধ্যে আর ওই ডুবে যাওয়া হরিণটিকে কষ্ট করে তুলে আনা দরকার মনে করলোনা সে।

বর্শাবাজ এই শিকারের দক্ষতা অর্জন করেছে অভিজ্ঞতা থেকে। তাই পরিবারের অন্য পুরুষরা তো বটেই অন্যান্যরা তার কাছে বর্শা নিক্ষেপের তালিম নেয়। প্রথম দিকে হরিণ যখন কাছে থাকে প্রায় ভূমি সমান্তরাল ভাবে বর্শা হরিণের দিকে ছুঁড়ে দিতে হয় যথাসম্ভব এর হার্টের দিকে তাক করে। এখানে গায়ের জোরটি খুবই প্রয়োজন যাতে চামড়া ভেদ করে পাথরের বর্শাগ্র বিদ্ধ করতে পারে হরিণের নাজুক অঙ্গ। যখন আহত হরিণ সন্ত্রস্ত হয়ে হ্রদের দিকে নেমে যায় তখন পেছন থেকে এবং ওপর থেকে আরো বর্শা হরিণের দিকে ছোঁড়া হয় যা পিঠে, ঘাড়ে নানা জায়গায় গিয়ে বিদ্ধ করে। বর্শাগ্র যদি হরিণের শরীরের যথেষ্ট ভেতরে গিয়ে তার নাজুক অঙ্গকে ক্ষতি নাও করে, হরিণের জীবন এমনিতেই বিপন্ন হয়ে যায় শুধু ক্রমাগত রক্ত ক্ষরণে। একবার এভাবে আহত হলে ও রক্ত ঝরতে থাকলে শেষ পর্যন্ত হরিণ নিস্তেজ হয়ে কাবু হয়ে যায়। বর্শা তাই এক মারণাস্ত্র। বরাবর এই বর্শাই ছিল ওদের চিরায়ত মোক্ষম অস্ত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে তীর-ধনুক। এই বৃক্ষবিরল জায়গায় বাঁকানোর মত সঠিক কাঠ দিয়ে ধনুক তৈরি কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও কোন কোন শিকারি দক্ষতার সঙ্গে তীর ছুঁড়েই হরিণকে আরো সহজে কাবু করতে পারছে। কিন্তু বর্শাবাজের মতো অন্যরা এখনো বর্শার ওপরেই নির্ভর করছে।

বল্গা হরিণের এই অভিবাসনের মৌসুমে তাদের চলাচল পথের খুব কাছেই এসে ক্যাম্প খাটিয়েছে বর্শাবাজের পরিবারসহ তাদের জনা তিরিশেকের দলটি। এই অভিবাসনের পুরো মৌসুমটি ওরা এদিকেই বসত স্থাপন করে অস্থায়ী ক্যাম্পে। তাদের এই জীবনের অনেকখানিই বল্গা হরিণ নিয়ে। ক্যাম্পগুলো সব বল্গা হরিণের চামড়ার তৈরি, নিজেদের পোষাকও তাই। আসবাব ও হাতিয়ারের বেশ খানিকটা বল্গা হরিণের শিঙের ও হাড়ের তৈরি। বাদবাকি সব হাতিয়ার অবশ্য পাথরের তৈরি— শুধু শিকারের জন্য বর্শাগ্র ও তীরের অগ্রভাগ নয়, বিভিন্ন রকম কুঠার, চামড়া ছিলার ও মাংস কাটার উপযুক্ত বিভিন্ন ছুরিও ধারালো পাথরে

তৈরি। শরতের এই দিনে ইতোমধ্যে কনকনে শীতল বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে প্রায় উন্মুক্ত এই তুন্দ্রা আর তৃণভূমির এলাকায়। শুধু মাঝে মাঝে উপত্যকার নিচু জায়গাগুলোর ঢালে কিছু কিছু পাইন গাছের কুঞ্জ। এই মৌসুমে দিনের দৈর্ঘও কমে যাচ্ছে দ্রুত, বিকেলে শিগগির অন্ধকার নেমে আসে। বর্শাবাজদের এখানে ক্যাম্প করে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বল্গা হরিণের দলবদ্ধ অভিবাসন মৌসুমের সুযোগে যত বেশি সম্ভব হরিণের মাংস ও তার দেহজাত অন্যান্য জরুরি জিনিসগুলো সংগ্রহ করে ফেলা।

এ সময় যেহেতু বড় আকারের শিকার পর পর প্রায় প্রত্যেক দিন হচ্ছে তাই একদিকে বর্শা, তীর ইত্যাদি অস্ত্রের প্রয়োজন হচ্ছে খুব বেশি— বিশেষ করে এর নষ্ট হয়ে যাওয়া পাথরের অংশের। আবার অন্যদিকে শিকার করা হরিণকে কাটাকুটি করে সব কিছু সংগ্রহ করতে প্রয়োজন নানা রকম হাতিয়ারের— ঘন ঘন ব্যবহারে যাকেও প্রায়শ বদল করতে হয়। পুরুষরা যখন শিকারে ব্যস্ত, মহিলারা সে সময় এই হাতিয়ারগুলো তৈরি করে রাখতে ব্যস্ত থাকে। বর্শাবাজের পরিবারও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্শাবাজের বৌ, ছোট বোন এরা এ কাজে বেশ দক্ষ— অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে তারা আগেভাগেই এই হাতিয়ার নির্মাণে দারুণ ব্যস্ত থেকেছে। ছোটরাও এই কাজে হাত লাগাচ্ছে, দ্রুত শিখেও ফেলছে ভাল হাতিয়ার তৈরির কাজ। শিকার করার কাজটি শক্ত সমর্থ পুরুষদের কাজ— কারণ খুব জোরে বর্শা নিক্ষেপ করতে হয়, অনেক সময় বিশাল বল্গা হরিণের যথেষ্ট কাছে গিয়ে। কিন্তু এই বড় পশুটার মৃতদেহকে চামড়া ছিলে কেটেকুটে এর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলাদা করার ব্যাপারটিও কম পরিশ্রম সাপেক্ষ নয়— যে কাজের অনেকটা করতে মহিলারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এমন কি বল্গা হরিণের মাথার শাখা-প্রশাখা সমেত বিশাল শিংগুলোকে ঠিক মত সংগ্রহ করার কাজটিতেও। ঝলসানোর জন্য মাংসের ও আভ্যন্তরীন অঙ্গগুলোর নানা অংশ ছাড়িয়ে নেবার কাজটি প্রায় পুরোপুরিই মেয়েদের দ্বারা হচ্ছে। খাওয়ার মাংস, চামড়া, আর শিঙ ছাড়াও শক্ত রগের তন্তুগুলো যত্ন করে ছাড়িয়ে নেয় ওরা যা তাঁবু, পোষাক ইত্যাদি তৈরি করতে সুতার কাজ করবে, আর নেয় বিশেষ বিশেষ হাড় বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য। যেমন সরু চিকন হাড় থেকেই তৈরি হবে সেলাইয়ের সুচ, চেপ্টা হাড় থেকে তৈরি হবে চামচ ইত্যাদি।

ক্যাম্পের বাইরে আগুন জ্বালিয়ে চলছে সব রকমের কাজ। ইতোমধ্যে অবশ্য খাওয়ার জন্য নেয়া মাংস ঝলসানোর জন্য তৈরি হয়েছে। একদিকে আগুনে মাংস ঝলসানো হচ্ছে আর তা বেটে দেয়া হচ্ছে দলের সবার মধ্যে। বিশেষ বিশেষ মজাদার অংশগুলোর— কলজে, হার্ট, কিডনির স্বাদ যেন সবাই পায় সে ব্যাপারেও চোখ রাখছে বিশেষ করে পরিবেশনকারী সিনিয়র মহিলারা। শরতের এই ক্যাম্পে কাটানোর ফুর্তিটিই হলো অসম্ভব পরিশ্রম করা এবং ভরপেটে মাংস খাওয়া।

এবার পাঁচটি পরিবারের মানুষ এক সঙ্গে ক্যাম্প ফেলেছে এখানে— বর্শাবাজ পরিবার তারই একটি। প্রত্যেক পরিবারের একাধিক তাঁবু পর-পর খাটানো হয়েছে। তাঁবুর সামনে নানা রকম কাজ চলছে আগুনের চার ধারে। পরবর্তী শিকারের জন্য হাতিয়ার তৈরি, বাছাই, মেরামত এর মধ্যে একটি। আর প্রায় প্রত্যেক তাঁবুর সামনে দেখা যাচ্ছে বল্গা হরিণের ছিলে নেয়া চামড়াটিকে পাকা করার কাজ। বেশ কয়েকটি খুটি গেড়ে চামড়াটিকে এগুলোর সাহায্যে উল্টো করে টান টান বিছিয়ে রাখা হয়েছে। এর জন্য উপযোগী পাথরের ধারালো কোরানি দিয়ে চেঁছে চেঁছে চামড়ার সঙ্গে লেগে থাকা শেষ মাংসটুকু এবং শেষ চর্বিটুকু খুব যত্ন করে তুলে ফেলা হচ্ছে। এ কাজ দ্রুত করে রোদে শুকিয়ে একে যত তাড়াতাড়ি ব্যবহারোপযোগী করা যাবে তত ভাল।

বাইরে কাজ করতে করতে এক ফাঁকে বর্শাবাজের বৌ তাদের তাঁবুর পর্দাটি একটু ফাঁক করে নিচু হয়ে ভেতরে ঢুকলো ওখানে সব ঠিক আছে কিনা দেখতে। তাঁবুর ভেতরেও ছোট্ট একটি আগুন জ্বলছে— তার পাশেই শুইয়ে রাখা হয়েছে কয়েক মাস বয়সের একটি বাচ্চাকে— বর্শাবাজের ভাইয়ের নবজাত বাচ্চা। বাচ্চা শুয়ে আছে চামড়ার তৈরি একটি বাঁকা নৌকা আকৃতির আঁটসাট বিছানায়— আর তার কাছে বসে এর বাঁকানো তলার ওপর ওটি দুলিয়ে দুলিয়ে গান গেয়ে গেয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে বর্শাবাজের দশ বছরের কিশোরী মেয়ে। তার মা শিশুটাকে কোলে নিয়ে মেয়েকে বাইরে খাবার খেতে পাঠিয়ে দিলো।

খাওয়া দাওয়ার কাজ অনেকটা সেরে গেলে ওদের কয়েকজন বাইরে পাথরের ওপর পাথর অথবা হরিণের শিঙের চোখা অংশ ঠুকে ঠুকে নানা রকম হাতিয়ার বানাবার কাজে বসে গেছে— এটিই বাড়ির আঙ্গিনায় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর জন্য প্রয়োজনীয় ফ্লিন্ট পাথর ওরা আরো দক্ষিণের ফ্লিন্ট প্রাপ্তি স্থান থেকে এনেছে। ফ্লিন্ট পাওয়াটি সহজ নয়। চুনা পাথরের মাঝে মাঝে তার ভেতর ডুবে আছে কালো ফ্লিন্ট খণ্ড— চুনাপাথর ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগুলো উদ্ধার করতে হয়েছে। ছোট নুড়ির আকার থেকে শুরু করে ৫০ কিলো ওজনের ৭০-৮০ সেন্টি মিটার লম্বা পর্যন্ত বড় ফ্লিন্ট খণ্ড এভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এই ফ্লিন্টই এখানে এবং সর্বত্র যাবতীয় শক্ত কাজের জন্য হাতিয়ারের প্রধান নির্মাণ সামগ্রী— তাই অত্যন্ত মূল্যবান। এই ক্যাম্পে আসার সময় আগে থেকে তৈরি বেশ কিছু হাতিয়ার নিয়ে আসা হয়েছে, আর আনা হয়েছে এরকম ফ্লিন্ট পাথরের কাঁচামাল। এখন সেগুলোর ওপর প্রতিদিন কাজ চলছে, কারণ শিকার করতে গিয়ে এবং বল্গা হরিণের কাটাচেরা করতে গিয়ে প্রতিদিনই কিছু কিছু হাতিয়ার নষ্ট হচ্ছে।

হাতিয়ার তৈরির কাজ অনেকে করছে— পুরুষ, স্ত্রী, এমন কি কম বয়সীরাও, যদিও সবার দক্ষতা সমান নয়। যে ভাবে আড্ডা দিতে দিতে ওরা কাজ করছে, মনে হতে পারে যে কাজটি খুব সহজ, আসলে কিন্তু তা নয়। মূল পাথর থেকে যে

পাতলা অংশটি ঠোকাঠুকির ফলে ভেঙ্গে আসবে তার আকার আকৃতি নির্ভর করছে কী রকম হাতুড়ি ব্যবহার করা হয়েছে, পাথরের ঠিক কোন জায়গায় আঘাত করা হয়েছে, আর ঠিক কী রকম কোণ করে তা করা হয়েছে, ইত্যাদির ওপর। কাজেই কে কী রকম হাতিয়ার পেতে চাচ্ছে সেই অনুযায়ীই এগুলো করতে হচ্ছে। মূল পাথরটি বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে হাতুড়ির আঘাত কী ভাবে পাথরটির কোথায় করতে হবে। ওই আড্ডার মধ্যেই তাদের 'উঃ', 'আঃ', 'দুৎ শালা' ইত্যাদি রকমের ব্যথার বা গালির শব্দ ইত্যাদি শুনে বোঝা যায় যে ছোটখাট কোন অঘটন ঘটেছে— হয় হাতুড়ির আঘাতটি পাথরে না পড়ে আঙ্গুলে এসে লেগেছে, নইলে মূল পাথরটি দুই টুকরা হয়ে ভেঙ্গে গেছে, অথবা পাতলা যে অংশটি ভেঙ্গে আসার কথা তা পুরো না এসে অর্ধেকটা মূল পাথরে থেকে গেছে— সেখানে একটি অবাঞ্ছিত ধাপ সৃষ্টি করে। মূল বড় পাথর থেকেও কুঠার ইত্যাদি তৈরি হতে পারে। সেটি ঠিকমত না হলে সব পাতলা অংশ যুৎসই ভাবে ভেঙ্গে নেবার পর বাকি মূল পাথরটি ফেলে দেয়া হচ্ছে। ব্যবহারে সব চেয়ে বেশি হারাতে হচ্ছে শিকারের কারণে ছুঁড়ে দেয়া বর্শার অথবা তীরের পাথুরে অগ্রভাগ— তাই এগুলোই তৈরি করতে হচ্ছে বেশি।

পেট ভরে মাংস খাওয়ার পালা এখন প্রায় দিনই হচ্ছে। তবে শিকারবিহীন দিনের জন্য কিছু কিছু মাংস ধোঁয়া দিয়ে শুকিয়ে সংগ্রহও করে রাখা হচ্ছে। তা ছাড়া সামনে বেশ কিছু দিন পথে কাটাতে হবে ঠাঁই বদলের সময়। জমিয়ে রাখা মাংসগুলো তখন কাজে লাগবে। খাওয়া দাওয়া ভাল হলেও এই শরতের কালটি বড় পরিশ্রমের সময়। বর্শাবাজ পরিবারের সবার জন্যই শুধু কাজ আর কাজ। মন খুলে দুটি কথাও হয়না পরিবারের মধ্যে। তার বৌ পোয়াতি, ভাগ্য ভাল হলে আগামী বসন্তের পরের দিকে তাদের কোল জুড়ে একটি বাচ্চা আসবে। বোনের বাচ্চাটিকে যখন আদর করে তখন এ কথা তাদের দু'জনেরই খুব মনে হয়। সেই সঙ্গে জাগে নানা আশঙ্কাও। মাঝে দারুণ শীত— কাটাতে হবে অন্য জায়গায় যেখানে আশ্রয়ের, খাবারের নানা অনিশ্চয়তা।

শরতের দিনগুলো শেষ হয়ে আসছে, শীতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আরেন্সবার্গের দুই হ্রদের মাঝখান দিয়ে বল্গা হরিণের মূল দলগুলোর অভিবাসন শেষ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। এখন শুধু ছোট ছোট দলে কিছু সময় পর পর বাদবাকিরা পার হচ্ছে। এবারকার মত শিকারের মৌসুম শেষ হয়ে যাচ্ছে— বর্শাবাজরা কয়েক দিনের মধ্যে তাদের ক্যাম্প গুটিয়ে, শিকার থেকে যা সংগ্রহ করতে পেরেছে তা নিয়ে অনেক দক্ষিণে ফেরত যাবে। সেখানে শীতের প্রকোপ কম, শীতে থাকার জন্য গুহা বা পাথরের ঘর বা ওরকম কিছু পাওয়া যাবে— তাঁবুর ওপর নির্ভর করতে হবেনা। সেখানে উদ্ভিদের ঘন আড়ালে ছোটখাট নানা শিকারও পাওয়া যাবে। তবে কিছুই এই শরতের মৌসুমের মত হবেনা। মনে হয় সারা বছরের জন্য পেট ভরে সব রকমের স্বাদ মিটিয়ে মাংস তারা খেয়ে নিয়েছে।

বর্শাবাজের পরিবারের ছোট বড় সবার দিকে তাকালেই তা বোঝা যায় সবারই স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। এটি শুধু উন্নত পুষ্টির কারণে হয়নি একই সঙ্গে আনন্দ-ফুর্তি, খোলা আবহাওয়ায় কঠোর পরিশ্রম— সবই এতে অবদান রেখেছে। এটিই এই শরতের শিকারের মৌসুমে পরিবার পাঁচটির সব চেয়ে বড় সংগ্রহ।

তবে সামনের শরতকালগুলোর কথা তারা বলতে পারছেনা। নানা কারণে বল্গা হরিণের সংখ্যায় বছর বছর হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে। সংখ্যা কমে গেলে এই পরিবারগুলোর খাদ্য প্রাচুর্যের অভাব ঘটে। বিশেষ করে গ্রীষ্মের শেষ থেকে শীত পর্যন্ত সময়টা ওরা এভাবে খাদ্যাভাবের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। এই ব্যাপারটি অবশ্য সব জায়গায় সমান ভাবে হয়না। বল্গা হরিণের প্রাচুর্য এবং তাদের অভিবাসনের বিষয়টি উত্তর ইউরোপের বিশাল জায়গা জুড়ে ঘটে— উত্তর জার্মানী, বেলজিয়াম, উত্তর ফ্রান্স সর্বত্র। তাই ওদের পক্ষে নানা অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটি খুব জরুরী— বিশেষ করে তুলনামূলক ভাবে কাছের অন্য মানব বসতিগুলোর সঙ্গে, আবার কয়েক শত কিলোমিটার দূরের মানুষের সঙ্গেও। এতে তারা অতি মূল্যবান তথ্য একে অপরের থেকে জানতে পারে— যেমন বল্গা হরিণের সংখ্যায় কোথায় এবার উঠতি এবং কোথায় পড়তি। তাছাড়া অন্যান্য আবহাওয়া ও পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যগুলোও খুব জরুরী। উত্তর ইউরোপে এখনো জনবসতি খুবই কম। বর্শাবাজরা পাঁচটি পরিবারের মাত্র জনা তিরিশকে মানুষ এবার আরেন্সবার্গে বল্গা হরিণ শিকারে নিজেদের মধ্যেই শরত কালটি কাটালো। এখানে আসা, থাকা, যাওয়ার পথে অন্য কোন দলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হয়নি বল্লেই চলে— যদিও অল্পবিস্তর দু'একজন করে মানুষের আসা যাওয়া ঘটেছে অন্য দল থেকে। সাধারণ ভাবে মানুষ যথেষ্ট চাপে রয়েছে বলতে হয়। তাই পরিবেশগত তথ্য বিনিময়গুলো খুব জরুরি। তাছাড়া যাদের শিকার ভাল হয়েছে তাদের সঙ্গে পণ্য বিনিময়, মাংস বিনিময়টিও বিভিন্ন দলের জন্য লাভজনক। আরো বড় কথা হলো বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী বিনিময়। নিজেদের ছোট দলের মধ্যে এটি কম সম্ভব বলে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমেই অন্য দলে বিয়ের সম্ভাবনাগুলোও খুঁজে দেখতে হয়।

বর্শাবাজরা অবশ্য এখন চলে যাচ্ছে জার্মানীর মধ্য-রাইন অঞ্চলে রাইন নদীর পারে গোনেসডর্ফে— যেখান থেকে ওরা এসেছিলো। শীত-বসন্ত ওরা ওখানেই কাটাবে। ওখানে বেশ কিছু বৃক্ষ আচ্ছাদন আছে, রাইন উপত্যাকায় বন্য ঘোড়া, পশমী গণ্ডার এসব বড় প্রাণী ঘোরাফেরা করে, ছোটখাট বন্য প্রাণীরাও রয়েছে। সেখানে পাথর এবং গাছপালা দিয়ে শীতের আবাস তৈরি করার সুযোগ আছে। অবশ্য নানা দিক থেকে মানুষ শীতে গোনেসডর্ফে আসে। গত বছর মোট শ'খানেক মানুষ এসেছিলো। বর্শাবাজরা ভাবছে এবারো হয়তো তাই হবে। এর চেয়ে খুব বেশি না হলে শীতে ওখানে চলনসই গোছের শিকার পাওয়া যাবে। পুরুষরা কয়েকজন দলবদ্ধ হয়ে কয়েক দিনের জন্য চলে যাবে প্রধানত ঘোড়া

শিকারের চেষ্টায়। তার আগে অবশ্য আশ্রয়ের ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে। যে বাড়িটি গত বছর ফেলে এসেছিলো মেরামত করে সেখানেই আশ্রয় নিতে পারবে এমন আশা আছে। শীতে এ বাড়ির আশপাশেই কাটাবে, দূরে যাবেনা। পুরুষরা যদিওবা ক'দিনের শিকারে যাবে মেয়েরা তো বাড়িতেই থাকবে আগুন জ্বালিয়ে, তার পরিচর্যা করে, পুরো বাড়িরও মেরামত এবং পরিচর্যা করে। ওখানে ওরা সবচেয়ে বেশি সময় দেবে যে চামড়া এবার যোগাড় হয়েছে তা দিয়ে পরিবারের সবার জন্য নতুন শীতবস্ত্র তৈরির কাজে। আরো বড় কথা শীতে বয়স্কদের ও খুব ছোট বাচ্চাদেরকে খুবই যত্নে উষ্ণ রাখতে হয়— এটিও ঘরের মহিলাদের কাজ। তারপর এক এক দিন যখন ঘোড়ার মত বড় পশু শিকার করে আনা হবে তখন আবার বড় আগুন জ্বালিয়ে তা নিয়ে হৈ হৈ আনন্দ, গান, নাচ— অন্তত কিছুদিনের জন্য। সেটি যদি নাও হয় বাড়ির কাছেই পাওয়া যাবে খরগোস। ওদের গর্ত, ইঁদুরের গর্ত সেগুলো খুঁজে বের করে আপাতত খাবার কাজ চলে যায়। এ ছাড়া শীতে বন্য ফলমূল যে খুব একটা পাওয়া যাবে সে আশা বৃথা। অবশ্য পরে বসন্ত এলে সেদিক থেকেও কিছু সুবিধা হয়ে যাবে।

*   *   *

শেষ বরফযুগ শুরু হবার আগে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে বসবাস কঠিন হলেও সেখানে কিছু মানুষের বসত ছিল (২৫ হাজার বছরেরও আগে)। কিন্তু বরফ যুগে ইউরোপের মানুষ মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে উষ্ণতর অঞ্চলে চলে আসতে বাধ্য হয়। তারপর ১৫ হাজার বছর আগে বরফ যুগের অবসানে মানুষ একটু একটু করে আবার উত্তরে যায়। সেখানে ফসিল পশু-হাড়ের ওপর তার হাতিয়ারের দাগ দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এটা বুঝতে পেরেছেন।

শৈত্য ও শুষ্কতার অবসানে উত্তর ইউরোপের চিরবরফ হিমবাহগুলো আরো উত্তর দিকে সরে গেলে উত্তরের তুন্দ্রা, তৃণভূমি ও পাইন বন অঞ্চলে বল্গা হরিণের বিস্তৃতি ঘটেছিলো। এটি জার্মানীর উত্তর অঞ্চল এমন কি ফ্রান্সের প্যারিস অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। বল্গা হরিণের ঝাঁক প্রতি শরত কালে যে ভাবে আরো উত্তরে অভিবাসী হতো তার চলাচল পথে সহজ শিকারের সুযোগ নিয়ে এখানকার মানুষের মৌসুমী জীবনযাত্রার একটি ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিলো। এর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩০ এর দশকে আরেন্সবার্গের মাইনডর্ফ অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে একই জায়গায় অসংখ্য বল্গা হরিণের হাড়ের সন্ধান পাওয়া যাওয়াতে। এর মধ্যে বেশ কিছুর গায়ে বর্শা বা তীরের আঘাতের চিহ্নও ছিল। এভাবে ৩০ হাজার বছর আগে থেকে শুরু করে এখানে পর-পর গুহা ভালুকের, ম্যামথের, বন্য গরুর এবং বল্গা হরিণের হাড় পাওয়া গেছে যা বরফ যুগের আগে পরের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের শিকারের ফল বলে মনে করা হয়। গবেষণায় এও দেখা গেছে যে এর মধ্যে বল্গা হরিণের হাড়ের আধিক্য ১০-১১ হাজার বছর আগে পর্যন্ত বজায় ছিল— অর্থাৎ আমাদের বর্শাবাজের সময়ের শিকারে নিহত বল্গা হরিণের অনেক হাড়ও প্রত্নতত্ত্ববিদের কাছে ধরা পড়েছে।

আরেন্সবার্গের শিকারের নমুনা এভাবে পাওয়া গেলেও এখানকার তাঁবুতে বাস করা মানুষের কোন নিদর্শন কিন্তু পাওয়া যায়নি। কিন্তু ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে বল্গা হরিণ শিকারের অন্য জায়গার কাছে তা পাওয়া গিয়েছে। প্যারিসের কাছে পর্বতে ঘেরা জায়গায় ৫০টি পৃথক তাঁবু ক্যাম্প এলাকার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে ওই একই সময়ের। পাথরের হাতিয়ার এখানে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, বর্শার ও তীরের অগ্রভাগ সহ। তবে এর তিনটি ক্যাম্প অঞ্চলে ছাড়া বাকিগুলোতে উদ্ভিজ নিদর্শন যেমন তীরের কাঠি ইত্যাদি পাওয়া যায়নি। ভাগ্যক্রমে ওই তিনটা ক্যাম্প সীন নদীর বানের এলাকায় অবস্থিত হওয়াতে এখানকার নিদর্শনগুলোর প্রতি বছর বানের পানিতে আসা পলির দ্বারা ঢাকা পড়েছে। এভাবে মিহি পলির বহু স্তরের নিচে আটকা পড়ে বায়ুশূন্য থাকাতে সব জৈব নিদর্শন সহ সেই ক্যাম্প জীবনের অনেক নিদর্শন অবিকৃত পাওয়া গিয়েছে— কাঠের অংশ, হাড়, ক্যাম্প-আগুনের আশপাশের জিনিস সব। একটি ক্যাম্পে একই সময়ের কিছুদূর পর পর পাঁচটি আগুন ও তার আনুসঙ্গিক পাওয়া গিয়েছে যাতে মনে হয় পাঁচটি পরিবারের ক্যাম্প পড়েছিলো ওখানে। প্রত্যেকটিতে কাটাকুটি করা বল্গা হরিণের হাড় ওখানকার ভোজের কথা মনে করিয়ে দেয়। হাড়গুলো এমন অবিকৃত যে পাঁচটি জায়গার কিছু কিছু হাড়ের বিভিন্ন টুকরা কাছাকাছি এনে মিলিয়ে দেখা গেছে যে একই হরিণের একই হাড়ের একটি অংশ এই আগুনে, অন্য একটি অংশ অন্য আগুনে— এমন দেখা গেছে। এতে মনে হয় একই হরিণের মাংস সব পরিবারকে সুন্দর ভাবে ভাগ করে দেয়া হয়েছিলো। আবার প্রমাণ পাওয়া গেল যে এরকম শিকারি-সংগ্রাহক সমাজের একটি বড় শক্তি ছিল খাবার ভাগ করে খাওয়ার নিয়ম।

প্যারিসের কাছে আর একটি এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননে একটি ক্যাম্প অঞ্চল থেকে পাথরের হাতিয়ার তৈরির সময় এর ফলশ্রুতিতে চূড়ান্ত হাতিয়ার, আধা-তৈরি, বাতিল হওয়া, ফেলে দেয়া পাথরকুচি, অবশিষ্ট মূল পাথর ইত্যাদির যে বড় স্তুপ গড়ে ওঠে হুবহু তার সন্ধান পাওয়া গেছে। ফলে সেদিনের পাথরের হাতিয়ার তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটিই বোঝা গেছে। পাথরের ওপর প্রত্যেকটি আঘাতে হাতিয়ার তৈরিকারীর মনে কী উদ্দেশ্য কাজ করেছে তাও এ সবের মাধ্যমে ফুটে ওঠেছে। ক্যাম্পের বাইরে আগুনের পাশে বসে ওরা কী ভাবে ওগুলো তৈরি করছিলো, গ্রহণ করছিলো, ফেলে দিচ্ছিলো সেই দৃশ্যগুলোই যেন এসব গবেষণার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠেছে।

বল্গা হরিণ শিকারি ছোট ছোট দলে বিভক্ত ওই মানুষগুলো সেদিন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য, তথ্য বিনিময়ের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিত। এর একটি প্রমাণ হলো সে সময়ের কিছু সামুদ্রিক শঙ্খের ফসিল পাওয়া গেছে প্যারিসের কাছের এবং লোর উপত্যাকার জন বসতে— একটি উপকূল থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে, অন্যটি ৩৫০ কিলোমিটার দূরে যেখানে থেকে শঙ্খগুলো কেউ না কেউ নিয়ে গেছে। সে সময় বিশাল জায়গায় অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুটিকতেক ছোট দলের পক্ষে এটি কোন সহজ বা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলনা। শঙ্খ বা শাঁখ জিনিসটি নেহাত অলঙ্কারে ব্যবহারের জিনিস, জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস নয়। তবুও হয়তো উপহার হিসেবে, বিনিময়ের জন্য বা অন্য কোন কারণে এই দীর্ঘ দূরত্ব প্রতিকূল পরিবেশে ওরা অতিক্রম করেছে। একই ভাবে উত্তরে রাইন অঞ্চল থেকে দক্ষিণে আল্পস ও দানিয়ুব পর্যন্ত

প্রত্যেকটির চিহ্নিত উৎস থেকে কোয়ার্টাজ, এম্বার ইত্যাদি আলঙ্কারিক জিনিস নিয়ে যাওয়াটি প্রত্নতাত্ত্বিক খননে দেখা গেছে।

শরতে উত্তরের বল্গা হরিণ শিকারিদের দক্ষিণের একটি শীতকালীন আবাস প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবিস্কার করেছেন গোনের্সডর্ফে, ১৯৫৪ সাল থেকে শুরু করে যেখানে দীর্ঘ প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে। সেখানে বাড়ির, ঘরকন্নার নানা নিদর্শন ছাড়াও আবিস্কার হয়েছে বেশ কিছু পাথরের ওপর খোদাই করা চিত্র— অধিকাংশ নারীর ছবি এবং বিভিন্ন জীবের ছবি। অন্যভাবে জানা গেছে এখানকার শীতকালীন বড় শিকারের মধ্যে প্রধান ছিল বন্য ঘোড়া। তাই ঘোড়ার ছবি স্বাভাবিক ভাবেই প্রচুর এসেছে। কিন্তু প্রচুর ম্যামথের ছবিও ওরা এঁকেছে যেই প্রাণীটা ও সময় ওই দক্ষিণের অঞ্চলে ছিলনা বলেই বলা যায়। স্পষ্টত অনেক উত্তরের হিম শীতল অঞ্চলের ম্যামথের অভিজ্ঞতা ওরা এখানে কাজে লাগিয়েছে। তাছাড়া পাখি, সীল, পশমী গণ্ডার ইত্যাদির ছবিও রয়েছে ওই সব চিত্রকর্মে। সে সময়ে সমাজে নারীর বিশেষ ভূমিকাই হয়তো নারী-চিত্র আঁকতে প্রাচীন শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করেছে, বিশেষ করে ওই শীতকালীন আশ্রয়ে পুরুষ যখন বিরল শিকারের সন্ধানে বাইরে ঘুরতো নারীই অন্য যাবতীয় কাজ করতো, সমাজটিকে আগলিয়ে রাখতো। এরকম একটি পাথরের ওপর খোদাই করা পাশাপাশি চার জন নারীর ছবি দেখা যাচ্ছে। মোটেই হুবহু ছবি নয়, খুবই বিমূর্ত ঢঙের ছবি শুধু বক্র রেখার টানেই বোঝা যাচ্ছে যে এরা নারী। দেহের ভঙিমায় বোঝা যাচ্ছে ওরা কর্মরত। ওদের একজনের পিঠে বাঁধা রয়েছে দেখা যাচ্ছে একটি শিশু— তাও রেখার টানে বিমূর্ত। ভাবতে অবাক লাগে যে এতদিন আগের শিল্পী কেমন করে শুধু কতগুলো রেখার টানে এতটা কথা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

হাজার খানেক বছর ব্যবধানে পশ্চিম ইউরোপের বরফ যুগের একেবারে শেষের দিকের ম্যাগডেলেনিয়ান রীতি থেকে এই চিত্রশিল্প অনেক সরে গেছে। তখন সবই ছিল অনেক বেশি বাস্তবানুগ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের খুটিনাটিতে অবাক হবার মতো— তা সে ছবিই হোক, ভাস্কর্যই হোক, অল্প গভীর খোদাইয়ের মাধ্যমে রিলিফই হোক। এক হাজার বছর পর এর সব মাধ্যম রয়েছে, কিন্তু কাজগুলো দ্রুত করা— অল্পকিছু রেখায় এক টানে দেখানো, বাস্তবানুগ ও বিস্তারিত হবার বদলে বিশেষ কিছু দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বিমূর্ত প্রকাশে।

পাথরের বর্শাগ্র

গোনেসডর্ফে পাথরে আঁকা চার
নারীর বিমূর্ত ছবি

সিরিয়ার আবু হোরাইরার যাযাবর ঃ ১২ হাজার বছর আগে

পূর্বপুরুষদের ছিল এখানে সুন্দর স্থায়ী বসত, অথচ এখন প্রতিকূল পরিবেশে জীবিকার সন্ধানে মাঝে মাঝে ঠাঁই বদলাতে হয়। তাই দুঃখ করেই ওর নাম রাখা হয়েছিলো যাযাবর। অবশ্য সেই সুবাদে তারা নানা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে ওদের বাছাই করা মূল্যবান শস্যবীজ। সৃষ্টি হচ্ছে কৃষির সম্ভাবনা।

আবু হোরাইরা জায়গাটি ইউফ্রেটিস নদীর একেবারেই কাছে। বার হাজার বছর আগের এখানকার দৃশ্য দেখছি। নদী তীর থেকে শুরু হওয়া তৃণভূমি অদূরে লাল বেলে পাথরের পাহাড়ে বিস্তৃত হয়েছে, যেখানে এখনো খুঁজলে হাজার দুয়েক বছর আগের পাথরের গায়ে কাটা স্থায়ী গ্রামের কিছু চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু সে সব পুরানো দিনের স্মৃতি এখন লোকমুখে শুধু কিংবদন্তীর গল্পের মত শোনা যায়। এ জায়গায় এক সময় চমৎকার আবহাওয়া ছিল, তৃণভূমি ছিল অত্যন্ত সুজলা সুফলা। ইউফ্রেটিসের পানি একে এমন উর্বর প্রকৃতির দেশ করে তুলেছিলো যে বড় বড় তৃণভোজী পশুর সমারোহে এটি ভরপূর ছিল। আর এর সুযোগ নিয়ে শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ বংশ পরম্পরায়ে থাকার জন্য গড়ে তুলেছিল বেশ ঘনবসতির গ্রাম। তাদের বাড়ির বন্য বাগানে ঘন হয়ে ফলতো নানা রকম বন্য শস্য— বার্লি, গম এবং অপেক্ষাকৃত নতুন রাই। এ জায়গা থেকে শুরু করে একেবারে দক্ষিণে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ কিনারা পর্যন্ত পুরো মধ্যপ্রাচ্যে কম বেশি এরকম একটি অবস্থা বিরাজ করেছে তখন। একই ভাবে স্থায়ী গ্রামে একই রকম কালচারের অধিকারী শিকারি-সংগ্রাহক মানুষের বেশ রমরমা দিন গেছে। কিন্তু ১২ হাজার বছর আগের এই দিনে ওই সব নেহাত অতীত।

এখন আবু হোরাইরায় যে অল্পস্বল্প মানুষ থাকে তারা মৌসুম বিশেষে আসা যাওয়া করে, আসে বেশ দূর দূরান্তের এলাকা থেকে। গাছের কাণ্ড ও ডালপালার কাঠামো আর চামড়ার আচ্ছাদন দিয়ে অস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করে নেয়। এখানে এখন গত বহু বছর ধরে চলছে জলবায়ু পরিবর্তনের পালা— আবহাওয়া ক্রমেই

শীতল আর শুষ্ক হওয়ার দিকে যাচ্ছে। ঘাস আর গাছপালার সতেজতা কমে যাচ্ছে। ছাপিয়ে ওঠা নদীর কল্যাণে চারিদিকে যে জলাভূমিগুলো ছিলো এখন সেগুলোও প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার মত। ফলে শিকারের বড় অভাব। যে তৃণভূমিতে এক কালে গাজেল হরিণ গিজ গিজ করতো এখন একটি হরিণ শিকার করতে প্রাণান্ত হতে হয়। তবুও নদীর অববাহিকায় উর্বর মাটিতে সঠিক মৌসুমে বন্য শস্যের ফসলটি এখনো মন্দ হয়না, তাই আশপাশের শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ এখনো এখানে এসে অস্থায়ী ডেরা বাঁধে। এমনি একটি পরিবার হলো যাযাবরদের পরিবার। যাযাবর ওরা আসলে সবাই— সবার জীবনই যাযাবরের জীবন। কিন্তু তবুও বাবা-মা এই ছেলেটির নাম রেখেছে যাযাবর। হয়তো অতীতের সোনালী যুগের স্থায়ী আবাসের উপাখ্যানগুলো তাঁদেরকে আজকের যাযাবর কথাটির ওপর গুরুত্ব দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। যাযাবর এখন তার ভরা যৌবনে— নিজের বৌ ও একটি শিশু পুত্র রয়েছে, তাছাড়া মা বাবা ভাই বোন নিয়ে তার আট জনের সংসার। আজকের ঘুরে বেড়ানো পরিবারগুলোর তুলনায় এ সংখ্যাটি সামান্য বেশি বটে, তবে এক কালে এখানকার স্থায়ী গ্রামে পরিবার হতো আরো অনেক বড়; এখানকার মুরব্বিদের কেউ কেউ বলেন যে এখানকার জনসংখ্যা লাগামহীন ভাবে বেড়ে চলেছিলো বলেই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী গ্রামের জীবনযাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি, খাদ্য সংকট দেখা দিয়ে ওই পরিস্থিতি বদলে গেছে।

যাযাবরকে এখন বছরের কোন সময় পরিবার নিয়ে কোথায় যাবে তা হিসেব করে চলতে হয়। জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্রে এর ছাপ পড়েছে— তাদের শিকারের পদ্ধতিকে এখন আরো উন্নত হতে হয়েছে, বাড়ির বাগান রচনার কাজকেও। একটি প্রতিকূল জলবায়ুর মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য তাদের সংগ্রাম তীব্রতর হয়েছে। তাদের বিশ্বাস ও আচার-আচরণের ওপরও অনিবার্য ভাবে এর প্রতিফলন ঘটছে। চারিদিকে উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়াতে, দক্ষিণের ও পশ্চিমের অনেক জায়গা প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হওয়াতে, এখন আবু হোরাইরার মত অপেক্ষাকৃত উর্বর স্থানে অস্থায়ী ভাবে আগত পরিবারদের চাপ বেড়েছে; এই বাড়তি প্রতিকূলতার মধ্যেই তাদেরকে নিজেদের চাহিদা মেটাতে হচ্ছে।

এখানকার সমস্যাগুলো একদিনে তৈরি হয়নি, কিন্তু এখন যাযাবরদের মত পরিবারকে তার মূল্য দিতে হচ্ছে। যেমন বহুকাল ধরে একটি অভ্যাস চলে আসছে যে শিকার করার সময় বেছে বেছে সব চেয়ে বড় পুরুষ পশুকেই শিকার করা হতো। সেকালে শিকারের পশু সংখ্যায় ছিল অনেক, তাদের আকারো ছিল বড়। এটি বিশেষ করে গাজেল হরিণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য ছিল, অবশ্য বন্য গরু, বন্য ছাগল ও বন্য শূয়োরের ক্ষেত্রেও কিছুটা ছিল বলা যায়। পুরুষ পশু সব সময় অপেক্ষাকৃত অনেক বড় হয়, এতে একটি শিকারেই অধিক মাংস পাওয়া যায়, তা ছাড়া স্ত্রী পশু শিকার করলে বংশবৃদ্ধি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, পুরুষ পশুর ক্ষেত্রে তা হয়না কারণ বংশ বিস্তার করতে বেশি পুরুষের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু

যে কথা কেউ চিন্তা করতে পারেনি তা হলো বড় সাইজের পুরুষগুলো এক নাগাড়ে শিকার হতে থাকায় বংশবৃদ্ধির জন্য বন্য অবস্থায় যে পুরুষগুলো বেঁচে রইলো তাদের অধিকাংশই হলো ছোট সাইজের পুরুষ। ছোট পুরুষের বংশধররাও হলো ছোট— ফলে পুরুষ-স্ত্রী নির্বিশেষেই তারা বংশ পরম্পরায় ছোট হতে থাকলো। এখন স্বল্প সংখ্যক যে সব পশু শিকারের জন্য রয়েছে সবই ছোট; আর শিকারও করা হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সব পশুকে। কাজেই শিকার পেলেও তার থেকে যথেষ্ট মাংস খাদ্য হিসেবে তখন পাওয়া যাচ্ছে না। অধিক জনসংখ্যা অথচ খাদ্যাভাব বাড়ছে— এটিই হলো আজকের শিকারি-সংগ্রাহকের প্রধান সংকট। খরগোস, গিরগিটি, শেয়াল ইত্যাদি ছোট শিকারের ওপর যে নির্ভর করবে তারও সুযোগ কমে গেছে। জলাশয় শুকিয়ে যাওয়ার ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ খাবারও কমে গেছে।

বসবাসের স্থায়ীত্ব না থাকায় যাযাবর পরিবারের জীবন এমনিতেই এখন যথেষ্ট চাপের মুখে রয়েছে। পরিবারের সবাই সকাল-সন্ধ্যা ব্যস্ত থাকে জীবিকার সন্ধানে। যখন পথে পথে থাকে তখন তো অনেকটাই সঙ্গে নেয়া সংরক্ষিত খাবারের ওপর নির্ভর করতে হয়। পুরো অঞ্চলটাতেই প্রকৃতি এমন নিষ্ফলা যে আগেকার দিনের বিচরণশীলদের মতো পথের মধ্যেই যেতে যেতে অফুরন্ত শিকার-সংগ্রহের সুযোগ আর নেই। যখন তাদের অস্থায়ী গন্তব্যে পৌঁছে গেলো তখনো আশ্রয় তৈরি করা ছাড়াও অনেক পরিশ্রমের কাজ থেকে যায়। গন্তব্যগুলো হয় সেখানেই যেখানে ওই বিশেষ মৌসুমে তুলনামূলকভাবে একটু বেশি শিকার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, বন্য ফলমূল সংগ্রহের কিছু হলেও সুযোগ রয়েছে সেখানে। তাছাড়া যেখানে অন্তত একটি পুরো মৌসুম কাটানোর সম্ভাবনা থাকে সেখানে দ্রুত একটি বন্য শস্য বাগান সৃষ্টির ওপর তারা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেয়। এদিক থেকে পরিবারের সবাই যেন বন্য বাগানে কাজের এক এক জন বিশেষজ্ঞ— কঠিন পরিস্থিতি তাদেরকে এ কাজে দক্ষ করে তুলেছে। যাযাবর নিজে কৈশোর কাল থেকেই একজন দক্ষ চাষী— বাবা-মার থেকে এর সকল খুঁটিনাটি সে সব সময় শুনে এসেছে, হাতেকলমে করে এসেছে; কীভাবে তৃণভূমিতে বন্য শস্য চিনতে হয়, কখন সেখানে কীভাবে কাস্তে চালাতে হয়। আরো শিখেছে নিজেদের বাগানে শস্য ছিটিয়ে যে চারা গজানো হয় তাকে নিড়িয়ে, আগাছা পরিস্কার করে, পানি দিয়ে, কিছু কিছু পাতলা করে দিয়ে কীভাবে যত্ন নিতে হয়।

এও ওই বন্য শস্যই, কিন্তু বন থেকে এটি পেতে চাইলে সংগ্রহে যে সময় লাগে তাতে পরিবারের ক্ষিধে মেটেনা— এই বন্য বাগানে এক জায়গা থেকে পাওয়াটিই ভরসা। ওখানে হাতের কাজে, পরিশ্রমের কাজে যাযাবর নেতৃত্ব দেয় বটে, তবে শস্যের আসল যাদুকর হলো যাযাবরের বাবা ও মা। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাদেরকে শস্যের সূক্ষ্ম সব ভাবসাব বুঝতে শিখিয়েছে; মাটির সঙ্গে, আবহাওয়ার সঙ্গে, তার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে শিখিয়েছে। এই জ্ঞান তারা দু'জন তাদের

ছেলেমেয়েদেরকে, বৌদেরকে এমন কি শিশু নাতিকে পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করে দেয়ার চেষ্টা করছে। জীবন সংগ্রাম কঠিন হওয়াতেও প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়াতে পরিবারের সবার মধ্যে এই সক্ষমতাগুলো জন্মানো এখন খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

যখন একটি জায়গাতে অস্থায়ী বসত করে বছর খানেক অন্তত থাকে যাযাবরদের দৈনন্দিন জীবনটি লক্ষ্যনীয়। সপ্তাহের অন্তত দু-একটি দিন যাযাবর তার ভাই বা অন্য আত্মীয় কয়েকজনকে নিয়ে শিকারের খোঁজে যায়, বাড়ির মেয়েরা ও যায় ফলমূলের সন্ধানে। সব সময় আশানুরূপ না হলেও ওখান থেকে যা খাবার আসে দৈনন্দিন তার ওপরেই নির্ভর করতে হয়। তবে এই নির্ভরতা বেশি হয় চাষের বাগানের শস্য যখন তখনো পেতে বাকি, অথচ জমানো আগের মৌসুমের শস্যও ফুরিয়ে এসেছে তখন। এছাড়া অন্য সময় খাবারের জন্য ওদের দুশ্চিন্তা কম। মৌসুম অনুযায়ী অন্তত কিছু গম, কিছু বার্লি কিংবা মটরশুটি বা ডাল তাদের জুটবেই। এজন্যই যতদিন পারে এক জায়গায় থেকে বন্য শস্যের ওই নিজের বাগান গড়ে তোলাটি পরিবারের জন্য খুব জরুরী। তাই যাযাবর, আর তার ভাইবোনকে অধিকাংশ সময় দেখা যায় সারা দিন নিজেদের বাগানের পরিচর্যা করতে। নিজের খাবার নিজে ফলাবার এক রকম সক্ষমতা তাদের হয়েছে।

এই সক্ষমতার একটি দিক হচ্ছে চাষের জন্য উপযুক্ত হাতিয়ার তৈরি করতে পারা। গাছের ডাল দিয়ে, হাড় দিয়ে, শিং দিয়ে এবং পাথর দিয়ে বনকাটা গাছের শিকড় উপড়ে ফেলে জমি তৈরি, করার মাটি ঝুরঝুরে করার, নিড়ানি দেবার যে হাতিয়ারগুলো এখন ওরা তৈরি করছে তা আগেকার থেকে উন্নত। কাস্তের ব্যাপারেও কথাটি সত্য। শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাটিও এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগেকার স্থায়ী গ্রামে যা সম্ভব হতো এখন তা আর সম্ভব হচ্ছেনা। এই শস্য শুধু বর্তমান অস্থায়ী আবাসেই তাদের উদরপূর্তি করবেনা, এই আবাস ছেড়ে যখন পথে বেরিয়ে যাবে, যখন দূরে নতুন আবাস গড়বে তখনো অনেক দিন চলতে হবে এর ওপর নির্ভর করে। সে কথা মনে করেই নানা আঁশের বোনা বড় থলে, চামড়ার ছোট থলে, ঝুড়ি ইত্যাদিতে শস্য সংরক্ষণের আয়োজন করে তারা।

তবে এ সবের মধ্যে নিজেদের এক রকম অলক্ষ্যেই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভবিষ্যৎ রচনা করে চলেছে ওরা, শুধু তাদের পরিবারের জন্য নয়, অনাগত পুরো মানব জাতির জন্যই। এটি হলো তারা একটু একটু করে শস্যের উন্নতি সাধনও করছে। যে শস্যের চাষ তারা করছে তার সবই বন্য জাতের, ফলে এর ফসল খুব কম, আর এর আচরণও সুবিধাজনক নয়। বিশেষ করে পাকার মুহূর্তেই খোসা ফেটে গিয়ে মাটিতে ঝরে পড়ার অভ্যাসটি খুবই অসুবিধাজনক। বার্লি, গম, রাই, মটরশুঁটি, ডাল সব কিছুর ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি ঘটছে। অবশ্য এদের প্রত্যেকটিতে ব্যতিক্রমী অল্প কিছু শস্য সব সময়েই ওই বন্যদের মধ্যেই পাওয়া যায় যেগুলো পাকার পরেও অক্ষত থাকে— কিন্তু সেগুলো খুবই অপ্রতুল। তাই যাযাবর পরিবার

সব সময় বাগানে নজর রাখে যাতে পাকার ঠিক সময়টির আগে আগে হরেদরে ওই শস্যের সব গোছা কাস্তে দিয়ে কেটে আনা যায়। এর মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু ফেটে মাটিতে ছড়িয়েও গেছে— সেগুলো থেকে পরের বারের শস্য পাওয়া যায়। এরপর এই বসত ছেড়ে দূরে অন্য বসতে গিয়ে যখন নতুন জমি চাষ করবে তখন লাগাবার জন্য বীজ শস্য তারা কেটে আনা গোছা থেকেই বেছে নেয় গোছা ঝেড়ে শস্য আলাদা করার পর। ওই বাছাই করার সময় না ফেটে শক্ত ভাবে লেগে থাকা শস্যগুলোকে তারা বিশেষ ভাবে পছন্দ করে— কারণ এগুলো পরবর্তী শস্য কাটার ক্ষেত্রে তাদেরকে ফেটে ঝরে যাওয়া থেকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখবে।

তাছাড়া আরো বেশ কিছু গুণাগুণকে ওরা গুরুত্ব দেয়। কিছু শস্যের দানা অপেক্ষাকৃত পুরুস্টু থাকে, ওগুলোই বাছাই করা হয় বেশি। ওই যে নিড়ানি দেয়ার, আগাছা বাছার, পোকা বাছার, পানি দেয়ার যত্ন ওরা করেছে এক একটি শস্যের, এর সব নমুনা কিন্তু তাতে সমান ভাবে সাড়া দেয়নি। কোন কোনটির ছরায় এক সঙ্গে অনেক শস্য এসেছে, অন্যগুলোর ছরা বড় দুর্বল। প্রতিকূল আবহাওয়ায় এই ব্যাপারটি যেন আরো বেশি বেশি ঘটছে। যত্নে যেগুলো সাড়া দিতে পারছে তারাই যেন হৃষ্টপুষ্ট ও সংখ্যায় বাড়ছে; অন্যগুলোর অবস্থা সুবিধার নয়— তাদের টিকে থাকাই দায়। যাযাবর পরিবারের সবারই চোখ কিন্তু ভালগুলোকে বাছাই করার ব্যাপারে খুবই তীক্ষ্ণ। অভিজ্ঞতা ও বড়দের দেয়া প্রশিক্ষণ তাদেরকে একাজে দক্ষ করে তুলেছে।

ফলে বীজশস্য হিসেবে ছোট ছোট চামড়ার থলেতে যেগুলোকে সযত্নে আলাদা করে তুলে রাখা হলো তা যেন এক সোনার খনি— সব ভাল ভাল গুণের শস্য, অন্তত কিছুটা হলেও অন্যগুলোর চেয়ে ভাল। ওরা যদি বর্তমান বাগানেই এগুলো লাগাতো তা হলে খুব একটা কিছু লাভ হতোনা। কারণ এই অল্প কিছু বাছাই করা বীজের তুলনায় এখানে আগের ফসল থেকে ঝরে পড়ে আছে অনেক বেশি বীজ— অসংখ্য মামুলি শস্যবীজ, যাদের ভীড়ে বাছাইকরাগুলো পাত্তাই পাবেনা। কাজেই পরের ফসল আগের ফসলের মতো একই আসবে। কিন্তু এ বীজ বাছাই করা হয়েছে পরবর্তী গন্তব্য স্থানে গিয়ে নতুন তৈরি করা জমিতে লাগাবার জন্য। সেখানে এই বাছাই করা বীজ থেকে বাছাই করা ফসল হবে। ওখান থেকে আবার বাছাই করা হবে পরবর্তীতে আরো অন্যত্র লাগাবার বীজ— সেই বাছাইয়ের ফল হবে আরো ভাল। তাদের মনের মত করে শস্য পাওয়ারও ব্যাপার এটি— অর্থাৎ কিনা এ যেন বন্য শস্যকে নিজের মত করে পোষ মানিয়ে নেয়া। ধীরে ধীরে এমন বীজ পাওয়া যা পাকলে ফেটে যায়না, পাকার আগে যথেষ্ট পুষ্ট হয়, ছরার মধ্যে অনেকগুলো ধরে, অথচ পাকতে বেশি দেরীও করেনা। শেষ পর্যন্ত এই যে শস্য পাওয়া গেল এর সঙ্গে মূল বন্য শস্যের অনেক তফাত হয়ে গেলো। বন্য ভাবে এগুলো হয়তো প্রকৃতিতে তেমন ফলবেওনা, ওগুলোর সঙ্গে মিশে বংশ বৃদ্ধিও করবেনা; কিন্তু তাতে কী, এ শস্য যাযাবরের মত

চাষী পরিবাররা সব সময় চাষ করেই ফলাবে। তাহলেই ওরা পাবে কৃষিজাত শস্য।

কিন্তু হায় পোষা কুকুর পাওয়ার মতই পোষা শস্য পাওয়ার ব্যাপারটিও অতি অতি ধীর গতির ব্যাপার। তাই যাযাবর পরিবারের দশ-বিশ পুরুষ আগে থেকেই একাজ একটু একটু করে এগোলেও এখনো সত্যি সত্যি কৃষিজাত শস্য পেতে অনেক বাকি। এখনো যা তারা চাষ করছে তার মূল প্রকৃতি বন্য শস্যের মতই, তবে এই দিকে সেই দিকে কিছু কিছুটা তাদের মনের মত হচ্ছে মাত্র। তবে ওতেই তাদের অনেক লাভ। তাই ওই চামড়ার ছোট ছোট থলেতে সংরক্ষণ করে রাখা বাছাই করা বীজগুলো যাযাবর পরিবারের কাছে তো বটেই এই পুরো অঞ্চলের সব মানুষের খুব প্রয়োজন। এ যেন এক মূল্যবান ধন। আবু হোরাইরা অঞ্চলে অধিকাংশ সময় যাদের বাস তারা এদিক থেকে একটু বেশি ভাগ্যবান কারণ এখানকার মাটি অপেক্ষাকৃত উর্বর— তাদের বীজও ভাল হয়। নানা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিনিময়ের জন্য বীজের একটি দারুণ মূল্য রয়েছে। তাছাড়া যাযাবর ও তার পরিবার যে রকম কুশলতার সঙ্গে বিভিন্ন শস্যের উন্নত বীজ গজাতে ও বাছাই করতে পারছে তা সবার পক্ষে সম্ভবও হয়না।

যাযাবরের পূর্বপুরুষরা যখন আবু হোরাইরার স্থায়ী বাসিন্দা ছিল তখন এখানকার গ্রামের বনেদী পরিবারগুলোর যথেষ্ট বনেদিপনা ছিল, তাদের ঘরে ঘরে ঝিনুক, শামুক, শাঁখ, হাড়ের আকর্ষণীয় অলঙ্কার তৈরির ব্যবস্থা ছিল। আরো আকর্ষণীয় সব অলঙ্কারের উপাদান তারা বিনিময় করে আনতো সমুদ্রের কাছের মানুষের কাছ থেকে। তরুণ-তরুণীরা বিশেষ করে নানা অলঙ্কারে সাজতে পছন্দ করতো। তবে অলঙ্কারের আরো বড় ব্যবহার হতো মৃতকে কবর দেয়ার সময়— তার মাথা, গলা, হাত অলঙ্কারে অলঙ্কারে মুড়িয়ে দেয়া হতো। তরুণ তরুণীরা এখনো অলঙ্কার পছন্দ করে, কিন্তু তাদের নিত্য পরিশ্রমী জীবনযাত্রা সব সময় যেটি হতে দেয় না। এই রকম জীবনযাত্রায় বনেদিপনার সুযোগ যে তেমন নেই তার প্রমাণ এখন আর ওভাবে সজ্জিত করে কাউকে কবর দেয়া হয়না। আরো বড় কথা আগে পুরো পরিবারের নানা সদস্যকে কবর দেয়ার কবরখানা ছিল যেখানে বেশ আচার অনুষ্ঠান করে সবাইকে আলাদা কবর দেয়া হতো। যাযাবররা এখনো তাদের অনেক আগের পূর্ব- পুরুষদের এমনি কবরখানা দেখে থাকে। কিন্তু তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে মৃতদের এক এক জনকে আলাদা আলাদা কবর না দিয়ে একটি সাধারণ কবরে শায়িত করতে হয়েছে। অস্থায়ীভাবে বসবাস করে বলে এর স্থান নিয়েও অনিশ্চয়তা থাকে। যাযাবরের বাবা প্রায়ই রাতের খাবারের পর পুরানো দিনের গল্প করেন— বিশেষ করে তাঁর জানা পূর্বপুরুষদের কথা। ওদের নিয়ে তাঁর অনেক স্মৃতি আছে। কিন্তু ওদের কবর নিয়ে তাঁর তেমন উচ্ছাস নেই, কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিকমত মনেও করতে পারেননা কবর কোথায়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন ও জীবনযাত্রার সংকট মানুষের কালচারে এবং আচার অনুষ্ঠানে বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

অলঙ্কার ইত্যাদির অর্থনৈতিক মূল্যায়নেও কিন্তু যাযাবরদের কাল আর তার পূর্বপুরুষদের কালে বড় পার্থক্য রয়েছে। আজ যে মৃতদেহের সঙ্গে শামুক, ঝিনুক, শাঁখের অলঙ্কার ব্যবহার করা হচ্ছেনা সেটি সেগুলোর অভাবের কারণে নয়, বরং সেগুলোর অবমূল্যায়নের ফলে। আগে যখন স্থায়ী ভাবে সবাই আবু হোরাইরাতে থাকতো বাইরের কোথাও তাদেরকে বড় একটি যেতে হতো না— অলঙ্কারের সামগ্রীগুলো গ্রামের মধ্যে কী আছে , অল্প বিস্তর কী এলো, আর কোথায় গেলো তার পর একটি নিয়ন্ত্রণ তাদের থাকতো। ফলে এগুলোর মূল্য রক্ষিত হতো। এখন যাযাবরদের ভ্রমণের জীবনে শামুক-ঝিনুক শাঁখ, কড়ি বাইরে থেকে ইচ্ছেমত আনা নেয়া করা যায়। ফলে নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে এগুলো মূল্য হারিয়েছে। এখন বরং তার জায়গায় কৃষি পণ্যের ও ভাল হাতিয়ারের মূল্য বেড়েছে।

আবু হোরাইরার মানুষরা যখন নতুন গন্তব্যে যায় তখন মাঝে মাঝে যাত্রা পথের কোন কোন মিলন কেন্দ্রে অন্তত কয়েক দিনের জন্য যাত্রা বিরতি করে। এই মিলন কেন্দ্রগুলো খবরাখবর আদান প্রদানের জায়গা ও একটি বড় বাজার হিসেবে কাজ করে। কয়েক বছর আগে যাযাবররা যখন আবু হোরাইরা ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছিল তখন তাদের লটবহর দেখলে বেশ হাসি পেত। অন্য জরুরী জিনিসের সঙ্গে তারা বহন করে নিয়ে যায় সেই বীজের থলেগুলো— কোনটি হাতে, কোনটি কাঁধে বা কোনটি কোমরে বাঁধা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই বীজ থেকেই পরবর্তী স্থানে চাষের জমি সুফলা হবে। মাঝখানে ওই মিলন কেন্দ্রের বাজারে যখন তারা সপ্তাখানেক কাটিয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো একটু বিশ্রাম নেয়া, আর ওখানে তখন নানা দিক থেকে আসা অন্য মুসাফিরদের সঙ্গে জিনিসপত্র বিনিময় তখন অন্যান্য নানা জিনিসের বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে বীজও বিনিময় হয়েছে— অথবা বীজের বদলে অন্যান্য সামগ্রী। যার মটরশুটির বীজ বেশি আছে সে নিয়েছে সেই বাড়তি বীজ দিয়ে গমের বীজ। তাছাড়া যখন ওই মুসাফিররা শুনেছে যে এই বীজ এসেছে ইউফ্রেটিস তীরের আবু হোরাইরা থেকে তখন তার বাড়তি কদর হয়েছে বটে— কারণ এগুলো যাযাবরদের মত অভিজ্ঞ চাষীদের নিপুণ বাছাইয়ের ফল। যা একদিন নেহাতই বনে বাদাড়ে পাওয়া বন্য প্রজাতির শস্য ছিল ওদের হাতে পরিবর্তিত হয়ে তা হয়ে পড়েছে বিনিময় করার জন্য মূল্যবান বীজ। শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের মধ্যেই এটি যেন কৃষকের জীবনের আভাস পাওয়ার একটি বড় হাতছানি।

* * *

প্রত্নতত্ত্ববিদরা সিরিয়ার আবু হোরাইরা অঞ্চলের একই স্থানে বিভিন্ন যুগের মানব বসতির সন্ধান পেয়েছেন এবং তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে ১৪ হাজার বছর আগে থেকে স্থায়ী গ্রামের সন্ধান পাওয়া গেছে, এবং তখন সেখানে সারা বছর বিশেষ করে গ্রীষ্মের শুরুতে দেদার গাজেল সহ প্রচুর পশু শিকারের সাক্ষ্য পেয়েছেন। প্রাচীন পরাগরেণুর যে উদ্ঘাটন ঘটেছে তাতে ভূমিতে কয়েক রকম বন্য শস্যের রেণু ঘন হয়ে থাকতে দেখা গেছে, যাতে মনে

হয়েছে যে এগুলোর ঘন সংবদ্ধ বাগান রচনা করা হয়েছিলো। আলাদা ঘরে হাতিয়ার আর অলঙ্কার তৈরির কারখানার নিদর্শন আবিষ্কার এবং এক সঙ্গে দশ বার জন বা আরো বেশি মানুষের একই জায়গার কবরে পাওয়া ও তাদের প্রত্যেকের মরদেহে প্রচুর শামুক-ঝিনুক মালার সমারোহ— এসবও স্থায়ী বসত, বনেদী পরিবার, এবং আচার-অনুষ্ঠানের আধিক্য সম্পর্কে বেশ ধারণা পাওয়া যায়।

আবু হোরাইরা এবং অনুরূপ আশে-পাশের আরো কয়েকটি জায়গায় ভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ওই সময়ের প্রায় এক হাজার বছরের মধ্যেকার সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পাওয়া গেছে। পাহাড়ের ঢালে পাথরে গড়া দেয়ালের স্থায়ী বাসস্থানের বদলে পাওয়া গেছে অস্থায়ী আশ্রয় স্থলের আলামত। সেখানে জীবন যাপনের যে নমুনা পাওয়া গেছে তাতে স্পষ্টত অবস্থার অবনতি দেখা গেছে যার সঙ্গে সে সময়ের জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্কও ধরা পড়েছে। অধিক শীত, খরা, সার্বিক শুষ্কতা ও উদ্ভিদহীনতার ছাপ অনেক কিছুর মধ্যে দেখা গেছে। প্রাচীন উদ্ভিদের পরাগরেণুর পরীক্ষায় দেখা গেছে ওই কালে বন্য শস্য ও অন্যান্য উদ্ভিদ বন ও তৃণাঞ্চলে যথেষ্ট বিরল হয়ে পড়েছিল। অন্য দিকে আশ্রয় স্থলে পশু হাড়ের নমুনা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তখন পশু শিকার যেমন একদিকে কমে গেছে অন্য দিকে শিকার করা পশু ক্রমে ছোট হয়েছে। কমবয়সী পশু শিকারে বাধ্য হবার ব্যাপারটিও এ ভাবেই আন্দাজ করা যাচ্ছে।

একই সঙ্গে অবক্ষয়ের ছাপ দেখা গেছে কবর দেয়া মানুষদের কঙ্কাল বিশ্লেষণে। খাদ্যাভাব জনিত বিভিন্ন রোগের চিহ্ন তাতে রয়েছে, শরীরের উচ্চতাও বেশ খানিকটা কমে গেছে। পারিবারিক আনুষ্ঠনিক কবরখানার অভাব, তাতে অলঙ্কারে মুড়ে কবর দেয়ার রীতি আর না থাকার বিষয়টিও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্পষ্টত জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানেও অনিবার্য ভাবে পরিবর্তন এসেছিলো।

ইতিবাচক দিক থেকে একটি বিষয় প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন তা হলো আবু হোরাইরাতে বন্য রাই শস্যের থেকে কিছুটা উন্নত রাই বীজের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর থেকে মনে হয়েছে চাপের মধ্যে থাকা মানুষ অন্তত এই শস্যটিকে পোষ মানাবার কাজে এগিয়ে গিয়েছিলো। যদিও অন্য শস্যের ক্ষেত্রে এমন পোষ মানানো বীজ পাওয়া যায়নি, মনে করা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি ঘটা শুরু হয়েছিলো। সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানীরা বর্তমানের বন্য শস্য থেকে বাছাই করে পুনরায় ভিন্ন জায়গায় সেগুলো লাগিয়ে এবং বেশ কিছু প্রজন্ম ধরে একই ভাবে তা করে গিয়ে উন্নত ও কৃষক বান্ধব শস্যজাত পেয়েছেন। তাই মনে করার কারণ আছে যে ১২ হাজার বছর আগে আবু হোরাইরার শিকারি-সংগ্রাহক মানুষরাও তাদের যাযাবর জীবনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার নতুন জমিতে বীজ নিয়ে গিয়ে নিজেদের অজান্তে এই একই কাজ করেছিলো। উন্নত পোষমানা রাই শস্যের সৃষ্টি খুব সম্ভব এ ভাবেই হয়েছে। এ ভাবেই দুর্দিনের চাপে শিকারি-সংগ্রাহক মানুষদের ভেতরেই ভবিষ্যতের কৃষিজীবী মানুষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

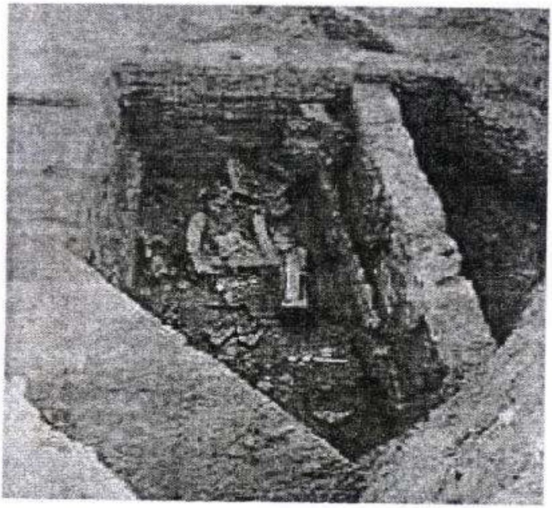

আবু হোরাইরার খনন

আবু হোরাইরার ভাল বাড়ির নক্সা (পুনর্নির্মাণ)

ইংল্যাণ্ডের স্টার ক্যারের অগ্নি ঃ
১১ হাজার বছর আগে

প্রতি গ্রীষ্মে হ্রদের পাড়ে ক্যাম্পিঙের জীবন যাপন করে ওরা। কাছের বনে যেমন শিকার চলে, তেমনি চলে হ্রদের পাড়ের ঝোপঝাড়েও; সেই সঙ্গে হ্রদে মাছ ধরা। কিন্তু সবার আগে এজন্য ক্যাম্পের দিকে জংলাগুলো আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। অগ্নির মত মেয়েরা তাতে নেতৃত্ব দেয়।

উত্তর ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ারের স্টার ক্যার জায়গাটি হ্রদের পারে। উত্তরে ও দক্ষিণে অনুচ্চ পাহাড়ের গায়ে বার্চ গাছের বন, এসব গাছের তলায় ঘন হয়ে ঘিরে ধরা ফার্ন ঝোপ। ১১ হাজার বছর আগের গ্রীষ্মে ওখানে সাময়িক ভাবে ক্যাম্প করা মানুষগুলো দৃশ্যটিকে এভাবেই দেখছে। গ্রীষ্মের শুরুতে দক্ষিণের অঞ্চল থেকে ওরা এখানে এসে ক্যাম্প গেড়েছে ওই বার্চবনে আর হ্রদের ধারে ভাল শিকারের আশায়। নানা কারণে বিচিত্র রকমের শিকারের জন্য জায়গাটিকে ওরা খুব উপযোগী মনে করে। শিকারের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলো এখানকার হ্রদের পারের লাল হরিণ। তবে বনে বন্য শূয়োর, রো হরিণ, এল্ক (খুব ভারি ও প্রশস্ত বড় শিংওয়ালা পরে বিলুপ্ত বড় হরিণ), বন্য গরু— এসবও রয়েছে। আবার হ্রদের জলচর পাখিগুলোও খাদ্য হিসেবে খুব লোভনীয়— বুনো হাঁস, পানকৌড়ি, ডুবুরি ইত্যাদি। খোদাই করা গাছের গুড়ির লম্বা ছিপ নৌকায় বসে হ্রদে মাছ ধরার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এসবের টানেই প্রতি গ্রীষ্মের শুরুতে এখানে চলে আসে এ মানুষগুলো।

এদের একটি পরিবারের প্রধান মহিলার নাম অগ্নি। তিন ছেলে আর এক মেয়ের গর্বিতা মা অগ্নির ছেলেরা ইতোমধ্যেই তাদের বাবার সঙ্গে মিলে নানা রকম শিকারে অভ্যস্ত। মেয়েটা ছোট তাই সবার আদরের। ওদের বাবা খুব দক্ষ শিকারি হলেও বাড়িতে একেবারে শান্তশিষ্ট মানুষ— অগ্নির কর্তৃত্বটাই এখানে বেশি করে চোখে পড়ে। অগ্নি সার্থকনামা, কারণ প্রতি বছর এইখানে এসে ক্যাম্প খাটাবার পর প্রথম যে বিরাট কর্মযজ্ঞটি তারা করে তা হলো হ্রদের পারের

ইতোমধ্যে বেয়াড়া রকমে বেড়ে ওঠে শুকিয়ে যাওয়া শণ ও বেত গাছগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তা পুড়ে ছাই করে ফেলা। হরিণের চামড়ার তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্পটিকে কোন রকমে খাড়া করতে পারলেই এ কাজে মনোযোগ দেয় তারা। পুরুষরা যখন তীর-ধনুক ও অন্যান্য হাতিয়ারগুলো তৈরি বা ঠিক ঠাক করার কাজে আর প্রাথমিক খাদ্য যোগাড়ে ব্যস্ত থাকে তখন মেয়েরা এই আগুন লাগাবার দল গঠন করে। আর এ দলের নেতৃত্বে প্রায়ই দেখা যায় অগ্নিকে। কাজটি খুব কঠিন না হলেও বেশ সাবধানতার সঙ্গে এটি করতে হয়।

হ্রদের যেদিকে ক্যাম্পগুলো রয়েছে শুধু সে দিকটায় আগুন দেয়া হয়। হ্রদের কিনারাটি বেশ দীর্ঘ এবং এখানে শুকনা বেত শনের ঝাকড়া অংশটি কম প্রশস্ত নয়। এই পুরো জংলাটি পুড়িয়ে দিয়ে ছাই করে ফেলতে হবে। এমন একটি অদ্ভুত কাজ করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে বৈকি। গ্রীষ্মের শুরুতে যদি একে ছাই করে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া যায় আগামি দু'তিন মাসে হ্রদের কিনারার এই মাটি নতুন উর্বরতা লাভ করবে, আর অনুকূল আবহাওয়ায় তাতে গজিয়ে ওঠবে ইতোমধ্যে লুকিয়ে থাকা বীজ থেকে নানা রকম ঘাসের নতুন কচি অংকুর। এই অংকুর শিগ্‌গির হরিণের জন্য আকর্ষণীয় সাইজের ঘাস হয়ে ওঠবে। হরিণ শিকারের সেটিই হবে মোক্ষম সময়। আসলে বার্চ গাছের বিস্তৃত বনটির চেয়েও অগ্নিদের কাছে লোভনীয় জায়গা হলো হ্রদের এই নিচু পাড়টি, এবং হ্রদটিও। ওই বেত-শনের জংলাটি থাকাতে তাদের ক্যাম্প থেকে হ্রদকে দেখা যেরকম সম্ভব হয়না, তেমনি হ্রদের কিনারায় রাখা তাদের নৌকা পর্যন্ত সরাসরি দ্রুত যেতেও পারেনা ওই জংলার ভেতর দিয়ে। আগুন দিয়ে এটি দূর করলে তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়বে পুরো হ্রদের পাড় আর পুরো হ্রদ।

১১ হাজার বছর আগের ওই দিনে এখানকার সব মানুষই বিশুদ্ধ শিকারি-সংগ্রাহক। শীতে গ্রীষ্মে যেখানেই থাকুক সম্ভব মত শিকারের মাংস, বড়শি বা হারপুন দিয়ে ধরা মাছ, প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা ফল-মূল, শাক- সবজি— জীবিকার তাদের এই একই পথ। কিন্তু স্টার ক্যারের হ্রদের পাড়ে জংলা পুড়িয়ে, পানির ধারের জমি খালি করে ঘাষের অংকুরোদগমের যে সুযোগ তারা করে দিচ্ছে— তাতে ওই শিকারি- সংগ্রাহকের জীবনেও একটি নতুন ধরনের উদ্যোগ কৃষির আভাস মেলে যা— যদিও চাষবাসের ন্যূনতম ছোঁয়া পেতেও তাদের এখনো বহু বাকি।

এদিকে অগ্নি এবং তার লোকজন মশাল হাতে তৈরি। শুকনা ডাল পাতা দিয়ে তৈরি মশাল হাতে যারা রয়েছে তাদের অধিকাংশই নারী— যাদের বলতে পারি অগ্নিকন্যা। অগ্নি তাদেরকে বার বার করে বুঝিয়ে দিয়েছে জংলায় আগুন লাগাবার সময় এবং তারপর কী কী সতর্কতা নিতে হবে। একবার আগুন লাগিয়ে দিলেই জংলাটি নিজে নিজে পুড়ে গিয়ে পরে শুধু ছাই পড়ে থাকবে, ব্যাপারটি ওরকম নয়। বেশ শুকনা বেত ও শনের জংলা হলেও এটি জ্বলে ধিকিধিকি করে—

কখনো এক এক জায়গায় নিভেও যায়। তাই অগ্নিকন্যাদেরকে এটি শাসন করতে হয়— এখানে আধপোড়া বেত ভেঙ্গে দিয়ে, ওখানে পুনরায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে, যাতে আগুন জ্বলতেই থাকে আর দ্রুত হ্রদের পাড়টি উম্মুক্ত হতে থাকে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। আগুন জ্বালাবার পর পর ওখানে তো বটেই যেখানে ওদের তাঁবু সে জায়গা পর্যন্ত ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে, চোখ জ্বালা করে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, ধোঁয়ার কণায় চোখমুখ কালো হয়ে যায়। যারা এর কাছে থেকে কাজ করছে তাদের জন্য আগুনের উত্তাপকেও তুচ্ছ করার মত নয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে ওদের গায়ে তখন তেমন কিছু বস্ত্র নেই; পোষাক মাত্রই চামড়ার তৈরি বলে পূর্ণ পোষাকে থাকা এই উত্তাপে সম্ভবও নয়।

অগ্নিকন্যাদের শুধু আগুনের দিকে খেয়াল রাখলে চলেনা, শিশুদের দিকেও খেয়াল রাখতে হয়। ধোঁয়া, উত্তাপ ইত্যাদি সত্ত্বেও নানা বয়সের শিশুরা তাঁবুর বাইরে এসে এই মজার দৃশ্য দেখছে। যারা বেশি ছোট, চোখ জ্বালা করার কারণে কান্নাকাটি শুরু করেছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় শিশুদের ফুর্তির আরো একটি কারণ আছে। পানির ধারের ওই বেতবনে বাস করে অনেক বন্য জলচর পাখি, খরগোস, লোমবিহীন ভোল ইঁদুর এবং আরো কত কি। ওদের অনেকগুলোর গর্ত, বাসা ইত্যাদি দিব্যি ওখানে ছিল! আগুন আর ধোঁয়ার তাড়া খেয়ে এখন এই ছোট ছোট প্রাণীগুলো সব বের হয়ে এসেছে। ছেলেমেয়েরা মহাফুর্তিতে ওদের পেছনে ধাওয়া করছে। কান্নারত শিশুকে সামলানো যেমন দরকার এসব ছেলেমেয়েরা অসাবধানে দৌড়ের চোটে আগুনের অতিরিক্ত কাছে যেন না যায় সেটি দেখাও জরুরি। অবশ্য যারা একটু বেশি বড় কিশোর কিশোরী তারা ওই সব পলায়নরত প্রাণীদের দু'একটি ধরেও ফেলছে, শিকারও করছে। এত সবের মধ্যে আগুনের দলের নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে অগ্নিকে, ঘরে-বাইরে-আগুনে চরকিবাজি করতে করতে। এবার গরমে স্টার ক্যারে শিকার করতে এসেছে অগ্নিদের যে দল তার সদস্য সংখ্যা জনা তিরিশেকের বেশি হবেনা— পাঁচ ছয়টি পরিবার যারা অগ্নির পরিবারের সঙ্গে নানা ভাবে সম্পর্কিত। গত বহু বছর ধরে ওরা এবং ওদের পরিবার নিয়মিত এখানে এসেছে— কখনো কখনো আরো কিছু পরিবার এসেছে, কখনো আসেনি।

আগুন দেবার পর ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসা ছোট ছোট পশু-পাখি যে পরিমাণ শিকার হয়েছে তাতে এই শুরুর দিনগুলোর ভোজ খারাপ হচ্ছে না। সামনের কয়েক মাস ভাল শিকার, ভাল সংগ্রহ, ভাল দিনের আশায় নানা রকম প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। যারা বনের ভেতরে গিয়েছে তারাও আসলে যতটা না শিকার করছে তার চেয়ে ঘুরে ফিরে দেখছে বনের অবস্থা এখন কী রকম— লাল হরিণের পায়ের ছাপ নানা জায়গায় কেমন দেখা যাচ্ছে, বুনো শূয়োরের দাঁতের আঘাতের চিহ্ন গাছের গুড়িতে কেমন পড়েছে, গাছতলার ফার্নের ঘন বৃদ্ধির মধ্যে শূয়োরের তছনছ করাটি কতখানি দেখা যাচ্ছে ইত্যাদি। এই তথ্যের ওপর নির্ভর করে শিকারের কৌশল ঠিক করা হবে।

যারা বনে যায়নি তারা অন্যান্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক পরিবারই চাচ্ছে একটি ছিপ নৌকা বানিয়ে নিতে— কারণ কেউ না কেউ সব সময় হ্রদে কিছু না কিছু মাছ ধরতেই পারবে। এটি একটি বড় আকারের কাজ— তাই বন থেকে যুৎসই কাঠের গুড়ি যোগাড় করে কেউ কেউ তার মাঝখানটিতে গভীর ও প্রশস্ত করে খোদাই করার কাজে লেগে গেছে। দলের মধ্যে কয়েকজন এই কাজে বিশেষ ভাবে দক্ষ— ওরা বেশ কিছু দিন এ কাজে লেগে রইলো। গত বছরের রেখে যাওয়া নৌকাও কয়েকটি খুঁজে পাওয়া গেল। মাছ ধরার বাকি সরঞ্জামগুলো তৈরি করা কঠিন নয়— ছিপ, বড়শি ইত্যাদি নানা রকম উদ্ভিজ সরঞ্জাম থেকে সহজে তৈরি করা হলো। প্রচুর পরিমাণে যেটি লাগবে তা হলো শিকারের ও অন্যান্য কাজের হাতিয়ার। হাতিয়ারের একটি অংশ পাথরের, বাকি অংশ প্রাণীজ ও উদ্ভিজ বস্তু থেকে। স্টার ক্যারের হ্রদের তীরে ও বনে যে ধরনের শিকার তা বল্গা হরিণের ঝাঁকের মধ্যে শিকারের থেকে বেশ আলাদা। স্টার ক্যারের শিকারের পশু লাল হরিণ, বুনো শূয়োর, যাই হোক না কেন তারা একাকী বা মাত্র কয়েকটি মিলে বিচরণ করে, হঠাৎ হঠাৎ দেখা মেলে। বনে ঝোপের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে তাদের কাছে যেতে হয়। ওই ফার্নের ঝোপের মধ্য দিয়ে হালকা তীর ছুঁড়ে তাকে আহত করতে পারলে হয়তো রক্তের দাগ অনুসরণ করে করে দুর্বল হয়ে যাওয়া পশুটিকে খুঁজে নিয়ে মারতে পারা যাবে। এ ধরনের শিকারের জন্য পাথরের হালকা ও ক্ষুদ্র হাতিয়ারের দরকার বেশি হয়। এখানে বড় আঘাতের থেকে সূক্ষ্ম আঘাতটি গুরুত্বপূর্ণ। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো বিশেষ বিশেষ ধরনের আঘাতের জন্য বিশেষ অস্ত্র— অর্থাৎ অস্ত্রের বৈচিত্র। তাছাড়া প্রয়োজনীয় ফ্লিন্ট পাথরের প্রাচুর্য যেহেতু এখানে নেই তাই অল্প পাথর ব্যবহার করার জন্যও ছোট অস্ত্র দিয়ে কাজ সারতে হয়। ছোট বিশেষায়িত পাথরের ব্যবহার করেই চামড়া বা কাঠ ছিদ্র করার জন্য ছোট ছুরি বা করাতের ধারালো অংশ, সবজি ইত্যাদি চাঁছার ছুরি, কোরানি ইত্যাদি তৈরি হয়। যদিও পুরুষরা এই পাথরের কাজগুলো বেশি করছিলো, অগ্নি ও অন্যান্য কয়েকজন মেয়ে তাদের বেত শন পোড়ানোর কাজ শেষ করে এ কাজেও যোগ দিলো।

হাতিয়ার তৈরির অন্য উপকরণের মধ্যে একটি প্রধান জিনিস হলো বল্গা হরিণের শিং আর পশু হাড়। এখানে আসার সময়ই ওরা বেশ কিছু বল্গা হরিণের শিং নিয়ে এসেছে— যা গত শরতে ও শীতে সংগ্রহ করা হয়েছিলো। এবার নারী পুরুষের একটি দল তার থেকে হারপুন তৈরির কাজে লেগে গেছে। হারপুনগুলো বর্শার মত কিন্তু শিকারের পশুর শরীরে ঢুকলে আটকে যাবার মত এর নানা ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা থাকে। শিঙের সোজা লম্বা একটি অংশ নিয়ে তাতে ধারালো পাথরের হাতিয়ার দিয়ে লম্বালম্বি কয়েকটি গভীর দাগ নেয়া হয় তারপর একে ফাটিয়ে বাকি কাজের জন্য যুৎসই চেপ্টা করে নেয়া হয়। এর ওপরেই হাতিয়ার চালিয়ে এক প্রান্তকে সরু চোখা করে, তার পেছনে ছোট ছোট শাখা প্রশাখার সৃষ্টি

করে, অন্য প্রান্তে যুৎসই ভাবে হাতে ধরার আর দড়ি বাঁধার ব্যবস্থা করে, তৈরি হচ্ছে হারপুন। ছোট বড় পশু, মাছ ইত্যাদি শিকারের জন্য তৈরি হচ্ছে নানা রকম হারপুন। যারা তৈরি করছে তাদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই শিকারি বলে ঠিক জানে কী শিকারের জন্য কোন্ ডিজাইনের হারপুন বেশি সুবিধাজনক। এভাবে ডিজাইন কেটে কেটে, এবং চেঁছে চেঁছে ইচ্ছেমত আকার দেবার জন্য বল্গা হরিণের শিঙের তুলনা হয়না— অথচ জিনিসটি দারুণ শক্ত, শিকারের পশুকে আহত করার জন্য খুবই যুৎসই। শুধু শিকারে কেন হাতিয়ার তৈরিরও হাতিয়ার হিসেবে এর কদর অনেক। একে সরু সুচালো করে নিলে অথবা ছেনির মতো চওড়া ধারালো করে নিলে তার চাপে পাথরকে ফাটিয়ে পাথরের হাতিয়ার তৈরি করা যায়।

তবে অগ্নি এবং তার নারী কুশলীদের আসল সুনাম অন্য কাজে। ওই জংলাতে আগুন দেবার কাজটি তো এখানে আসার শুরুতেই ওরা নিজেরাই আয়োজন করে শেষ করে ফেলেছে। এভাবে ওরা এই পুরো ক্যাম্পিং এলাকার চেহারাটাই বদলে দিয়েছে। পুরুষদেরকে আহত শিকারের পিছু পিছু অনেক দূর যেতে হয়। অনেক সময় দিতে হয়। কিন্তু অন্যান্য ধরনের শিকারগুলোও তুচ্ছ করার মত নয়, আর তার জন্য যে হাতিয়ার ও জিনিসপত্র প্রয়োজন হয় তাও তুচ্ছ করার মত নয়। এর অধিকাংশ কিন্তু নির্ভর করে উদ্ভিজ নানা জিনিসের সহায়তায় অন্য রকম সব কলাকৌশলে— আর এখানেই অগ্নি, তার আত্মীয়ারা আর বান্ধবীরা বিশেষ ভাবে হাত পাকিয়েছে। ওদেরকে গার্হস্থ্য কাজে কাম্পের কাছাকাছি থাকতে হয়— হয় হ্রদের পারে, অথবা বনের সংলগ্ন জায়গাগুলোতে। ওরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে পরস্পরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এখানেই অন্য রকম হাতিয়ার ও অন্য রকম শিকারের একটি জগত রচনা করে ফেলেছে। তাদের মধ্যে যে সৃজনশীল কাজের একটি চমৎকার স্ফুরন আছে তার প্রকাশ তারা এভাবে ঘটাচ্ছে।

এই যেমন মাছ ধরার খাঁচার কথা ধরা যাক। যে বেতের জংলাগুলো ওরা পুড়ে দিল এরকম বেত হ্রদের পারের থেকে তারা সংগ্রহ করে রেখেছে। এখান থেকে বাকল চেঁছে নিয়ে তা বুনে মেয়েরা চমৎকার কৌশলে মাছ ধরার খাঁচা বানিয়েছে— যার এক দিক দিয়ে মাছ খাঁচায় ঢুকতে পারে বটে, কিন্তু ঢুকলে আর বেরুতে পারেনা। এগুলো ওরা হ্রদের কিনারায় অগভীর পানিতে পেতে রাখে। রাতে এভাবে পাতা থাকলে প্রায় সকালেই গিয়ে ছোট ছোট মাছ পায়, বেশির ভাগ সময়ে পায় হ্রদের বাইন মাছ— সাইজে ছোট। একটু বড় মাছের জন্য আলাদা রকমের খাঁচা বানানো হয়— বনের চেরি গাছের সরু ডাল আর পাইনের শিকড় দিয়ে বোনা বড় খাঁচা, যাকে আবার আকৃতি দিতে হয়েছে শনের পাকানো দড়িতে বিশেষ বিশেষ গিট্টু দিয়ে। এগুলো পাতা হয় হ্রদের আর একটু গভীর পানিতে। মাছ ধরার পর ছোট বড় সব মাছকে কাঠ ফালি করা শিকের মধ্যে গেঁথে গেঁথে সরাসরি আগুনের ওপর রেখে ঝলসানো হয় এসব অন্য রকম মজা— যেটি প্রায় দিনই উপভোগ করা যায়, পশু শিকার মিলুক আর না মিলুক।

বড় মাছের জন্য বেশ একটু বড় খোপের মাছ ধরার জাল তৈরিও এরা করছে। বনে যে উইলো গাছ তার বাকল তুলে এনে লম্বা ফালির মত ছিড়ে নিলে সেগুলো দিয়ে দিয়ে খোপ খোপ জালটি তৈরি হয়। এভাবে বড় একটি জাল তৈরি করতে বেশ কয়েক দিন সময় লাগে— একই জালে দু'তিন জন মেয়ে কাজ করা সত্ত্বেও। ঘরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখন যে সময় পাচ্ছে এ জাল বুনতে হাত লাগাচ্ছে। জাল তৈরি হয়ে গেলে এর তলায় ছোট ছোট পাথরের গুলতি যোগ করে দেয়া হয়েছে— পানিতে জাল ফেল্‌লে পাথরের ভারে সেটি যেন হ্রদের তলার দিকে ডুবে যায়। আবার জালের ওপরের অংশের সঙ্গে লম্বা সুতা দিয়ে বেশ কিছু পাইনের বাকল লাগিয়ে রাখা হয়েছে— এই বাকলগুলো ভেসে থাকে ও জালকে কিছুটা ভাসিয়ে রাখে। সব সময় না হলেও কখনো কখনো এই জাল ফেলার ও তা দিয়ে মাছ ধরার কাজেও মেয়েরা অংশ নেয়। ওই যে নৌকাগুলো তৈরি হয়েছে তাতে চড়ে হ্রদের কিছুটা গভীরে গিয়ে জাল ফেলতে হয়। এভাবে বড়শি, জাল, খাঁচা সব রকম কৌশল অবলম্বন করে চলে স্টার ক্যারের মাছ ধরা। এখানকার খাদ্য প্রাচুর্যে গ্রীষ্ম কাটাবার একটি মজাই হলো এত সব মাছ খাবার সুযোগ। মাছ শুধু প্রায় দিন খাচ্ছেই না সময় সময় কিছু মাছ ফালা ফালা করে তা আগুনের ধোঁয়ায় অনেক্ষণ রেখে ভবিষ্যতে খাওয়ার জন্য জমিয়ে রাখতেও শিখেছে ওরা।

মাছ ধরার একটি কাজে অবশ্য পুরুষের দলকেই কাজে নামতে হয়। সেটি হলো হ্রদের বিশেষ বিশেষ জায়গায় যেখানে মাছ ধরার খাঁচা বসানো হয়, অনেক দূর থেকেও মাছ যেন ওই খাঁচার দিকেই অগ্রসর হয় সেই ব্যবস্থা করা। এজন্য বনের হাজেল ঝোপের থেকে সরু ডালগুলো নিয়ে অনেক লম্বা ও হ্রদের গভীরতার সমান চওড়া খুবই ঘন বুনোটের বেশ কিছু বেড়া বোনা হয়েছে। হ্রদের কিছুটা মাঝের দিক থেকে কিছুটা কিনারায় খাঁচার দিকে দুপাশে দুই সারি লম্বা খুঁটি পেতে তার সঙ্গে এই বেড়া খাড়া করে দেয়া হয়েছে। এই দুই বেড়া অনেকটা ফানেলের মত হ্রদের মাঝের দিকে চওড়া আর কিনারার দিকে আস্তে সরু হয়ে আসা দু'পাশে আবদ্ধ একটি পথের সৃষ্টি করেছে যা অনেক মাছকে যেন পথ দেখিয়ে সোজা খাঁচার দিকে নিয়ে আসে সেখানে আটকা পড়ার জন্য। ওই নৌকায় চড়ে হ্রদের মাঝে গিয়ে এই বেড়াগুলো স্থাপন করতে সম্মিলিত যথেষ্ট পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। কিছুটা নৌকা থেকে, কিছুটা সাঁতার কেটে, কিছুটা ডুব মেরে এ কাজ করতে হয়।

গ্রীষ্মকালে মাংস ও মাছের দিক থেকে স্টার ক্যার ও তার কাছাকাছি অন্যান্য জায়গাগুলোতে প্রচুর বৈচিত্র থাকলেও ফলমূলের ক্ষেত্রে তেমন অবশ্য নেই। তবে দুটি নিরামিষ আহার এখানেও যত ইচ্ছে তত করা যায়। এদের একটি হলো বনের হাজেলনাট। এই বাদামটি অল্প আগুনে রোষ্ট করে সার্বক্ষণিক খাবার হিসেবে ব্যবহার করে স্টার ক্যারের বাসিন্দারা। আর হ্রদের ধারেকাছে কাজ

করার সময় ওরকম আর একটি সার্বক্ষণিক পাওয়া যাবার মত খাবার হচ্ছে পানিফল— যা হ্রদের কিনারায় অগভীর পানিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ঝলসানো লাল হরিণ, বুনো শুয়োর, জলচর পাখি অথবা মাছের ভোজ শেষে গভীর রাতে খোলা আকাশের তলে প্রায়শ বসে মানুষগুলোর আমোদ ফুর্তির আসর। ওই সময়েই ঘটে রোষ্ট করা হাজেলনাটের ভাল ব্যবহার— সামনে রোষ্ট হচ্ছে আর ঝুড়ির মধ্যে করে তা মেয়েরা বিলোচ্ছে; আগুনের চারদিকে গোল করে বসা আড্ডা দেয়া স্ত্রী-পুরুষ তা এক রকম বেখেয়ালেই খেয়ে চলছে। শত শত হাজেলনাট এভাবে এক বৈঠকেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই সঙ্গে চলছে গান— কখনো কখনো একক কণ্ঠে, কখনো এক সঙ্গে। সব কিছু তুঙ্গে ওঠে যখন সবাই দাঁড়িয়ে গিয়ে আগুনের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে নাচতে থাকে। নাচগুলোর অধিকাংশই শিকারকালীন অঙ্গভঙ্গির অনুকরণে— অবশ্য তালে তালে সঙ্গীতের ছন্দে। হরিণ শিকারের অনুকরণ করার সময় অনেকে হরিণ মুখোশ মুখে লাগিয়ে হরিণ সাজছে, অন্যরা হাতিয়ার হাতে থাকার ভঙ্গি করে শিকারি সাজছে। মেয়েরাও মুখোশ পরে হরিণও হচ্ছে, আবার শিকারিও হচ্ছে— যদিও তারা সত্যিসত্যি হরিণ শিকার খুব বেশি করে না। মজার ব্যাপার হলো এই মুখোশগুলো এই নাচের জন্য তৈরি হয়নি, বরং সত্যিকার শিকারের জন্যই তৈরি হয়েছে গাছের বাকলকে হরিণের মাথার মত চিত্রিত করে। ঝোপের মধ্যে হরিণকে অনুসরণ করার সময় যাতে চট্‌ করে হরিণ শিকারিকে মানুষ হিসেবে চিনতে না পারে এ জন্যই মুখোশ পরে অনুসরণ।

* * *

১৯৩০ এর দশকে ইংল্যাণ্ডের প্রত্নতত্ত্ববিদরা ওখানে বেশ কিছু মেসোলিথিক বসত আবিষ্কার করেছিলেন— যার মধ্যে স্টার ক্যার অন্যতম। মেসোলিথিক মানে মধ্য প্রস্তর যুগ– পুরাতন প্রস্তর যুগ (পেলিওলিথিক) এবং নব্য প্রস্তর যুগের (নিয়োলিথিক) মাঝামাঝি একটি পরিস্থিতি। ওই সময় জীবন-জীবিকা পুরাতন প্রস্তর যুগের শিকারি-সংগ্রাহকের স্ত রেই রয়েছে, নব্য প্রস্তর যুগের শুরুতে বন্য শস্যের চাষবাস শুরু এবং পরে কৃষি যুগের সূচনা— এর কোনটাই মোটেও দেখা দেয়নি যা সমসাময়িক মধ্যপ্রাচ্যে দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও জীবিকার বৈচিত্রে, কৌশলের বিস্তারে এটি পুরাতন প্রস্তর যুগের থেকে উন্নত। স্টার ক্যারের খননে তাই প্রমাণিত হয়েছে। একটি পুরানো নালার মধ্যে প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া যাওয়াতে জায়গাটি প্রত্নতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেছিলো। এখানকার প্রায় ১১ হাজার বছর আগের নিদর্শন সমূহের চমৎকার টিকে থাকার কারণ হলো এখন এখানে রয়েছে আবদ্ধ পানির মধ্যে পীট কয়লা ভর্তি বিশাল জলা। এরকম পীটের জলায় পচনশীল জৈব জিনিসও দীর্ঘদিন ধরে প্রায় অবিকৃত থাকতে দেখা গেছে— হাড়, শিং, কাঠ, উদ্ভিদ আঁশে তৈরি জিনিসপত্র তাই ওখানে অবিকৃত পাওয়া গিয়েছে— আর পাথরের তো কথাই নেই। পরবর্তীকালে এরকম পীটের গর্তে মানুষের পুরো মৃতদেহও অবিকৃত আবিষ্কৃত হয়েছে।

এখানকার বর্শাগ্র ও তীরের মাথা হিসেবে পাথরের ক্ষুদ্র অস্ত্রগুলো লক্ষণীয়। এগুলো অল্প আঘাত করেই বিশাল পশুকে রক্তক্ষরণে নিহত করতে পারতো। স্টার কারের সমসাময়িক ডেনমার্কের একটি খনন স্থল থেকে বন্য গরুর একটি পুরো কঙ্কালে দেখা গেছে পাঁজরে এরকম দুটি ক্ষুদ্র অস্ত্র গেঁথে আছে। এর একটির আঘাত সেরে গেছে। অন্যটি কিছুদিন পরের, তা সারেনি— খুব সম্ভব ওটিতেই দীর্ঘ রক্তক্ষরণে পশুটির মৃত্যু হয়েছে। ওখানকারই আরেকটি খনন স্থলে বন্য গরুর পশ্চাদভাগে তীরের ক্ষুদ্র পাথুরে অগ্রভাগ গাঁথা দেখা গেছে যা শুধু মাংসকে ক্ষত করেছে। খুব সম্ভব তাতেই রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে।

পীটের জলায় আবিষ্কৃত এসব নিদর্শন থেকেই আমরা এখানে বছর বছর অল্প একদল মানুষের গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পিং আবাসের পরিচয় পেয়েছি। এটি যে গ্রীষ্ম কাল সেটি বোঝা গেছে পশু নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া হরিণের দাঁতের অবস্থা দেখে। আজকালকার হরিণের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় যে ওই সব হরিণকে যখন শিকার করা হয়েছিলো মোটামুটি সে সময় তাদের যে দাঁতের উদ্গম হয়েছিলো সেগুলো সাধারণত মে-জুন মাসে উদ্গম হয়। লাল হরিণ ছাড়াও বুনো শূয়োর, খরগোস, বন্য গরু, জলজ পাখি- এসব বহু প্রাণী র হাড় প্রচুর পরিমাণে ওই পীট গর্তে প্রায় অবিকৃত পাওয়া গেছে। পীট জলায় সংরক্ষিত হবার কারণেই দড়ি, খাঁচা, বেড়া ইত্যাদি পঁচনশীল উদ্ভিজ জিনিসের কিছু কিছু নমুনা আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে, যে কারণে আমরা স্টার ক্যারের এবং ইউরোপের নানা রকম মেসোলিথিক প্রযুক্তির তথ্য পেতে পেরেছি। পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনাগুলোর মধ্যে কিছু চমকপ্রদ জিনিস হচ্ছে হরিণের মত মুখোশ, এবং বল্গা হরিণের শিং দিয়ে তৈরি নানা ডিজাইনের হারপুন। এগুলো বেশ ব্যতিক্রমী জিনিস, এরা স্টার ক্যারের বাসিন্দাদের চিন্তার ও কাজের বৈচিত্রগুলো তুলে ধরতে পেরেছে।

ত্রিশের দশকে স্টার ক্যারের খনন কাজ শুরু হয়ে তা শেষ হয়েছে ১৯৫১ সনে এসে। কিন্তু তারপরও বহু দশক ধরে এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর ওপর গবেষণা চলে এসেছে। নতুন গবেষণার ফলে অনেক ধারনা পরে পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম দিকে মনে করা হয়েছিলো স্টার ক্যারের বসতটি ছিল শীতকালীন বসত— হয়তো বা বল্গা হরিণের ঝাঁক শিকারের জন্য। বল্গা হরিণের অনেক শিং ও সে সবের তৈরি হাতিয়ার পাওয়াতেই এ সন্দেহ করা হয়েছিল। পরে হরিণের দাঁত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে বসতটি ছিল গ্রীষ্মকালীন— বল্গা হরিণের শিং অন্য জায়গা থেকে আনা হয়েছে। ওখানে যে আগে হ্রদ ছিল সে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে প্রাচীন পরিবেশ উদ্ঘাটনের নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে। কিন্তু সেই হ্রদের কিনারায় বেত-শন জংলায় যে আগুন দেয়া হতো সেটি আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন গবেষণায় ১৯৯০ এর দশকে। পুন:উদ্ঘাটনে ওই হ্রদটি ঠিক যে জায়গায় থাকার কথা তা বোঝা গেছে— যদিও তা এখন পীট জলার অন্তর্ভুক্ত। ওই প্রাচীন হ্রদের কল্পিত কিনারা অঞ্চল আর মাঝের অঞ্চল থেকে নতুন পৃথক পীট নমুনা নিয়ে তার বিস্তারিত আণুবীক্ষণিক গবেষণা করা হয়েছে। প্রায় কঠিন অবস্থার ওই পীটের খনন করে আনা নলাকৃতি নমুনা থেকে খুব পাতলা পাতলা স্লাইজ করে নানা স্লাইজে বিভিন্ন সময়ের উদ্ভিদের পরাগরেণু, কাঠকয়লার গুড়ো, উদ্ভিদের ক্ষুদ্র অংশ ইত্যাদির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এভাবে বরফ যুগের আমল থেকে যুগে যুগে এখানকার উদ্ভিদের পরিবর্তনগুলো বোঝা গেছে। ১১ হাজার বছর আগের হ্রদের কিনারার স্লাইজে বেত শন অন্যান্য ঘাসের সঙ্গে প্রচুর কাঠ কয়লার গুড়ো পাওয়া যাচ্ছে, আর

পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ওই বেত শনের পোড়া অংশ। কাঠকয়লার অনেকখানি এসেছে হ্রদের কিনারায় ক্যাম্পগুলোতে প্রতিদিন যে আগুন জ্বালানো হয়েছে সেখান থেকে। আর বেত শনের পোড়া অংশের হঠাৎ প্রাচুর্য ওখানে আগুন দেবার কথাটিই সামনে তুলে আনে। দেখা গেছে ১১ হাজার বছর আগের দিকে প্রায় প্রতি বছরই এক সময় এরকম কাঠকয়লার গুড়ো ও পোড়া অংশ বেড়ে গিয়ে আবার কমে গেছে। স্পষ্টত এটি প্রতি বছর মৌসুমি ক্যাম্পিং ও জংলায় আগুন দেয়াটাকেই প্রমাণ করছে।

এভাবে প্রায় ৮০ বছর চলার পর দেখা গেছে যে কয়েক দশক এখানে মানুষের আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর আবার যথারীতি শুরু হয়ে প্রতি বছর চলেছে আরো শত বছর ধরে। পীটের স্লাইজ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এক পর্যায়ে বন এগিয়ে এসে হ্রদের কিনারা আর তার ভেতরের কিছুটাও দখল করে ফেলছে। বনের গাছের প্রকৃতি পরিবর্তন হওয়াটাও এর একটি কারণ। আগের বার্চ ও পাইন বনের প্রাধান্যের বদলে উইলো ও আসপেন গাছ বেড়ে গিয়ে সেগুলো হ্রদের দিকে এগিয়েছে। যা ছিল হ্রদ তা হয়ে পড়লো 'ক্যার' অর্থাৎ ঘন জলা বন। আরো পরে এখন থেকে সাড়ে দশ হাজার বছর আগে আগাগোড়া জায়গা হাজেল গাছ ও হাজেল ঝোপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হ্রদের অস্থিত্বটি হারিয়ে যায়, এখানে মানুষের গ্রীষ্মকালীন আসাটিও বন্ধ হয়ে যায়। ওরা হয়তো অন্য কোন জায়গায় তাদের গরম কাল কাটিয়ে শিকার-সংগ্রহের কাজ চালিয়ে গেছে। এদিকে ওদের সেই প্রিয় হ্রদটি জলা বনে পরিণত হবার ফলে জলার মধ্যে কাদায় চাপা পড়া ওই গাছের অবক্ষয়িত অংশগুলো পীটে পরিণত হয়ে পীট জলায় তাদের কীর্তিগুলোর অবিকৃত সংরক্ষণ সম্ভব করেছে।

স্টার ক্যারের খনন

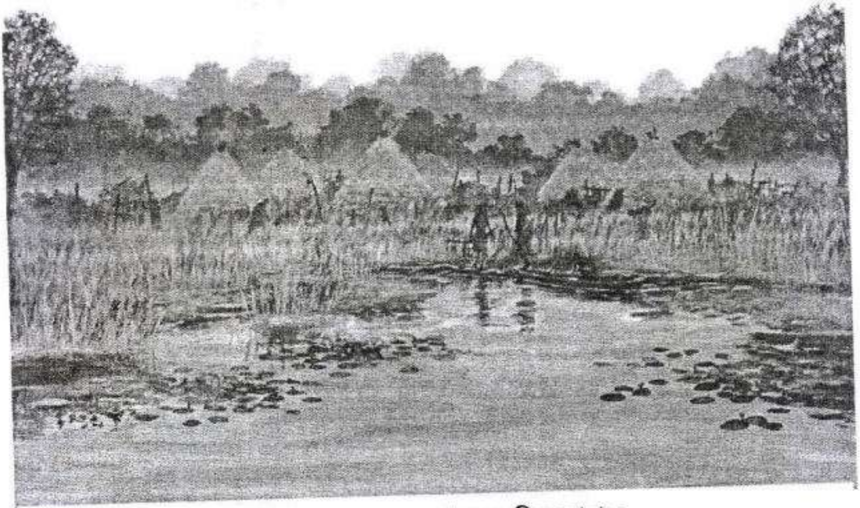

স্টার ক্যারের হ্রদের পারের কল্পিত আবাস

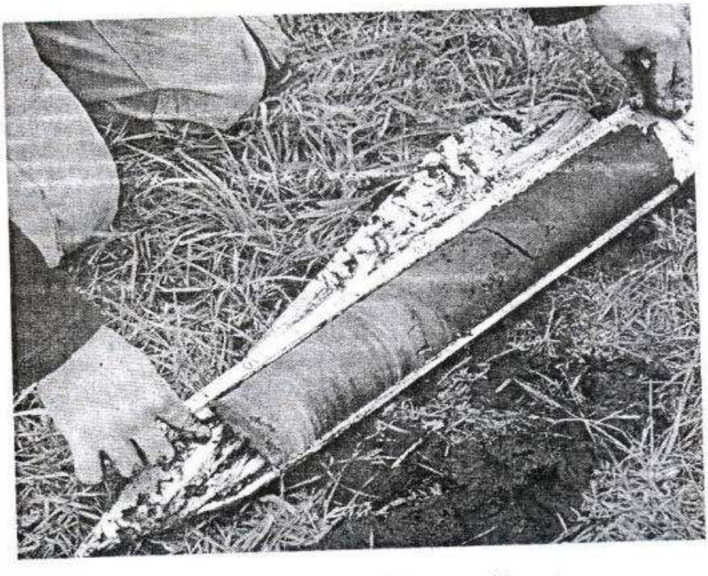

বিশ্লেষণের জন্য তুলে আনা পীটের নলাকৃতি কোর

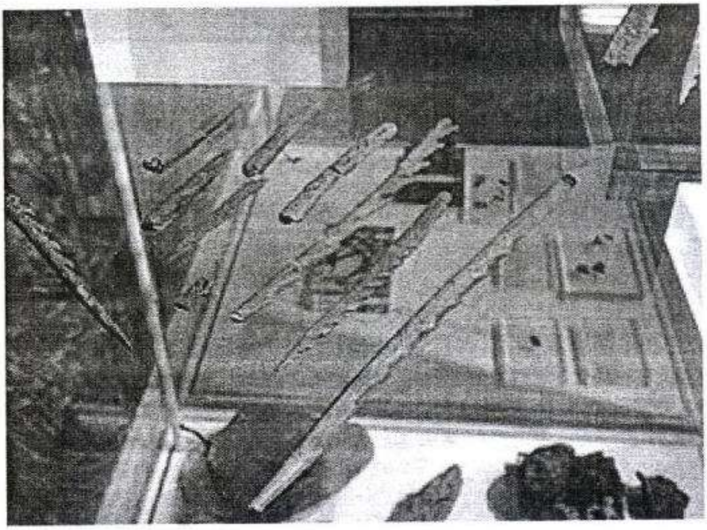

স্টার ক্যারের হাতিয়ার

সিরিয়ার মুরেবেটের দাদীমা ঃ
১১ হাজার বছর আগে

শিকারের প্রাচুর্যের সঙ্গে নিজেদের হাতে গড়া বন্য শস্যের বাগান যে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে তাতে শুধু স্থায়ী গ্রাম নয়, এক রকম শহরেরও আভাস আসছে। আর এটি সুযোগ করে দিয়েছে শিল্প চর্চার এবং তীর্থ যাত্রার।

সিরিয়াতে ইউফ্রেটিস নদীর যে পারে আবু হোরাইরা জায়গাটি ছিল (বর্তমানে একটি হ্রদের মধ্যে বিলুপ্ত) তার উল্টো দিকের পারে ৫০ কিলোমিটার দূরে ছিল মুরেবেট গ্রামটি (এটিও এখন হ্রদের মধ্যে)। এগার হাজার বছর আগের ওই দিনে আমরা মুরেবেটে বেশ জমজমাট একটি গ্রাম দেখছি— গ্রাম না বলে যাকে শহরও বলা যায়। কিছু কাল আগেও হঠাৎ প্রতিকূল জলবায়ুর কারণে জীবন-জীবিকার চাপে এ অঞ্চল যে ভুগছিলো, এখানকার মানুষ যে স্থায়ী বসতের বদলে বিশাল এলাকায় ঘুরে ফিরে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়েছিলো, সে কথা এখন এখানে কেউই ভাবতেই পারবেনা। এখন উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু, খরার বা মরুময়তার চিহ্নমাত্র নেই। বরং বর্ধিষ্ণু এই গ্রাম এবং আশপাশের এমনি আরো গ্রাম মিলে গড়ে ওঠেছে একটি নতুন ধরনের কালচার— কিছু কিছু বিশ্বাস, সংস্কার আর আচার যেখানে বেশ কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছে।

এখানকার যে পরিবারটি নিয়ে আমাদের গল্প তার মধ্যমণি হলেন পরিবারের সব চেয়ে বয়স্ক মানুষটি— সবাই যাকে দাদীমা বলে ডাকে। দাদীমার স্বামী মারা গেছে বহুদিন আগে। তাঁর ছেলে গোটা পরিবারের কর্তা। কিন্তু দাদীমার স্থান তার অনেক ওপরে, কারণ তিনি পুরো গ্রামের দাদীমা— তাদের আচার অনুষ্ঠানে, পূজার আয়োজনে নেতৃত্ব দেবার প্রধান ব্যক্তিত্ব। কেউ তাঁকে এ কাজে নিয়োগ করেনি, তিনি তাঁর দীর্ঘ বৈধব্যের সময় নিজগুণে এসব আয়ত্ব করেছেন। নিজের গ্রামের বয়োজৈষ্ঠদের সঙ্গে তো বটেই, ভিন গ্রামের অভিজ্ঞদের সঙ্গেও এ নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের চর্চা। আজ এই পরিণত বয়সে তাই এসব ব্যাপারে তাঁর পরামর্শই প্রায় শেষ কথা।

পরিবারে দাদীমা সবার প্রিয়, সবার শ্রদ্ধাভাজন— তাঁর নাতি নাতনীরা সহ সবার ভালমন্দ নিয়ে সব সময় সজাগ। আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ছাড়াও পরিবারের খুঁটিনাটি সব বিষয়েও তাঁর পরামর্শ সবাই মাথা পেতে নেয়। যে বাড়িটাতে এ পরিবারের বাস মুরেবেট গ্রামটিতে সে রকম বেশ কিছু বাড়ি আছে। এরকম কিছু বাড়ি পাশাপাশি থেকে ভেতর দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, পরস্পরের মধ্যে আসা যাওয়া করা যায়। ওদের বাড়িটি বেশ কয়েকটি কামরায় বিভক্ত সবই অংশত পাহাড়ের গায়ে কৌশলে তৈরি— প্রত্যেক কামরার নিচের দিকে বেশ খানিকটা মাটির ভেতরে প্রোথিত; চার দেয়াল পাথর গেঁথে গড়া। বাড়ির মাঝখানে আছে পাথরেরই কয়েকটি স্তম্ভ যেখান থেকে কাঠের লম্বা বীম চারিদিকে রশ্মির মত বিস্তৃত হয়ে সব জায়গায় দেয়ালে ওপর ভর রেখে শেষ হয়েছে। এটিই ছাদের কাঠামো— এর ওপরে চামড়া ও ডালপাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি হয়েছে ছাদ। এমন মজবুত করে, বড় করে, বানানো বাড়ি দেখেই বোঝা যায় এ সব পরিবার মুরেবেটের স্থায়ী বাসিন্দা।

বাড়ির কামরাগুলোর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর খোলামেলা যেটি, সেটিতেই থাকেন দাদীমা। এর যা আসবার ও সাজসজ্জা তাতে একে শুধু থাকার ঘর না বলে একটি গৃহ-মন্দিরও বলা যায়। পাথরের, ঝিনুক, শাঁখের নানা অলঙ্কার-সজ্জা তো রয়েছেই, যে জিনিসটি বেশি নজর কাড়ে তা হলো ছোট ছোট অনেকগুলো নারীমূর্তি— কিছু কিছু পাথর খোদাই করে তৈরি, বাকিগুলো কাদায় গড়া। এগুলো নারীর হুবহু স্বাভাবিক চেহারার বলা যাবেনা; যেমন মুখের সবকিছুর বিস্তারিত নেই, হাত পায়ের অনুপাতও ঠিক নেই। মনে হয় ইচ্ছে করে সাধারণ নারীর বদলে রহস্যময়ী দেবী-মূর্তি গড়া হয়েছে। ঘরের এ মন্দির হলো ওই রহস্যময়ী দেবীকে পূজো দেয়ার মন্দির। মুরেবেটের শ'খানেক মাইলের মধ্যে বেশ ক'টি বড় বড় তীর্থস্থানের মত রয়েছে যেখানে এই দেবীর থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ আরো বড় দেবী রয়েছে। দাদীমা সহ এদিককার অনেক মানুষের ওখানে যাতায়ত ছিল, এখনো অন্যদের আছে। কাদায় গড়া দেবী মূর্তির সঙ্গে মুরেবেটের ঘরে ঘরে আর যা আধুনিক জিনিস দেখা যায় তা হলো পোড়া মাটির বাটি। পূজার উপাচার রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় এ সব বাটি, অন্যান্য গেরস্থালি কাজে কিন্তু এগুলো তেমন ব্যবহৃত হয়না।

মুরেবেটের মানুষরা সবাই শিকারি-সংগ্রাহক; ভাল আবহাওয়া, ঘন বনাঞ্চল ও তৃণভূমির কারণে এখন শিকারের প্রাচুর্য রয়েছে এখানে। গাজেল হরিণ ছাড়াও বন্য গরুও বেশ পাওয়া যায়। বন্য শস্যের বাগানগুলোও বেশ সমৃদ্ধ। এ সমৃদ্ধির একটি লক্ষণ হলো দাদীমার ঘরের সঙ্গেই রয়েছে শস্যের একটি গোলা, বেশ কিছু দিনের প্রয়োজনীয় শস্য জমা রাখার মত। পাথরের টুকরা কাদায় জুড়ে জুড়ে তৈরি হয়েছে এই গোলা। ভাল আবহাওয়া ছাড়া আর যে কারণে শস্যের এ সমৃদ্ধি তা হলো তার বীজের উচ্চ মান। এই বীজ এখনো বন্য পর্যায়েই রয়ে গেছে বটে তবে নানা গুণাগুণের দিক থেকে এগুলো বন্যের ভেতরেও যথেষ্ট বাছাই করা।

দাদীমার পরিবারসহ মুরেবেটের মানুষের জীবনে একটি বড় স্থান দখল করে আছে তাদের তীর্থযাত্রা— বেশ কিছু তীর্থস্থানে। মুরেবেট থেকে শ'খানেক মাইল উত্তরে রয়েছে ওই তীর্থগুলোর একটি, এ জায়গার নাম জেরফ এল আহমার। অন্য সব দিক থেকে ওখানকার সব বাড়িগুলোও মুরেবেটের মতই। কিন্তু গ্রামটির মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে দুটি ব্যতিক্রমী স্থাপনা। একটি হলো পুরো গ্রামের জন্যই একটি বিরাট আকারের শস্যাগার। একটি কেন্দ্রীয় চত্বরের চারিদিকে বৃত্তাকারে সাজানো রয়েছে ছয়টি কক্ষ— যার প্রত্যেকটি শস্যের গোলা। মাঝখানের চত্বরটি বড়ই রহস্যময়। এর যে বৃত্তাকার দেয়াল তার থেকে টাঙানো রয়েছে চারটি বিশাল বন্য গরুর মাথার কঙ্কাল— সেগুলোর বড় বাঁকানো শিং রীতিমত দর্শনীয়। এটি জেরাফ এল আহমারের বাসিন্দাদের নিয়মিত পূর্জা অর্চনার স্থান। শিকার আর শস্য চাষের প্রাচুর্যের কারণেই এসব পূজা অর্চনার অবকাশ হচ্ছে এখানকার মানুষের। এই প্রাচুর্য আবার তাদেরকে রহস্যময় সব শক্তির কৃপার ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। ওই গরুর মাথার কঙ্কাল সেই শক্তিরই প্রতিনিধিত্ব করছে। সর্ব সাধারণের জন্য উদ্বৃত্ত শস্য রক্ষার জন্য এখানকার শস্যাগারের আয়োজনটিও সে জন্যেই। শস্য সম্পদ ও পূজা অর্চনাকে এক জায়গায় নিয়ে আসার বিষয়টি লক্ষ্যনীয়।

তীর্থ যাত্রার বিশেষ সময়গুলোতে মুরেবেট সহ কমবেশি দূরত্বের অনেক জনপদ থেকে ভক্ত মানুষরা এখানে পূজো দিতে আসে। দাদীমা কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে নিয়মিত এসেছেন, এখন বয়সের কারণে নিজে এতটা পথ হেঁটে আসতে পারেননা, তবে পরিবারের বেশ কয়েকজনকে পাঠিয়ে দেন। জেরফ এল আহমারের পূজারীদের কাছে দাদীমার মান সম্মান এখনো প্রচুর। নানা রকম জায়গা-তৃণভূমি, বনভূমির মধ্য দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তীর্থযাত্রা সহজ কাজ নয়। শুধু হেঁটে হেঁটে যাওয়া, পথে পথে পশু-চামড়ার তাঁবু খাটিয়ে রাতের বিশ্রাম, সকালে উঠে আবার হাঁটা। সঙ্গে বহন করার লটবহরও কম নয়। যদিও পথে কিছু শিকার-সংগ্রহ চলে, তবুও অনেক খানি খাবার ও পানীয় নিজেদেরকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। তার ওপর তীর্থস্থানে গিয়ে ওখানকার শস্যাগারে দান করার জন্য সব চেয়ে সেরা কিছু বীজ বয়ে নিয়ে যেতে হয়। এটি মানতের বীজ বলে কথা। ভাগ্য ভাল যে পথে দু'একটি যা লোকালয় পাওয়া যায় তীর্থযাত্রীদেরকে ওরা খুব খাতির ও সম্মান করে। এই যে তীর্থযাত্রীরা চারিদিক থেকে আসে, তারাও নিজেদের বেশ কিছু কিছু শস্য এভাবে এখানকার শস্যাগারে দান করে যায়। দূর দূরান্তের শস্য-বীজে সমৃদ্ধ বলে উন্নত বীজের একটি কেন্দ্র হিসেবেও জেরফ এল আহমার বেশ খ্যাতি লাভ করেছে। যে সব তীর্থযাত্রীর সামর্থ্য কম তারা এই বীজকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে ভাল বীজ পেয়ে থাকে। আশপাশে বেশ কিছু জায়গা থেকে এমন বহু মানুষ আসে, ওসব জায়গায় চাষের মান ভাল নয়, বীজের গুণও নয়।

মুরেবেটের মানুষ যখন এখানে আসে তখন অবশ্যিই এখানকার ফুলদানির মত চিত্রিত পাথরবাটি কিনে নিয়ে আসে। এগুলোর ওপর নানা জ্যামিতিক আঁকিবুঁকির চিত্রণ করা থাকে। সেই সঙ্গে এখানকার শিকারি বাজ পাখির ছোট মূর্তিগুলোও বিখ্যাত। এই বাজপাখির ছবি আবার দেখতে পাওয়া যায় ছোট ছোট পাথরের পাটার ওপর গভীর আঁচড় কেটে আঁকা সুন্দর সব শিল্পকর্মে। এসবের ওপর এরকম শিকারি পাখি, সাপ, পশু, কীটপতঙ্গের ছবি এমন ঘন সংবদ্ধভাবে থাকে যেন মনে হয় ছবির মাধ্যমে কিছু গল্প বলা হচ্ছে। তবে যারা কেনে তারা যেমন বলতে পারে না এই গল্প কী, যারা আঁকে তারাও ব্যাখ্যা করে বলতে পারেনা। এ যেন এক রহস্যময় শিল্পকর্ম।

জেরফ এল আহমারে যারা তীর্থ করতে আসে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে রওয়ানা হয়ে যায় আরো বেশ কিছু মাইল উত্তরে গোবেকলির (বর্তমান তুরস্কে) উদ্দেশ্যে; কারণ ওটি আরো বড় একটি তীর্থস্থান। বছর দশেক আগে দাদীমা স্বয়ং এই মহাতীর্থে গিয়েছিলেন, সে গল্প এখনো তিনি নিত্য সবাইকে বলেন। মুরেবেট থেকে কেউ না কেউ এখনো প্রতি বছর গোবেকলিতে তীর্থে যায়। মুরেবেট থেকে যে সব তীর্থযাত্রী জেরফ এল আহমারে তীর্থে যায় তাদের মধ্যে যে ক'জন আরো কঠিন যাত্রায় গোবেকলিতে যাবে তাদের কথা গ্রামের সবাই আগে থেকে জানে। ওরা ক'জন অবশ্যই যাবার আগে দাদীমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে যায়। ওখানে করণীয় সম্পর্কে তাঁর পরামর্শও নেয়।

এখানকার প্রধান আকর্ষণ হলো এখানকার অতিকায় স্তম্ভগুলো। স্তম্ভগুলো তৈরি হয়েছে কতগুলো অতিকায় বাড়ির সঙ্গে। পাহাড়ের ঢালে বেশ বৈশিষ্টময় এই পাথরে গড়া বাড়িগুলো। প্রত্যেকটির মাঝখানে চুনাপাথর থেকে সঠিক আকৃতিতে খোদাই করে নেয়া এই রকম পাশাপাশি দুটি স্তম্ভ— আট ফুটের মত উঁচু, ওপরে দুদিকে দুটি বাহু বিস্তৃত অনেকটা ইংরেজি 'টি' অক্ষরের আকৃতি দিয়ে। ঠিক একই রকম সাত আটটি স্তম্ভ আবার রয়েছে বাড়ির কিনারায় সমান দূরত্বে স্থাপন করা। দুটি স্তম্ভের মাঝখানের জায়গাটিতে বসানো আছে পাথরের বেঞ্চ। স্তম্ভগুলোর গায়ে সেই জেরফ এল আহমারের চিত্রণের মতই সাপ-বাজপাখি-পশু- কীট পতঙ্গের ছবি ঘন হয়ে খোদাই করা রয়েছে। এখানে আঁকা পশু-বৈচিত্রের মধ্যে এ অঞ্চলে বেশি পাওয়া যাওয়া শিকারের পশুদেরই প্রাধান্য রয়েছে— গাজেল, শেয়াল, বন্য শূকর, বন্য গরু ইত্যাদি। মুরেবেটের তীর্থযাত্রীরা অবাক হয়ে দেখে এখানকার মানুষ কী পরিমাণ সময় ও পরিশ্রম এই স্তম্ভগুলোর নির্মাণে ব্যয় করেছে। এটি তারা পেরেছে তাদের শিকারের প্রাচুর্য ও উন্নত শস্য চাষের কারণে। তীর্থযাত্রীর এই স্তম্ভগুলোর কাছে অনেক সময় কাটায়, মাঝখানের বেঞ্চগুলোতে বসে তারা দেবীর পূজা দেয়। কিন্তু এই আচার-অনুষ্ঠানে তাদের তীর্থ শেষ হয়না। ওই অদ্ভুত প্রাণী-চিত্রণের অনুকরণে চিত্রিত কিছু পাথর ওরা

বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য কিনে নেয়। এগুলো প্রধানত সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে রাখা হয়। কিন্তু এখানকার ভাল বীজ কিনে আনাও একটি লক্ষ্য থাকে।

তীর্থযাত্রীরা যারা আসে গোবেকলির উন্নত শস্য বীজের প্রশংসা তাদের মুখে মুখে। আসলে যে শস্য এখানে উৎপাদন হয় এর বন্য বাগানে, তা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের চাহিদা মিটিয়েও প্রতি বছর এখানে যে অন্তত কয়েক শত তীর্থযাত্রী একত্র হয় তাদেরও খাবারের কাজে লাগে। শুধু তাই নয় একে বিখ্যাত গোবেকলি বীজের কেন্দ্রভূমি হিসেবে পুরো অঞ্চলের জন্য একটি বীজের বাজারও বলা যায়। ব্যাপক হারে এই বীজ উৎপন্ন করতে গিয়ে চাষের যে কলাকৌশলের উন্নতি হয়েছে তাতেই এই বীজের গুণাগুণগুলো আরো বেড়েছে এবং আরো বাছাই হয়ে এসেছে ক্রমাগত। তাই বীজগুলো কিন্তু ক্রমেই অনন্য হয়ে ওঠছে। শিগ্‌গির একদিন হয়তো বন্য শস্যের সঙ্গে তার কোন মিলই থাকবেনা।

তীর্থ করতে যারা গোবেকলিতে যায় তারা কয়েকশ'মাইল দূরের জনপদগুলো থেকেই বেশি যায়। অর্থাৎ বর্তমান সিরিয়ার উত্তর অংশ আর তুরস্কের পূর্ব অংশের জায়গাগুলোতেই বিশেষ ভাবে ছড়িয়েছে এখানকার বৈশিষ্টময় শিল্পকর্মের নিদর্শন এবং এখানকার উন্নত বীজ। কিন্তু এর ব্যাপ্তি কিন্তু ওখানেই শেষ নয়। বরং সেখান থেকে আবার নানা ভ্রমণ ও চলাচলের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়ে এগুলো চলে গেছে সেই আইন মাল্লাহা, ওহালো এমন কি সম্পূর্ণ ইরাক, জর্দান, প্যালেষ্টাইন (বর্তমান নামে বল্‌লে) হয়ে ভূমধ্যসাগর তীর পর্যন্ত। এটি বিশেষ ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে এ পুরো এলাকার নানা বসতিতে এসব নিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি খুব সহজ দর্শনীয় জিনিসের বিস্তৃতিতে। তা হলো নিকট চকচকে কালো আগ্নেয় শিলার সুন্দর কাচপাথর ওবসিডিয়ানের। ওই পুরো তল্লাটে গোবেকলির কাছের একমাত্র আগ্নেয়গিরি ছাড়া এই পাথরের অন্য কোন উৎস নেই। সর্বত্র ফ্লিন্ট পাথরের মেটমেটে ছাই-কালো রঙের নির্মাণ সামগ্রি দিয়েই বাকি সারাটা অঞ্চলের-কাজের কাজ বলুন আর নান্দনিক শিল্পকর্ম বলুন-সব প্রয়োজন মেটাতে হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কাজে ওবসিডিয়ান পাথরের ব্যবহারের মূল্য অনেক। আর এই পাথর ওসব জায়গায় গিয়েছে মূলত গোবেকলিতে যাওয়া ভ্রমণকারী, তীর্থযাত্রী, বীজ ক্রেতাদের হাতে হাতে।

এভাবে এই অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র একই রকম বন্য বাগান পরিচর্যা ও স্থায়ী বসতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিতে আশ্চর্য রকম উন্নত মানের অনেক শিল্পকর্ম দেখা যাচ্ছে। এগুলো সৃষ্টি হচ্ছে মুরেবেটে, আবার আইন মাল্লাহায় অথবা আইন শাখরিতে— চলে যাচ্ছে এ অঞ্চলের নানা জায়গায়। অথচ এই সকল অঞ্চলে আগে কোনদিন এভাবে শিল্পকর্মের দিকে মানুষের এতটা মনোযোগী হতে দেখা যায়নি। ঐ বন্য বাগান রচনা করে নতুন ধরনের যে জীবনজীবিকার ষ্টাইল এখানে দেখা দিয়েছে এটি তারই ফলশ্রুতি। নিশ্চিন্ত স্থায়ী বসবাস, সারা বছর এখানেই খাদ্যের নিশ্চয়তা তাদেরকে সেই অবকাশ, সেই মননশীলতা দিয়েছে। মুরেবেটের

দাদীমা যে আচার-বিশ্বাসের মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়েছেন তার সঙ্গেও এর সম্পর্কে দেখা যায়। বাড়িতে তাঁর কামরায় যে গৃহ মন্দিরের কথা বলেছি সেখানে রাখা আছে তাঁর সংগ্রহের এ রকম অনেক কিছু এসব শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে পাথরের ওপর আঁচড় কেটে খোদাই করা নানা কিছু চিত্র, সাংকেতিক চিহ্ন, এবং আরো দারুণ সব উন্নত শিল্পকর্ম পাথরের ভাস্কর্যে। অবাক হবার বিষয় যে এর মধ্যে নরনারীর যৌনতাকেও বিষয়বস্তু করা হয়েছে কোন কোন শিল্পকর্মে। দাদীমার কাছে দেবীর পূজার উপাচার হিসেবে এগুলোরও একটি গুরুত্ব রয়েছে— যৌনতা তাঁর কাছে দৈব সৃষ্টির পবিত্র উপায়, কোন খেলো বিনোদন মাত্র নয়।

উদাহরণ স্বরূপ এখানে আছে ছোট একটি ভাস্কর্য কর্ম যাতে মানুষের যৌন মেলামেশা, ভালবাসাকে বাধহীন ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ছোট নুড়ি পাথরের অপূর্ব খোদাইয়ের মাধ্যমে। এতে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন উপবিষ্ট মানব-মানবী অতি ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে রয়েছে। তাদের হাত পা পরস্পরকে পেঁচিয়ে, তাদের চোখ পরস্পরের চোখের দিকে। কিন্তু এ সবের কোনটাই খুব স্পষ্ট করে বাস্তবানুগ করে খোদাই করা নয় যদিও বেশ বোঝা যাচ্ছে। আসলে মুখমণ্ডলের কোন কিছুরই স্পষ্ট প্রকাশ নেই। এমনকি কোন জন যে মানবী আর কোন জন মানব তা বোঝাবারও কোন চেষ্টা করা হয়নি; যে কোন জনকে যে কোনটি হিসেবে আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। স্পষ্টত যে ভাস্কর এটি খোদাই করেছেন তাঁর কাছে স্ত্রী পুরুষ একেবারেই সমান, তাদেরকে কোন ভাবে আলাদা করার কথা তিনি ভাবেননি— এক্ষেত্রে তাঁর সমাজ যেভাবে চিন্তা করে তিনিও সেভাবে চিন্তা করেছেন— এই নতুন সংস্কৃতিতে দু'জনেই সমান গুরুত্ব পায়, তাদের পরস্পর বন্ধন ফুটিয়ে তুলতে গিয়েও তাদেরকে সমান ও অভিন্ন হিসেবে দেখানো হয়েছে। হাতের মুঠোর সমান আকারের ছোট একটি নুড়ি পাথরের ভাস্কর্যে স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসাকে যে এতখানি বাঙময় করে তোলা যায় তা ভাবা কঠিন— সব কিছু বাস্তবানুগ করে দেখালে এতটা হতোনা।

দাদীমার গৃহ মন্দিরে আরো নানা শিল্পকর্ম আছে যার সঙ্গে একদিকে আটপৌরে জীবন অন্যদিকে অতিপ্রাকৃত কিছুর সংযোগ আছে ভাবা যায়। একটি পাতলা পাথরের পাটার এক দিকে খোদাই করা দেখছি কয়েকটি রেখায় আঁকা একটি সুন্দর পাখি— ঠোঁট, চোখ, মাথা, পালক সব; আর এর উল্‌টো পিঠে কিছু জ্যামিতিক চিত্র— যেন একটি সাংকেতিক চিহ্নের মত। আরেকটিতে দেখা যাচ্ছে পাথর খোদাই করা ছোট্ট নারী মূর্তি— অলঙ্কৃত, আয়েস করে হেলান দিয়ে বসা, চুল পরিপাটি করে খোঁপা করা, হৃষ্টপুষ্ট দেহ। এ সবের মধ্যে কম বাস্তবানুগ হয়েও বেশ স্পষ্ট বিষয়বস্তু যেমন আছে, তেমনি আবার অবোধ্য সাংকেতিক আঁকিবুকিও রয়েছে— আঁকার ভঙ্গি থেকে মনে হয় যেন কোন একটি বার্তা লুকানো রয়েছে এতে।

চিত্রিত পাটা, ছোট মূর্তি ইত্যাদি ছাড়া এখানে রয়েছে গোবেকলি থেকে আনা চমৎকার ওবসিডিয়ানের অলঙ্কার। এ সব নেহাত ব্যক্তি অলঙ্করণের জন্য নয়

মোটেই— কারণ এত মহামূল্যবান ও বিরল সামগ্রী মানুষের অলঙ্করণে ব্যবহৃত হবার নয়— এ বরং সেই রহস্যময়ী দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত উপাচার। কিছুটা ভিন্নতার মধ্যে হলেও এমনি দেবদেবী তখন ওই পুরো অঞ্চলেই পূজ্য— সেটি মুরেবেটে হোক, জেরফ এল আহমারেই হোক, আর গোবেকলিতেই হোক। ভিন্নতার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে মুরেবেটে যেখানে প্রধান পূজনীয় স্ত্রী শক্তি, এটি জেরফ এল আহমারে নারী ও পুরুষ উভয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সেখানে পুরুষ শক্তির প্রধান প্রতীক হলো ষাঁড় মূর্তি। আর গোবেকলিতে ব্যাপক ভাবে রয়েছে পুরুষ শক্তির আরাধনা— ষাঁড় ছাড়াও এখানে যে নানা পশু প্রতীকে শক্তিকে প্রকাশ করা হয় তার সবই পুরুষ পশু। মুরেবেটের গৃহদেবী যেখানে মাতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করে অন্যত্র তা প্রকৃতির রুদ্র মূর্তির। সেখানকার সাপ, বাজ পাখি, ষাঁড় ইত্যাদির চিত্রণের মধ্যে। এই চিত্রণ ধারণ করে গোবেকলির জগদ্দল স্তম্ভগুলো এমনি রুদ্র মূর্তিরই প্রতীক হিসেবে মানুষকে আকর্ষণ করছে।

মুরেবেটের দাদীমা যখন তাঁর ঘরে মাতৃত্বের প্রতীক দেবীর পূজার আয়োজন করেন তখন তিনি তাঁর পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কামনা যেমন করেন তেমনি তাঁর বন্য শস্য বাগানের অধিক ফলনশীলতাও কামনা করেন। প্রতি বছর নিয়ম করে তাই তাঁরা তীর্থস্থানগুলো থেকে পবিত্র বীজ সংগ্রহ করেন। এই যে ওই পুরো অঞ্চলটিতে বন্য শস্য চাষের ব্যাপারটি ক্রমে ক্রমে কিছুটা মানুষের আয়ত্বাধীন পোষমানা শস্যের কৃষির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার সঙ্গে এই সব কিছু জড়িত হয়ে গেছে। বয়সের কারণে দাদীমা এখন নিজে তীর্থে যেতে পারেন না, এ নিয়ে তাঁর আক্ষেপের সীমা নেই। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যখন গল্প করেন তখন প্রায়ই আসে আগকার দিনের তীর্থযাত্রায় তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর বিশ্বাস আজ তাঁর পরিবারের এবং মুরেবেটের যে সমৃদ্ধি এর মূলে রয়েছে তাঁদের গৃহদেবতার সুনজর ও তাঁদের নিয়মিত তীর্থযাত্রা।

*　　*　　*

মুরেবেটের ধ্বংসাবশেষ খননের কাজ প্রত্নতত্ত্ববিদরা শুরু করেন ১৯৭১ সালে। ওখানে কয়েক হাজার বছর স্থায়ী মানব বসতির সন্ধান পাওয়া যায় যার মধ্যে ১১ হাজার বছর আগের বাড়িগুলোর নিদর্শন খুব স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। তখনকার গৃহ নির্মাণ শৈলী, জীবন-জীবিকার চিহ্ন, হাতিয়ার, বন্য শস্য বাগানে চাষ, অলঙ্করণ, মূর্তি পূজা ও সামগ্রী যা পাওয়া গেছে তা সমসাময়িক ইউরোপ ও এশিয়ার, বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সঙ্গে মিলিয়ে একে 'নতুন প্রস্তর যুগ' নামে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সভ্যতা কালের সূচনা বলে চিহ্নিত করা গেছে।

মুরেবেট খননের নেতৃত্বদানকারী প্রত্নতত্ত্ববিদরা ওই অঞ্চলের সংস্কৃতি বিশেষ করে তাদের আচার-বিশ্বাস ইত্যাদির প্রবণতাগুলো নানা নিদর্শনগুলো থেকে আন্দাজ করার চেষ্টা করেছেন। এতে তাদের বন্য শস্য চাষের সঙ্গে, শিকার পদ্ধতির সঙ্গে এসব আচার-বিশ্বাসের একটি গভীর সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করেন। যদিও জীবনযাত্রা এখনো

আগের মতই শিকারি সংগ্রাহকের, সেটি যে এখানে শিগ্‌গির বদলে যাবার দ্বার প্রান্তে ছিল তার কিছু প্রমাণ ওই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে— বিশেষ করে বন্য শস্য থেকে কৃষি শস্যে রূপ পেতে এমনি একটি প্রস্তুতির আভাস ওতে ছিল। প্রধানত শস্যবীজের নমুনা এবং চাষের হাতিয়ার থেকে এটি আন্দাজ করা গেছে। আসলে বর্তমান তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক, জর্দান, লেবাননের যে বক্রাকার অংশকে 'উর্বর সরু চাঁদ' (ফার্টাইল ক্রিসেন্ট) বলে এখন উল্লেখ করা হয় প্রথম কৃষি ওখানে এসেছিলো বলে, সে সময়ের আর দু'এক হাজার বছরের মধ্যে সেখানেই শিকারি-সংগ্রাহক মানুষের কৃষক মানুষে পরিণত হবার বৈপ্লবিক পরিবর্তনটির সূচনা হয়েছিলো। তার আগের প্রস্তুতিপর্বে আমাদের এই মুরেবেটের কাহিনীর কালে এই উর্বর সরু চাঁদ অঞ্চলে বন্য ফসল চাষের বাগান নির্ভর স্থায়ী বসবাসের যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছিল তাকে নাতুফিয়ান সংস্কৃতি বলা হয়। কৃষি বিপ্লবের অনেক আলামত এই সংস্কৃতির মধ্যেই ফুটে ওঠে।

জেরফ এল আহমারের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ চলেছে ১৯৯৫ সাল থেকে— জায়গাটি কৃত্রিম এক হ্রদের মধ্যে চলে যাবার ঠিক আগে আগে। এখানে বাড়ির পর বাড়ি উম্মোচিত হয়েছে কিন্তু সেগুলোর মধ্যে আটপৌরে গেরস্থালি আয়োজনের থেকে বেশি চোখে পড়েছে বাড়িগুলোর বড় মাপের সৌকর্য, গ্রামের মাঝখানে শস্যাগারের বড় আয়োজন, এবং আরো অবাক হবার মত ঘরের মেঝের নিচে মস্তকবিহীন মনুষ্য কঙ্কাল। এমনি অন্য এক বাড়িতে মেঝেতে বিশাল চারটি ষাঁড়ের মাথার কঙ্কাল যেগুলো মনে হয় ওই ঘরের দেয়ালে ঝুলানো ছিল। তাছাড়া পাওয়া গেছে ছোট ছোট পাথুরে পাটার ওপর খোদাই করা সাপ, শিকারি পাখি, শিকারি পশু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির এক দুর্বোধ্য চিত্রণ। এই সবকিছু মিলে জেরফ এল আহমারের এক ধরনের আদি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কেন্দ্র ভূমির রূপটিই প্রকাশ পেয়েছে— যেখানে বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্করের পূজাটাই যেন দেখা যাচ্ছে যার রাগ প্রশমনে নরবলির প্রথা থাকার সম্ভাবনাও বাদ দেয়া যাচ্ছেনা।

১৯৬০ এর দশকে তুরস্কের গোবেকলিতে মধ্যযুগের বাইজাইনটাইন সভ্যতার কিছু নিদর্শন আবিষ্কার হওয়াতে জায়গাটি প্রত্নতত্ত্ববিদদের নজরে প্রথম আসে। এরপর প্রায় ৩০ বছর অবহেলিত থাকার পর ১৯৯৪ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এখানকার কিছু ডিবির মত জায়গায় আরো অনেক প্রাচীন নতুন প্রস্তর যুগের কিছু ছিটেফোটা নিদর্শন খুঁজে পান। পরবর্তী পাঁচ সাত বছরের খননের মাধ্যমে এখানে প্রায় ১১ হাজার বছর আগের অদ্ভুত একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আবিষ্কার হয়েছে যার কেন্দ্রে রয়েছে অনেকগুলো আট ফুট উঁচু 'টি' অক্ষরের আকৃতির চিত্রিত স্তম্ভ। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এরকম বিরাট আকারের মানব-স্থাপনা খুব সম্ভব এই প্রথম। পুরো ওই নাতুফিয়ান অঞ্চল জুড়ে আবিস্কৃত বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক যোগাযোগও এভাবে স্পষ্ট হয়েছে— যার মধ্যে বন্য শস্য চাষের উন্নয়ন ও শস্যবীজ, বিশেষ করে গমের বীজের উন্নয়নটিও লক্ষ্যণীয়।

মুরেবেট থেকে এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে জেরফ এল আহমারে ও গোবেকলিতে তীর্থযাত্রার বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন আভাস থেকে। শেষোক্ত দুটি জায়গার কিছু স্থাপনা ও নিদর্শনকে বড় আকারের সমাবেশ ও আচার অনুষ্ঠানের উপযোগী বলে মনে হচ্ছে যা স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বড়। আর এর অনেকটাই বেশ রহস্যময়— সাদামাটা ব্যবসা-কেন্দ্র বা এমনি সাধারণ সমাবেশের সঙ্গে যা মেলেনা। অন্য দিকে ওখানকার স্তম্ভ ইত্যাদির সঙ্গে মিল আছে এমন রহস্যময় চিত্রণ সহ নানা নিদর্শন ও

শিল্পকর্ম বেশ দূরের অনেক লোকালয়ে পাওয়া গেছে যাও তীর্থযাত্রাকে ইঙ্গিত করে। গোবেকলির একমাত্র উৎস থেকে ওবসিডিয়ানের অলঙ্কার নানা জায়গায় পাওয়ার ব্যাপারটিও লক্ষণীয়।

প্রায় ১১ হাজার বছর আগের নাতুফিয়ান সংস্কৃতির নানা স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে তার উন্নত শিল্পকর্ম— বিশেষ করে ভাস্কর্যের প্রচুর নিদর্শন প্রায় অবিকৃত খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্য এটি ছিল একটি বিস্ময়— কারণ এ অঞ্চলে এই মানের শিল্পকর্ম একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার। তাছাড়া এই শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু আগেকার পৃথিবীর অন্য বিভিন্ন স্থানের শিল্প স্ফুরনের থেকে আলাদা। যেমন ইউরোপে শেষ বরফ যুগে যে অত্যন্ত উঁচু মানের শিল্পকর্ম দেখা দিয়েছিলো এবং বরফ যুগের অবসানেও সেখানে ও অন্যত্র এখনো বিশুদ্ধ শিকারি-সংগ্রাহক মানুষদের যে শিল্পকর্ম দেখা গেছে তার মূল বিষয় ছিল শিকারের পশু এবং এ পশুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। কিন্তু এই নাতুফিয়ান সংস্কৃতির এই শিল্পকর্মে প্রথম বিশেষ গুরুত্ব পেতে দেখা গেল মানুষে মানুষে বিশেষ করে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ককে। এমনকি মানুষ যে আরেক মানুষের জন্য সাংকেতিক বার্তা এঁকে রাখতে পারে, ম্যাজিক চিহ্ন সৃষ্টি করতে পারে, তাও প্রথম শিল্পকর্মে দেখা দিলো।

এর একটি অনন্য সৃষ্টি হলো আমাদের কাহিনীতে বর্ণিত নুড়ি পাথরের ওপর খোদাই করা সেই মানব-মানবীর গভীর আলিঙ্গনের মূর্তিটি। এটি প্যালেষ্টাইনে বেথেলহেমের কাছে একটি জায়গা আইন শাখরিতে পাওয়া গেছে একটি গুহায় আরো কিছু নিদর্শনের সঙ্গে। সেজন্য একে আইন শাখরি প্রেমিক যুগল বলা হয়। গুহাটি যে ১১ হাজার বছর আগের একটি নাতুফিয়ান বসত ছিল সেটি নিঃসন্দেহ। প্রেমিক যুগলের ছোট্ট মূর্তিটি তাই সে বসতের মধ্যে সামাজিক আচারের প্রয়োজনই মেটাচ্ছিল ধরে নেয়া যায়।

আমাদের কাহিনীতে বর্ণিত অন্য শিল্পকর্মগুলোও বিভিন্ন নাতুফিয়ান বসতের স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে— এপিঠে পাখি ওপিঠে সাংকেতিক চিহ্নের, আয়েসী নারী মূর্তির ইত্যাদি যে সব ছবির কথা বলে হয়েছে। আইন শাখরির প্রেমিক যুগলের মূর্তি এবং এই বিভিন্ন ভাস্কর্যগুলো এখন প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বিভিন্ন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

মুরেবেটে খনন

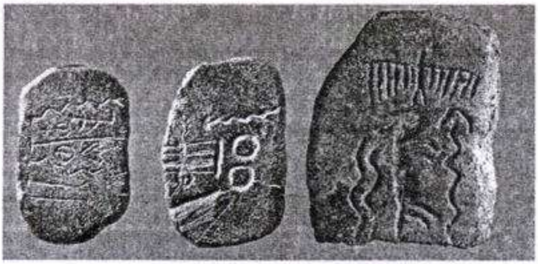

জেরফ এল আহ্‌মারে পাথরের চিত্রণে নানা প্রতীক

মুরেবেটের ছোট মূর্তি (পাথর)

গোবেকলির 'টি' আকৃতির স্তম্ভগুলো

আইন শাখরির আলিঙ্গনরত মানব-
মানবী (পাথরে খোদাই)

গোবেকলির স্তম্ভের চিত্রণ

ভারতের দমদমার আমদানী ঃ
১১ হাজার বছর আগে

ছোটনদী ঘেরা গ্রামটির বাসিন্দা অনেক হলেও মাছ ধরার ও কাছের বনে শিকার করার সুযোগ তাদের প্রচুর। কিন্তু একটি বড় সমস্যা হলো এখানে হাতিয়ার তৈরির পাথর নেই। পাথর আনতে আমদানী নামের মানুষটিকে দলেবলে গঙ্গা পেরিয়ে যেতে হয় সুদূর দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতে। সে এক দারুণ অভিযান।

উত্তর ভারতের গঙ্গা উপত্যকাটি একেবারেই সমতল বিশাল এলাকা। এখানে বর্তমান উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ থেকে ৭০ কিলোমিটারের মত উত্তর পূর্বে সুলতানপুর শহরের কাছে দমদমায় এ গ্রামটি ছিল আজ থেকে প্রায় ১১ হাজার বছর আগে। গ্রামের এদিকটি ৪০-৫০টি বৃত্তাকার বাড়ি দিয়ে তৈরি। কিছু দূরে এরকম আরো বাড়ি রয়েছে— বেশ ঘন হয়ে। সব মিলে দমদমায় শ' পাঁচেক মানুষের বাস হতে পারে। এই বিশাল সমতল জায়গার অধিকাংশের মত এ গ্রামেরও চারিদিকে গাছ গাছড়ায় ভরা— কোথাও ঘন বন, কোথাও ততটা ঘন নয়। দুটি ছোট নদীর মাঝখানে দমদমা জায়গাটি নিজে অবশ্য বেশ খোলামেলা, এখানে মানব বসতিটিও বেশ পুরানো। ওই বনে শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবে সারা বছরেই খাদ্যের যোগান হতে পারে বলে মানুষ এখানে স্থায়ী ভাবেই থাকে— মৌসুমী অভিবাসনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনযাত্রা এখানে বেশ কঠিন। বনে উদ্ভিজ খাদ্য যা পাওয়া যায় তা একটু রুক্ষ ধরনের— বন্য শস্য, ডাটা জাতীয় সবজি, শিকড়, ফল। বনে শিকার করার মত পশু রয়েছে, তবে শিকারের অস্ত্র তৈরির যে প্রধান কাঁচামাল সেই উপযুক্ত পাথর এখানে খুব দুর্লভ, দক্ষিণে অনেক দূরদেশে পাহাড়ি এলাকা থেকে আনতে হয়। পাথরের বিকল্প হিসেবে অবশ্য পশুর হাড়ের হাতিয়ার তৈরি হয়, তবে তার জন্য উপযুক্ত হাড়ও কষ্ট করে যোগাড় করতে হয়।

দমদমার অধিকাংশ মানুষকে কখনো বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে না হলেও বেশ ক'জন মানুষ এখানে আছে যাদের কাজই হচ্ছে হাতিয়ার তৈরির

ওইসব সামগ্রী পাথর বা হাড় দূর থেকে আনা। এটি তারা নিয়মিত না করলে এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা চালু রাখা খুব কঠিন হতো। তাই ওরা গ্রামে সবার কাছে বেশ জনপ্রিয়। ওদের মধ্যে নেতাগোছের এক জনের তো নামই হয়ে গেছে আমদানী। অনেকটা সময় তাকে গ্রামে দেখা না গেলেও তার পুরো পরিবার গ্রামে কিছু বাড়তি খাতির পায়। পরিবারের কারো সঙ্গে দেখা হলেই সবাই জিজ্ঞেস করে আমদানীর খবর কী? যে দল নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে সে দক্ষিণে বিন্ধ্য পার্বত্য এলাকায় পাথর সংগ্রহে গেছে তারা কখন ফিরবে, ইত্যাদি। তাদের পাথর নিয়ে আসার ওপর নির্ভর করবে সঠিক সময়ে সবার জন্য নানা হাতিয়ারের যোগান ঘটবে কিনা। শিকারের জন্য তীর, বর্শা এসবের ব্যাপার তো রয়েছেই, ঘরে বাইরে ব্যবহারের জন্য নানা কাটাচেরা, ছিলা, গর্ত করা, ছিদ্র করা সব কাজের হাতিয়ারের যোগানটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাথরের জন্য এসব যাওয়া আসা ছাড়াও আমদানীর আর একটি বড় কাজ হলো শীতের পরেপরে আশপাশের বনগুলোতে তন্ন তন্ন করে খুঁজে মৃত বড় বড় পশু বিশেষ করে হাতি, গণ্ডার, গৌরের (ভারতীয় বাইসন) হাড় সংগ্রহ করা। ওই সব জন্তু প্রচুর পরিমাণে উত্তরের তরাই অঞ্চল থেকে সময় সময় এদিকে চলে আসে এবং আসা যাওয়ার পথে একটি অংশ মারা পড়ে। দমদমার মানুষের জন্য পাথরের বিকল্প হাতিয়ার তৈরির উপাদান হিসেবে এ হাড়ের মূল্য অনেক।

আমদানী নিজে বাড়িতে সব সময় না থাকলেও তার পরিবারের পরিবেশ বেশ জমজমাট। বেশ বড়সড় দুটি গোলাকার ঘর তাদের। এতে বয়স্ক বাবা মা দুজনেই আছে, আরো আছে বৌ, নিজের চার ছেলেমেয়ে, তার সদ্য বিবাহিত ছোট ভাই তার বৌ সহ। আমদানীর বাবার বয়স চল্লিশের বেশি। তাকে বেশ দীর্ঘজীবীই বলতে হবে— কারণ, এ অঞ্চলে পঁয়ত্রিশের ওপরে পুরুষ স্ত্রী কাউকেই খুব বেশি বাঁচতে দেখা যায়না— ত্রিশের কম বয়সেও স্বাভাবিক কারণে মারা যাওয়াটি অহরহ ঘটে। আমদানী ওই বাইরে সফরে যাওয়ার কাজটি শুরু করেছিলো তের চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই— তখন তার বাবার সঙ্গে দলে যেতো। কাজটি কয়েক পুরুষ ধরেই তারা করছে। অন্য সবার মত ছোটখাট শিকারের কাজ যে পরিবারের সদস্যরা দৈনন্দিন করছেনা তা নয়, তবে তাদের জীবন প্রধানত আবর্তিত হচ্ছে ওই পাথরের ও হাড়ের হাতিয়ার-সামগ্রী যোগাড় করে তার সরবরাহ নিশ্চিত করার কাজে। তাই আমদানী নিজে সফরে থাকলেও বাড়ির আঙ্গিনায় প্রায়ই মানুষের আনাগোনা ঘটে— যুৎসই কিছু পাথর বা হাড় কিনবে বলে। স্ত্রী-ছেলে-বুড়ো সহ পরিবারের নানা জনকে দেখা যায় সংগৃহীত এরকম জিনিসগুলো সাইজ ও ব্যবহারের বিভিন্নতা হিসেবে আলাদা আলাদা করে বাছাই করে রাখতে। হাতিয়ার তৈরির কাজটির সঙ্গেও তারা বেশ জড়িত আছে। তবে সত্যিকার উঁচু মানের হাতিয়ার তৈরি দেখতে গেলে এখানে নয়, যেতে হবে কাছেই দু'একটি কারিগর পরিবারের বাড়িতে।

দমদমার বাড়িগুলো অনেকটা গোল তাঁবুর মতো— বাড়ি তৈরিতে নির্মাণ সামগ্রীর প্রায় সবই এসেছে বন থেকে। সব সমান সাইজের শাল কাছের মতো থামগুলো বৃত্তাকারে মাটিতে গাড়া, যেগুলো দেয়াল ও ছাদের ভার বহন করছে। সরু ডাল আর বাঁশের বেড়া বানিয়েই দেয়াল আর ছাদের মূল কাঠামো তৈরি হয়েছে। আর তার সূক্ষ্ম ফাঁকগুলো ভরাট করছে উদ্ভিদ আঁশ, শন ইত্যাদি। ছাদের ছাউনিতে পাড়াগায়ের চিরন্তন খড়-শনের ছাউনি বল্‌লে ফুরিয়ে যায়। প্রত্যেকবার বর্ষার আগে ছাদটি আবার বেশ ভাল করে ছেয়ে নিতে হয়, কারণ এ অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু সৃষ্ট বর্ষার উপদ্রবটি নেহাৎ কম নয়। ঘরের মেঝ বেশ ভাল করে দুরমুস করা শক্ত মাটির তৈরি। এর মধ্যে এক পাশে উনুন জ্বলছে, উনুনের আশপাশে ভাল করে কাদায় লেপা জায়গায় পর পর বেশ ক'টি গর্ত যেখানে খাবার সহ নানা জিনিস সংরক্ষণ করা আছে। খাবারের পদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি হলো হরিণের মাংস— তবে এক রকম হরিণ নয়, লাল হরিণ, কুকুরে হরিণ, চিতল হরিণ, সম্বর এরকম নানা রকম হরিণের মাংস। এর সঙ্গে প্রায়ই যোগ হয় বুনো শূয়োরের মাংস। অবশ্য সবই বন থেকে আসে বলে ওখানকার পশু সংখ্যার উত্থান পতনের সঙ্গে পাতে কোন মাংস জুটবে তা অনেকটা নির্ভর করে।

প্রায়ই দেখা যাচ্ছে দু'একটি বছর হরিণ ভাল পাওয়া গেলে আবার এক বছর তার মন্দা দেখা যাচ্ছে— হরিণ যেন সেবার আর এদিকটাতে থাকতে চাচ্ছেনা। তখন পাখি আর মাছ শিকারের উৎসাহটা বেড়ে যায়। নদীতে ছিপ ফেলে মাছ ধরা এবং তীর অথবা গুলতি দিয়ে মেরে বুনো মোরগ, ময়ূর ইত্যাদি পাখি শিকার তখন নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে পশু-পাখি-মাছ শিকারের ওপর নির্ভর করে উনুনের চার পাশে খেতে বসা গোটা পরিবারের পাতে কী আসবে তা। সমস্যা হলো দৈনন্দিন খাবারের যোগানের তুলনায় লোকসংখ্যা এখানে বেশি— তাই মাছমাংসের বাইরে অন্য খাবারের ওপরও নির্ভর করতে হয়। যেদিন সবাই খাবার মত যথেষ্ট হরিণের মাংস আগুনে ঝলসানো যায় সে দিনটি ওদের জন্য ফুর্তির দিনই বলতে হবে। সবদ্নিের নিত্যকার যে খাবার সেটি নিরামিষ— এও সবকিছু ওই বন থেকেই আসে। শাক-পাতা, ডাঁটা, শিকড়, কাঁচা ফল, বুনো শস্যদানা ইত্যাদিকে সব ভাল করে পিষে নেয়া হয় কাঠের তক্তার ওপর। তারপর তা কাঠের-বাঁশের খোলে রেখে কাঠকয়লার আগুনে গরম করে সব ঢেলে দেয়া হয় কাঠের তৈরি বাটির মধ্যে পানিতে। ওভাবে নানা রকম উদ্ভিজ খাবার মেশানো এই ঘন জাউটিই তাদের প্রধান ও নিত্যকার খাবার— তরকারির ঘন্টও বলা যায় একে। শিকার ছাড়াও এই সব উদ্ভিজ খাবার সংগ্রহ করতেও বনের মধ্যে অনেক সময় কাটাতে হয়। সাধারণত মেয়েরাই এটি করে থাকে। একেতো গেছো প্রকৃতির খাবার তাও এসবের রান্না যথেষ্ট হয়না সব মিলিয়ে চোট্‌টি যায় দাঁতের মাড়ির ওপর। দমদমার মানুষের দাঁতের অবস্থা কারোই তেমন ভাল নয়।

আমিষ হোক বা নিরামিষ হোক খাবার যোগাড়ে হাতিয়ারের বিকল্প নেই। কাজেই আমাদের আমদানীকে তার দলবল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় বেশির ভাগ সময়। সাধারণত গরমে অথবা শরতে ওরা পাথর সংগ্রহ করতে বিন্ধ্য পর্বত এলাকায় যায়। একে রীতিমত একটি অভিযান বলা যায়। বনের মধ্য দিয়ে পশু চলাচলের ফলে যে পথগুলো তৈরি হয় যাতায়তের জন্য সেগুলোই তাদের সম্বল। যেতে যেতে বনে যখন যা পাওয়া যায়— খরগোস, পাখি, শূয়োর মেরে খাওয়া, নইলে অন্তত ফলমূল। কখনো সুযোগ মত দু'একদিন বিশ্রামের জন্য ক্যাম্পিঙের তাঁবু ফেলে একটু ভাল মন্দ খাবার চেষ্টা করে। আমদানীদের দলে সাধারণত দশ বারো জনের বেশি মানুষ থাকেনা। এরকম অভিযানে এমন ছোট দলে চলাটাই সবদিক থেকে সুবিধাজনক। দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে এক পর্যায়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌছলে ওখানে এক আধটি গ্রামের সাক্ষাত হয়তো বা মেলে— তখন খাবার দাবার পেতে সুবিধা হয়। তাছাড়া গঙ্গা পার হবার জন্যও স্থানীয় মানুষের সহায়তার দরকার হয়, গাছের গুড়িতে তৈরি নৌকা অথবা ভেলা ওদের কাছ থেকে যোগাড় করা যায়।

গঙ্গা পেরিয়ে আবার শুরু হয় তাদের দীর্ঘ যাত্রা যতক্ষণ না ধীরে ধীরে পাহাড়ী এলাকা দেখা দেয়। সব মিলে শ'দুয়েক কিলোমিটারেরও কিছু বেশি পথের ধাক্কা এই যাত্রা। আসলে দক্ষিণের গাঙ্গেয় উপত্যকা যেখানে শেষ হয়ে যায় বিন্ধ্যাচলের পাথুরে রুক্ষ মাটির ছোট ছোট পাহাড়ের শুরু সেখান থেকেই কিছুটা হয়ে যায়। আরো দক্ষিণে গিয়ে আমদানীর দল খুঁজতে থাকে তাদের পছন্দসই পাথর— ফ্লিন্ট, কোয়ার্টজ ইত্যাদি। এ অঞ্চলটি আসলে পাথরের স্বর্গ রাজ্য— তাই মনের মত পাথর সংগ্রহ করে আবার ফিরতি যাত্রা করতে তাদের বেশি দেরি হয়না। তবে কত পাথর আনতে পারবে তা নির্ভর করে কত ভার বহন করে আবার এতটা কঠিন পথ অতিক্রম করে দমদমায় ফেরত আসতে পারবে তার ওপর। খুব বড় পাথরের খন্ড নয়— ছোট বড় ডেলার আকারের পাথর তারা খোঁজে। যাওয়ার সময় পশু চামড়ার বড় বড় শক্ত ঝোলা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে ওরা। পাথর ভরে এগুলো কাঁধে-পিঠে ঝুলিয়ে বহন করে ফিরতে হবে ওদের। ফেরার পথ তাই যাওয়ার পথ থেকে অনেক বেশি পরিশ্রম সাপেক্ষ।

তবে পরিশ্রম সার্থক হয় যখন দেখে পুরো দমদমা গ্রাম অপেক্ষা করে আছে কখন আমদানীদের দল তাদের পাথরের মূল্যবান সংগ্রহ নিয়ে এসে হাজির হবে। অবশ্য এই দলটিই যে পাথর আনার একমাত্র দল তা নয়। এদিক থেকে আমদানীদের বেশ কিছু প্রতিযোগিতার সম্মূখীন হতে হয়। কারা ভাল পাথর আনতে পারে, তাড়াতাড়ি আনতে পারে তারাই ভাল দাম পাবে। খাবার দাবার, চামড়া, হাড়, সুতা, পোষাক, অলঙ্কার, নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি নানা জিনিসের বিনিময়েই চলে এসব লেনদেন। আমদানী শুধু পাথর সংগ্রহ অভিযানের নেতৃত্ব দেয়াতেই পটু নয়, সে পাকা ব্যবসায়ী, ওদের পুরো পরিবারই পাথরের, হাড়ের, এবং এসবের তৈরি হাতিয়ারের ব্যবসায় নাম করেছে।

দমদমার অন্যান্য পাথর সংগ্রাহকরাই আমদানীদের একমাত্র প্রতিযোগী নয়। এক্ষেত্রে কিছুটা দূরত্বে থাকা অন্য দুটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে আরো প্রতিযোগী রয়েছে তাদের। এর একটির নাম মহাদহ এবং অন্যটির সরাই-নহর। দুইটাই দুটি বাওড়ের পারে অবস্থিত। আগে ছোট নদী ছিল, স্রোতের অভাবে মরে গিয়ে নদীর এই শাখাটি এখন ধনুকাকৃতি প্রবাহহীন হ্রদ বা বাওড়ে পরিণত হয়েছে। এগুলো বাওড় হওয়াতে কোন কোন দিকে গ্রামবাসীদের বরং সুবিধাই হয়ে গেছে। ওই হ্রদগুলো মাছের ও অন্য মাৎস্য সম্পদের ভাল আকরে পরিণত হয়েছে। মহাদহে এবং সরাই-নহরে তাই পশু শিকার তো দমদমার মত চলেই, তবে মাছ পাওয়া যায় অনেক বেশি। এ গ্রাম দুটির তুলনামূলক সমৃদ্ধির কারণটি এখানেই। তাছাড়া শামুক-ঝিনুক যা এখানে পাওয়া যায় তা দিয়ে ভাল অলঙ্কার তৈরি হয়। দূরে অলঙ্কারের ব্যবসা করতে গিয়ে মহাদহ আর সরাই-নহরের অনেকে কিন্তু বিন্ধ্য থেকে আনা পাথরের ব্যবসায়ও পারদর্শী হয়ে ওঠেছে। ওদেরো কেউ কেউ এখন চলে যাচ্ছে বিন্ধ্যতে পাথর সংগ্রহে, এবং সে পাথরের একটি অংশ বিক্রি করছে দমদমাতে যেখানে পাথরের চাহিদা বেশি। আমদানীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটি তৈরি হয়েছে এখানেই।

আমদানীর ভাই এবং ওর ভাইয়ের বৌ ভাল হাতিয়ার তৈরি করতে পারে। তবে হাতিয়ার তৈরির আরো সৌকর্য দেখতে গেলে যেতে হয় ওদের কয়েক বাড়ি পরের তাদেরই বন্ধু কারিগরের বাড়িতে। পাথর সমৃদ্ধ জায়গাগুলোতে তৈরি হাতিয়ার বা অস্ত্র যারা দেখেছে তাদের কাছে দমদমায় তৈরি হাতিয়ারগুলোকে খুবই ছোট মনে হবে। এমনিতেই যুগটি হলো ক্ষুদ্র হাতিয়ারের— নানা বিশেষ কাজের জন্য পাথরের সূক্ষ্ম কাজে একেবারে সেই প্রয়োজনের মাপে হাতিয়ার তৈরি করাটাই নিয়ম। এখানে এটি করা হয় খুবই সাবধানে— কারণ নষ্ট করার মত পাথর এখানে নেই। তৈরি করতে নষ্ট হয়ে যাওয়া, বা আধাআধি তৈরি হওয়া ফেলে দেয়া পাথরের স্তুপ যা অন্য অনেক জায়গায় দেখা যায়, এখানে তার দেখা মেলা ভার। ভেঙ্গে ভেঙ্গে বের করা পাথরকুচিগুলোর প্রত্যেকটিকে বিশেষ বিশেষ রূপ দেয়া হচ্ছে— ছোট ছুরি, চামড়া ছিলার ব্লেড, ত্রিভুজের মত তীরের মাথা, খাঁজ কাটা হারপুনের মাথা ইত্যাদি। মূল পাথরটিকেও কাজে লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে হাতলের সঙ্গে লাগিয়ে ছোট কাজের হাতুড়ি হিসেবে। একটু বড় হাতিয়ার তৈরি করতে পাথরের অভাবে বড় পশু-হাড়ের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। আঘাত করার বা ছেঁচার মুগুর থেকে শুরু করে বর্শা, হারপুন, অন্য হাতিয়ারের সুচালো অগ্রভাগ এই সব দিব্যি হাড় দিয়ে তৈরি হচ্ছে। তা ছাড়া অনেক ধারালো অস্ত্র, ব্লেড, ছুরি তৈরি হচ্ছে হাড়ের। বড় হাড়ের খুঁটি ও পাটাতন বানিয়ে কিছু আসবাবও তৈরি হচ্ছে।

যে সব পশু নিত্য শিকার করা হচ্ছে সেই হরিণ, শূয়োর ইত্যাদির হাড় ছোট; সেগুলোর অভাব নেই বটে কিন্তু তা দিয়ে হাতিয়ার তৈরির সুযোগ কম। ভাল হাতিয়ার তৈরি করতে হলে বিশালাকার জন্তুগুলোর হাড় প্রয়োজন। ঠিক দমদমার

কাছের বনে না হলেও, একটু দূরে আরো ঘন বনে গেলে শীতকালে দেখা মেলে হাতি, গৌর, গণ্ডার, বন্য গরু, বুনো দাঁতালো শূয়োর, ইত্যাদি বিশালদেহীদের। এরা উত্তরে তরাই অঞ্চল থেকে (বর্তমান নেপাল সীমান্ত) শীতকালে এদিকে চলে আসে, বসন্তে আবার ফেরত যায়। এদেরকে শিকার করে খাওয়ার বা এদের হাড়, চামড়া ইত্যাদির ব্যবহার করার সুযোগ দমদমার মানুষের কম। ওরা ওই রকম দলবদ্ধ বৃহদাকার শিকারে অভ্যস্তও নয়, আর সে রকম হাতিয়ারও তাদের নেই। ওরা বরং খোঁজ করে মরে যাওয়া এ সব পশুর হাড়। শীতকালেও তাই আমদানীদের দলের কাজ ফুরিয়ে যায়না, তারা তখন বনের মধ্যে দূরে দূরে চলে যায় হাতি বা গৌর বা এমনি অন্য পশু কোথায় মরে পড়ে আছে সেই সন্ধান নিতে। তরাই থেকে অভিবাসনে আসা-যাওয়ার পথটি এসব পশুর জন্য বেশ কিছু বিপজ্জনক হয়। পথে দুর্ঘটনা, হিংস্র পশুর আক্রমণ ইত্যাদি হরদম ঘটছে, মৃতদেহ অনেক দিন হয়তো পড়ে থাকে। বনের মৃতভোজীরা— শকুন, হায়েনা, ডালকুকুর হয়তো ইতোমধ্যেই খেয়ে তাদের কঙ্কালটুকু শুধু অবশিষ্ট রাখে। কোন সময় আরো তাজা মৃতদেহ যদি মেলে— তখন চামড়া, চর্বি এগুলোও সংগ্রহ করা যায়।

আমদানী ও তার দল শীতকালে যখন বনে হাড় সংগ্রহ অভিযানে যায় তখন এই সব দিকেই তাদের লক্ষ্য থাকে। প্রথমে তাদের দেখতে হয় এবার তরাই থেকে আসা কোন জন্তুরা বনের কোন দিকটাতে বেশি হানা দিয়েছে। তাদের অভিজ্ঞ চোখে নানা আলামত থেকে এটি ধরা পড়ে। যেমন হাতি কী ভাবে একটি অঞ্চলের ঝোপঝাড় গাছপালাকে দুমড়ে মুচড়ে যায় সেটি দেখে ওরা বুঝতে পারে হাতির দলের আনাগোনা কোন দিকে, অথবা দাঁতালো বুনো শূয়োর যেভাবে শিকড় খোঁড়ার জন্য মাটি ওলট পালট করে— তাতেই তাদের সন্ধান মেলে। তা ছাড়া এক একটি পশুর মলের আধিক্য দেখেও টের পাওয়া যায় সেই পশুর উপস্থিতি। যেখানে তাদের চলাচল, কাজকর্ম বেশি মৃতদেহ পাওয়ার সম্ভাবনা ওদিকেই থাকে বেশি। কাছে গেলে অন্যান্য পশুর আতঙ্কিত আওয়াজ, মৃতভোজী প্রাণী শকুন ইত্যাদির প্রাচুর্য এসবও দেখিয়ে দেয় যে এদিকে কিছুটা তাজা মৃতদেহ রয়েছে। আর পুরানো কঙ্কালতো নানা জায়গাতেই পাওয়া যেতে পারে। এভাবে প্রত্যেক শীত মৌসুমে সংগৃহীত হাড়ও দমদমার হাতিয়ারের চাহিদা অনেকখানি মেটায়।

দৈনন্দিন কাজের সময় দমদমার সাধারণ মানুষকে পাওয়া যায় তিনটি এলাকার যে কোনটিতে। প্রথমটি হলো যেখানে ওই খড়-শন দিয়ে ছাওয়া গাছ বাঁশ দিয়ে তৈরি বেশ ঘন হয়ে বৃত্তাকার বাড়িগুলো রয়েছে। অল্প কিছু উঠান আর রাস্তার কথা ছেড়ে দিলে ওদিকে সবই বাড়ি— খাওয়া দাওয়া, অবসরে আড্ডা দেয়া, ঘুমানো আর কোথাও কোথাও হাতিয়ার তৈরি, গার্হস্থ্য-আসবাব তৈরি, এগুলোর ব্যবসা— ইত্যাদিই এখানকার কাজ। তাছাড়া মূল্যবান সব জিনিস খাবারদাবার, পাথর, হাড়, হাতিয়ার, অলঙ্কার, আসবাব এসব জমিয়ে রাখার ব্যবস্থাও এখানটাতেই।

বাড়িগুলো থেকে বেশ একটু দূরে গাছপালা কেটে কিছুটা উন্মুক্ত করা একটি জায়গা হলো দ্বিতীয় কর্ম এলাকা— একে বলা যায় পশু কাটাকুটির জায়গা। প্রতিদিন যারা যেখানেই শিকার করুক— বেশির ভাগ শিকারকেই নিয়ে আসা হয় এখানে। এখানেই সেই শিকারের চামড়া ছিলে, তাকে কাটাকুটি করে মাংস, আভ্যন্তরীন অঙ্গ, মাথা, হাড় ইত্যাদি আলাদা করা হয়, এবং খাবার অংশগুলো নিয়ে যাওয়ার পর বাকি অংশের প্রক্রিয়াকরণের প্রাথমিক কাজগুলোও এখানে হয়। এভাবে চামড়া, হাতিয়ারের উপযোগী হাড়, সুতা তৈরির জন্য রগ ইত্যাদিকে উপযুক্ত করে নেয়া হয়। এসব কারণে এই এলাকাটিতে বর্জ্য ইত্যাদি জমতে থাকে এবং তাই পরিবেশও সব সময় ভাল থাকে না। তাই একে বাড়ি ঘর থেকে একটু দূরে আলাদা রাখা হয়েছে।

দমদমার তৃতীয় যে কর্ম এলাকাটি রয়েছে তা হলো গ্রামের কাছের নদীর পার। এটি হলো মাছ ধরার জায়গা। মাছ ধরা হয় সাধারণত জাল ও ছিপের সাহায্যে এবং সুবিধাজনক জায়গায় কিছু কিছু খাঁচার ফাঁদের সাহায্যে। দমদমার কাছে বেতঝাড় বা বাঁশ ঝাড়ের কমতি নেই; বনের মধ্যেও আছে, গ্রামের পাশেও আছে। সেখান থেকে সরু বাঁশ বা বেত দিয়ে ছিপ তৈরি করতে অসুবিধে হয়না। তা ছাড়া এসব সামগ্রী দিয়েই তৈরি করা হয় মাছ ধরার ফাঁদ। জালগুলো তৈরি হয় উদ্ভিজ আঁশের সরু দড়ি পাকিয়ে এবং তাতে গিট্টু দিয়ে দিয়ে। নদীর পারে পারে এ জাল পেতে রাখা হয়। সাধারণত অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা ওই দিকে ব্যস্ত থাকে— কিছুক্ষণ পর পর গিয়ে ছিপ, জাল, ফাঁদ এসব পরীক্ষা করে মাছ কিছু পড়লো কিনা দেখতে। অলঙ্কার তৈরির জন্য এখানে শামুক-ঝিনুক খোঁজারও কাজও রয়েছে।

বাড়ির ভেতরের উনুনের আশপাশটিও কিন্তু কম কর্মমুখর এলাকা নয়। শিকার আর, মাছ ধরার ওপর সব সময় নির্ভর করা যায়না। প্রতিদিন পরিবারের নানাজন বন থেকে যা সংগ্রহ করে আনছে মূল খাবারটি সেখান থেকেই আসছে। এগুলো পিষে, গুড়ো করে, উত্তপ্ত করে খাবারের উপযুক্ত করতে হয়। বড় পাথরের অভাবে শিল-পাটা, যাঁতা ইত্যাদি কম হলেও একেবারে নেই তা বলা যাবেনা। একটার ওপর আরেকটি পাথর রেখে যাঁতা তৈরি করে রাখতে দেখা যায়। উনুনের আশপাশে যে সব তৈজস আছে তার মধ্যে কাদায় তৈরি খানিকটা পোড়া ঘটিবাটি রয়েছে। এগুলোকে ঠিক পোড়া মাটির পটারির পর্যায়ে ফেলা যাবেনা, কারণ পোড়াটি খুবই অসম্পূর্ণ। তবে উনুনের ওপর রাখা এসব খানিক পোড়া কাদার তাওয়ার ওপর রেখে খাবারকে একরকম সেঁকার কাজ চলে। আবার বুনো শস্য ইত্যাদি জমা করে রাখার জন্যও এরকম আধ-পোড়া ঘড়া, বয়াম ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। বাদবাকি তৈজস সব বাঁশ-বেত-কাঠের তৈরি। এ দিয়েও নানা কাজ চলে যাচ্ছে— যেমন কাঠের বাটির মধ্য থেকে গরম জাউ খাওয়া, বাঁশের মধ্যে রেখে কম আঁচে খাবার গরম করা।

বাড়ির আশপাশে, এমন কি বাড়ির ভেতরেই আর একটি কাজ কখনো কখনো দু:খজনক ভাবে করতে হয়— তা হলো মৃত আপন জনকে কবর দেয়া। কাছে কবর

দেয়ার মধ্যে অবশ্য মৃত শিশুরা পড়েনা। শিশুমৃত্যু এত বেশি যে দমদমার মানুষ একে খুব নিয়মিত ঘটনা মনে করে তাই বয়স্কদের জন্য কবর দেয়ার যে নিয়ম ও আনুষ্ঠানিকতা আছে তা না মেনে মৃত শিশুদের গ্রামের বাইরে গণ কবরে সমাহিত করে। কিন্তু বাকিদের ব্যাপারে ওরা অত্যন্ত সযত্ন কবরের ব্যবস্থা করে। কবরগুলো দেয়া হয় সাধারণত বাড়ির সঙ্গের উঠানে বাইরের একটি উনুনের কাছে। কবরকে পাশে রেখেই উনুনের অনেক রান্নাবান্নার কাজ চলে। কবর দেয়ার সুনির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয়— কীভাবে শোয়ানো হবে, কোনমুখী করে শোয়ানো হবে ইত্যাদি। তাছাড়া মৃতকে সাধ্যমত অলঙ্কারেও সাজিয়ে দেয়া হয়। পাথর মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও কবর দেবার সময় সুন্দর পাথরের মালা, নেকলেস ইত্যাদি গায়ে দেয়া হয়, সঙ্গে পাথরের দু'একটি হাতিয়ারও— যেমন তীরের মাথা। শামুক ঝিনুকের তৈরি অলঙ্কারেও সাজানো হয় মৃতদেহ। এই অলঙ্কারও দমদমায় যে খুব সহজলভ্য তা নয়। তবুও মৃতের ক্ষেত্রে সবাইকেই অলঙ্কারে সাজিয়ে দেয়া নিয়ম। আর একটি রীতি হলে কবর খুঁড়ে প্রথমে তার মধ্যে অল্প কিছু কাঠ-পাতা পুড়ে কিছুটা ধিকি ধিকি আগুন জ্বালিয়ে রেখে পরে ওসব কিছুকে ছাইয়ে পরিণত করা। ওই গরম ছাইয়ের ওপরই মৃতদেহকে তার অলঙ্কারাদি নিয়ে শুইয়ে দেয়া হয়। ওরা মনে করে মৃতের জন্য এভাবে কবরটি পবিত্র ও আরামদায়ক হয়ে ওঠে।

স্থায়ী ঘনবসতির একটি কুফল দেখা যায় এখানে সেটি হলো পরস্পর কলহ— যা প্রায়শ হিংসাত্মক কাজে পরিণত হয়। যে তীর-ধনুক শিকারের কাজের জন্য তৈরি হয় তাকে অন্য মানুষের ওপরও তখন তারা প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেনা। প্রতি বছরই গ্রামে এরকম কলহে মানুষ মারা যাচ্ছে। আমদানীরা যে সব সময় দূরদেশে যাচ্ছে, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের সঙ্গে থাকতে হয়।

বাড়িগুলোর নির্মাণ সামগ্রী এবং ভেতরেও চুলার উপস্থিতির কারণে অগ্নিকান্ডের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কয়েক বছর পর পর বড় অগ্নিকান্ডে পুরো গ্রাম জ্বলে গেছে এমন ঘটনা প্রচুর। এমনটি ঘটলে একই জায়গায় নতুন করে আবার ঘর বাঁধতে হয়। আসবাব, হাতিয়ার, তৈজসপত্রের অধিকাংশ কাঠ বাঁশের তৈরি বলে আগুনে এসবও অনেকটা পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। হাড় ও পাথরের হাতিয়ারও নষ্ট হয়। যদিও প্রায় সর্বস্ব হারিয়ে সব কিছু আবার নতুন করে করতে গিয়ে মানুষের অনেক দুর্ভোগ ঘটে, তবুও ওরকম আগুন দমদমাকে চরম পরিবেশ দূষণ ও মহামারীর স্থায়ীত্ব থেকে রক্ষা করছে।

গাঙ্গেয় উপত্যাকার যে জায়গায় দমদমা রয়েছে প্রত্যেক বছর বর্ষার প্রভাব এখানে ভাল মতই পড়ে। গঙ্গার পানি ফুলে উঠে তা দমদমার ছোট নদীতে পৌঁছে তাকেও প্লাবিত করে ফলে। চারিদিকের নিচু জায়গাগুলো পানিতে ডুবে গেলে কিছুদিনের জন্য দমদমা একটি জলবেষ্টিত দ্বীপে পরিণত হয়। এ সময়টিই খুব কষ্টে কাটে মানুষের— শিকারে যাওয়া, উদ্ভিজ খাবার সংগ্রহে যাওয়া তখন খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তা অল্প কিছুদিনের জন্য। এরপর পানি নেমে গেলে নব উদ্যমে আবার

সবকিছু শুরু হয়ে যায়। বনে নতুন গাছ গজায়, ঘাস গজায়, শিকারের প্রাণীর আনাগোনা বাড়ে। আমদানী আবার তৈরি হয়ে যায় বিন্ধ্য পর্বতের দিকে তার পাথর সংগ্রহের অভিযানে রওয়ানা হতে। রোগ-শোক, অগ্নিকান্ড, বন্যা কোন কিছুই আমদানীর কাজকে বেশী দিন থামিয়ে রাখেনা। দমদমার স্বার্থেই সেটি সম্ভব নয়।

* * *

প্রত্নতত্ত্ববিদরা ভারতের উত্তর প্রদেশের দমদমার মেসোলিথিক (মধ্য প্রস্তর যুগ) বসতটি আবিষ্কার করেছেন ১৯৭৮ সালে। কাছাকাছি প্রায় সমসাময়িক আরো দুটি বসত আবিষ্কৃত হয়েছিল এর কয়েক বছর আগে মহাদহ ও সরাই-নহর রাই নামক স্থানে। এখন এই সমতল ভূমিতে উত্তর প্রদেশের সাধারণ সব গ্রাম রয়েছে, ১১ হাজার বছর আগের ওই ঘন বনভূমির চিহ্ন মাত্র নেই । বহু পুরানো পশু-হাড়ের টুকরা ও মানুষের হাড় এখানে ওখানে পাওয়া যাওয়া থেকেই এগুলোকে প্রাচীন বসত বলে প্রথম সন্দেহ হয়। ১৯৮৭ সন পর্যন্ত পরিচালিত খনন কাজের ফলে উত্তর ভারতের মেসোলিথিক মানব বসতের এই বিরল নমুনা ক'টি চমৎকার ভাবে উন্মোচিত হয়েছে। তবে বাড়ির নির্মাণ সামগ্রী প্রায় পুরোপুরিই পচনশীল উদ্ভিদের হওয়াতে শুধু বৃত্তাকারে সাজানো বাড়ির খুঁটির গর্তগুলোর অস্তিত্ব থেকে বুঝে নিতে হয়েছে বাড়ির অবস্থান গুলোকে— নির্মাণের কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবে ওখানটিতেই মাটির ভেতরে স্তরে স্তরে দেড় মিটার পর্যন্ত গর্তে পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া ও ব্যবহৃত পশু-হাড়, আর কিছু কিছু পাথরের ক্ষুদ্র হাতিয়ার (মাইক্রোলিথ) বা তার অংশ। দমদমাসহ ওই তিনটি বসতের আবিষ্কৃত বড় নিদর্শনই হলো ওই পশু-হাড়।

প্রাপ্ত পশু-হাড় ও অন্যান্য জৈব বস্তু নিয়ে ল্যাবোরেটরিতে প্রচুর গবেষণা এর পর হয়েছে, হাড়ের অধিকাংশই পাওয়া গেছে ছোট ছোট ভাঙ্গা টুকরার আকারে। এরকম বহু হাজার টুকরার ওপর গবেষণায় কোনটি কোন পশুর বা পাখির হাড় তা নির্ণয় করা হয়েছে। দেখা গেছে ৭৭% হাড়ই স্তন্যপ্রায়ী পশুর, ১২% সরীসৃপের, ৯% পাখির এবং ১.২৫% মাছের। পশুর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক হলো নানা ধরনের হরিণের এবং তারপর সর্বোচ্চ হলো বুনো শূয়োরের। এগুলোর একটি বিশাল অংশের ওপর হাতিয়ারের কাটা দাগ আছে অথবা খাওয়ার চিহ্ন আছে। এসব পশুর হাড়ের প্রকৃতি দেখে বোঝা গেছে যে তাদের শিকার করা হয়েছে বছরের প্রায় সব রকম সময়ে। এতে বোঝা যায় যে বাসিন্দারা সারা বছরেই এখানেই বাস করতো— মৌসুম বিশেষে অভিবাসী হতো না। এখানে বাড়ির মধ্যে প্রচুর নানা রকম ইঁদুরের বিশেষ করে বান্ডিকূট ইঁদুরের হাড় পাওয়া গেছে। এই শেষোক্ত ইঁদুর নিয়মিত ভাবে মানুষের ফেলনা খাবার খেতে না পেলে বেঁচে থাকতে পারেনা। এতেও বোঝা যায় যে এখানে স্থায়ী মানব বসত ছিল। এখানে কোন পোষা গরু, ছাগল ইত্যাদির হাড় পাওয়া যায়নি। পোষা কুকুরেরও পাওয়া যায়নি। যে ধরনের গরু, ছাগল, কুকুরকে সহজে পোষ মানানো যায় সেগুলোর বন্য অবস্থার হাড়ও পাওয়া যায়নি।

ওই বসতগুলোতে শিকার করা এসব পশু-পাখির হাড় ছাড়াও বড় বড় প্রাণী র হাড়ের টুকরাও পাওয়া গেছে যারা এখানকার প্রাণী ছিলনা। এর মধ্যে আছে বন্য গরু, বাইসন , হাতি, গণ্ডার, বড় বন্য শূয়োর ইত্যাদি। মনে করা হচ্ছে এগুলো উত্তরে তরাই অঞ্চল

থেকে প্রতি শীতে ওদিকে আসতো, এদের হাড় হাতিয়ার তৈরির জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অধিকাংশ পশু-হাড় অন্তত এক পাশে পোড়া বা অঙ্গার অবস্থায় পাওয়া গেছে। এরা যে ভাল সংরক্ষিত হয়েছে তার একটি কারণ এটি। যে সব হাড় এক পাশে বা অংশত শুধু পোড়া, মনে হয় তা মাংস ঝলসে খাবার সময় পুড়েছে। এরকম হাড়ের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু অধিকাংশ হাড় চারিদিকে ভাল করে পোড়া, অনেকগুলো পুরো অঙ্গারায়িত। ঠিক তেমনি বাড়ির সীমানার মধ্যে অঙ্গারায়িত অবস্থায় কিছু তৈজস ও জিনিসপত্র পাওয়া গেছে— বাঁশ-কাঠ ইত্যাদির তৈরি ঝুড়ি, রান্নার বা খাবার পাত্র, সংরক্ষণ পাত্র ইত্যাদি। এ সব এমনিতে পচে যাওয়ার কথা। অঙ্গারায়িত হয়েছে বলেই এগুলো সংরক্ষিত হয়েছে এবং এগুলোর ব্যবহার আমরা জানতে পারছি। এভাবে প্রায় সামগ্রিক ভাবে সব হাড় ও তৈজসপত্র পুড়ে যেতে দেখে মনে করা হচ্ছে বাড়িগুলো ব্যাপক অগ্নিকান্ডে প্রায়ই জ্বলে যেতো।

পাথরের হাতিয়ারগুলো দেখে মনে হয় এগুলো মেসোলিথিক যুগের সাধারণ যে রকম ক্ষুদ্র পাথরের হাতিয়ার (মাইক্রোলিথ) তার চেয়েও খানিকটা ছোট। পাথরের হাতিয়ার তৈরির ফলে সাধারণত যে অনেক ফেলনা পাথরের চল্‌তা বর্জ্য হিসেবে দেখা যায় তাও খুব একটা এখানে দেখা যায়নি। সব কিছু থেকে মনে হয় এখানে পাথরের টানাটানি ছিল। বর্তমানেও এ অঞ্চলের কাছাকাছি কোন জায়গায় ব্যবহারযোগ্য পাথর নেই। হাতিয়ারগুলো বিন্ধ্য অঞ্চলের পাথর থেকেই তৈরি মনে হচ্ছে। স্পষ্টত সেগুলো ওখান থেকে আনতে হয়েছে। অন্য দিকে বড় পশুর হাড়ের হাতিয়ার ও অলঙ্কার পাওয়া গেছে— হাতির দাঁতেরও। পাথরে তৈরি তীরের যে অগ্রভাগ তা কোন কোন হরিণের হাড়ে বিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। তা থেকে শিকারের সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া গেছে। তাছাড়া কবর দেয়া মানুষের মাথার হাড়ে বিদ্ধ এরকম তীরের অগ্রভাগ পাওয়া গেছে। মানুষের নিজেদের মধ্যে হিংসাশ্রয়ী আক্রমণের নমুনা এতে মেলে।

দমদমার মানুষ যে স্থায়ী ভাবে থাকতো তার আর একটি প্রমাণ হলো ওই তিনটি বসতে প্রচুর পরিমাণে সযত্ন কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাড়ির একেবারে সংলগ্ন এসব কবরের কঙ্কালগুলোর ওপর গবেষণা করে শুধু কবর দেবার আচার, অভ্যাস, মৃতদেহকে অলঙ্কারে সাজিয়ে দেবার ব্যাপারই জানা যায়নি, বরং তখনকার সামাজিক জীবন ও স্বাস্থ্য জীবন সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা গেছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের কবর পাওয়া গেছে প্রায় সমান সমান- বেশির ভাগের বয়সই পঁয়ত্রিশের নিচে— মনে হয় এর বেশি খুব বেশি মানুষ তখন বাঁচতোনা। শিশুদের কবর না পাওয়া যাওয়াতে ধারণা করা হচ্ছে তাদেরকে গ্রামের বাইরে অন্যত্র কবর দেয়া হয়েছে। কবরের সবাই প্রায় স্বাস্থ্যহানি, দাঁতের প্রদাহ ইত্যাদি কারণে মারা গেছে। বড় ছোঁয়াচে অসুখ, মহামারী ইত্যাদিতে মৃত কারো কবর বসতের মধ্যে আবিস্কৃত হয়নি। তাতে মনে হয় ওদেরকেও গ্রামের বাইরে কবর দেয়া হয়েছে।

প্রত্নত্ত্ববিদরা পুরো এলাকা জরীপ করে ওই বসতের সঙ্গে তিনটি পৃথক কর্ম এলাকা চিহ্নিত করেছেন— গ্রামের মধ্যে বসত, এর একটু দূরে পশু কাটাকুটির জায়গা— যেখানে হাড় ইত্যাদির নিদর্শন থেকে ওখানকার কাজ বোঝা গেছে, আর নদীর ধারে মাছ ধরার জায়গা।

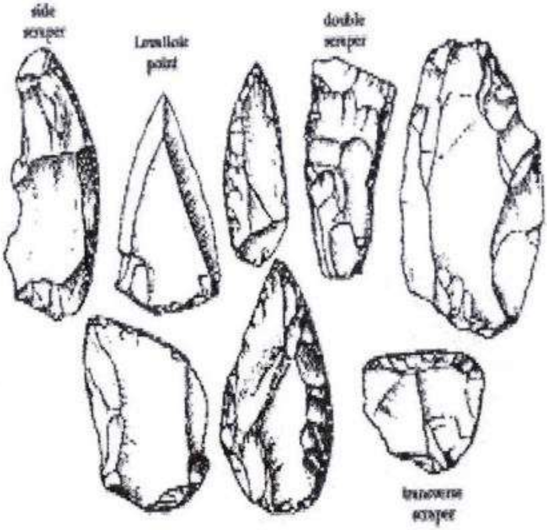

দমদমায় পাওয়া পাথরের হাতিয়ার

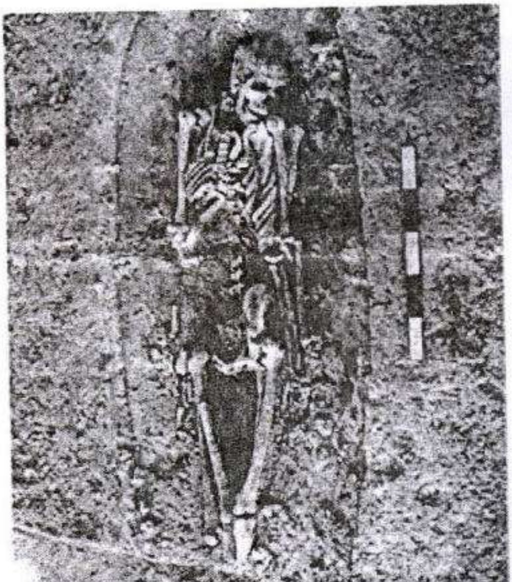

দমদমায় কবরে মৃতদেহের কঙ্কাল

জর্দানের বাইধার তানি তাঁতী ঃ
১০ হাজার বছর আগে

তানি তাঁতীর বাবা চাষও করতেন কাপড়ও বুনতেন। তানি কিন্তু পূর্ণ সময়ের জন্য তাঁতী। কারণ অন্যদের কৃষিতে ও পশুর খামারে তারও খাদ্য উৎপাদন হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ শ'লোকের জমজমাট শহরে তাই নতুন কিছু পেশায় নানা মানুষ কাজ করতে পারছে।

জন্মের পর বাবা-মা মেয়ের নাম দিয়েছিল তানি; কিন্তু পঁচিশ বছর বয়স হতে না হতেই তার নামের সঙ্গে সবাই তাঁতী কথাটি লাগিয়ে দিয়েছিল, এবং তা সঙ্গত কারণেই। জর্দান উপত্যাকার যে জনপদে তানিদের বাস তাকে আর শুধু একটি বসত বা গ্রাম বলার কোন উপায় নেই— সব অর্থেই এটি একটি শহর; হয়তো পৃথিবীর আদি শহরগুলোর একটি। বাইধা নামের ব্যতিক্রমী এই জনপদের বাসিন্দার সংখ্যা অন্তত পাঁচ শ'য়ের মতো হবে; অথচ এ অঞ্চলে মানুষের অন্যান্য অধিকাংশ বসতে বড় জোর দশ বারোটা বাড়ির বেশি নেই। ওই সব ছোট ছোট বসতিতে মানুষ মোটামুটি একটি ঘনিষ্ঠ সমাজ হিসেবে বাস করে যার অনেক কাজকর্ম এক সঙ্গে চলে; বাড়তি শিকার, বাড়তি ফসল সবার মধ্যে বন্টিত হয়, বেশির ভাগ আচার অনুষ্ঠান সবাই এক সঙ্গে করার চেষ্টা করে। এমনকি বাড়িগুলোও ভেতর দিয়েই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু বাইধার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা।

সময়ের তাগিদে এখানে গড়ে ওঠেছে রীতিমত একটি শহর। এখানকার বাড়িগুলো বেশ বড়; প্রায়গুলোই দোতলা, চারকোনা— গ্রামের বাড়ির মতো বৃত্তাকার নয়। আলাদা আলাদা বাড়িগুলো রাস্তার দু'পাশে সাজানো, অনেকগুলোর সামনে একটুখানি উঠোন ও তারপর অনুচ্চ পাথরের দেয়াল, যাতে আশপাশের খোলা জমি থেকে বেলে মাটি উড়ে এসে উঠোন না ভরাতে পারে। এমনি ধারার প্রায় আশিটার মতো বাড়ির একটির বাসিন্দা আমাদের তানি তাঁতী।

পাথর গেঁথে তোলা বাড়িটিতে এক তলার ছাদে সরু কাঠের গুড়ি পাশাপাশি বিছানো পাটাতনের ওপর রয়েছে দ্বিতীয় তলা, তারও ওপর পশু চামড়ার ও ডাল

পাতার আসল ছাদ। ওই দোতলায় রয়েছে তানি তাঁতী ও তার সহকর্মীদের তাঁতের কারখানা। তানি তার কৈশোর বয়স থেকেই এ কাপড় বোনার কাজে হাত পাকিয়েছে। এ কাজের কদর আছে, কারণ চামড়ার অথবা পশমী কাপড় এ অঞ্চলের মানুষ আর বেশি পরতে চায়না। যুগ যুগ ধরে পশু চামড়ার আর পশম থেকেই এসেছে মানুষের সব পোষাক। শীতের দিনে এগুলো বেশ জমকালো হয় আর গরমের দিনে নেহাত যেটুকু না হলে নয়। অবশ্য এ অঞ্চলে গরমের দিনে বন্য উদ্ভিদ আঁশের মধ্যে গিট্টুর পর গিট্টু দিয়ে এক রকম হালকা কাপড় তৈরির রীতিও প্রচলিত রয়েছে। এই আঁশ আসে কোন কোন ঘাস, বেত, শণ জাতীয় উদ্ভিদ থেকে। এরকম গিট্টু দিয়ে, বিনুনি গেঁথে, অথবা উপর-নিচ করে বুনে গিয়ে তা দিয়ে পর্দা, ঝুড়ি, থলে এসব তৈরির রীতিও চালু রয়েছে। এখানে মরু সাগরের কাছে একরকম আলকাতরা পাওয়া যায়। বেশ কিছু থলে বা ঝুড়ির ভেতরটায় গলিয়ে নেয়া আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে এতে পানি বা অন্য তরল বহনের ব্যবস্থাও এরা করতে পারে।

কিন্তু পোষাকের জন্য এখনকার নতুন ফ্যাশনে যে রকম কাপড়ের চাহিদা এখানে তুঙ্গে রয়েছে তা হলো পাকানো সুতায় তাঁতে বোনা কাপড়। ওই উদ্ভিজ আঁশগুলোকে এভাবে এক রকম টাকুর মাথায় পাকিয়ে সুতা তৈরির কৌশলটি বেশ কিছুদিন ধরে চালু ছিল, কিন্তু সে ভাবে জনপ্রিয় হয়নি। এখন ওদের ফসলের বাগানে একটি চমৎকার আঁশের গাছের চাষ হচ্ছে। প্রকৃতিতে এই আঁশের উদ্ভিদ বন্য হিসেবে পাওয়া গেলেও নিজেদের বাগানে এর চাষের অন্ধিসন্ধি ওরা শিখে ফেলেছে। এটি হলো ফ্ল্যাক্স, এর থেকে লিনেন সুতা তৈরি হয়। এ সুতা বুনে যে কাপড় তৈরি হয় চামড়ার বা পশমের কাপড় তার কাছে ঘেঁষতে পারেনা। এখন এই লিনেনের কাপড় ছাড়া বাইধার মানুষের মন ভরছেনা; বরং এখানকার কাপড় আশপাশের অনেক জায়গার মানুষও এসে নিয়ে যাচ্ছে। আর এখানেই তানি তাঁতীর হাত যশ।

এই যশের পেছনে আছে তার ছোট্ট হাত-তাঁত। ছোটখাট একটি কাঠের ফ্রেমে টানা সুতাগুলো বাঁধা আছে। এ সুতাগুলোর কয়েকটি কয়েকটি বাদ দিয়ে গিয়ে বাকিগুলোর অন্য প্রান্ত একত্র করা আছে। বাদ দেয়াগুলোর অন্য প্রান্ত আবার পৃথক ভাবে একত্র করা আছে। তানি একবার প্রথম গুচ্ছ ও অন্যবার দ্বিতীয় গুচ্ছ একটু তুলে নিয়ে উভয় গুচ্ছের ফাঁক দিয়ে মাকুতে জড়ানো আড় সুতা চালান করে দেয়। এরপর একে ভাল করে ইতোমধ্যে বোনা কাপড়ের সঙ্গে আঁট করে জমা করে নেয়। ছোট্ট মাকুটা ভারি সুন্দর— পশু-হাড় দিয়ে বেশ কায়দা করে তৈরি।

তানি এই তাঁত চালাতে শিখেছিলো তার মা ও বাবার কাছ থেকে। বাবা নিজেই এই তাঁত তৈরি করেন কাঠকে সুন্দর করে কেটে, তাকে বন্য লতার রশি দিয়ে বেঁধে। ওই পাথরের তৈরি কুঠার আর করাত দিয়ে কেমন আশ্চর্য দক্ষতার

সঙ্গে তিনি এই কাঠকে সাইজ করে, ছিমছাম করে একটি হাত-তাঁতের রূপ দেন সেটি না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সেই থেকে গোটা পরিবারের কাজ হয়ে পড়েছে এ তাঁত তৈরি করা এবং একই সঙ্গে সে তাঁতে কাপড় বোনা। কিছু কিছু তাঁত অন্যরাও কিনে নিয়ে যায়। তবে তানি যখন কিশোরী হিসেবে বেড়ে ওঠছিলো তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো তাঁতে কাপড় বোনাতে তানির যেরকম হাত, পারিবারে আর কারো সে রকম নয়। সেই থেকে তানি হয়ে পড়েছে তানি তাঁতী।

এখন তানির নিজের বাড়িই একটি তাঁত ঘরে পরিণত হয়েছে। বাইধাতে শহরের আবহ থাকার একটি ফল হলো এখানে খুব বেশি না হলেও অল্প কিছু মানুষ নিজের বিশেষ দক্ষতা ব্যবহার করে অনেকটাই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। তানির বাবা-মা তাঁত বানালেও, কাপড় বুনলেও, তাঁদের আসল কাজ অবশ্য চাষবাস ও গেরস্থালি করা। কিন্তু তানি ও তার স্বামীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়। ওদের দুই কিশোর ছেলের ক্ষেত্রেও তা নয়। তারা সবাই প্রায় পুরোপুরিই ব্যস্ত আছে সুতা পাকানো, কাপড় বোনা, এবং পোষাক তৈরির কাজে। এমনটি অবশ্য নয় যে শহরের সব মানুষ তাদের যাবতীয় কাপড় বা যাবতীয় পোষাক তাদের মত পেশাদারদের থেকে কিনছে। এখনো অধিকাংশ মানুষ নিজের বাগানের ফ্ল্যাক্স দিয়ে নিজেই সুতা পাকায়, নিজেই কাপড় বোনে, নিজেই পোষাক বানায়। কিন্তু তারপরও তানি তাঁতীর পরিবারের মতো কয়েকটি পরিবার রয়েছে যারা নিজেদের শিল্পের ওপর ভিত্তি করেই জীবিকা নির্বাহ করছে। এই কারণে শহরের প্রায় সবাই তাদেরকে খুব ভাল করে চেনে, কারণ ফ্যাশন মত কাপড় পেতে হলে নিজে না বানিয়ে ওদের কাছেই নিজেকে সোপর্দ করতে হয়। ফ্যাশনের পোষাক বলতে কী বোঝায় তা তাদের পরিবারের সবার গায়ের পোষাকের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

বাইধার আধা-শহুরে পরিবেশে পরিবার কেন্দ্রিক জীবনের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গেছে। বাইধা যখন অল্প কয়েক ঘর মানুষের গ্রাম ছিল তখন জীবন ছিল সমাজ-কেন্দ্রিক; কেউ শুধু নিজের পরিবারের ওপর নির্ভর করতোনা, যা করতো পুরো গ্রাম নিয়ে করতো, বিপদ-আপদও সবাই এক সঙ্গে সামাল দিতো। কিন্তু এখন প্রত্যেক পরিবারকে নিজ নিজ কাজকর্মের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। অবশ্য তানি তাঁতীর পরিবার বলতে তার বাবা-মা ও ভাইদের পরিবারের সঙ্গে একেবারেই একাত্ম— যদিও ওরা কাছাকাছি আলাদা বাড়িতে বাস করছে। এখনো তানির বাবাই মেয়েকে তাঁত তৈরিই শুধু করে দিচ্ছেন না, সব সময় ছোট খাট মেরামতও করছেন— ওদের কাজ বেশি পড়লে নিজেই সুতা পাকাতে হাত লাগাচ্ছেন।

এখানকার পোষাকের একটি বিশেষ দিক হলো এগুলো বেশ রঙিন। তানির ভাই কাছের বন থেকে এমন সব ফল ও বাকল নিয়ে আসে যার থেকে চমৎকার রঙ তৈরি হয়— বিশেষ করে সবুজ ও হলুদ রঙ। এই রঙ দিয়ে তানির লিনেন

সুতাগুলো রাঙানো হয়। ওভাবেই তারা পায় এমন খোলতাই রঙের পোষাক। তানির ভাই বনে ঘুরে ঘুরে রাঙাবার উপযুক্ত ফলমূল খুঁজে বের করতে যেমন ওস্তাদ তেমনি বিশেষ বিশেষ ধরনের আরক-মশলা সংগ্রহ করতেও পারদর্শী। প্রায় দিন সন্ধ্যার পর তানির তাঁত-ঘরে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়ে পারিবারিক আড্ডার আসর বসে। মাঝে মাঝে দু'একজন বন্ধু বান্ধব এসেও জোটে। আরক-মশলাগুলো কাজে লাগে সেখানেই।

ভাল-মন্দ নানা জিনিস খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা চলে। চাষবাসের কথা যেমন হয় তেমনি তাঁতের কথা, ব্যবসার কথা, শহরের নানা ঘটনার কথা চলে। তবে খাবারদাবার যাই হোক যে জিনিসটি সে সময় সবার চাই তা হলো ওই আরক-মশলার তৈরি পানীয়— বলা যায় এক রকমের হার্বাল চা। এটি বানাবার পদ্ধতিও ভারি অদ্ভুত। এ সময় ওরা সাধারণত বাড়ির নিচের তলায় মাঝখানের উনুনের চার ধারে মাদুর পেতে বসে। ছোট ছোট পাথরের ঘের দেয়া এই উনুন প্রায় সারাক্ষণই ধিকি ধিকি জ্বলে। ওখানে এক ধরনের সুগন্ধ কাঠ দেয়া থাকে যাতে ঘরটি কেমন একটি গন্ধের ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন থাকে। এতে পোকা মাকড়ের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়— আবহটি ওদের ভালই লাগে। উনুন থেকে অত্যন্ত উত্তপ্ত পাথর তুলে আলকাতরার প্রলেপ দেয়া ঝুড়িতে মশলা যোগ করা পানিতে তা ডুবিয়ে দেয়া হয়। এভাবে ওই ঝুড়িতেই তৈরি হয় সেই হার্বাল চা। সেখান থেকে ছোট ছোট পাথরের বাটিতে ঢেলে সেটিতে সবাই চুমুক দেয়।

সুতা, কাপড় ও পোষাক বিক্রির উপার্জন থেকে তানিরা ভালই জীবিকা চালাতে পারলেও ওদের বৃহত্তর পরিবারের জীবনযাত্রা অবশ্য এখনো কিছুটা আবর্তিত হয় চাষবাস নিয়ে। আর এখন চাষবাস বলতে শুধু বাগানের ফসল নয়, এক রকম পশুর খামারও বটে।

বাইধা শহরের ভেতরে ভেতরে রয়েছে চাষবাসের বাগান, আর শহরের চারিদিকে তো রয়েছেই। এসব বাগানে এখন যে গম, বার্লি, ডাল, মটরশুটি ইত্যাদি জন্মানো হয় তার সবই বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য বাছাই হতে হতে বন্য রূপের থেকে একেবারেই ভিন্ন হয়ে পড়েছে— বলা যায় কৃষকের কাছে পোষ মেনে তার মনমর্জি অনুযায়ীই এটি বড় হয়, ফসল দেয়— তার প্রকৃতিই হয়ে পড়েছে ওরকম, আদি প্রকৃতি হারিয়ে গেছে। কাজেই বাইধার চাষবাস এখন প্রায় পুরোটাই কৃষিজীবীর চাষবাস।

বাবা-মাদের চাষবাসের সুফল তানিরাও হাতে হাতেই পায়, গত মৌসুম থেকে বাবার পাঠানো প্রচুর শস্য তানি তাঁতীর বাড়ির ভেতরেই মজুদ রয়েছে। তানির স্বামী ও ভাই দু'জনেরই শিকারের সখ— কালেভদ্রে ওরা তীর-ধনুক নিয়ে আশপাশের বনে শিকারে যায়; দু'একটি গাজেল বা শূয়োর আর না হলে নিদেন পক্ষে শেয়াল, খরগোস একটা কিছু নিয়ে ফেরে। তবে ওরকম কিছু যে এখনো আছে তার একটি কারণ মানুষ এখন শিকার খুব কমই করে। শিকার না করেও

রুটির সঙ্গে মাংস তানিদের প্রায়ই পাতে পড়ে। সেটি আসে তাদের ছাগলের আর ভেড়ার খামার থেকে। খামার মানে এমন আহামরি কিছু নয়, বেশ কয়েকটা পোষা ছাগল বা ভেড়াকে বেড়ার ভেতর রেখে লালন পালন করা। বড় কথা হলো এসব ছাগল বা ভেড়া আর এখন আর বন্য নয়, পোষ মানা। সেটি এগুলোকে দেখলেই বোঝা যায়— যেমন সাইজে এরা বন্যগুলোর চেয়ে ছোট, হাবভাবে ক্ষিপ্রতা চঞ্চলতাও এগুলোর অনেক কম। বাইধার লোকেরা অবশ্য এভাবেই ওদের পেয়েছে পূর্বের ভিনদেশীদের থেকে যারা নাকি প্রথমে বেছে বেছে ওরকম গোবেচারা গোছের বন্য ছাগল আর বন্য ভেড়াগুলো নিয়ে এসে তাদেরকে মাঠে চরিয়ে, শীতের মৌসুমে যত্নে রেখে ঘাস-পাতা এনে খেতে দিয়ে পোষ মানিয়ে নিয়েছিল। এরকম খামারের ভেড়া বা ছাগল এখন বাইধাতেই কিনতে পাওয়া যায়— যাদের নিয়ে যে কেউ খামার গড়তে পারে। বাইধা শহরে এরকম খামার, বা ছাগলের বা ভেড়ার ঝাঁক নিয়ে চরাতে নিয়ে যাচ্ছে এমন দৃশ্য প্রায়শ দেখা যায়। তানিরা ওদের থেকে খাবার জন্য এগুলো কেনে। তবে বাবা-মা'র যে খামার সেখান থেকেও নিত্য মাংস পাঠানো হয়।

মূল কথা হলো এখন বাইধার মানুষ আর শিকারি-সংগ্রাহক নয়, বরং তারা প্রধানত কৃষিজীবী; আর তাদের মধ্যে তানি তাঁতীর মত কেউ কেউ অন্য রকম কর্মজীবী। কিন্তু কৃষির মজা হলো সব কিছুর উৎপাদন মানুষের আওতার মধ্যে হচ্ছে বলে যারা চাষবাস করছে শুধু তাদের চাহিদাই এই উৎপাদন মেটাচ্ছেনা, অন্য কাজ যারা করছে তাদের চাহিদাও মেটাচ্ছে। ফলে এখানে নানা নতুন নতুন কাজ সম্ভব হয়েছে। এখানে রঙ বেরঙের সুন্দর পোষাক তৈরিতেও কিছু মানুষ পূর্ণ সময় দিতে পারাতে কম বেশি সবাই ফ্যাশন দুরস্ত পোষাকের সখ মেটাতে পারছে। এ প্রক্রিয়াটি বাইধাতেই প্রথম শুরু হয়েছে সেটি বলা ঠিক হবেনা, ফসলের কৃষি আর পশুর খামার একটু একটু করে এ অঞ্চলের নানা জায়গায় গড়ে ওঠছিলো অনেক দিন থেকে।

আজ বাইধার মানুষের জন্য একটি বড়দিন— তানি তাঁতীর পরিবারের জন্যও। প্রায় ৫০০ জনের এই শহরটি এত বড় যে নিজেদের পরিবারের মধ্যেই তাদের কাটে। এর বাইরে সবাই যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অবশ্য কারো কারো পেশাটাই এমন যে অন্যদের সঙ্গে তাদের মেলামেশা করতে হয়, যেমন তানি তাঁতীর স্বামীকে তার পোষাক ব্যবসার জন্য। ওদের প্রতিবেশী এক জন যথেষ্ট বয়োবৃদ্ধ মানুষের ডাক্তারিতে হাতযশ আছে। তাই অসুখ বিসুখ হলে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে অনেকে আসে, আসার সময় তাঁর জন্য কিছু উপহার নিয়ে আসে— সাধারণত খাদ্যদ্রব্য উপহার। এ সব ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ কম। তবে আজকের দিনটি অন্য রকম— শহরের যে মুরব্বি পরিষদ রয়েছে তাদের ডাকা সভায় সবাইকে যেতে হবে। কাঁচা রাস্তার অলিগলি পার হয়ে তানি তার স্বামী ও ভাই হাজির হয়েছে শহরের একেবারে কেন্দ্র স্থলের একটি

চত্বরে। আসার সময়েই বেশ ভীড় দেখা গিয়েছে অনেকে বেশ সেজেগুজে এসেছে। আবার ছাগল চরাতে চরাতে ছাগল নিয়েই হাজির হয়েছে কেউ কেউ। আজ মনে হয় 'সকলের তরে সকলে আমরা' এমন মনোভাব নিয়ে সবাই আগ্রহ ভরে এসেছে।

কেন্দ্রীয় চত্বরটির সামনে পর পর চারটি পাথরে গড়া আয়তাকার ঘর— প্রত্যেকটি সমান এবং বেশ বড় আকারের। এগুলোর মেঝেতে নানা রকম শস্য স্তুপ করে রাখা হয়েছে। দেখলে বোঝা যায় যে এগুলো কেন্দ্রীয় শস্যাগার। তানি তাঁতীরা যখন ওখানে পৌঁছেছে চত্বরে তখন অনেক মানুষ অপেক্ষা করছে। ওই চারটি শস্যাগার যেন তাদের দেখার জন্য উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে। এখন অল্পকিছু শস্য এখানে রাখা আছে, তবে আগে যথেষ্ট ছিল তা বোঝা যায়। এখান থেকে ডানের দিকে তাকালে একটি বিশাল দালানের সুন্দর সামনের ভাগ দেখা যায়। এই দালানটি নানা দিক থেকে অনন্য। এখানকার আর কোন স্থাপনা এর ধারে কাছের আকারে নয়। এর বিরাট ফটকের মধ্য দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই যে কক্ষে ঢোকা হয় তা বিরাট একটি হল-ঘর যার মাঝখানে রয়েছে একটি স্তম্ভ। আশ্চর্যের বিষয় হলো এই হল-ঘরের দেয়াল, মেঝ, ছাদ সবকিছু পুরো চুনের ধবধবে সাদা পলেস্তরায় ঢাকা— সাদা রঙটি যেন পুরো ঘরটি থেকে ঠিকরে পড়ছে। শুধু দেয়ালের নিচের দিকে চারিদিকে বেড় দিয়ে একটি মোটা লাল রঙের ব্যান্ড। এই হল-ঘর পার হলে এমনি আর একটি বিশাল কক্ষ— এটিও একই ভাবে সাদা চুনের পলেস্তরা দেয়া, একই ভাবে দেয়ালের লাল ব্যান্ড। চোখ ধাঁধানো সাদার মধ্যে ঘরের মাঝখানে ছোট ছোট সাদা পাথরের বৃত্তের মধ্যে একটি উনুন। হল-ঘরটি শহরের মিলন কেন্দ্র। মজার ব্যাপার হলো এখানে বহু মানুষের জায়গা করে দেবার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু কোন অলঙ্করণ, কোন মূর্তি, কোন আসবাব— কিছুই এর মধ্যে নেই।

বয়স্করা বলেন এই দালান যখন তৈরি হচ্ছিল তখন শহরের অনেক মানুষকে এখানে কাজ করতে হয়েছে। শুধু চুনের পলেস্তরা করার জন্যই লেগেছে— কয়েক হাজার কিলো চুন। চুনাপাথর এনে আগুনে পুড়ে চুন তৈরি করে লাগাতে প্রয়োজন হয়েছিল বিরাট আয়োজনের— এর জন্য যে লাকড়ি লেগেছে সে ছিল এক স্মরণীয় ব্যাপার। সবাই যে হাত লাগিয়েছিলো, এখনো যে সবার বাগান ও খামার থেকে শস্য, পশু ইত্যাদি বছর বছর মুরব্বি পরিষদকে দিতে হয় এসবও একটি নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। আজ এসব ব্যাপার নিয়েই সবাইকে জানানো হবে।

মুরব্বি পরিষদ কেমন করে শহরের প্রভাবশালী লোকদের নিয়ে তৈরি হয়েছে সে খবর তানি তাঁতীর পরিবারের কেউ জানেনা। তবে তারা এ পরিষদের কথা মানে— কারণ শহরের শান্তি, শৃঙ্খলা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় না থাকলে তাদেরই ক্ষতি। ওই মুরব্বিরাই সবার সহায়তা নিয়ে এ কাজগুলোর আয়োজন করছেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা এলেন, সবার উদ্দেশ্যে কিছু বল্‌লেন। সামনে

শহরের ভাল মন্দ কী আসছে ধারণা দিলেন। খাদ্যাভাবের কারণে কাদেরকে শস্য সাহায্য দিতে হয়েছে তা জানালেন। কিছু কিছু খামার যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়ম মানছেনা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু যারা এসেছে তাদেরকে এসবে খুব মনোযোগী মনে হলোনা। শহরের সবাই এক জায়গায় এসেছে, অনেকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এই ফুর্তিতেই তারা রয়েছে। তারা বরং তাদের চাষবাস ঘর সংসারের কথা পরিচিতদের সঙ্গে বলার জন্যই বেশি উদগ্রীব হয়ে ছিলো। তানি তাঁতী ও তার স্বামীকে বাড়ি ফেরার জন্য তাড়া দিলো তার ভাই। কারণ আজ সবার কাজকর্ম বন্ধ বলে সে বাড়িতে একটু বড় আড্ডার ব্যবস্থা করেছে— বেশ কয়েক জন বন্ধুবান্ধবকে তার সেই আরকের হার্বাল চা পানের দাওয়াত দিয়েছে। সেই সঙ্গে তাদেরকে তার আরো সুন্দর ঘন সবুজ রঙের কাপড়ের কিছু স্যাম্পল দেখাবে।

*　　*　　*

১৯৫৮ সালের দিকে জর্দানের বিখ্যাত পাথুরে পাহাড় কেটে তৈরি রোমান আমলের মন্দির পেট্রার উদ্ঘাটনের কাজ করছিলেন এক দল প্রত্নতত্ত্ববিদ। সেখান থেকে প্রায় ঘন্টা খানেকের হাঁটা পথ দূরের বাইধার ১০ হাজার বছর আগের প্রাচীন শহরটি তাঁরাই ভাগ্যক্রমে আবিষ্কার করেন। ১৯৫৮ সালে খনন শুরু করে ১৯৮৩ সালে তা শেষ করার মধ্যে ওই কালের বাইধা শহরের ৬৫টি পৃথক বাড়ির ধ্বংসাবশেষ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর থেকে দুনিয়ার সর্বপ্রাচীন একটি শহরের মৌলিক গঠনটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেছে। শুধু তাই নয় চতুষ্কোন এ সব দোতালা বাড়ির আগে ওই জায়গাতেই যে বৃত্তাকার কুটিরের সমন্বয়ে ছোট গ্রাম ছিল তাও উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা বাইধা শহরের কেন্দ্রের সেই চুনের পলেস্তরা দেয়া বিরাট বিরাট কক্ষের সমন্বয়ে ভবনটি আবিষ্কার করে হতবাক হয়েছেন। অদ্ভুত বিশাল এই যে ভবন তার পুরো রোমাঞ্চ ওই ধবধবে সাদা পলেস্তরা আর তাতে ওই লাল ব্যান্ডটির মধ্যে— বাকিটা শুধু শূন্যতা। তাই আন্দাজ করা হয়েছে যে এটি শহরবাসীকে বিশেষ বিশেষ সময়ে জড়ো করার জন্যই তৈরি হয়েছিল। তৈরিতে যে শ্রম লেগেছে সেকথা বাদ দিলেও শুধু চুনের পলেস্তরা দিতেই আজকের হিসেব অনুযায়ী প্রয়োজন হয়েছে দুই হাজার কিলোগ্রাম চুন— যা তৈরি করতে পোড়াতে হয়েছে অন্তত নয় হাজার কিলোগ্রাম কাঠ। এটি অল্প মানুষের কাজও নয়, অল্প মানুষের সম্পদের ব্যাপারও নয়। শুধু ওই পলেস্তরার হিসেব থেকে বোঝা যায় যে একটি পৌর কর্তৃপক্ষ ওখানে ছিল যার আয়োজনে ও নেতৃত্বে (অথবা আদেশে) এই জাতীয় কেন্দ্রীয় স্থাপনা ও কাজগুলো সম্পন্ন হতো।

আমরা এ কাহিনীতে বাইধাকে দেখিয়েছি তানি তাঁতীর শহর হিসেবে, যেখানে মানুষ পোষাকের জন্য পশু চামড়া ও পশমের ওপর নির্ভর করছেনা, বরং উদ্ভিজ আঁশের পাকানো সুতা আর তা দিয়ে বোনা কাপড়ের ওপর নির্ভর করছে। এর প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদরা বাইধাতে পাননি— স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া যাওয়ার কথাও নয়, কারণ এ সংক্রান্ত সব কিছু আঁশ, সুতা, কাপড়, তাঁত সব সহজে পচনশীল জিনিস; বেশি দিন যার অস্থিত্ব থাকেনা, ১০ হাজার বছর তো নয়ই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাইধার থেকে

খানিকটা উত্তরে তখনকার বা এখনকার কোন জনবসতি থেকে দূরে ছোট্ট একটি গুহা নাহাল হেমারে কিছু প্রাচীন নিদর্শন ১৯৮৩ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে। বহুকালের সঞ্চিত বালিতে গুহাটি ঢাকা ছিল। কালক্রমে নাগেভ মরুভূমির অংশ এই স্থানের সঞ্চিত বালি এমন খটখটে শুষ্ক ছিল যে খননের ফলে এর থেকে বের হয়ে এসেছে কাপড়ের টুকরা, পাকানো সুতার বান্ডিল এবং ঝুড়ি। ওই দশ হাজার বছর আগের বাইধার সমসাময়িক হলেও এগুলো এখনো অবিকৃত আছে। ওরকম শুষ্ক পরিবেশে কোন ব্যাকটেরিয়া টিকতে পারেনা বলেই জিনিসগুলো পচতে পারেনি। যে কাপড় পাওয়া গেছে তা নানা রকম উদ্ভিজ আঁশের পাকানো সুতায় তৈরি। সুতার গঠন দেখে বোঝা যাচ্ছে তা পাকানোর পদ্ধতি। তেমনি বিভিন্ন টুকরায় কাপড়ের বুনোট দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এর কোনটা তৈরি হয়েছে গিট্টু দিয়ে দিয়ে, কোনটি ঘন ঘন সেলাই দেয়ার মত করে, আবার কোনটি সরাসরি হাত-তাঁতে বুনে। ঝুড়ি যা পাওয়া গেছে তাতে উদ্ভিজ আঁশের দড়িকে বিনুনির মত করে বুনে সেই বিনুনিগুলোকে একের সঙ্গে অন্যটা ঘন সংবদ্ধ ভাবে পেচিয়ে একটি পাত্রের আকৃতি দেয়া হয়েছে। এর ভেতরটাতে আলকাতরার মত জিনিসের প্রলেপ দিয়ে তাকে তরল ধারনের উপযুক্ত করা হয়েছে। কাছেই মরু সাগরের কিনারায় এরকম আলকাতরার সঞ্চয় এখনো রয়েছে। ওই ঝুড়ির কাছেই হাড়ের তৈরি উল বোনার কাঁটার মত জিনিস পাওয়া গেছে যা খুব সম্ভব ওই ঝুড়ি তৈরির কাজে হাতিয়ার ছিল। পাওয়া কাপড়ের নমুনার মধ্যে কয়েকটি ছিল লিনেনের। ছোট হাত-তাঁতের কোন নিদর্শন না থাকলেও হাড়ের তৈরি মাকুর মত জিনিস তাঁতের অস্থিত্বের প্রমাণ দেয়— তা ছাড়া লিনেন কাপড়ের বুনোনি থেকে এর অস্থিত্ব বোঝা যায়। আবার লিনেনের থেকেই বোঝা যায় যে তখন সেখানে ফ্ল্যাক্স আঁশের চাষ হতো।

নাহাল হেমারের গুহায় কাপড়গুলো টুকরা টুকরা ভাবে পাওয়া গিয়েছে— পুরো পোষাকের কোন নমুনা তাতে নেই। কিন্তু একটি শুধু ব্যতিক্রম— কাপড়ের তৈরি একটি টুপি পাওয়া গেছে যা অনেকটা ফানেল আকৃতি। উল্‌টো ফানেলের মত রেখে মাথায় পরলে নিচের দিকে যেখানে মাথায় ফিট করে তা ফানেলের মুখ, সেখানে একটি ফিতার মত রয়েছে, ওপরের দিকটা সরু হয়ে ওঠে গিয়ে একটি গোল ঝুঁটিতে গিয়ে শেষ হয়েছে; এই টুপিতে কপালের কাছের অংশে সবুজ একটি পাথর আটকানো রয়েছে অলঙ্কার হিসেবে। মনে হয় টুপিটি উৎসব বা অনুষ্ঠানে পরার টুপি— হয়তো সব কাপড়ই উৎসবের পোষাকের অংশ— জানার উপায় নেই। তবে বাইধার মত শহরের এত কাছে নাহাল হেমারে দৈবক্রমে রক্ষা পাওয়া কাপড়ের নমুনাগুলো থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি যে বাইধার মানুষের পোষাক এই কাপড়েই তৈরি হতো। শুধু তাই নয় এত মানুষের পোষাক নিত্য তৈরি করার পেছনে যে প্রচুর কাজ ও দক্ষতা প্রয়োজন তাও নিশ্চয়ই এ শহরের দৈনন্দিন জীবনে যথেষ্ট প্রভাব রাখতো— যার ফলে তানি তাঁতীদের পরিবারের মত বিশেষায়িত জীবিকার সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। উদ্ভিজ আঁশের তৈরি ঝুড়ির বিষয়টিও লক্ষণীয়— চামড়ার থলের বদলে এগুলো অনেক বেশি সৌকর্যময় এবং আটপৌরে ব্যবহারের উপযোগী; আলকাতরার প্রলেপের কারণে ঠান্ডা বা গরম পানি বহনেরও উপযোগী। মনে রাখতে হবে যে আমরা যে যুগের কথা বলছি সেই যুগ পর্যন্ত দুনিয়ার কোথাও থেকে পটারি অর্থাৎ পোড়ামাটির ঘটিবাটির কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। পরে অবশ্য এই পটারিই পাত্র হিসেবে বড় ভূমিকা নিয়েছিলো। দশ হাজার বছর

আগের বাইধাতে তাই উদ্ভিদ আঁশে দড়ি তৈরির, বিনুনি গেঁথে এবং তা পেচিয়ে ঝুড়ি তৈরির, আলকাতরা গলিয়ে তার প্রলেপ দেয়ার একটি কর্মব্যস্ততা যে ছিল; ওই আঁশ, ওই আলকাতরার গন্ধ যে এখানকার পরিবেশ যে ভারি করতো; তা আমরা বলতে পরি।

বাইধাতে যে সব শস্যবীজ পাওয়া গেছে তার অধিকাংশ কৃষিতে পোষমানানো বীজ যার সঙ্গে বন্য জাতের প্রজাতিগত ভেদ রয়েছে। কাজেই উদ্ভিজ ফসলের ক্ষেত্রে কৃষি-যুগ প্রায় পুরোপুরিই এখানে এসে গিয়েছিলো। বলা যায় কৃষির আতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত মধ্য প্রাচ্যের 'উর্বর সরু চাঁদের' অন্তর্ভূক্ত এই জায়গায় মানুষের কৃষি ও নাগরিক সভ্যতার সূচনাটি ইতোমধ্যে ঘটে গিয়েছিলো। কিন্তু এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় তা হলো পশু চারণের ক্ষেত্রেও কৃষি যুগের সূচনা। অবশ্য ইরাক ও ইরানের কোন কোন জায়গায় হয়তো তারো কিছু আগে এটি ঘটেছে। বাইধাতে যে অসংখ্য পশু-হাড় পাওয়া গেছে তার মধ্যে গাজেলের হাড় বেশি নেই, বরং ছাগলের হাড়ই অনেক বেশি এবং কিছু ভেড়ার। অথচ সেই যুগে ওখানকার বন্য পরিবেশে গাজেল প্রচুর থাকলেও ছাগল বা ভেড়া তেমন ছিলনা। কাজেই বলা যেতে পারে এর সবই খামারের পোষমানা ছাগল ও ভেড়া। তাছাড়া যে হাড় পাওয়া গেছে তা বিভিন্ন বয়সী পশুর খুব একটা নয়, বরং বছর দুয়েকের কিছুটা বড় ও পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পশুর হাড়— তার খুব কম বয়সের নয় তা হলে মাংস কম হবে, আর বেশি বয়সেরও নয় তা হলে তাদেরকে অনর্থক খাওয়াতে হবে, চরাতে হবে অনেক বেশি দিন ধরে। প্রায় একই বয়সী পশুর হাড় পাওয়া যাওয়াটিও এগুলোকে খামারের পশু বলে প্রমাণ করে। দুধের জন্য নয় বরং মাংসের জন্য ছাগল বা ভেড়ার চাষ করা হতো তাও বেশ স্পষ্ট হয়েছে, দুধ দেবার বয়সের আগে অধিকাংশকে মেরে ফেলার বিষয়টি দেখে।

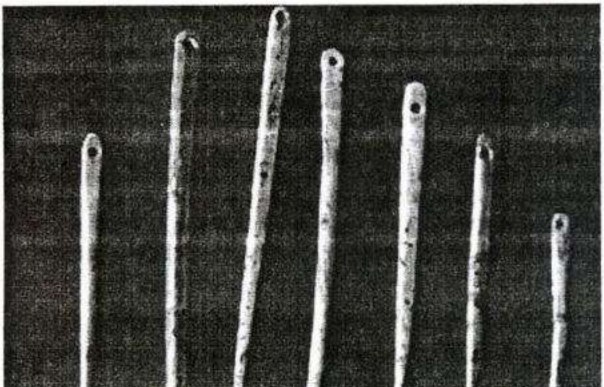

হাড়ের সুচ

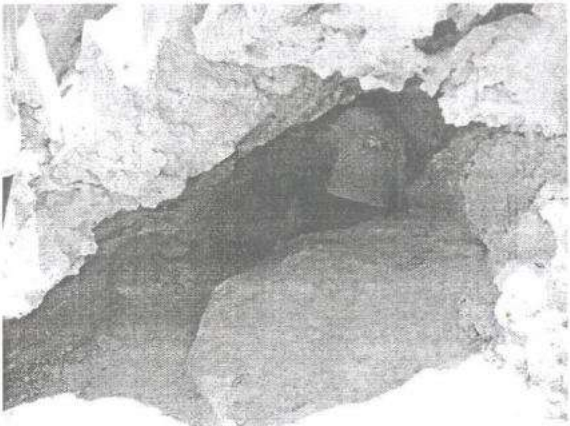

নাহাল হেমার গুহা

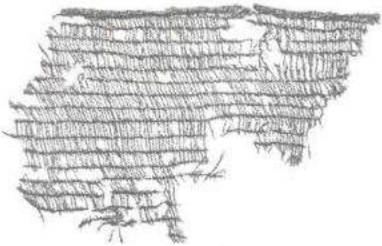

নাহাল হেমার গুহায় দৈবক্রমে
সংরক্ষিত কাপড়

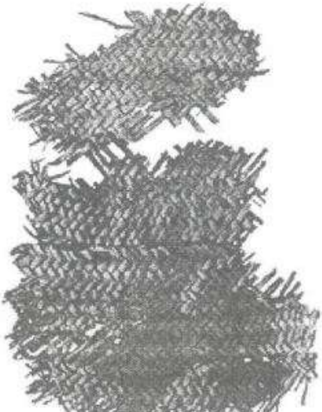

নাহাল হেমার গুহায় বোনা বেতের
ঝুড়ির সংরক্ষিত অংশ

নাহাল হেমার গুহায় বোনা বেতের ঝুড়ির সংরক্ষিত অংশ

সাইপ্রাসের টেন্টার মুহাজির ঃ
১০ হাজার বছর আগে

সাইপ্রাস দ্বীপটিতে মানুষের বসত খুব বেশী দিন আগের নয়। এশিয়ার মূল ভূখন্ড থেকে নৌকা করে এসে অভিবাসীরা একে আবাদ করেছে। সেভাবে আমাদের মুহাজির পরিবার এখানে নিয়ে এসেছে পোষা ছাগল আর কৃষির শস্যবীজ। তবে এখানে মোটামুটি স্থায়ী হতে তাদেরকে অমানুষিক সংগ্রাম করতে হয়েছে।

সাইপ্রাসের টেন্টার কাছের যে ছোট খাঁড়ি সেখানে একটি নৌকা এসে ভিড়লো। এটি নিকটতম মূল ভূখণ্ড থেকে এসেছে। সাইপ্রাস দ্বীপটি পশ্চিম এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের কাছেই ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত হলেও এইটুকু সমুদ্র যাত্রা এ নৌকার আরোহীদের পক্ষে নেহাত কম ঝক্কি নয়। আগেকার দিনের মত মোটা গাছের গুড়ির মাঝখানটি পাথরের কুড়াল দিয়ে খোদাই করে করে ফাঁপা করে নেয়া একেবারে সরল প্রকৃতির নৌকা এটি নয়। তাছাড়া শুধু দাঁড় টেনে চালাবার নৌকাও নয়। অনেকগুলো তক্তা নিপুণভাবে জোড়া দিয়ে এটি তৈরি হয়েছে, আর এতে রয়েছে পাল— উভয়েই খুব নতুন ধরনের ব্যাপার। তা সত্ত্বেও নৌকার আরোহী পরিবারটির ক্লান্তিতে ও উৎকণ্ঠায় এখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সমুদ্রযাত্রাটি আগাগোড়া মসৃণ ছিলনা মোটেই। ছোট সরু নৌকাটিতে আরোহী পরিবারের সব সদস্যরা ছাড়া জীবন্ত পোষা পশু আর মালপত্র কম নয়। পুরো পথ সবাইকে গাদাগাদি করে বসে কোন ভাবে নৌকা আঁকড়ে থাকতে হয়েছে। সমুদ্রের ঢেউয়ে নৌকাটি একটি খেলনার মত উতাল পাথাল করেছে। কখনো কখনো এ নৌকাটি থাকবে, না টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙ্গে পড়বে, তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে। নৌকার গতির দিক ঠিক রাখতে এটি চলেছে কখনো পাল তুলে, কখনো পাল নামিয়ে দাঁড় টেনে। অবশেষে দূরে সাইপ্রাসের তটরেখা যখন দেখা গেছে তখন তাদের আস্থা ফিরে এসেছে, এই যাত্রায় বোধ হয় বেঁচে গেলো। কিন্তু তারপরও টেন্টার খাঁড়িতে নৌকা ভিড়ানো সহজ হয়নি।

ওরা আসছে সিরিয়া অঞ্চলের পশ্চিম উপকূল থেকে। ওখানে একটি গ্রামের বাসিন্দা ছিল এই কৃষিজীবী পরিবার। কিন্তু পর পর কয়েক বছরের খরায় ওখানে আকাল দেখা দিয়েছে। এই পরিবার ও প্রতিবেশী আরো বেশ কিছু পরিবারের চাষের শস্য নষ্ট হয়েছে বার বার। পানির ও ঘাসের অভাবে খামারের ছাগল ও ভেড়া অধিকাংশ মরে গেছে। এখানে পড়ে থাকলে অবশিষ্টগুলোকেও হারাতে হবে। লোকমুখে ওরা শুনেছে এই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় এখন এই একই অবস্থা। দক্ষিণে জর্দান উপত্যাকার দিকে যাবার কথা চিন্তা করেছিলো— কিন্তু সেখানকার বড় বড় শহরগুলোতে অনেক মানুষ, সেখানেও নাকি খাদ্যাভাব। তাছাড়া স্থলপথে সকল কৃষি উপকরণ আর অবশিষ্ট ছাগল ভেড়া নিয়ে মরুময় এ পথে পাড়ি দেয়া দুরূহ। এর মধ্যে আশপাশের দু'একটি পরিবারকে নৌকা করে সমুদ্রপথে সাইপ্রাসের দিকে পাড়ি দিতে দেখেছে— এখন নাকি অনেকেই সেখানে যাচ্ছে। শুনেছে এখনো দ্বীপটিতে মানুষ বেশি নেই, সে তুলনায় বনভূমি, চাষের উপযোগী জমি আছে বেশি। তাদের এদিকটায় শিকারের পশু একেবারে কমে গেলেও সাইপ্রাসে হরিণ ইত্যাদি রয়েছে। তাছাড়া ওদের কৃষকরাও নাকি বেশ ভাল করছে, যাদের অধিকাংশই এই মূল ভূমি থেকে এভাবেই গিয়েছে নানা সময়ে। কাজেই বুকে সাহস করে তারা সমুদ্র পাড়ি সত্যি ওরা সাইপ্রাসে এসে হাজির হয়েছে।

নৌকাটি যখন তীরে এসে ভিড়লো কাছেধারে যারা ছিলো সবই ওদিকে ছুটে গেল— কৌতুহল ভরে নতুন অভিবাসীদেরকে স্বাগত জানাতে। পরিবারের জনা বারো স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নৌকা থেকে নামলো। তাদেরকে বেশ কাহিল দেখালেও সুস্থ দেহে নতুন দেশে এসে পৌঁছতে পারাতো চোখে মুখে খুশিও ঠিকরে পড়ছিলো। খাদ্যাভাবে পরিবারের সবারই দুর্বল স্বাস্থ্য— বিশেষ করে শিশুদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা দারুণ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। পরিবারের কর্তা এবং সবার বয়োজ্যেষ্ঠ মুহাজিরের বয়স চল্লিশের মতো— এখনো যথেষ্ট কর্মক্ষম। ছোটবেলায় বাবা মা যে নাম দিয়েছিলো সেটি মুহাজির নয়। পরে সাইপ্রাসেই স্থানীয় মানুষদের কাছেই তার নতুন নাম হয়ে পড়েছিল মুহাজির অর্থাৎ অভিবাসী। খরার প্রাদুর্ভাব হওয়ার আগে পর্যন্ত মুহাজিরের বাবা মা সহ পরিবারের আরো কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ বেঁচে ছিলেন— কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতি গত কয়েক বছরে তাঁদের কেড়ে নিয়েছে। এখন নতুন ভাবে বাঁচার আশায় পুরো পরিবার এই দ্বীপে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিবারের সদস্যরা নৌকা থেকে নামার পর নৌকার অন্যান্য আরোহীদের নামানো হলো— চার পাঁচটা ছাগল আর একটি হরিণ। তাছাড়া তারা কয়েক বস্তা গম আর বার্লিও নিয়ে এসেছে, প্রধানত নতুন চাষের বীজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য।

সমুদ্রের কাছেই কিছু পুরানো ভাঙ্গা বাড়ি রয়েছে, মুহাজির পরিবার আপাতত কয়েকদিন এখানে আশ্রয় নেবে। উদ্দেশ্য হলো সম্ভাব্য স্থায়ী বসত সম্পর্কে খোঁজ

খবর করা। সমুদ্র পারের এই জায়গাটি বিখ্যাত হলো বেশ কিছু চমৎকার গভীর কুয়ার জন্য। কুয়াগুলো মুহাজিরদের খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কাছাকাছি এতগুলো গভীর কুয়া এর আগে ওরা কখনো দেখেনি। সিরিয়ার যেখান থেকে ওরা এসেছে সারা বছর পানি থাকার মত ভাল পানির উৎস খুব বিরল। এখানে কুয়া আছে, তবে মানুষের বসত তেমন নেই। পানির অভাব না থাকলেও চাষবাস অথবা বসতের জন্য সমুদ্র পারের এই জায়গাটি ভাল নয়। মাটিগুলো পাথুরে— হয়তো বাতাসের তোড়ে নরম চাষ-উপযোগী মাটি উড়ে চলে গেছে। অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে তৃণভূমি কিছু আছে। এখন কুয়ার চার ধারে বেড়া দিয়ে বেশ কিছু পশুর খামার গড়ে ওঠেছে। এখান থেকে চাষের পশু নানা গ্রামে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মুহাজিরের সঙ্গে আনা ছাগল ও হরিণ আপাতত কিছু খাদ্য পানীয় এই খামারে পেলো— তার পরিবার সদস্যরাও ওখানে কিছু কাজ পেলো, খাবারও পেলো।

এই কুয়াগুলোকে ঘিরে যে শুধু পশু খামার রয়েছে তা কিন্তু নয়, এক রকম ছোটখাট কারখানাও রয়েছে এখানে— কয়েক জন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ ও তিন চারজন কিশোর কিশোরী ওখানে পাথরের বাটি বানাচ্ছে। পানি খাওয়া, স্যুপ খাওয়া, নানা মশলার হার্বাল চা খাওয়া ইত্যাদির জন্য পাথরবাটিই কি সিরিয়ায় কি সাইপ্রাসে সবার ভরসা। মুহাজিরের পরিবারের কয়েক জন তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে তাদের কাজ দেখলো। যদিও এ কাজে তারা দক্ষ নয়, তবুও যতখানি পারে কাজে হাত লাগাবার চেষ্টা করলো। সাইপ্রাসের বিশেষ ধরনের পাথরবাটি খুবই নাম করা। এর কিছু কিছু তারা সিরিয়াতেও দেখেছে যা এখান থেকে কেউ কেউ বিক্রির জন্য নিয়ে গেছে। ওখানেওতো পাথরবাটি তৈরির ও ব্যবহারের প্রচলন আছে। তবে সেগুলো আর সাইপ্রাসেরগুলোর আকাশ পাতাল তফাত। মুহাজিরদের আদি বাসস্থানে নিজেদের পাথরবাটি ছোট পাথর খন্ডের মাঝখানে কোন রকমে একটি গর্ত করে নেয়া ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সাইপ্রাসেরগুলো রীতিমত একটি শিল্পকর্ম। সাইপ্রাসের যে অল্প কিছু মানুষ সবাই নিজেরা অথবা মাত্র কয়েক প্রজন্ম এখানে অভিবাসী হয়েছে মূল ভূখণ্ড থেকে। কিন্তু এর মধ্যে পাথরবাটি তৈরিতে তাদের অনন্য দক্ষতা গড়ে ওঠেছে।

প্রথমে নরম পাথরের ওপর শক্ত পাথরের হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে তাকে মোটামুটি বাটির আকৃতি দেয়া হচ্ছে। বাটির গর্ত খুব গভীর নয়, কিন্তু এর কিনারা, তার সংলগ্ন হাতল, এবং কোন কোনটির সঙ্গে বদনার নলের মত নল এগুলো ওই একই পাথর থেকে ছোট ছোট টুকরো ঠিকরে ফেলে দিয়ে মোটামুটি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এটি করতে করতে চারিদিকে জমে উঠছে ছোট বড় অনেক পাথর-কুচি। তারপর শুরু হয় খুব ধৈর্যের একটি কাজ— ছোট ছোট বিভিন্ন আকৃতির ঘর্ষণ-পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে পাত্রের সব কিছুকে সঠিক আকৃতি দেয়া হচ্ছে এবং এর সুগোল অবয়বকে মসৃণ করে তোলা হচ্ছে। এ ভাবে ঘষার সময় সব সময় এতে

পানি ঢালা হচ্ছে। এ সব কাজে অদক্ষ শ্রমিকেরও সহায়তার দরকার হয়, এবং প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। এটিই কুয়ার সঙ্গেই কারখানা থাকার সুবিধে, আর এটিই মুহাজির পরিবারের চট করে এখানে কাজ পাওয়ার কারণ।

মুহাজির লক্ষ্য করলো এখানকার দু'একজন মানুষের কোমরে গোঁজা রয়েছে কালো পাতলা পাথরের চমৎকার ছুরি। একজন থেকে একটি চেয়ে নিয়ে দেখলো অসম্ভব ধারালো এর কিনারা, দেখতেও চমৎকার। ঠিক এরকম ছুরির কথা সিরিয়ায় তার গ্রামে শুনেছিল তুরস্কে পাওয়া যায় বলে। জানতে পারলো এখানেও এটি আসে তুর্কী অভিবাসী অথবা ব্যবসায়ীদের হাতে হাতে। এভাবে নানা অঞ্চল থেকে আসা অভিবাসী মানুষ নানা রকম চমৎকার জিনিস এখানে নিয়ে এসেছে, সেই সঙ্গে এনেছে সেখানকার প্রযুক্তিও। এই যেই খামারে এখন মুহাজির পরিবার অতিথি, এতে ছাগল, ভেড়া, শূয়োর, গরু, ইত্যাদি তো রয়েছেই, বেশ কিছু কুকুরও আছে। এরা সবাই পোষমানা পশু। পোষমানা পশু তো দূরে থাক, আগে নাকি পুরো সাইপ্রাসে বন্য ভাবেও এই পশুগুলো ছিলনা। পূর্ববর্তী অভিবাসীরা মূল ভূখণ্ড থেকে পোষা হিসেবেই এগুলো প্রথম এনেছে। আজ এখানকার সবারই জীবিকা এদের নিয়ে। চাষের উন্নত কৃষির শস্যবীজও অভিবাসীরাই এনেছে। এদিক থেকে মুহাজির ও পরিবার সদস্যরাও ভাবলো তারাও তো তাদের কর্তব্য করেছে অন্তত কিছু হলেও কৃষির পশু এবং কৃষির বীজ ওরা নিয়ে এসেছে, নিজেদের হাজারো দৈন্যদশা সত্ত্বেও।

যে জিনিসটি মুহাজিরদের অবাক করেছে যে সাগর পারের এই জায়গার কোন স্থায়ী বসত নেই, অল্প কিছু মানুষ অস্থায়ী ভাবে থাকে। তারা লোকালয় থেকে অনেক দূরে এই খামারে ও কারখানায় কাজ করে। এই কাজটুকুর জন্যই ওরা এখানে থাকে। তাদের আত্মীয়স্বজন সবাই থাকে অন্যত্র। তাই মুহাজির পরিবারও স্থায়ী বসতের সন্ধানে অন্যত্র পাড়ি দিলো।

এবার স্থলপথে ভ্রমণ করে মুহাজির পরিবার তাদের গন্তব্য টেন্টায় চলে এসেছে। ওই পাথুরে মাটি আর তৃণভূমির ওপর দিয়ে বাচ্চাকাচ্চা ও লটবহর নিয়ে হেঁটে টেন্টা যাওয়াটি খুব সহজ হয়নি— তবুও অভিবাসী বলে কথা। ওই কারখানায় কাজ করার সময় মুহাজির ও তার বৌ বেশ কয়েকজনকে ভাল বন্ধু করে নিতে পেরেছিলো। ওদের কেউ কেউ টেন্টা অঞ্চলের মানুষ। তাদের কাছে মোটামুটি পথঘাটের একটি ধারণা পেয়েছে ওরা। কোনদিকে কতখানি গেলে কী ল্যান্ডমার্ক দেখতে পারে তাও জেনে নিয়েছে। টেন্টার কাছে গিয়ে একটি বনের মত জায়গাও অতিক্রম করতে হয়েছে তাদের; সেটিই ছিল একটু বেশি বিপজ্জনক। এর মধ্য দিয়েই তারা পৌঁছেছে টেন্টায়।

টেন্টা গ্রামটি বেশ পুরানো গ্রাম— এককালে অভিবাসীরাই একে গড়ে তুলেছিলো। এখনো মাঝে মাঝে নতুন মানুষ এসে এর পরিসর বাড়াচ্ছে। টেন্টায় আসার কারণ ছিলো সিরিয়ায় মুহাজিরদের প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে একটি পরিবার

কয়েক বছর আগে এখানে এসেছে এমন খবর তাদের কাছে ছিল। শুরুতে পরিচিত লোকের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এই ভরসায় এখানে আসা। টেন্টায় পাহাড়ের গায়ে রয়েছে অনেকগুলো বৃত্তাকার একতলা বাড়ি— তারই একটাতে সেই পরিচিতরা থাকে। ওদের বাড়ির কাছেই খুঁটি, ডালপাতা আর পশু চামড়া দিয়ে একটি অস্থায়ী নিবাস গড়ে ফেল্‌লো মুহাজির পরিবার। এ যেন শহরের ভেতরেই গৃহহীন পরিবারের একটি বস্তি, ছাউনি তুলে কোন রকমে মাথা গোঁজা। কিন্তু মুহাজিরের মত গেরস্ত মানুষ বেশি দিন এভাবে থাকতে পারেনা। পরিবারের সবাই মিলে সামনে কিছুদিন শত কষ্ট স্বীকার করে খুব খাটাখাটনি করে বেশ কিছুদিনের খাদ্য মজুদ করে ফেলবে। পরিকল্পনা হলো এই সামনের শস্যবীজ লাগাবার মৌসুমের আগেই কিছু চাষের জমি করে ফেল্‌বে— ইতোমধ্যে পাশের বনে শিকারি-সংগ্রাহক হয়েই কিছুটা দিন কেটে যাবে। এর মধ্যে ঠিক স্থানীয়দের মতোই একটি বাড়িও উঠিয়ে ফেলবে।

সিরিয়ায় যেখান থেকে ওরা এসেছে সেখানে মানুষ চাষের ওপর, পশু পালনের ওপর এতো নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে শিকারের কথা লোকে তেমন মনেই আনতোনা। কিন্তু এখানে টেন্টায় কিন্তু তা নয়— লোকে চাষবাস করে বটে, কিন্তু শিকারের এবং কিছু কিছু সংগ্রহেরও সুযোগ রয়েছে বলে তারও সদ্ব্যবহার করে, যেমনটি এককালে সিরিয়ায়ও করতো। তবে নানা সময় মূল ভূখণ্ড থেকে যে পোষমানা পশুগুলো অভিবাসীরা নিয়ে এসেছে সেগুলো খামারে ও বাইরে চরিয়েই তাদের অধিকাংশের দিন কাটে। অল্পকিছু মানুষ ব্যস্ত রয়েছে পাথর-বাটি, পাথরের বাসন ইত্যাদি তৈরির কাজে। টেন্টার ঘরে ঘরে যেমন এগুলো ব্যবহার হয়, তেমনি ব্যবসায়ীদের হাতে হাতে চলে যাচ্ছে সাইপ্রাসের ভেতরে ও বাইরে নানা জায়গায়। সামনের দিনগুলোতে জমি তৈরি ও বাড়ি বানাবার কাজে যেন পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারে সে জন্য মুহাজির পরিবারের সবাই কোমর বেঁধে বাড়তি খাদ্য সংগ্রহের কাজে লেগে গেছে। পাথরবাটি তৈরি এবং পশু চারণের ও বন্য খাবার সংগ্রহের কাজ করে তারা সেটি করছে।

যখন একটু সুযোগ পায় মুহাজির ও পরিবারের বড়রা প্রতিবেশীদের বাড়িগুলো ভাল করে ঘুরে দেখে— ঠিক এমনি একটি বাড়ি ওদের সহায়তা নিয়ে তাদেরকেও তৈরি করতে হবে। অনেকটা এমন বাড়ির কিছুটা ধ্বংসাবশেষ সিরিয়ায় থাকতে ওরা দেখেছে, কিন্তু আজকাল সেখানে বাড়ির ধরন বদলে গেছে। বাইধার মতো শহরের দেখাদেখি বৃত্তাকার বাড়ির বদলে রোদে শুকানো ইটের চারকোনা বাড়িই লোকে গ্রামেও পছন্দ করছে— অনেকগুলো আবার দোতলাও। কিন্তু এখানে সাইপ্রাসে দেখা যাচ্ছে প্রথম দিকের অভিবাসীরা তাদের আমলের বাড়ির যে ষ্টাইল মূল ভূমি থেকে নিয়ে এসেছিলো এখনো তারা ওটিই ধরে রেখেছে, বদলাবার খুব একটি চেষ্টা করেনি।

টেন্টায় পাহাড়ের গায়ে গোল গোল ছোট ছোট বাড়িগুলো একটির সঙ্গে একটি খুব ঘন সংবদ্ধ হয়ে তৈরি। পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় রয়েছে বেশ বড়সড়

একটি বাড়ি। এর আবার একটি দেয়ালের বদলে পর পর বৃত্তাকার কয়েকটি দেয়াল— সেই দেয়াল ঘিরে আবার কয়েকটি ছোট ছোট বৃত্তাকার কামরা। এটি গ্রামের মন্দির, নানা অনুষ্ঠানের সময় সবাই এখানে আসে। একে ঘেঁষে রয়েছে চারিদিকে ওই বাড়িগুলো। এরা এতো ঘন যে দূর থেকে দেখলে মৌচাকের মত মনে হয়। বাড়ির কাছে আসলে অবশ্য বোঝা যায় কেমন করে রোদে শুকানো মাটির ইট গেঁথে গেঁথে একেবারে গোল দেয়ালের এই বাড়ি তৈরি হয়েছে। ছোট বাড়ি, তাতে রয়েছে ছোট একটি দরজা এবং আরো ছোট একটি জানালা। ছাদের কাঠামো কাঠের, সমতল ছাউনি ছাওয়া হয়েছে যথারীতি ডাল পাতা, চামড়া ইত্যাদি দিয়ে। কোন কোন বাড়ির নিচের দিকটা রোদে শুকানো মাটির ইটের বদলে একই আকারের পাথরের ইট। তবে পাথর যে সব ক্ষেত্রে খুব সাইজ করে কাটতে পেরেছে তা নয়, অনিয়মিত আকৃতিগুলো মাটি দিয়ে সমান করে নেয়া হয়েছে। ভেতরে বাইরে একটু সৌন্দর্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে চুনের পলেস্তরা দিয়ে, এই পলেস্তরার কারণে একেবারে বৃত্তাকার সিলিন্ডার অবয়বের বাড়িগুলোকে দেখতে মন্দ লাগেনা। দেয়ালগুলো শুধু এক ইট পুরু, সেদিক থেকে তেমন জবরদস্ত কিছু নয়, যদিও কয়েকটি ব্যতিক্রমী বাড়ি দুই ইট পুরুও রয়েছে।

প্রায় সব বাড়ির মধ্যে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। একটিই কামরা, ওখানে আবার কামরার মাঝখানে একই রকম ইটের গাঁথুনি করে বেশ লম্বা চওড়া একটি চারকোনা স্তম্ভ খাড়া করা হয়েছে যা খানিকটা ওপর পর্যন্ত ওঠেছে ছাদ পর্যন্ত নয়। কোন কোন বাড়িতে এরকম একটি নয় পাশাপাশি দুটি চারকোনা স্তম্ভ। এসব স্তম্ভের জন্য কামরার মধ্যে থাকার জায়গা খুব কমে গেছে বটে তবে স্তম্ভের ওপরে কাঠের পাটাতন বিছিয়ে দেয়া আছে তাতেও রাতে মানুষ ঘুমাতে পারে, বসে কাজকর্মও করতে পারে। এভাবে কামরার মধ্যেই একরকম দোতলার সৃষ্টি করা হয়েছে। বাড়ির মেঝেটা মাটিকে ভাল ভাবে দুরমুস করে শক্ত ভাবে তৈরি— কোন কোনটায় মেঝেতে সুন্দর লালমাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানেই এক জায়গায় ছোট ছোট পাথর ঘেরা একটি জায়গাতে উনুনের ব্যবস্থা। মাংস ঝলসানো, পাথর গরম করে রুটি সেঁকা, শীতকালে ঘর গরম রাখা এই সব কাজ ওই উনুনের। আসবাব বলতে খুব বেশি কিছু নেই অধিকাংশ ঘরে। তবে শস্য পেষার জন্য শিলপাটা ইত্যাদি আছে সবার কাছে, আর আছে প্রচুর পরিমাণে পাথর-বাটি পাথর-বাসন, থলে, ঝুড়ি ইত্যাদি।

ঘরের মেঝেতে আর একটি জায়গা যে ভাবে ব্যবহৃত হয় মুহাজিররা একটু অবাক হলো। এখানে ওরা আপনজনদেরকে যথাসম্ভব ঘরের মধ্যেই গর্ত করে কবর দিয়ে রেখেছে। ছোট কবরে দেহটাকে নানা ভাবে ফিট করিয়েছে কিন্তু অনেক যত্ন ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তারা এসবের বর্ণনা শুনলো— কী ভাবে কবরের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে সুন্দর কিছু পাথর-বাটি, শস্য, অলঙ্কার ইত্যাদি এখন অবশ্য সব কবর বাড়ির মধ্যে দেয়া যাচ্ছেনা। বাড়ির বাইরে উঠোনেও কিছু কবর আছে, তবে সবই নিজেদের খুব কাছে।

অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তাদের বাড়িতে যাবার সুযোগ ঘটলে মুজাহির বুঝতে পারলো যে যতটা একই রকম মনে হয় আসলে বাড়িগুলো তা নয়। বড় বড় পরিবারের আসলে একই সঙ্গে কয়েকটি বাড়ি আছে কাছাকাছি, ওগুলোকে সামনে রেখে তাদের উঠোন— বিভিন্ন বাড়িকে বিভিন্ন জনের থাকার ব্যবস্থা তো বটেই অন্যান্য কাজেও লাগানো হয়। সঙ্গতি সম্পন্ন কারো কারো বাড়ি মাটির ইটে নয়, বরং আগাগোড়া পাথরের ইটে তৈরি— এখানে যে চুনাপাথর যথেষ্ট রয়েছে সেই চুনাপাথরের ইট। সব বাড়ি যে হুবহু বৃত্তাকার তাও নয়— তবে সব দেয়ালই বক্রাকার, কোথাও কোনা নেই। কারো কারো বাড়ির আবার ছাদ সমতল নয়— ওপরে একটু চাপা গম্বুজের মত বানিয়েই ছাদ করা হয়েছে। মুহাজির অবশ্য ভাবছিলো যে নিজেদের জন্য তারা নেহাত সাদামাটা একটি বাড়িই রোদে শুকানো কাদা দিয়ে তৈরি করবে আপাতত। পরে চাষবাসে কিছু সমৃদ্ধি পেলে ধীরে সুস্থে তাকে বাড়াবে।

বাড়িগুলোর দর্শনীয় দিক হলো ওই ধবধবে সাদা চুনের পলেস্তরা। ভেতরের দেওয়ালেওতো বটেই ঘরের ভেতরে যে চারকোনা বড় স্তম্ভগুলো রয়েছে পলেস্ত-রার প্রলেপে সেগুলোও ধবধবে সাদা— দেখে মনে হয় বিশাল কিছু সাদা ক্যানভাস মেলে রাখা হয়েছে চিত্রিত করার জন্য। কিন্তু এই ক্যানভাস খুব অল্পই ব্যবহৃত হয়েছে— অল্প কিছু চিত্রণ এখানে ওখানে রয়েছে, খুবই সাদামাটা টানে অনেকটা জ্যামিতিক ঢঙে মানুষের বা পরিচিত পশুর একটু ধারণা মাত্র দেয়া হয়েছে। বাকি ক্যানভাস খালিই থেকেছে সে বাঁকানো দেয়ালই হোক আর আয়তাকার স্তম্ভের তলই হোক। তবে পাথরের ও রোদে শুকানো কাদার ছোট ছোট মূর্তির কমতি নেই এখানে। এগুলোও খুব সাদামাটা, অনেকটাই কাটা কাটা জ্যামিতিক ঢঙে— বেশির ভাগই পুরুষ বা নারী মূর্তি— কিন্তু কোনটিতে মুখমণ্ডলের বা দেহাবয়বের কোন বিস্তারিত দেবার কোন চেষ্টা নেই।

মুহাজিররা যে জায়গা থেকে এসেছে সেখানে চিত্রণের বা মূর্তি নির্মাণের ধারাটি অনেক বেশি বিস্তারিত। সাইপ্রাসে অভিবাসী হবার পর মনে হলো বাড়ি তৈরি থেকে চিত্রকর্ম সব কিছুকে এখানকার মানুষ কিছুটা সরলীকৃত করে ফেলেছে। কৃষির ক্ষেত্রে কিন্তু সে রকম কিছু হয়নি। বরং নতুন নতুন অভিবাসী দল মূল ভূখণ্ডের সর্বশেষ কৃষি প্রযুক্তি, যুগে যুগে উন্নত হওয়া পোষমানা শস্যের বীজ, পোষমানা পশু এখানে নিয়ে এসেছে। আমাদের মুহাজির পরিবারও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই এখানকার কৃষি হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করতে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি। প্রথম সুযোগেই ওরা পাথরের কিনারা থেকে একটু দূরে কিছু জায়গা চাষের জন্য পরিস্কার করে নিয়েছে। খুবই কঠিন কাজ হয়েছে এটা— পুরো পরিবার এতে দারুণ খেটেছে, পাথর সরানো, গাছগুলো কেটে তার গুড়িগুলো টেনে তোলা, মাটি কুপিয়ে কিছুটা চাষ দেয়া সব কিছু। পাহাড় থেকে যে কয়েকটি সরু জলধারা নেমে এসেছে- নালা কেটে সেখান থেকে এ জমিতে

পানি আনারও ব্যবস্থা করেছে ওরা। বেশ কিছু ভাল বীজ আসার সময়েই নিয়ে এসেছিলো— সেগুলোই লাগিয়ে দিয়েছে। ফসলের সবুজ চারা গজিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা এখন পুরাদমে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে আবার নিজেদের গেরস্থালি জীবনে ফেরত যাওয়ার। ইতোমধ্যে নিজেদের পশু-খামারটি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিকার-সংগ্রহের ওপর মুহাজিরদের নির্ভরশীলতাটাও কমে গেছে। ছাগলের মাংস প্রয়োজনমত পাচ্ছে পরিবারের সবাই। পুষ্টিহীনতার দিন শেষ হয়ে গেছে, শিশুদের স্বাস্থ্যও এখন অনেক ভাল। বাড়ি তৈরির কাজও এগিয়ে যাচ্ছে।

তারপরও অভিবাসী জীবনের বিড়ম্বনা কম নয়। টেন্টার গ্রামে সম্প্রতি জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে অভিবাসীদের কারণে, ফলে বাড়ি তৈরির জায়গা, উপকরণ, যুৎসই চাষের জমি এগুলো নিয়ে খিটিমিটি বাড়ছে। যারা বহুদিন আগে থেকে আছে, আর যারা সম্প্রতি আসছে এই উভয়ের মধ্যে একটি টানা পোড়েনের ভাব লেগেই আছে। একই পাহাড়ের ঢালে একই ভাবে ঘনসংবদ্ধ রূপে বাড়িঘর— এখানে খামারগুলো গড়ে তুলতে গিয়ে অধিক জনবসতি নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে— মানুষ ও পশু বর্জ্যের দূষণে স্বাস্থ্য হানি হচ্ছে, সংঘাতও বাড়ছে। মুশকিলের বিষয় হলো এখানকার সমাজটাই এমন যে নতুন ভাবে চিন্তা করে নতুন সমাধান বের করার স্বাধীনতা এখানে কম। সে কারণে অনেকদিন ধরে সব এক ভাবে চলছে— সেই বহু আগের পুরানো অভিবাসীরা যে ধারা নিয়ে এসেছিলো।

এখানে সামাজিক নেতৃত্ব যে ভাবে গড়ে ওঠা দরকার সে ভাবে তা হচ্ছেনা। মুহাজিরের মনে আছে সিরিয়ায় তাদের সুদিনে গ্রামের সবাই কী ভাবে তাদের বড় ঘরটায় একত্র হয়ে গ্রামের কল্যাণে নানা সিদ্ধান্ত নিতো। কেউ চাষবাসে অসুবিধায় পড়লে কেন্দ্রীয় শস্য গোলা থেকে বীজ দিয়ে তাকে সাহায্য করতো। এখানে কিন্তু সর্বজনীন চিন্তাভাবনা, সহায়তা দান এসবের রেওয়াজ নেই। মুহাজির পরিবারকে প্রাণপণে কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছে। পরিবারের বার জন সদস্যের সবাইকে দিন রাত কাজ করতে হয়েছে নেহাত শিশু দু'একজনকে বাদ দিয়ে। মুহাজির, তার স্ত্রী, তার ছোট ভাই ও তার স্ত্রী, ওদের কিশোর-কিশোরী পাঁচ ছয় জন সন্তান প্রায় সবাই চাষবাস ও পশু-খামারের কাজে অধিকাংশ সময় ব্যয় করে। ছেলে-মেয়েদের কাউকে কাউকে ছাগলের পাল নিয়ে তাদের চরাতে যেতে হয়েছে বনের দিকে, নানা ছাগলকে এখানে ওখানে খুঁটি দিয়ে বেঁধে রেখে খাওয়াতে হয়। ছাগলের জন্য ঘাস-পাতা যোগাড়, নিজেদের জন্য জ্বালানী কাঠ যোগাড় এগুলোর ঝক্কি কম নয়। এখন এসবের চাপ অনেকটা কমে গেছে। প্রত্যেকটি কাজে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি এসেছে। আহামরি কিছু না হলেও এখানকার রীতিতেই বাড়ি যেটি বানিয়েছে তাতে পুরো পরিবার বেশ আরামেই থাকতে পারছে।

চাষের কাজ ছাড়াও বড়রা পাথরের নানা হাতিয়ার তৈরিতে দক্ষ বলে সেটি ওরা পেশা হিসেবে নিয়েছে। সিরিয়ার থাকতে মুহাজিররা দুই ভাইয়ের বৌ সব

সময় নিজেদের জন্য নিজেরাই কাপড় বুনে, নিজেরাই সব সময় পোষাক বানিয়েছে। এখানে তা ওরা শুধু নিজের জন্যই করছেনা, বিক্রির জন্যও করছে— যদিও এখানে খুব উচ্চ মানের ফ্ল্যাক্স আঁশ পাওয়া যায়না, যা পাওয়া যায় তা কিছুটা মোটা বন্য প্রকৃতির।

তবে চাষবাস আর পশুর খামারে কাজ বাদ দিলে এ পরিবারের বেশি সময় কাটছে পাথরের কাস্তে তৈরির কাজে; সিরিয়ার বিখ্যাত কাস্তে তৈরিতে মুহাজির দম্পতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। টেন্টার ও তার বাইরেরও চাহিদার কারণে মুহাজিরদের বাড়িতে এই কাস্তে তৈরির রীতিমত একটি কারখানা গড়ে ওঠেছে। বড়রা মূল পাথরকে বাঁকানো রূপ দেবার ছোট ছোট করাতের দাঁতের মত ধারালো অংশের সমন্বয় ঘটাবার মূল কাজটি করলেও বাকিরাও কারখানার অন্য নানা কাজে হাত লাগায়— যুৎসই পাথর সংগ্রহের, তাকে সাইজ করে কাটার কাজ সহ। এ ভাবেই মুহাজির পরিবার নতুন অসহায় অভিবাসীর পর্যায় থেকে টেন্টায় মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত একটি সফল পরিবারে পরিণত হচ্ছে।

* * *

নতুন প্রস্তর যুগের সময়কার প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদে সাইপ্রাস বেশ সমৃদ্ধ। এর বিভিন্ন পর্যায়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সাইপ্রাসের কয়েকটি জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে, যদিও এখানকার মানব বসতি নতুন প্রস্তর যুগের খুব বেশি আগে ঘটেনি। এখানকার মাইলুতকিয়ার প্রাচীন কুয়াগুলো বিখ্যাত— ১১ হাজার বছরেরও পুরানো এসব কুয়ার কোন কোনটি হাজার হাজার বছর ধরে জলপূর্ণ ও ব্যবহারের অবস্থায় ছিল। ১০ হাজার বছর আগের পাথরের হাতিয়ার, ফ্লিন্ট পাথরের টুকরা এগুলো কুয়ার ভেতর থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ উদ্ঘাটন করেছেন। আরো কিছু নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে যা তখনকার ও পরের নানা বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠানের পরিচায়ক— যেমন এক সঙ্গে ২৩টি ছাগলের কঙ্কাল, অলঙ্কারে সাজানো গুছানো মানব মস্তকের খুলি ইত্যাদি।

প্রায় একই সময়ের মানব বসত যে সব জায়গায় উদ্ঘাটিত হয়েছে তার মধ্যে আছে শিলোরকাম্বোস, খিরোকিতিয়া এবং টেন্টা। এর সবগুলোতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে যা বিশেষ দৃষ্টি কেড়েছে তা হলো একই রকম বৃত্তাকার বাড়ি, রোদে পোড়া কাদামাটির ইট অথবা পাথরের ইটে গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৩০ সালে খিরোকিতিয়ার খনন কাজ শুরুর পর থেকে নানা স্থানে এরকম বাড়ির সমাবেশ আবিষ্কৃত হয়েছে— যার অধিকাংশের ক্ষেত্রে ভূমি থেকে অন্তত মিটার খানেক বৃত্তাকার দেয়াল তখনো অক্ষত খাড়া রয়েছে, আর যার বৃত্তাকার কক্ষের মাঝখানের আয়তাকার স্তম্ভগুলোও সে রকম বা তার চেয়ে বেশি উচ্চতায় খাড়া রয়েছে। কৌতূহলের বিষয় হলো ১৯৯০ এর দশকে মূল ভূখণ্ডে সিরিয়ার জেরেফ এল আহ্মারের খনন কাজে প্রায় হুবহু একই রকম বাড়ি উদ্ঘাটিত হয়েছে— কিন্তু সেগুলো আরো হাজার খানেক বছর বেশি পুরানো— অর্থাৎ প্রায় ১১ হাজার বছর আগের। স্পষ্টত প্রাচীনতর অভিবাসীদের মাধ্যমে এই স্থাপত্য রীতি সাইপ্রাসে এসেছে এবং এখানে হাজার হাজার বছর ধরে তাতে পরিবর্তন আসেনি। মাঝখানের ওই আয়তাকার বড় স্তম্ভের প্রয়োজন ছাদকে ধারণ করার জন্য ছিলনা— কারণ ছোট কক্ষের বেশ পুরু বৃত্তাকার

দেয়ালটিই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। এর যে আসলে কী ব্যবহার ছিল কেউ নিশ্চিত হতে পারেনি, তবে কেউ মনে করেন এর ওপরে একটি কাঠের পাটাতন আরো মানুষ থাকতে পারার জন্য একটি 'দোতলার' কাজ করতো।

সাইপ্রাসের এসব উদ্ঘাটিত জনবসত থেকে পাওয়া সব নিদর্শনের সঙ্গে সিরিয়া ও তুরস্ক উপকূলের 'উর্বর সরু চাঁদ' এলাকার আদি কৃষি যুগের সূচনার আমলের কৃষি হাতিয়ার, শস্য বীজ, পোষা পশু ইত্যাদির হুবহু মিল রয়েছে, যার থেকে ধারণা করা হয় সাইপ্রাসের প্রাচীনতর শিকারি-সংগ্রাহক অভিবাসীদের মধ্যে আলাদা ভাবে কৃষি বিবর্তিত হয়নি, বরং ওই উর্বর সরু চাঁদ এলাকার থেকে কৃষিজীবী অভিবাসীরাই সাইপ্রাসে এসে এই পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এটি ১১ হাজার বছর আগে শুরু হয়ে আরো দু'এক হাজার বছরের মধ্যে পূর্ণতা পেয়েছিলো— এখানকার মানুষ শিকারি-সংগ্রাহক থেকে সম্পূর্ণভাবে কৃষিজীবীতে পরিণত হয়েছিলো। তবে তাদের নিজস্ব দক্ষতার ছাপও পড়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপক ও বিচিত্র ভাবে নির্মিত পাথরবাটির ক্ষেত্রে। এগুলো প্রায় সব ক্ষেত্রে সব বসতের মধ্যে প্রচুর পাওয়া গেছে, এমনকি কবরে মৃতদেহের সঙ্গেও। অপরিসর সেই বৃত্তাকার বাড়ির মেঝেতেই এরকম বেশ কিছু কবর আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে বেশ আনুষ্ঠানিকতার ছাপ রয়েছে— তা স্ত্রী-পুরুষ-শিশু যে কারো কবরের ক্ষেত্রেই। আরো বহুকাল পরে পোড়ামাটির ঘটিবাটি (পটারি) প্রচলিত হবার আগে পর্যন্ত পাথরবাটির ব্যাপক আদর থেকে গিয়েছিলো।

ওই দশ হাজার বছর আগের টেন্টা, খিরোকিতিয়া ইত্যাদি বর্ধিষ্ণু গ্রামের ধ্বংসাবশেষে প্রত্নতত্ত্ববিদরা যা অনেক খননেও খুঁজে পাননি তা হলো সামাজিক ভাবে ব্যবহৃত বা কর্তৃপক্ষীয় কার্যক্রমকে স্পষ্ট করে এমন কোন ভবন। পাহাড়ের চূড়ায় অপেক্ষাকৃত বড় তিন দেয়াল বিশিষ্ট স্থাপনা রয়েছে বটে কিন্তু তাতে স্পষ্ট ভাবে ওই রকম পাবলিক বিল্ডিঙের অবয়ব ছিলনা। এর থেকে টেন্টার মত গ্রামে সামাজিক নেতৃত্বের অভাবের ধারণা করা হয়েছে।

টেন্টার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ

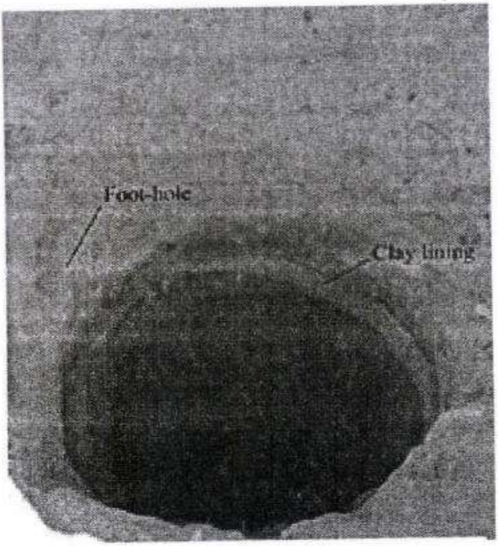

মাইলুতকিয়ার প্রাচীন কুয়া

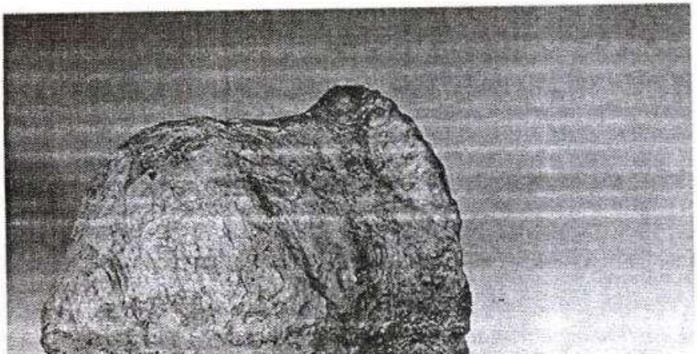
টেন্টার পাথর-বাটি ও পাথর বাসন

ভারতের ভীমবেকতার শিল্পী ঃ
১০ হাজার বছর আগে

পাহাড়গুলোর মাঝে মাঝে বন। এখানে পাহাড়ের গুহার খোপখাপে অথবা শিলা দেয়ালের আশ্রয়ে কিছু মানুষের বসত। বনে শিকার-সংগ্রহই তাদের জীবিকা, জীবন আর আনন্দ। সেখানকার শিলা দেয়ালে শিল্পী নামের মানুষটির তুলিতে ধরা পড়েছে এ জীবন।

ভারতের মধ্য প্রদেশের ভূপাল শহরের কাছেই রয়েছে পাথুরে পাহাড়ের ভীমবেতকা পাহাড় শ্রেণী এবং তার নিচের উপত্যকা। এখানে ১০ হাজার বছর আগের দৃশ্যে দেখতে পাচ্ছি উপত্যাকায় ঘন বনের গাছগুলোর ওপর মাথা উঁচিয়ে আছে বিশাল বিশাল শিলা খন্ড। পাহাড়ের ঢালগুলোও ঘন বনভূমি— সবখানেই বেশির ভাগ কাঁটাওয়ালা গাছ। ওর ভেতর দিয়ে নানা জায়গায় রয়েছে খুবই সরু পথ— এরকম অনেকগুলো পথের সৃষ্টি হয়েছে বুনো শূয়োর আর হরিণের যাতায়তে। তবে শিকারের খোঁজে মানুষরাও খুবই কষ্টে এ পথে চলাফেরা করে। যেহেতু শূয়োর বা হরিণের জন্য নিচু পথ হলেই চলে তাই পথের উপরিভাগ কাঁটাওয়ালা গাছের শাখা প্রশাখায় ভরা রয়েছে। মানুষকে এ পথ ব্যবহার করতে পথের সংস্কার করে নিতে হয়েছে, পাথরের ধারালো হাতিয়ার দিয়ে নিজের উচ্চতা পর্যন্ত ওই কাঁটাওয়ালা শাখা প্রশাখা কেটে সাফ করতে হয়েছে। এরকম সংস্কার করা রাস্তাগুলো সাধারণত শেষ হয়েছে পাহাড়ের গায়ে মানুষের দু'একটি পাথুরে আশ্রয়ের কোন না কোনটিতে।

এই পাথুরে আশ্রয়গুলোর কিছু কিছু সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ের শিলার দীর্ঘকালীন অবক্ষয়ে সৃষ্ট খোপখাপে, যার মধ্যে মানুষ রোদ-বৃষ্টি-বাতাস থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার মত বাসা গড়তে পারে। আবার কিছু পাথুরে আশ্রয় নিচের উপত্যকায় বিশাল এক একটি পাথরখন্ডের ওপর খুবই অদ্ভুত রকমে ব্যালেন্স করা, সাধারণত তার চেয়েও অনেক বড় অন্য পাথর খণ্ডের তলায় নিরাপদ আশ্রয়ে। মূলত শূয়োর, হরিণ ইত্যাদির তৈরি ওইসব রাস্তার অন্য প্রান্তগুলো প্রায়শ গিয়ে শেষ হয়েছে কোন একটি ফলগাছ-সমৃদ্ধ কুঞ্জে অথবা কর্দমাক্ত কোন অগভীর পানির ডোবায়, যার চারদিক ঘেরা কাদার মধ্যে দেখা যায় অসংখ্য নানা প্রাণীর ও মানুষের পায়ের ছাপ।

এভাবে বিভিন্ন পাথুরে আশ্রয়ে এখানে বেশ কিছু পরিবারের বাস সেই ১০ হাজার বছর আগেও। শিকারি-সংগ্রাহক জীবিকা, সংস্কৃতি, সব দিক থেকে ওরা মধ্য প্রস্তরযুগের মানুষ। ওই পাথুরে আশ্রয়ের ভেতরে আবার নিজেরা পাথরের দেয়াল তুলে বেশ চলনসই গোছের বাড়ি ওরা তৈরি করে নিয়েছে। বাড়িতে পাথরের যে সব হাতিয়ার ব্যবহারের জন্য মজুদ রেখেছে আর যেভাবে সেগুলো ব্যবহার করছে তাতে বোঝা যায় কোন্ ধরনের পাথরের যুগে তারা আছে। অধিকাংশ পাথরের হাতিয়ার ছোট অবয়বে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য তৈরি আর অনেকগুলোই অন্য উদ্ভিজ অংশের সঙ্গে জুড়ে ব্যবহারের জন্য। যেমন মোটা লাঠির আগায় লাগিয়ে বর্শা, ছোট কাঠের কাঠির মাথায় বসিয়ে তীর, যা ধনুক থেকে ছোঁড়া হবে। খুব দৃষ্টি আকর্ষণের মত একটি জিনিস প্রায় বাড়িতেই রয়েছে তা হলো একটার উপর রেখে অন্যটি ঘোরানো যায় এমন দুটি গোলাকার চেপ্টা পাথর, ওপরেরটায় একটা বড়সড় ছিদ্র। ওই ছিদ্র দিয়ে বুনো শস্য, শুটি, বাদাম ইত্যাদি ঢুকিয়ে পাথর দুটির পরস্পর ঘষাঘষিতে তা পেষা হয়— অর্থাৎ কিনা আদিম এক রকম যাঁতাকল। আশপাশের বন থেকে এরকম উদ্ভিজ খাবার সংগ্রহ করে খাওয়ার অভ্যাস এদের রয়েছে। তবে বাড়ির কাছে বা দূরে কোথাও জমি তৈরি করে কোন চাষবাসের কোন লক্ষণ নেই, কৃষি ফসলের তো নয়ই, বুনো ফসলেরও নয়। বাড়ির দেয়ালগুলোতে ওরা এক ধরনের মেটে হলুদ রঙের প্রলেপ দিয়েছে। এ রঙ এসেছে হলুদ ও লাল রঙের পাথুরে মাটির ডেলা থেকে। দেয়াল অবশ্য সব দিকে নিজের তৈরি নয়, কোন কোন দিকে ওই পাথুরে আশ্রয়ের খাড়া শিলাই দেয়ালের কাজ করছে। যেই বনটির প্রায় ভেতরেই তারা আছে সেখানে শিকারের অভাব নেই— হরিণ, শূয়োর, বানর, বুনো মোষ— এগুলোই বেশি। দলেবলে একটু পরিশ্রম করলে কিছু না কিছু শিকার সব সময় মেলে।

এখানে শিকারের প্রক্রিয়াও বহুমুখী। এ জন্য ওরা কাছাকাছি বনকে যেমন ব্যবহার করে তেমনি এই পাহাড় পার হয়ে দূরের পথেও প্রায়ই চলে যায়। ওই দূরের পথে দুএক রাত ক্যাম্প করে থাকে শিকারের প্রয়োজনে, অথবা ফল-মূল সংগ্রহের প্রয়োজনে। হরিণের চলাচলের পথে ফাঁদ পেতে রাখাটিও বেশ সাধারণ ব্যাপার; ভাগ্য ভাল হলে হরিণের পেছনে ছুটতে হয়না, বরং হরিণ ওদিকে পা বাড়ালেই ফাঁদের বিশেষ ফাঁসে তার পা আটকে যায়। যতক্ষণ না শিকারি এসে তাকে সাবাড় করে ততক্ষণ ওইখানেই ফাঁদের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। তবে শিকারকে অনুসরণ করার ব্যাপারও অবশ্য আছে— পায়ের ছাপ দেখে, মল দেখে তা করা হয়। সব সময় ভাগ্য ভাল যায়না, হরিণের থাবা খুঁজতে গিয়ে সদ্য রেখে যাওয়া বাঘের থাবা, বাঘের মল; অথবা হাতীর বা গণ্ডারের চিহ্ন মিলেছে এমন ঘটনা কম ঘটেনা। তখন ওখান থেকে যত দ্রুত উল্টো দিকে পালাতে পারে ততই মঙ্গল।

পশু শিকার ছাড়াও পরিবারের সবার জন্য অন্য রকম কাজও মেলা রয়েছে। মেয়েদেরকে এবং তাদের সঙ্গে ছোটদেরকেও দেখা যায় মাটি খুঁড়ে গর্তের শাকালু

বের করতে, অথবা ফলগাছের কুঞ্জে গিয়ে যে ক'টি পারে ফল সংগ্রহ করতে। মৌমাছির চাকের খোঁজটিও অনেক সময় তারাই করে। খোঁজ পেলে কেমন করে মধু সংগ্রহ করবে এই বিদ্যাটি পরিবারের কারো কারো ভালই জানা আছে। তবে পরিবারে একজন আছে যাকে এসব কোন কাজে বড় একটা দেখা যায়না। চল্লিশের কোঠার বয়সী এই মানুষটা কৈশোরে যৌবনে নিজেও এসব কাজ যে করেনি তা নয়; খুব সোৎসাহে না হলেও শিকারের দলে সেও যোগ দিয়েছে, তাতে সুবিধা না হলে সংগ্রাহকদের দলে যোগ দিয়েছে। সবাই তাকে সহজ কাজটিই দিতো— ফাঁদে হরিণ পড়েছে কিনা দেখে এসো, মহিলাদের দল বেশি দূরে ফল মূল মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বিপদে পড়লো কিনা দেখো, ওরা মৌচাকের কোন খোঁজ পেলো কিনা, মৌ- বিশেষজ্ঞদের যেতে হবে কিনা সে খবর আনো ইত্যাদি। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই এ মানুষটির আনন্দ অন্য কিছুতে— সেটি হলো ছবি আঁকা; রং বানিয়ে, তুলি বানিয়ে, পাথরের গায়ে ছবি আঁকা। এর আইডিয়াটি তার মাথায় এসেছে ঠিক এই রকম আগের ছবি দেখে।

এই অঞ্চলে এমন বেশ কিছু পাথুরে আশ্রয়ের মত আছে যেখানে এখন কেউ থাকেনা, কিন্তু সেখানে কবেকার প্রাচীন কারা যেন নানা রকম ছবি এঁকে গেছে— অনেক ছবি। বড়রা ওখানে গিয়ে এগুলো দেখে। অনেকে বলে এগুলো দৈবক্রমে আঁকা হয়েছে, অনেকে বলে ডাইনিরা এঁকেছে। কখন কেন কে এগুলো এঁকেছে এই নিয়ে সত্যি কোন ধারণা কারো আছে বলে মনে হয়না। কী এঁকেছে সেটিও সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখেনা— ওদের এত সময় কোথায়? তবে সবাই ওই ছবি আঁকা পাথরগুলোকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে, কিছুটা ভয়ের চোখেও। যেন এর মধ্যে কোন ম্যাজিক আছে। ছবিগুলো মনে হয় তাদের সংস্কারের একটি অংশে পরিণত হয়েছে! কিন্তু আমাদের ওই ছেলেটি তখনই ওগুলো খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখতো— কাছেধারে অন্য পাথরে ওরকম ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে। তার কাছে মনে হয়েছে এ ছবির মাধ্যমে এর চিত্রকররা কিছু বলার চেষ্টা করছে; সেটি তাকে বুঝতে হবে, সেও ছবি আঁকার মাধ্যমে কিছু বলার চেষ্টা করবে। সেই ছোটবেলা থেকে সবাই তাকে শিল্পী নামে ডেকে এসেছে। ছোটবেলায় এক সময় হয়তো ঠাট্টা করেই এই নামে ডাকতো, কিন্তু এখন শ্রদ্ধার সঙ্গেই এটি উচ্চারণ করে। প্রথম দিকে সবাই নেহাত একজন খেয়ালী ছেলে ভাবতো তাকে। এখন এত বছর পরে তাকে সবাই শুধু শিল্পীই মনে করেনা, মনে করে তার কিছু দৈব ক্ষমতা আছে; তাই যা আঁকছে তার ওপর এই এলাকার মানুষের ভাগ্য নির্ভর করছে। কাজেই এখন তাকে অন্যদের মত সাধারণ কাজ করতে বলাটি তারা চিন্তাও করতে পারেনা।

কাছাকাছি বেশ কয়েকটি পাথুরে বাড়িকে যোগ করা মানুষ হাঁটার যে পথটি বনের ভেতর একেবেঁকে অনেকদূর চলে গেছে সেটি ধরে অনেক্ষণ হাঁটলে পাওয়া যায় পাহাড়ের বেশ ওপরে একটি নির্জন পাথুরে আশ্রয়। অনেকটা গুহার মত এ

জায়গাটির বাইরেই খোলামেলা জায়গায় রয়েছে ছাই রঙের প্রায় খাড়া সমতল শিলা-দেয়াল। আমাদের শিল্পীকে প্রায়শ পাওয়া যাবে তার ওপর আনমনে ছবি আঁকা রত অবস্থায়। তার সামনে শুকানো লাউয়ের খোলগুলিই রঙের পাত্র। এরকম তিনটি পাত্র— একটিতে টকটকে ঘন লাল রঙ, আরেকটিতে কালো রঙ, অন্যটিতে সাদা রঙ। সব ছবি এই তিন রঙে আঁকা। এই রঙ কী ভাবে তৈরি হয়েছে তা কাছে ছড়িয়ে থাকা লাল, সাদা ও কালো রঙের নরম পাথরের ডেলা ছড়ানো দেখে বোঝা যায়। এগুলো থেকে পাথরের কোরানি দিয়ে কিছুটা গুড়া চেঁছে নিয়ে তা গাছে পাওয়া এক রকম তৈলাক্ত কষের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে এক একটি রঙ। যখন রঙ আরো ঘন করা দরকার শিল্পী আরো কিছু গুড়া চেঁছে তাতে যোগ করে ভাল করে মিশিয়ে নিচ্ছে। আঁকার জন্য রকমারি ব্রাশও বানিয়ে রাখা হয়েছে। কাঠির মাথায় কিছু উদ্ভিজ আঁশ দিয়ে তৈরি হয়েছে মোটা ব্রাশ, আর কাঠির আগা পাথরের হাতুড়ির আঘাতে ছেঁচে নিয়ে নানা সাইজের মধ্যম ও চিকন ব্রাশ।

শিল্পী কিছু একটা আঁকার জন্য ছাই রঙের পাথরের ওপর লাল রঙের একটি পোঁচ দিয়ে থেমে গেলো। মনে হলো এটি তার পছন্দ হয়নি। ওই ব্রাশটি রেখে দিয়ে একটি চিকন ব্রাশ দিয়ে আঁকতে লাগলো, রঙটিকেও একটু ঘন করে নিয়ে এবার দ্রুত ব্রাশ চালালো শিল্পী। আঁকছে একটি শিকারের দৃশ্য— সরু সব কাঠির মতো দেহ, হাত, পা নিয়ে শিকারি মানুষ বেশ কয়েক জন। গায়ে কোন পোষাক আছে এমনটি বোঝার উপায় নেই, শরীরের কোন অবয়ব বিস্তারিত নেই— কিন্তু অঙ্গভঙ্গিগুলো শিকারের সকল কায়দা কানুন অনেকটা বলে দিচ্ছে। শিকারিদের অধিকাংশদের পুরুষ মনে হচ্ছে, কয়েকজনের প্রশস্ত নিম্ন ভাগের কারণে জন্য তাদেরকে স্ত্রী মনে হচ্ছে। দু'জন মানুষের মাথায় কিছু রয়েছে— যাকে লম্বা বেণি মনে হতে পারে, টুপিও মনে হতে পারে। কারো কারো হাতে আছে তীর ধনুক, অন্যদের হাতে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শিকারের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে একটি হরিণ— সেটিকেও আঁকা হয়েছে অল্প কিছু রেখায়; তবে ওই শিকারি মানুষগুলোর তুলনায় হরিণের দেহ সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাটি বেশি। এই হরিণটি স্ত্রী হরিণ— তাই কোন শিং নেই। আরো বড় কথা এটি গর্ভবতী, সেটি শিল্পী মোটেই গোপন রাখেনি— কারণ গর্ভের বাচ্চাটিকে তার পেটের মধ্যে সরাসরি দেখা যাচ্ছে! স্পষ্টত শিল্পী যা দেখছে বা এক সময়ে দেখেছে, তা শুধু আঁকছেনা, যা ভাবছে তাও আঁকছে।

পুরো দৃশ্যটি একটি সক্রিয়তার ছবি— সবাই এখানে ব্যস্ত। কেউ তীর-ধনুক উঁচিয়ে আঘাত করতে ব্যস্ত, হরিণটি পালাতে ব্যস্ত, একজনকে দেখা যাচ্ছে কাঁধের ওপর একটি বাঁশের মত জিনিস বহন করছে যার আগায় ঝুলছে ইতোমধ্যে শিকার করা কোন ছোট পশু— ঠিক যে কী বোঝা যাচ্ছেনা। সঙ্গের একজন মহিলাকে দেখা যাচ্ছে দুই হাতে একটি ঝুড়ি সামলাতে ব্যস্ত— যদিও ঝুড়িতে কী আছে তা

জানাবার চেষ্টা শিল্পী করেনি। এখন সে একটি একটি করে মানুষ এতে যোগ করছে, তবে এই সামগ্রিক ছবির অনেকটা সে আগে থেকে যে এঁকে আসছে তা বোঝা যায়। এর একটু দূরেই মানুষদের অন্য একটি দলের ছবি যাদের শরীরের বাঁকানো ভঙ্গি দেখে মনে হয় বৃত্তাকারে সবাই নৃত্যরত অবস্থায় আছেঃ আর একটু বাইরের দিকে দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া আরো কিছু মানুষ। এদের কারো হাতে ঝুড়ি, কারো হাতে শুধু একটি লাঠি, কারো হাতে কিছু নেই— একজনকে দেখা যায় মাটিতে শুয়ে আছে। সবই কিছুটা উদ্দেশ্যবিহীন মনে হয়।

শিল্পী আপন মনে একাকী এগুলো এঁকেছে, এখনো আঁকছে। তার মনে কী আছে তা বোঝার উপায় নেই। একি কোন গল্পের কাহিনী সে আঁকছে? একি তার স্মৃতিতে থাকা কোন সত্যিকার দৃশ্যকে ছবির মাধ্যমে আবার মনে করছে? অথবা এ কি তার মনের মধ্যেকার কোন গোপন ইচ্ছে? বাস্তবে বাইরে যা ঘটছে শিকারের সময় তার অনেকখানিও এতে আছে, আবার এমনও কিছু আছে যা বাস্তবে নেই— অন্তত একই সঙ্গে নেই। যেমন শিকারের মধ্যেই নাচের দৃশ্য বা আনমনে ঘোরাফেরা বা মাটিতে শুয়ে থাকা এমন তো দেখা যায়না। খুব বেশি মানুষ যে এই নির্জন পাথুরে আশ্রয়ে এসে শিল্পীর কাজ দেখে তা কিন্তু নয়। সবাই খুব ব্যস্ত মানুষ। যারা মাঝে মাঝে আসে তারা অবাক হয়, মনে হয় শিল্পীকে এবং তার পেছনে ওদের কল্পিত দৈব শক্তিকে এক রকম পূজাই যেন করে।

শিল্পীর আঁকা ছবির বৈশিষ্টের কারণে শুধু নয়, ওরকম দৈব মনে হবার আরো কারণ ওদের ছিল। অনেকটা এ ধরনের ছবি আঁকা শিলা দেয়াল এই অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো কয়েকটি আছে, আর তাতে বেশ কিছু ছবিও আঁকা আছে— যেগুলো শিল্পীর আঁকা নয়, স্মরণ কালের মধ্যে কেউ এগুলো এঁকেছে এমন কথাও কারো জানা নেই। বংশ বংশানুক্রমে মুখে মুখে যে সব গল্প প্রচলিত আছে তাতেও এগুলোর চিত্রকর সম্পর্কে কোন উল্লেখ কোন গল্পে শোনা যায় না। সবাই মনে করে এগুলো স্বর্গের দেবতাদের কাজ। আবার অন্য কেউ কেউ মনে করে সুদূর অতীতে হয়তো দেবতারা শিল্পীর মত কোন কোন খেয়ালী মানুষের ওপর ভর করে তাদের দিয়ে এসব আঁকিয়ে নিয়েছিল। তাই তারা মনে করে শিল্পীও দেবতার ইচ্ছায় ছবি আঁকছে। এটি ঠিক যে শিল্পী আরো অনেকের মত ওই আগের ছবিগুলো দেখেছে, এগুলো তার নিজের আঁকার ওপর যে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে সেটিও স্পষ্ট।

আগের ছবিগুলোর রঙ কিছুটা ফ্যাকাসে হয়েছে বটে তবে সেগুলো এখনো তার রঙের স্পষ্টতায়, আঁকার সৌকর্যে আমাদের শিল্পীর আঁকা ছবির সঙ্গে রীতিমত প্রতিযোগিতায় রয়েছে। আর যে সব বিষয় নিয়ে এগুলো আঁকা তা এখনকার মানুষের মোটেই অপরিচিত নয়, যদিও কিছু কিছু বিষয় মানুষকে একটু অবাক করে। তারাও একই রকম লাল, সাদা ও কালো রঙের উপর জোর দিয়েছে, মনে হয় একই রকম রঙীন পাথুরে মাটির ডেলা ব্যবহার করেই এই রঙ তৈরি হয়েছে।

শিকারের দৃশ্যই বেশি— দেখলেই বোঝা যায় যে সেই অজ্ঞাত কালের অজ্ঞাত চিত্রকরদের জগতেও একই রকম শিকারের প্রাণীর প্রাচুর্য ছিল। এই কাছের বনগুলোতে যেই হরিণ, শূয়োর, বানর, বন্য ঘোড়া, ময়ূর ইত্যাদি এখন তারা দেখছে তখনো এগুলোই ছিল। তবে ওই ছবিগুলোতে অপেক্ষাকৃত ছোট অন্যরকম অনেক প্রাণীও বেশ গুরুত্ব পেয়েছে— সাপ, গিরগিটি, কুমির, ডালকুকুর, ইত্যাদি। এরা ঠিক শিকারের দৃশ্যে আসেনি— এসেছে আশপাশের প্রকৃতিতে সব সময় বিরাজমান কিছু ভয়ের জিনিস হিসেবে যা মানুষের আশপাশে সব সময় রয়েছে।

ওই কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া প্রাচীন ছবিগুলোতে দূরের উন্মুক্ত তৃণভূমির বড় বড় পশুর কোন কোনটি খুব দুর্দান্ত ভাবে দেখা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে বিশাল বন্য গরু, বাইসন, সিংহ, বাঘ, হাতি, বুনো মোষ, গণ্ডার, বিশালদেহী বুনো শূয়োর ইত্যাদি। মনে হয় তখন এসব জন্তুর থেকে মানুষের ভয়ের কারণ বেশি ছিল, তাই এদের নিয়ে ভাবনা বেশি ছিল, এদেরকে বেশি সমীহ করতেই হয়তো এমন ছবি। তাই অধিকাংশ ছবিতে যখন দেখা যাচ্ছে মানুষ শিকারের জন্য পশুকে তাড়া করছে, বিরল দু'একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিশাল একটি বাইসন তার চেয়ে অনেক ছোট একটি মানুষকে হিংস্রভাবে তাড়া করছে। এ ধরনের প্রাণীর উপস্থিতিতে মানুষকে বেশ অসহায় মনে হচ্ছে।

মজার ব্যাপার হলো আমাদের শিল্পী কিন্তু প্রাচীন ছবিগুলো অনুসরণ করে শুধু শিকারের বা পশু পাখির ছবি আঁকেনি বরং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য ছবিও আঁকতে শিখেছে— যেমন একটু কাছে থেকে মানুষকে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে। তাই কিছু ছবিতে গর্ভবতী নারীকে এবং মা ও শিশুকে গুরুত্ব দিয়ে এঁকেছে। তার চেয়েও বেশি এঁকেছে উৎসবের ছবি যেখানে নারী-পুরুষ সবাই বৃত্তাকারে নাচছে, বিশেষ পানীয় পান করছে, ইত্যাদি। কতগুলো ছবি দেখলে বোঝা যায় এগুলো কোন না কোন ধরনের আচার-অনুষ্ঠান, পূজা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। আগের পরের সবাই সব কিছু এঁকে গেছে— খোলামেলা, সবার দেখার জন্য উন্মুক্ত স্থানে পাহাড়ের গায়ে উন্মুক্ত শিলার গায়ে, দিনের আলো বাতাসে।

শিল্পীর গ্রামের ও তার আশপাশের গ্রামগুলোর মানুষ সব সময় এই চিত্র শিল্পের প্রতি বেশি আগ্রহ না দেখালেও তারা কিন্তু কখনো একে নষ্ট করার মত কিছু করেনি— এর ওপর নিজেরা কোন বাড়তি আঁকিবুকি করেনি। আর এগুলো তাদের জীবনযাত্রায় যে প্রচুর প্রভাব রেখেছে সেটিও বেশ স্পষ্ট। কারণ তাদের ঘরগুলোতে ঠিক এরকম রঙ দিয়ে দেয়ালকে সুন্দর করে রঙ করা হয়েছে।

* * *

ভারতে সেপিয়েন্স মানুষ পৌঁছেছিল খুব সম্ভব ৭৪ হাজার বছর আগে। এর কিছু আগে গুটিকতেক সেপিয়েন্স মানুষ তাদের উৎসভূমি আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। তাদের যারা মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলো সেখান থেকে এক সময় ইরান আফগানিস্তান হয়ে

মানুষ উত্তর ভারতে পৌঁছেছে কালক্রমে। কিন্তু তারও আগে আরেক দল মানুষ পূর্ব আফ্রিকা থেকে উপকূল অনুসরণ করে দক্ষিণ ভারতে এসে বসত করেছিলো— ওরাই ভারতে আদিতম সেপিয়েন্স মানুষ (আমাদের মত মানুষ)। ফসিল, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আর আধুনিক কালের ডি এন এ গবেষণার মাধ্যমে এই ব্যাপারগুলো নিশ্চিত হওয়া গেছে। ভারত অঞ্চলে সেই প্রথম আগমনকাল থেকে শুরু করে এ অধ্যায়ে আলোচ্য ১১ হাজার বছর আগের মানুষগুলো অবধি, এমনকি তারপরও বেশ কিছুদিন এখানে প্রায় সবাই ছিল শিকারি-সংগ্রাহক— দীর্ঘ পুরাতন প্রস্তর যুগে ও তারপর আমাদের শিল্পীর আমলের মধ্য প্রস্তর যুগে।

ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভূপাল নগরী থেকে ৬০ কিলোমিটারের মত দক্ষিণে ওবায়দুল্লাহগঞ্জ নামক শহরের কাছে পাথুরে পাহাড় ও বন অধ্যুষিত একটি জায়গা হলো ভীমবেতকা। এখানে ৬-৭ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকার মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি পাথুরে পাহাড়, যার মধ্যে অনেক খোপখাপ গুহা। আর রয়েছে অবক্ষয়িত পাহাড় থেকে সৃষ্টি উন্মুক্ত শিলা দেয়াল, তার মধ্যে পাথুরে আশ্রয়। ১৯৫০ এর দশকে অদূরে রেল রাস্তা ধরে ট্রেনে ভ্রমণের সময় এর অদ্ভুত ভূপ্রকৃতি ও শিলার দেয়াল একজন প্রত্নতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি এখানে এসে অনুসন্ধান চালান। এ অনুসন্ধানেই প্রথম আবিষ্কৃত হয় যে ওই গুহায় ও তার কাছে শিলা আশ্রয়ের উন্মুক্ত দেয়ালে রয়েছে অসংখ্য অদ্ভুত প্রাচীন চিত্র। সেই থেকে এখানে ৭টি পাহাড়ে মোট ৭৬০টি এরকম গুহা ও শিলা-আশ্রয় আবিস্কৃত হয়েছে যার ৫০০ টির মধ্যেই কিছু না কিছু প্রাচীন ছবি পাওয়া গিয়েছে। এদের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে শুরুতে তেমন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া না গেলেও পরে ১৯৭০ এর দশকে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু হলে ধীরে ধীরে বহু প্রাচীন মানব বসত উন্মোচিত হয়। এসব বসতের বিভিন্ন যুগের পাওয়া নিদর্শনের সঙ্গে সমসাময়িক হিসেবে ওই ছবিগুলোর আঁকার কালগুলোও প্রমাণিত হয়েছে।

ওই শিলা আশ্রয়গুলোতে যে বসতের নিদর্শন পাওয়া গেছে তার অধিকাংশ— মধ্য প্রস্তর যুগের, বিশেষ করে ১০ হাজার বছর আগেকার সময়ের। এই যুগের বৈশিষ্টপূর্ণ ক্ষুদ্র পাথরের হাতিয়ার এতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। দুই পাথরের চাকতিতে গড়া যাঁতাগুলো উদ্ভিজ খাদ্য সংগ্রহের সাক্ষ্য দেয়। তবে ওই সময়ের বা পরের অন্য যে কোন সময়ের চাষবাসের কোন হাতিয়ার বা চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায়নি। বসতগুলোতে যে রঙবস্তু রঙীন পাথুরে মাটির ডেলা হিসেবে পাওয়া গেছে এবং এসবের যে ব্যবহার আশ্রয়ের দেয়ালে দেখা গেছে, তাতে মনে হচ্ছে ছবিগুলো এই বসতের বাসিন্দারাই এঁকেছে। প্রায় একই রকম মধ্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও জীবন যাত্রার যে প্রতিফলন এখানকার আঁকা অধিকাংশ ছবিতে দেখা গেছে তাতে ওই চিত্রগুলোর সিংহভাগ যে ১০ হাজার বছর আগের সময় কালে অঙ্কিত তা প্রায় নি:সন্দেহ। এক দিকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো, অন্য দিকে এই ছবিগুলোতে আঁকা শিকার, উৎসব, জীবজন্তুর সঙ্গে সম্পর্ক, জীবন-জীবিকার অন্যান্য কাজ, স্ত্রী-পুরুষের ভূমিকা ইত্যাদির দৃশ্য থেকে ওই সময়ের ভীমবেতকার মানুষগুলো সম্পর্কে অনেকখানি জানা যায়। তবে ভীমবেতকার ওই গুহাগুলো, পাথুরে আশ্রয়গুলো আরো বহু আগে থেকে মানুষের বসত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভারত অঞ্চলে প্রথম সেপিয়েন্স মানুষের আগমনের কাল থেকে শুরু করে পুরাতন প্রস্তরযুগের নানা সময়ের মানুষের বসতের চিহ্ন এবং তখনকারো কিছু কিছু

হাতিয়ার এখানে পাওয়া গেছে। এমন কি শিলার গায়ে আঁকা অধিকাংশ ছবি ১০ হাজার বছরের দিকে আঁকা হলেও বেশ কিছু ছবি রয়েছে যেগুলো আরো অনেক প্রাচীন— সবচেয়ে প্রাচীনগুলো ধারণা করা হচ্ছে প্রায় ৩০ হাজার বছর আগের।

আবার অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত পরের আঁকা ছবিও কিছু কিছু আছে, যদিও সংখ্যায় তা খুব কম। যেমন সেই মধ্য প্রস্তর যুগের পর যখন পটারি বা পোড়া মাটির ঘটিবাটি কিছু পাওয়া যাচ্ছে তখনকার কিছু চিত্র পাওয়া গেছে। আবার তারও অনেক পরে ৫-৬ হাজার বছর আগের সময়ে তখন তামা, ব্রোঞ্জ রূপে ধাতব হাতিয়ার সবে দেখা দিয়েছে তখনকার ধাতব ঢাল তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে বা ঘোড়া অথবা হাতির ওপর চড়ে যুদ্ধরত ভঙ্গির কিছু ছবিও পাওয়া গেছে। বোঝা যাচ্ছে যে একেবারে পোষ না মানালেও মানুষ ওই ৫-৬ হাজার বছর আগে ঘোড়া বা হাতিকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করতে পারছে। সাধারণত একই জায়গায় একই পরিবেশে নিরবিচ্ছন্নভাবে এমন বহু হাজার বছর ধরে মানব বসতের স্পষ্ট নমুনা খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। তবে একেবারে ধাতব যুগ এসে যাওয়া সাম্প্রতিক সময়েও এখানে কৃষির কোন নমুনা দেখা যায়নি— না হাতিয়ার নিদর্শনে, না আঁকা ছবিতে, না অন্য কোন আলামতে। অথচ ভারতের অন্যান্য বহু অঞ্চলের মানব বসতিতে এর বহু আগেই শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের অবসানে বা তার পাশাপাশি কৃষি জীবন ভালভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছে। অবশ্য আমাদের কাহিনীর সময়, অর্থাৎ ১০ হাজার বছর আগে ভারতের কোথাও কৃষি এসে পৌঁছেনি।

ভীমবেতকার গুহা

ভীমবেতকার পাথুরে আশ্রয়

ভীমবেতকার পাথরে আঁকা চিত্র

পাকিস্তানের মেহেরগড়ের মুন্নি ঃ
সাড়ে আট হাজার বছর আগে

কাছাকাছি জায়গাতেই পর্বত, নদী, সমতল সবই আছে এখানে; পর্বত ফুঁড়ে গিরিপথ চলে গেছে দূরদেশে। সেই পথেই বাকি বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বদলে দিয়েছে ওদের জীবন— এমনকি সদ্য-তরুণী মুন্নি ও তার সইয়ের জীবনও। এই যোগাযোগের কারণে ওরা পোষা ছাগল চরাতে পারে, কৃষির কাজ করতে পারে, দূরদেশের অলঙ্কার পরতে পারে।

দেখা যায় প্রায় তিন দিকেই কিছু দূরে পর্বত— সেখান থেকে নেমে এসেছে বোলান নদী, আর এখানে সমতল ভূমিতে মেহেরগড় জায়গাটি। দৃশ্যটি আট হাজার বছর আগের বর্তমান পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের ইরান সীমান্তবর্তী এলাকার। বোলান নদী অবশ্য সৃষ্টি করেছে ওই পর্বতের মধ্য দিয়ে বোলান গিরিপথ যার উচ্চ দুর্গম পথে অতিক্রম করা যায় পর্বত, চলে যাওয়া যায় ইরান হয়ে আরো পশ্চিমে ইরাক (মেসোপোটেমিয়া), জর্দান, সিরিয়া, তুরস্ক— সেই উর্বর বাঁকা চাঁদে। কালেভদ্রে দূর পথযাত্রী কিছু মানুষ এরকম যাতায়ত করে এবং তা মেহেরগড়ের মানুষের জীবনে বেশ ভালই প্রভাব রাখে।

কিন্তু এখানকার মুন্নি নামের যে মেয়েটির কথা বলতে চাইছি তার কাছে ওই পর্বত, ওই বোলান গিরিপথ, বিস্তৃত সমতল, আঁকাবাঁকা নদী আবছা হয়ে দূরে মিলিয়ে যাবার দৃশ্য মাত্র। ওই আদুরে নামটিতে সবাই যখন তাকে ডাকতে শুরু করেছিল মুন্নি তখন একেবারে খুকি ছিল। এখন তার বিয়ে হয়েছে তাও বেশ কিছু দিন হলো, আপনজনদের কাছে নামটি যদিও মুন্নিই আছে। দেখতে মুন্নিকে অবশ্য এখনো একজন কিশোরী ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়না। সেই কিশোরী বয়স থেকেই পাড়ায় মুন্নির খ্যাতি তার ছাগলের পাল নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ও এই ছোট ছোট পশুগুলোর সঙ্গে তার অদ্ভুত সম্পর্কের জন্য। এই ছাগলের পাল মেহেরগড়ের মানুষের জীবন-জীবিকায় এখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। গৃহপালিত গরুর লালন পালনও বেশ কিছু চলছে তবে গরুগুলোকে ওভাবে চরাতে বেশি দেখা যায়না। পরিবারে

যে কয়টা আছে মুন্নি ও তার মা বাড়িতে রেখেই তাদের যত্ন আত্তি করেছে। বিয়ের পরও মুন্নি একই কাজে শ্বশুর বাড়িতেও খুবই প্রশংসা কুড়োচ্ছে। সেখানে তার সঙ্গে জোট বেঁধেছে তার দেবরের বৌ যাকে সে তার সই বলেই জানে। ওই বাড়িতে আবার ছাগল ও গরু পালার কাজ ছাড়াও বার্লি ও গম চাষ খুবই গুরুত্ব পাচ্ছে। আর মুন্নি ও তার সই তাদের শ্বাশুড়ির সঙ্গে মিলে সে কাজেও বেশ হাত দিয়েছে।

আসলে বহু দিন ধরে মেহেরগড়ের মানুষরা সমতল এবং পর্বতের ঢালের বনে শিকার করে জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে সঙ্গে পোষা পশু পালন ও বার্লি চাষের ওপরও কিছুটা নির্ভর করে আসছে। এদিক থেকে এরা পর্বত থেকে অনেক দূরে পূর্বাঞ্চলে যে আরো বিশাল সমতল বিস্তৃত হয়েছে সেখানকার মানুষদের থেকে আলাদা। এই কৃষির কাজটি মেহেরগড়ে ও তার আপশাশেই যেন সীমাবদ্ধ। এখানে মুন্নির শ্বশুর বাড়ির মত কিছু কিছু পরিবারতো এখন বেশ বড় আকারেই কৃষির দিকে ঝুঁকেছে। বড় করে জমি তৈরি করে তার বেশির ভাগ জায়গাতেই রীতিমত বার্লির চাষ করছে তারা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে খোসাছাড়া বুনো বার্লি জমিতে লাগালেও এখন এখানে ছয় সারি দানার খোসাওয়ালা পুরুষ্টু পোষ মানানো বার্লির বীজ বেশ সহজলভ্য। তাই মুন্নিদের চাষের খেতে এই বার্লিরই প্রাধান্য এখন। খানিকটা জমিতে পোষ মানানো গমের চাষও করছে ওরা— কিন্তু গমের ফলন কম, তাই ওরা বার্লি ফলাচ্ছে বেশি; খাচ্ছেও বেশি বার্লির সুজি, বার্লির জাউ। অনেকে যারা এত চাষ করেনা তারা মুন্নিদের পরিবারের মত বড় চাষী পরিবারগুলোর কাছ থেকে বার্লি কিনে নেয়, কারণ মুন্নিদের চাষের ফলন তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি।

চাষের বিস্তৃতিই মনে হয় মেহেরগড়ের সমাজে নারীর গুরুত্ব ও মর্যাদা বাড়িয়েছে। একদিকে পশুপালন ও অন্যদিকে বার্লির চাষ এই দুটিতেই তাদের প্রাধান্য বেশ স্পষ্ট। যেমন এই কৃষিই মুন্নিদের পরিবারে তার শ্বাশুড়িকে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসিয়েছে, কারণ এ কাজে মূল নেতৃত্ব তাঁর। এর প্রতিফলন ঘটেছে তাদের সংস্কৃতিতে— আচার অনুষ্ঠানে মেয়েদের সমান অংশ গ্রহণে। পটারির কিছু কিছু যেটুকু চর্চা মেহেরগড়ে রয়েছে তা নিত্য ব্যবহারের জন্য না হলেও আচার অনুষ্ঠানে স্থান পাচ্ছে, আর একই রকম স্থান পাচ্ছে ছোট ছোট কিছু পোড়ামাটির মূর্তি— প্রায় সবই নারীমূর্তি, নারীর গরিমাকে নানা ভাবে প্রকাশ করে। সে কথায় পরে আসছি।

মুন্নির শ্বশুর বাড়ি নদীর ধারে বেশ বড় সড় একটি চৌকোনা মাটির ঘর— ভেতরে ছয়টি কামরা, একান্নবর্তী সম্পন্ন চাষী পরিবারে এখানে যেমন হয়। চার কামরার বাড়িই এখানে বেশি, তবে দশ কামরা পর্যন্ত দেখা যায়। একটি কামরা অপেক্ষাকৃত ছোট বর্গাকৃতির; ওটি গোলাঘর, বার্লি শস্য উঠলে শুকানোর পর এখানেই রাখা হয়। নদীর ধারে কিছুটা ফাঁক ফাঁক করা প্রায়ই একই রকম দেখতে

অনেকগুলো বাড়ি এখানে। আর যাই হোক মেহেরগড়কে ছোট গ্রাম বলা যাবেনা। বাড়িগুলো রোদে শুকানো কাদার ইটে তৈরি— দুই প্রস্ত ইট পাশাপাশি গেঁথে দেয়াল তৈরি হয়েছে। ইটগুলো প্রায় সবই এক সাইজের— বেশ সরু, কাদার সঙ্গে বার্লি বা গমের খড় কুচিকুচি করে মিশিয়ে এর দৃঢ়তা বাড়ানো হয়েছে। দেয়াল গাথার সময় ইটের ফাঁকে ফাঁকে কাদার মশলা ব্যবহার করা হয়েছে, পাশাপাশি দুটি ইটে মশলাটি ঢুকে যেন ইটে ইটে সংযোগটি ভাল হয় এ জন্য ইটের মধ্যে একটু খাঁজ কাটা আছে। ভেতরের এসব ব্যবস্থা অবশ্য নতুন বাড়ি তৈরির সময় দেখা যায় অথবা পরিত্যক্ত ভাঙ্গা বাড়িতে। এর কারণ প্রায় বাড়িতেই ইটের গাথুনির ওপর চমৎকার ভাবে কাদার পলেস্তরা করা, শুধু তাই নয় সেই পলেস্তরায় আবার লাল মাটির গুড়ো দিয়ে রং তৈরি করে রঙীন ডিজাইনও করা হয়েছে V চিহ্নের মত চিহ্ন, বিন্দু চিহ্ন, রেখা চিহ্ন এ সবের নানা সমন্বয়ে রীতিমত জটিল ডিজাইন আঁকা হয়েছে। বাসা-বাড়ির নান্দনিক চেহারার ওপর এই সম্পন্ন গেরস্তরা যে বেশ জোর দেয় তা বেশ ভালই বোঝা যায়।

বাড়ির ছাদ সমতল, মূলত মাটি দিয়েই তৈরি, তবে তার সঙ্গে মেশানো রয়েছে মোটা মোটা বেত ও শণ জাতীয় আঁশ। পুরো গ্রাম জুড়ে মাটির ঘরের এমন জৌলুস গড়ে তুলতে ওরা পেরেছে তার কারণ বেশ আর্দ্র আবহাওয়া হলেও এখানে ভারী বৃষ্টি হয়না বল্লেই চলে— মাটিতে কখনো পানি জমেনা। এমন আবহাওয়া একদিকে আর্দ্র জায়গার উপযুক্ত বন চারিদিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, অন্য দিকে বার্লি, গম ইত্যাদির চাষের জন্যও বেশ ভাল। তাছাড়া বোলান নদীর কারণে পানির অভাব ওদের কখনো হয়না। অতীতে অবশ্য অন্য রকম সমস্যা কখনো কখনো হয়েছে নদীতে যখন বড় বন্যা এসেছে কিংবা নদী গতিপথ পরিবর্তন করেছে। বাড়ির দেয়ালের গোড়ায় রোদে শুকানো ইটের ভিত্তি পানিতে টেকেনা বলে বানের মধ্যে পড়া বাড়িগুলো ধসে গেছে। অতীতের এরকম ভাঙ্গা বাড়ি এখনো গ্রামের কোথাও কোথাও দেখা যায়।

কৃষিপ্রধান পরিবারের বাড়িতে সব সময় কৃষি ও শস্য প্রক্রিয়াকরনের জিনিসের সমারোহ থাকবে সেটিই স্বাভাবিক— বিশেষ করে ঘরের মেয়েরা এই নিয়ে মেলা ব্যস্ত থাকে। একের ওপর আরেক দুটি পাথরের চাকতি দিয়ে তৈরি হয়েছে শস্য পেষার যাঁতা। শস্য সংরক্ষিত হয় বেতের ঝুড়িতে। কিছু কিছু ঝুড়িতে আলকাতরার প্রলেপ দেয়া আছে এতে ঝুড়ি শক্তও হয়েছে আবার তরল রাখার উপযুক্ত হয়েছে। পটারির আলঙ্কারিক ব্যবহার থাকলেও কাজেকর্মে ব্যবহার নেই তাই চুলার ওপর তরল গরম করার জন্য কোন পাত্র এদের নেই। স্থানীয় ভাবে এখানকার নদীর ধারে মাটি থেকে আলকাতরা বের হতে দেখা যায়। দূর থেকেও সংগ্রহ করে আনা হয়ে এই প্রয়োজনীয় জিনিসটি। ঘরের বিভিন্ন কামরায় চুলা রয়েছে যা ঘর গরম করার কাজেও লাগে। তবে ঘরের বাইরে ছোট ছোট অগভীর গর্তও এক রকম হিটার হিসেবে কাজ করে। অঙ্গার ভর্তি ওই গর্তের মধ্যে

সব সময় কিছু ছোট ছোট নুড়ি পাথর দেখা যায় যেগুলোকে খুব গরম করে আলকাতরা প্রলেপ দেয়া ঝুড়ি, মাটির পাত্র, কাঠের পাত্র ইত্যাদিতে রাখা পানিতে ফেলে দিলে পানি পরোক্ষভাবে উত্তপ্ত হয়। এভাবেই ওদের নিত্য খাদ্য বার্লির জাউ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। মুন্নিদের বাড়িতে যখনই কোন মেহমান আসে তখনই এরকম জাউ করে অতিথিকে খেতে দেয়া হয়। তা ছাড়া স্থানীয় এক রকম সুগন্ধ গুল্ম পাওয়া যায় যাও এর কম উত্তপ্ত পানির মধ্যে দিয়ে তা এক রকম হার্বাল চায়ের মত খেতে দেয়া হয়। এটা এদের মেহমানদারী ও লৌকিকতার অংশ হয়ে গেছে।

নদীর পারে এবং ওদিকে পর্বতের কাছে পর্যন্ত মেহেরগড়ে বিস্তীর্ন উর্বর সমতল— অনেকটাই ঘাসে ঢাকা। আবার পর্বতের দিকটায় কিছু সমভূমিতে ও পর্বতের নিচের দিকের ঢালে সুন্দর খন্ড খন্ড বন। পপলার, উইলো, এল্‌ম, অ্যাশ ইত্যাদি গাছ-প্রচুর, আর এগুলোর নিচে নিচে ঘাস, ঝোপ ঝাড়। পোষা ছাগল, পোষা ভেড়া, আর কখনো কখনো পোষা গরু চরাবার জন্য এসব জায়গা খুবই আদর্শ জায়গা। মুন্নি আর তার সইকে প্রায় দেখা যায় তাদের বাড়ির অদূরে নদীর ধারে ধারে ছাগল চরাতে। ওদের ছাগলের পালটি বলতে গেলে এদিককার সব চেয়ে বড়। সব ছাগল এক সঙ্গে নিয়ে অবশ্য তারা বেরোয়না। এ কাজটি মুন্নির প্রিয় তার কারণ ছোটবেলা থেকে ছাগলের সঙ্গে তার খুব কাছের সম্পর্ক; ওর সইও কম যায়না এদিক থেকে। বন্য অবস্থায় এখানে যে ছাগল পাওয়া যায় তার তুলনায় এই পোষা ছাগলগুলো অনেক ছোট, মনে হয় পোষ মানাবার সুবিধার্থে মানুষ বেছে বেছে ছোটগুলোকেই গৃহপালিত করে তুলেছিলো। পোষা গরুগুলোও এখানকার বন্য গরুগুলোর চেয়ে ছোট— তবে তাতে স্থানীয় এই জেবু গরুর স্পষ্ট বৈশিষ্ট রয়েছে, কারণ এখানকার বন্য গরুর থেকেই এই গৃহপালিত গরু সুদূর অতীতে মানুষ পোষ মানিয়ে আপন করেছিলো। জেবু গরুর উঁচু কুজ, খাড়া শিং আলাদা ভাবে খুব চোখে পড়ে।

মুন্নি আর সইয়ের ওভাবে ছাগল চরাতে বের হওয়া শত ব্যস্ত এই দুই গেরস্ত তরুণীদের জন্য একটি বড় অবকাশও বলা যায়— ওই খোলা আকাশের নিচে সুন্দর পরিবেশে ছাগল নিয়ে ঘুরে বেড়াবার অবকাশ, দুই সইয়ের গল্প করারও অবকাশ। তাছাড়া এরকম কাজে বাইরে গেলে তাদের সামনে আরো একটি কাজ থাকে— তা হলো বন্য উদ্ভিজ খাবার সংগ্রাহকের কাজ। এটি পরিবারের অন্যরাও করে, বিশেষ ভাবে মহিলারা। বার্লি, গম সবই চাষ হচ্ছে বটে, কিন্তু ফসল ঘরে না ওঠা পর্যন্ত নানা রকম বন্য উদ্ভিজ সংগ্রহ করাটি খুবই জরুরী। নানা রকম বন্য শস্য, শিম, ফল, বাদাম এগুলোই প্রধান লক্ষ্য। সঙ্গে থাকা ঝুড়িতে ওরা এগুলো সংগ্রহ করে। ফলের মধ্যে এখানকার আবহাওয়ায় বড় ফল কম পাওয়া যায়, তবে দুটি ছোট ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে— খেজুর আর বরই। দুটিই মুন্নি আর তার সইয়ের অত্যন্ত প্রিয়। বাড়ির জন্য তো প্রচুর সংগ্রহ করেই, বাইরে থাকা কালে

সারাক্ষণ দুই সই গল্প করতে করতে এগুলো খেয়েই চলে। এগুলো অবশ্য কখনই মূল খাবারের অংশ হয়না— সেটি আসে শিকার থেকে এবং চাষের শস্য থেকে, এবং কখনো কখনো নিজেদের গৃহপালিত পশু থেকে।

শিকারের জন্য এই সমতলটি অদ্ভুত সমৃদ্ধ— সমতল পেরিয়ে পর্বতের ঢালটিও তাই। দৈনন্দিন ছোট ছোট শিকারগুলোর জন্য পরিবারের ছোট শিকারি দলই যথেষ্ট, আর এর জন্য বাড়ি থেকে খুব দূরেও যেতে হয়না। নদীর ধারে তৃণভূমি ও ঝোপঝাড়েই প্রচুর শিকরে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বুনো ছাগল, বুনো ভেড়া, বুনো গাধা; গাজেল আর নীলগিরি হরিণ; এবং প্রচুর বুনো শূয়োর। চার পাঁচজন মানুষ তীর-ধনুক অথবা বর্শা দিয়ে বেশ সহজেই এদের শিকার করতে পারে। এদেরকে কখন কোথায় পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা ওদের সবার রয়েছে— বিভিন্ন চিহ্ন দেখে তারা তা বুঝতে পারে। বসত অঞ্চল থেকে কিছু দূরে বোলান নদীতে এই প্রাণীদের পানি খেতে আসাও ওদেরকে প্রায়ই এক সঙ্গে পাওয়ার একটি সুযোগ। এমনি নদীর বিভিন্ন যুৎসই জায়গা এবং আরো দু'একটি পানির উৎস পর্বতের ঠিক নিচে নিচে পাওয়া যায় যেখানে বড় শিকারগুলো পানি খেতে আসে; এর মধ্যে থাকে বুনো মোষ ও বুনো গরু, কিন্তু কখনো কখনো হাতীও। এ ধরনের বড় শিকারের জন্য বড় প্রস্তুতি লাগে, শিকারি দলটিকেও বড় হতে হয়— তবে সে রকম শিকারও হরদম চলছে। কেন জানি এই যে বোলান নদী নানা ভাবে মেহেরগড়ের অন্ন যোগাচ্ছে তার থেকে সরাসরি খাদ্য সংগ্রহের তেমন কোন চেষ্টা এরা করেনা— অর্থাৎ মাছ ধরা বা মাছ খাওয়ার চল এখানে নেই বললেই চলে। তা ছাড়া নদীর কারণে নানা রকম পাখির যে সমাগম ঘটে তাতেও তাদের খুব একটি রুচি আছে বলে মনে হয় না।

শিকারের অস্ত্র তৈরিতে বোলান নদী অন্য ভাবেও অবদান রাখে— তা হলো এ নদীতে দূর পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রচুর পাথর পানির স্রোতে গড়াগড়ি খেতে খেতে এখানে আসে— নুড়ি পাথর থেকে শুরু করে বেশ বড় পাথরও এ ভাবে হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে যেমন সাধারণ পাথর যেমন রয়েছে তেমনি খুব উচ্চ মানের ফ্লিন্ট পাথরও রয়েছে। নদীতে গিয়ে এগুলো বাছাই করে আনার দক্ষ মানুষ রয়েছে তাদের মধ্যে। পাথরের হাতিয়ার তৈরিটি লক্ষ্য করার মত।

হাতিয়ার যদিও সবই স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে তৈরি হচ্ছে অলঙ্কার কিন্তু তা হচ্ছেনা। বলতে গেলে অলঙ্কারের প্রতি মেহেরগড়ের মানুষের আকর্ষণ তাদেরকে বহু দূরদূরান্তের সঙ্গে যোগাযোগে উদ্বুদ্ধ করেছে। অলঙ্কারই তাদের অনেককে ব্যবসায়ী ও দূর পথের যাত্রী করে তুলেছে। অবশ্য এর সঙ্গে কৃষি বীজ ইত্যাদির বিনিময়ের বিষয়টিও আছে। ওদের অলঙ্কারে পাথরের মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান দুটি হলো ল্যাপিজ লুজুলি এবং টর্কুইজ । প্রথমটি খুব ঘন নীল রঙের অত্যন্ত

মূল্যবান পাথর। মেহেরগড়ে এটি পেতে হলে আনতে হয় উত্তর আফগানিস্তানের বদখশান থেকে যেখানে অন্য পাথরের সঙ্গে মেশানো অবস্থায় এই রত্ন পাথর পাওয়া যায়। টর্কুইজ নীল-সবুজ ফিরোজা রঙের রত্ন পাথর— এটি ইরানের কিছু কিছু জায়গায় পাওয়া যায় আবার আরো দূরে প্যালেষ্টাইনের কাছে সিনাইতে পাওয়া যায়। মেহেরগড়ে উঁচু মানের পুঁতির দানা, লকেট, হার, চুরি এসব অলঙ্কারে এই দুটি পাথর বেশ খানিকটা ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বেলে পাথর ও চুণা পাথরের এবং চকচকে কালো সোপ-ষ্টোনের কিছু সুন্দর সুন্দর রূপও এসব কাজে ব্যবহৃত হয়। এর বেশির ভাগের জন্যও বোলান গিরিপথ দিয়ে পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগের ওপর নির্ভর করতে হয়।

একেবারে মেসোপোটেমিয়া থেকে পর্যন্ত ওখানকার ব্যবসায়ীরা এখানে আসে কালেভদ্রে। তবে আফগানিস্তান-ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ নিত্য দিনের। বিশেষ করে ইরানের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সুসা এবং পুরো জাগ্রোস পর্বতের কিনারা অঞ্চলে বার্লি ও গমের চাষ হচ্ছে বহুদিন ধরে। ওখানে গৃহপালিত ছাগল ও ভেড়ার প্রচলনও অনেক প্রাচীন। এই যোগাযোগের কারণেই হয়তো এতো পূর্বের জায়গা মেহেরগড়েও প্রায় একই রকম গৃহপালিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রচলন ঘটেছে। এর আশপাশে সব জায়গা যখন শিকারি-সংগ্রাহক জীবনযাত্রার মধ্যেই রয়ে গেছে মেহেরগড়ের সংস্কৃতিতে মধ্যপ্রাচ্যের উর্বর বাঁকা চাঁদ এলাকার কৃষি ও পশু পালনের প্রভাব পৌঁছে গেছে। অবশ্য মেহেরগড়ের মানুষদের নিজের চেষ্টাতেই এর বেশির ভাগ হয়েছে।

মুন্নির শ্বশুর বাড়িতে তার ভাসুর একজন আছেন যিনি প্রধানত আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করেন। এ জন্য দু'ধরনের মানুষের সঙ্গে তাঁকে কাজ করতে হয়। বোলান গিরিপথ দিয়ে পশ্চিম থেকে ব্যবসায়ীরা তাঁর প্রধান সরবরাহক— ওই ল্যাপিজ লুজুলি ও টর্কুইজের। দূর থেকে আসা এ মানুষদের কেউ কেউ মুন্নিদের বাড়িতে আসে। এ ভাবেই মুন্নি ও পরিবারের অন্যদের সুযোগ হয়েছে বিদেশী মানুষ দেখার। অন্য ধরনের মানুষ আসে অপেক্ষাকৃত কাছের আরব সাগর তীর থেকে।

বোলান গিরিপথের ওপার থেকে ব্যবসায়ীরা যখন এখানে আসে তাদের সঙ্গে বিনিময় করার মত সামগ্রী মেহেরগড়ের মানুষের কাছেও আছে। পাথরের অলঙ্কার ছাড়া অন্য যে অলঙ্কারের জিনিস ওখানে খুব প্রিয় তা হলো ঝিনুক, শাঁখ, ঝিনুক জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর খোল ড্যান্টিলিয়াম ইত্যাদি। এর প্রায় সবই আসে এখান থেকে ৫০০ মাইল দক্ষিণে আরব সাগরের পার থেকে। মেহেরগড়ের কিছু মানুষও ওখানে যাতায়ত করে এগুলো নিয়মিত আনে। এগুলোর ভাল চাহিদা রয়েছে বোলান গিরিপথের অন্য প্রান্তের দূর দূরান্তের মানুষের কাছে। তাছাড়া বার্লি ও গম শস্যের দু'একটি জাত মেহেরগড়ে এমন ভাল রয়েছে যে তারও একটি চাহিদা অন্যত্র আছে। কাজেই বীজের ব্যবসায়ও শুধু আমদানী হয়না, রপ্তানীও হয়। মুন্নির

ভাসুরের আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা পুরো পারিবারকে বেশ সমৃদ্ধ করছে।

আর একটি পেশা মেহেরগড়ে খুব ব্যতিক্রমী ভাবে উন্নত হয়েছে সেটি চিকিৎসকের পেশা, বিশেষ করে দাঁতের চিকিৎসার পেশা। যেমন চিকিৎসার প্রয়োজনে বা অন্য কোন কারণে দাঁতের এনামেলের ওপর ছিদ্র করতে হলে তা তারা অবলীলায় করে। এর জন্য খুব ছোট্ট একটি ড্রিলিং মেশিন বানিয়েছে। ছোট্ট একটি তীর ধনুকের ব্যবস্থায় ধনুকের ছিলার সঙ্গে ড্রিলটি পেচিয়ে রাখা হয়। ধনুকের বাঁকা অংশ বার বার টানলে ও ছাড়লে ড্রিলটি দ্রুতবেগে একবার ডানে ও আবার বামে ঘুরতে থাকে। এই ড্রিলের আগায় সূক্ষ্ম শক্ত ফ্লিন্ট পাথর রয়েছে বলে শক্ত এনামেলের মধ্যে ছোট্ট ছিদ্র করা সম্ভব হয়। কৃষির প্রচলন মেহেরগড়ে কিছু মানুষকে এমন বিশেষজ্ঞ হবার সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কৃষি, পশুপালন, গেরস্থালী, শিকার, সংগ্রহের মধ্যেই ডুবে রয়েছে— যেমন রয়েছে মুন্নি ও তার সই। বাইরে ছাগল চরানো, ফল-শস্য সংগ্রহ এসব কাজ এক সঙ্গে অনেক্ষণ ধরে করে বলে তাদের বন্ধুত্বটাই আলাদা রকম। সেই মুন্নি হঠাৎ একদিন একা হয়ে গেলো, কী এক অজানা রোগে অল্প কয়েকদিন ভুগেই তার সই হঠাৎ মারা গেলো। শোকে মুন্নি পাথর হয়ে গেলো বটে কিন্তু বাড়িতেই সইয়ের শেষকৃত্যের এতো দায়িত্ব তার ওপরও পড়লো যে নীরবে শোক করার অবকাশও সে শুরুতে পেলোনা। প্রায় কিশোরী বয়সে শ্বশুর বাড়িতে আসার পর থেকে এই সই ছিল তার ছায়া সঙ্গীনী। দুইজন পরস্পরকে যতটা বুঝতো তা অন্য কাউকে নয়। সেই সই এখন একটি নিথর দেহ।

মুন্নিদের বাড়ির উঠানে এর আগেরও পরিবারের এক জনের কবর আছে, মুন্নির স্বামীর এক ভাই কিছু দিন আগে মারা গিয়েছিলো তার কবর। এখন পাশেই দ্বিতীয় কবরটি খোঁড়া হলো। মেহেরগড়ে কবর দেয়াটি সংক্ষিপ্ত কোন কাজ নয়, এ অনেক আচার-অনুষ্ঠানের কাজ। বেঁচে থাকতে সই যে খুব সেজে গুজে অলঙ্কার পরে থাকতো তা নয়— ওর মতো চাষী-বৌয়ের সেরকম সাজার ফুরসৎ কোথায়? হাতে কিছু চুড়ি, আর গলায় একটি পুঁতির মালা এই ছিলো তার সাজ। কিন্তু মরনে তার সাজ হলো যথেষ্ট জমকালো এবং ব্যয় বহুল। শাঁখের ছোট ছোট কাটা অংশ দিয়ে তৈরি গলার হার, ডেন্টালিয়াম খোলের তৈরি মাথার টায়ারা, কোমরে পাথর খচিত একটি কোমরবন্ধ, ঝিনুকের চকচকে অংশ থেকে কাটা লজেন্স আকৃতির বেশ কিছু লকেট, এবং ল্যাপিজ লুজুলি পাথরের সুন্দর ভাবে কাটা একটি বড় গোলক থুতনির কাছে আলগোছে রাখা। ঘন নীল রঙের এই গোলকটি সব কিছুকে ছাড়িয়ে সইয়ের মৃতদেহকে একটি আলাদা গরিমা দিচ্ছে। আশপাশে গেরস্থালীর কিছু সরঞ্জাম কবরের মধ্যে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে আসল আচার-অনুষ্ঠানটি হলো সবার পর। সইয়ের নিজেরই ছাগলের পাল থেকে ছোট্ট পাঁচটি বাচ্চা নিয়ে আসা হলো মৃতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার জন্য। এক এক করে পাঁচটি ছাগলের বাচ্চাকে জবাই করে সেগুলো মৃতদেহের পাশে সাজিয়ে দেয়া হলো— যেন

পরলোকেও সে তার ছাগলের পালের থেকে সম্পর্কচ্যুত না হয়। সব আচার অনুষ্ঠান শেষে মাটি দিয়ে আবার কবরকে ঢেকে দেয়া হলো। বাড়ির একেবারে সঙ্গেই আছে বলে মারা গিয়েও সই পরিবারের একজন হয়ে রইলো।

* * *

মেহেরগড় প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকাটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৭৪ সালে। এর পর থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে এর ওপর আন্তর্জাতিক দলের খনন কাজ চলে। ২০০০ সালে এর খনন কাজ আবার নতুন ভাবে শুরু হয়। খননের ফলে রোদে শুকানো মাটির ইটের তৈরি বাড়িগুলো এবং সেগুলোর মাঝে মাঝে উঠানের অনেকগুলো উদ্ঘাটিত হয়েছে। এখানে পাওয়া নিদর্শনগুলো থেকে আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে সেদিনের মেহেরগড়ের জীবন যাত্রা। এই সেদিনটিও বেশ দীর্ঘ সময়। নয় হাজার বছর আগে থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের বিভিন্ন যুগের নিদর্শনগুলো স্তরে স্তরে পাওয়া গেছে এই খনন কাজে। মূল ধারার অনেক কিছু নিরবিচ্ছিন্ন ছিল কিন্তু যুগে যুগে অনেক কিছু বদলেও গেছে। আমরা একেবারে শুরুর শ'পাঁচেক বছর পরের সময়কে আমাদের কাহিনীর জন্য নির্বাচিত করেছি।

ওসময়ের বাড়িগুলোর বর্তমান ধ্বংসাবশেষ, তখনকার কবরের মধ্যে কঙ্কাল, অলঙ্কার, হাতিয়ার, বাড়ির মধ্যে ও উঠানে হাতিয়ার, চুলা, হাড়, সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া শস্যবীজ ইত্যাদি সে কাহিনীকে উদ্ঘাটন করেছে গবেষণায় তার নানা দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া পরাগরেণুর বিশ্লেষণ যেমন আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে মেহেরগড়ে সেদিন কী রকম গাছপালা, ঝোপ, ঘাস ইত্যাদি ছিল, তেমনি হাড়ের নির্দশন জানিয়ে দিয়েছে প্রাণীদের খবর। এর মধ্যে পোষ মানানো কৃষিজাত বার্লি ও গম পাওয়া গেছে আবার উভয়ের বন্য প্রজাতিও পাওয়া গেছে। তিনটি প্রাণী— ছাগল, ভেড়া ও গরুর গৃহপালিত রূপটির হাড়, দাঁত ইত্যাদি নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেভাবেই আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি মুন্নিদের ছাগল চরানোর বিষয়টিতে, আর একেবারে প্রায় প্রথম দিককার পূর্ণ পোষ মানানো বার্লি আর গমের চাষের মাধ্যমে ওদের কৃষিজীবী হয়ে ওঠার বিষয়টিতে। মধ্য প্রাচ্যের উর্বর বাঁকা চাঁদ এলাকায় কৃষির প্রথম উদ্ভাবনের পর প্রায় একই ধারার কৃষি ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম এ জায়গাতেই শুরু হয়েছে এমনটি মোটামুটি প্রমাণিত। এদিক থেকে মেহেরগড় অনন্য। বার্লি, গম, ও ছাগলের সমন্বিত ব্যবহার যেমন উর্বর বাঁকা চাঁদের কৃষির মূল সুরের কাজ করেছে এখানেও ঠিক তাই। এদিক থেকে মনে হতে পারে যে ওখানকার কৃষির প্রভাবের ঢেউটিই সাড়ে আট হাজার বছর আগের মেহেরগড়ে এসে ঢেউ তুলেছিলো। মেহেরগড়ে ব্যবহৃত অলঙ্কারে সুদূর জায়গাগুলোতেই শুধু পাওয়া যায় এমন পাথর ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহারেও এখানকার মানুষের দূরবর্তী সংযোগটি বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদরা এও মনে করছেন যে মেহেরগড়ের কৃষির আদি বীজ ও আদি পোষা ছাগল মধ্য প্রাচ্য থেকে আসেনি, মেহেরগড়ের মানুষই স্থানীয় বন্য অপেক্ষাকৃত ছোট ছাগল থেকে এবং স্থানীয় বন্য গরু থেকে নিজেদের গৃহ পালিত ছাগল এবং গৃহপালিত স্থানীয় বিশেষ জেবু গরু বহু কাল ধরে সৃষ্টি করেছে। উভয় জায়গার ওই দুই পশুর পার্থক্যের কারণেই তাঁরা এটি ভেবেছেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কিছু কিছু ব্যতিক্রমী জিনিস আমাদেরকে মেহেরগড়ের অন্য কিছু মাত্রার খবর দিয়েছে। যেমন পরিপূর্ণভাবে পটারি তখনো না করতে পারলেও ওরা কাদার ও কিছুটা পোড়া মাটির যে ছোট মূর্তিগুলো তৈরি করতো তাতে শুধু মেয়েদেরকে বেছে নেয়া ও মেয়েদেরকে পূর্ণ গরিমার প্রকাশ করার মাধ্যমে মেহেরগড়ের সমাজে মেয়েদের উচ্চস্থান প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন কবরে ১১ জন আলাদা মানুষের কঙ্কালে পেষণদন্তে ড্রিল করার চিহ্ন সবাইকে রীতিমত হকচকিয়ে দিয়ে গেছে। দাঁতের এনামেলে এরকম ছিদ্র করার জন্য সূক্ষ্ম ড্রিল যন্ত্র এবং দক্ষ হাত উভয়েরই দরকার হয়েছে— যদিও এতগুলো পৃথক ক্ষেত্রে কেন এটি করা হয়েছিলো তা স্পষ্ট জানা যায়না।

তরুণী সইয়ের মৃত্যুতে তাকে কবর দেবার সময়ের যে বর্ণনা আমরা দিয়েছি প্রত্নতাত্ত্বিকরা তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে আবিষ্কার করেননি। বরং অনেক কবরেই তাঁরা মৃতকে এমনি ভাবে দামী অলঙ্কারে সাজিয়ে আরো অনেক সামগ্রী দিয়ে দেবার বিষয়টি উদ্ঘাটন করেছেন। অন্তত পাঁচটি বিভিন্ন কবরে দেখা গেছে তরুণী মহিলার কঙ্কালের সঙ্গে ঠিক পাঁচটি ছাগলের বাচ্চার কঙ্কাল— প্রত্যেকবার ঠিক পাঁচটিই ছাগলের বাচ্চা। এর থেকে তরুণীদের ছাগল চরানো এবং সে জন্যই তাদের কবরে দেবার জন্য ছাগল উৎসর্গ করার নিয়মটি আন্দাজ করা হয়েছে করা হয়েছে। অন্যদের ক্ষেত্রেও যে সব হাতিয়ার ইত্যাদি দেয়া হয়েছে হয়তো সেগুলো নিয়েই তাদের পেশা ছিল।

মেহেরগড়ের কিছু কিছু মানুষের কঙ্কালের গবেষণায় এবং সে কঙ্কাল থেকে নেয়া ডিএনএ থেকে দেখা গেছে সেদিনের সেই মানুষগুলোর বংশধররা এখন আর সে জায়গায় নেই— বর্তমানের বেলুচিস্তান বা পাঞ্জাব সমতলের মানুষের সঙ্গে তারা একই গোষ্ঠির ছিলনা। তারা বরং ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষেরই সমগোত্রীয় ছিল। পরে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের সময়ে এসে মেহেরগড়ে আর ওই মানুষদের বংশধরদের বসতের কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ অঞ্চলের পরবর্তী মানুষরা অন্য গোষ্ঠির এবং কিছুটা অন্য সংস্কৃতির, যারা পরে এক সময় এখানে সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টি করেছে।

আকাশ থেকে নেয়া মেহেরগড় খনন স্থলের ছবি

মেহেরগড়ের বাড়ি আবিষ্কার

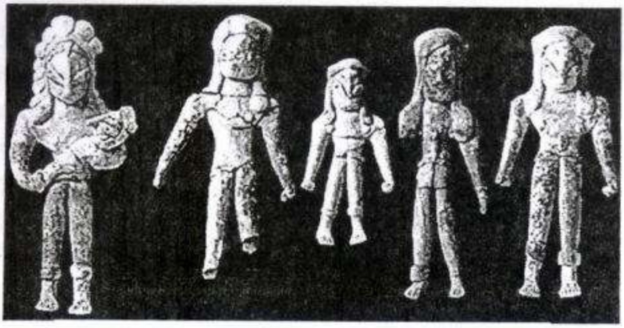

মেহেরগড়ের ছোট নারী মূর্তি

কবর থেকে পাওয়া অলঙ্কার

চিত্রিত পটারি

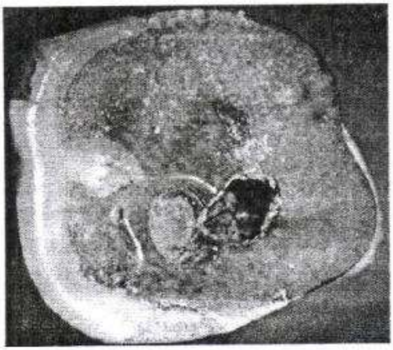

পেষন দন্তের মধ্যে ছিদ্র করে দন্ত-চিকিৎসা

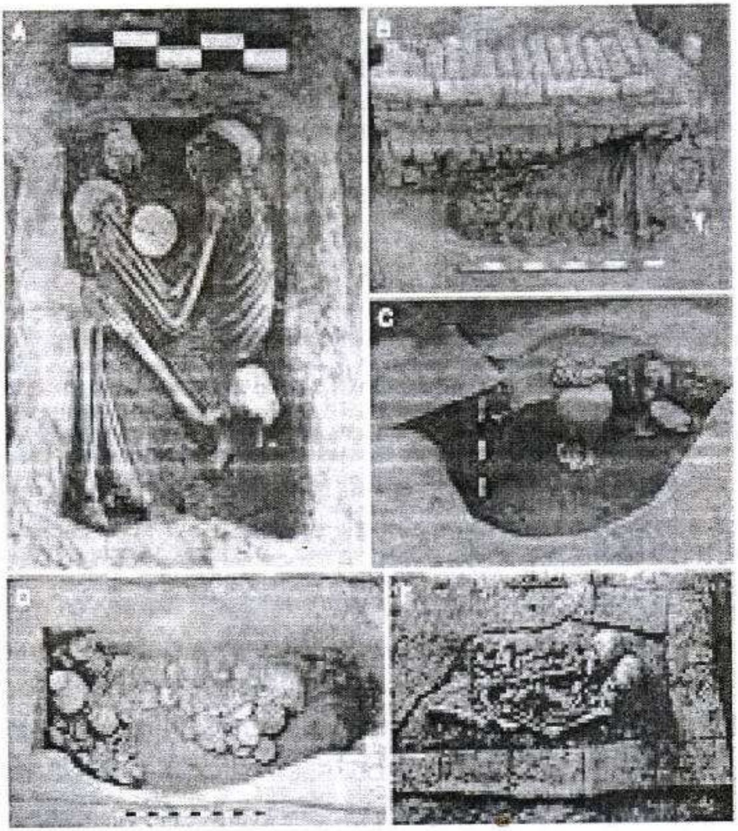

খননে নানা কবরের অভ্যন্তর

চীনের জিয়াহুর ওস্তাদ ঃ
৮ হাজার বছর আগে

একটি গ্রাম বৈ নয়, তবু জিয়াহু একটি অনন্য সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। তার পটারি, চাল শস্য গাঁজানো মদিরা পানীয় এবং সবার ওপরে সারস পাখির ডানার হাড় থেকে তৈরি তার অপূর্ব সুর তোলা বাঁশি ওই সংস্কৃতিতে একাকার হয়েছে। এই গ্রামের গর্ব হলো বাঁশির সুরের একজন কুশলী— ওস্তাদ নামেই যাকে সবাই চেনে।

পূর্ব-মধ্য চীনে পীত নদীর (ইয়েলো রিভার) কাছে হুয়াই নদীর ও তার উপনদী পরিবেষ্টিত গ্রাম জিয়াহু। আট হাজার বছর আগের ওই দিনগুলোতে গ্রামটির বেশ বাড়বাড়ন্ত অবস্থা— প্রধানত খাবারের প্রাচুর্যের কারণে। খুব কাছে না হলেও আশপাশে আরো দু'একটি গ্রাম আছে যাদের অবস্থাও বেশ ভাল। এখান থেকে উত্তরে তিন-চার দিনের হাঁটা পথে অবশ্য রয়েছে আরো বেশ কিছু গ্রাম যাদের নিজেদের মধ্যে ভাবধারার মিল রয়েছে, যা জিয়াহুর সঙ্গে কিছু মেলে, কিছু মেলেনা। কিন্তু এই সব কটি গ্রামের মধ্যে নানা কারণে জিয়াহু অনন্য। আর এই অনন্যতার একটি কারণ বোঝা যাবে এ গ্রামের ওস্তাদ নামে পরিচিত মানুষটিকে দেখলে। এই ওস্তাদ হলো সঙ্গীতের ওস্তাদ— বাঁশির যাদুকর তিনি, দিন-রাত বাঁশি বাজিয়ে সুরের চর্চা করেন। এখানে বাঁশি অনেকেই বাজায়, তাদের জীবনযাত্রা ও জীবনের কিছু কিছু আচারের সঙ্গে বাঁশির সুর তোলা জড়িয়ে আছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ বলেই ওদের কেউ কেউ ওস্তাদের কাছে ভাল বাঁশি বাজানো শেখে— ওস্তাদ নামটি শুরুতে এই সাগরেদদেরই দেয়া, এখন পুরো গ্রামের কাছেই তিনি ওস্তাদ নামে পরিচিত। সাগরেদদের জনা তিনেক নিজেরাও বেশ দক্ষ হয়ে ওঠেছে বাঁশি বাজনায়, ওরাও বেশ সুপরিচিত। তবে ওরা এখনো যুবক মাত্র, ওস্তাদ নিজের পঁয়ত্রিশ বছরের পরিণত জীবনে নিজ প্রতিভায় পুরো গ্রামের অসম্ভব শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। এই কালে এখানে যখন চল্লিশোর্ধ মানুষ কাউকে তেমন বেঁচে থাকতে দেখা যায়না, এমন বয়োবৃদ্ধ হয়েও ওস্তাদের সাধনায় এখনো কোন বিরাম নেই।

জিয়াহ্ গ্রামে বাড়ি আছে প্রায় ৫০টির মত— মানুষ দুই আড়াইশ' । যে কোন হিসেবে এটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বাড়িগুলো ছয়টি আলাদা আলাদা গুচ্ছে বিভক্ত। এক একটি গুচ্ছের মধ্যে বাড়িগুলো একটি অন্যটির খুব লাগোয়া। অধিকাংশ বাড়ি অংশত মাটির মধ্যে গর্তে আর অংশত ওপরে ডালপালার বেড়ার দেয়াল তোলা ও খড়ের ছাউনি দেয়া একটি মাত্র কামরা। তবে কিছু কিছু বাড়ি একটু বড় ও তাতে দু'তিনটি কামরা রয়েছে। তাছাড়া অল্প কিছু বাড়ি গর্তের মধ্যে নয় সমতলের ওপর গড়া, আর দু'একটি একটু নরম জলা জায়গার ওপর বলে গাছের খুঁটির ওপর টং ঘরের মত করে তৈরি। বাড়ির গুচ্ছগুলো আবার তিনটি তিনটি করে দুই ভাগে বিভক্ত যাদের মাঝখানে একটি বড় চত্বর। গ্রামের সব মানুষ এই চত্বরে জড়ো হতে পারে উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে। এর কাছেই একটি বেঢক বড় বাড়ি— মাঝখানে মাঝখানে বেশ কয়েকটি মোটা থাম থাকলেও যার একটিই বিরাট হল ঘর। পুরো গ্রামের বেশ কিছু মানুষ এখানে এই ঘরে বিশেষ বিশেষ ধরনের কাজ করে যেমন শিকারের অস্ত্র, হাতিয়ার, অলঙ্কার ইত্যাদি তৈরি — এ যেন একটি কারখানা ঘর। যখন প্রয়োজন হয় তখন অবশ্য এই ঘরটি গ্রামের সবার সলা-পরামর্শের জন্য সভা-সমিতির কাজেও ব্যবহৃত হয়।

বিশেষ ধরনের একটি কাজ কিন্তু এই বড় ঘরে হয়না, বরং ওই যে বাড়ির গুচ্ছগুলো তার প্রত্যেকটিতে এর আলাদা ব্যবস্থা আছে— সেটি পটারির কাজ। প্রত্যেক গুচ্ছের সঙ্গে দেখা যায় পটারি পোড়ার জন্য একটি আবৃত চুলা। এখানকার পোড়ামাটির পটারি এ অঞ্চলে দারুণ বিখ্যাত। গ্রামে এ কাজে হাত পাকানো বেশ কয়েকটি কুমোর পরিবার আছে— বিভিন্ন গুচ্ছের পাড়ায় তাদের বাস। কাদাকে লম্বা দড়ির মত আকারে নিয়ে এসে তাকে কয়েলের মত নানা সাইজে একের ওপর এক পেঁচিয়ে নানা আকার আকৃতির পটারি তৈরি করছে এরা। রান্নাবান্না অনেকটাই এ ভাবে নির্মিত হাঁড়ির মধ্যেই হচ্ছে। এদের একটি বিশেষ ডিজাইনের হাঁড়ি হলো পাত্রটির নিচে তিনটি পা সুন্দর বাঁকা হয়ে আছে যাতে এটি আগুনের ওপর বসানো যায়, আর আছে এর মুখে বেশ টাইট করে লাগানো যায় এমন ঢাকনি। আর এক রকম বৈশিষ্টময় পটারি হলো লম্বা গলা কুঁজো— পানীয় রাখার জন্য। পানীয় এতে যেমন সংরক্ষণ করা যায়, তেমনি সহজে ঢেলে খাওয়া যায়। গ্রামের সর্বত্র পটারি পোড়ার চুলা, পটারির আয়োজন, আর বাড়ির হেঁশেলে পটারির নানা ব্যবহার দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় এদের জীবনে পটারির কত বড় ভূমিকা রয়েছে।

জিয়াহ্র অধিকাংশ মানুষের কাজ অবশ্য শিকার-সংগ্রহ এবং চাষ। দিন দিন এই দ্বিতীয়টির প্রাধান্য বাড়ছে— কারণ এখানে মানুষ প্রধান খাদ্য হিসেবে ধানের ওপর নির্ভর করছে। এটি বন্য ধান নয় বরং এ অঞ্চলেই ওদের পূর্ব পুরুষদের নিজেদের হাতে পোষ মানানো পুষ্ট বেঁটে দানার ধান যার চাষের নিয়ম কানুন ওদের জানা। নদীঘেরা বৃষ্টিবহুল এ জায়গায় এ ধান জন্মানোর জন্য পানির অভাব

এখানে বড় একটা হয়না। গ্রামের ধারেই নদীর পার অবধি বেশ বিস্তীর্ণ সমৃদ্ধ তৃণভূমি আর তার মাঝে মাঝে কিছু ঝোপ ও আর বড় বড় গাছ— ওক, এল্‌ম, চেষ্টনাট, উইলো, মালবেরি, প্লাম। আর আছে মাঝে মাঝেই বেশ কিছু ছোট হ্রদ আর জলা। নদীর পারে পারে এই তৃণভূমি সাফ করেই ওদের ধানের খেত। যেখানে পানির সরবরাহ একটু কম সেখানে ওরা আর একটি শস্যের চাষ করে তা হলো বজরা— এটিও ওদের পূর্ব পুরুষরা বন্য থেকে পোষ মানিয়েছে। তবে উত্তরের দূরের ওই যে প্রায় একই সংস্কৃতির বেশ কয়েকটি গ্রাম সেখানে বজরার চাষই বেশি হয়, ধানের চাষের জন্য খুব উপযুক্ত পরিবেশ নেই বলে। অথচ তারাও ধান পছন্দ করে তাই জিয়াহু থেকে ধান-চাল কিনতে মাঝে মাঝে আসে ওরা। আসলে জিয়াহু থেকে অনেককেই অনেক কিছু কিনতে হয়— এতই অনন্য জায়গা এটি।

ওস্তাদের ও তাঁর সাগরেদদের কাজ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম— সুর নিয়ে তাদের কারবার, আর সে সুর সৃষ্টির বাঁশি নিয়ে। এ সব নিয়ে এমন মাতামাতি অন্য কোথাও দেখা যায়না। 'ওস্তাদের বাড়ি' বলে পরিচিত বাড়িটি থেকে প্রায় সময়েই বাঁশির সুর ভেসে আসে; কখনো এক সঙ্গে একাধিক বাঁশির যখন গ্রামের অন্য কয়েকজন তাঁর কাছে বাঁশি বাজনা শিখতে আসে। গ্রামের মানুষের এ ভাবে বাঁশি বাজনা শিখতে আসাটি অবশ্য নেহাৎ সখের বিষয় নয়, এটি ওরা জরুরি মনে করে। এর কারণ তাদের খুউব প্রিয় একটি পাখি শিকারের সঙ্গে এ সুরের সম্পর্ক আছে বলে তাদের বিশ্বাস। পাখিটি হলো লাল মাথা সারস (ক্রেইন)। এই সারসকে এ এলাকার এক রকম পতাকা বলা যায়। প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু বক গোষ্ঠির এ পাখি, দুই ডানা পুরো মেলে ধরলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব আট ফুটের মত— বেশ দশাসই ব্যাপার। ধবধবে সাদা পালক, নিচের কিনারায় কালোর ছোপ আর মাথার ওপরে পালকবিহীন অংশটি লাল। জিয়াহুর জলাগুলোর ওপর হাঁটার সময় যেমন, তেমনি আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাবার সময়ও তাদের রাজকীয় চেহারা। অন্যান্য জায়গায় এরা মৌসুমী পাখি— শীতের সময় উত্তর থেকে এসে আবার গরমে চলে যায়; আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে বলাকা হিসেবেও ওরা দৃষ্টি কাড়ে। জিয়াহুতে অবশ্য এরা সব মৌসুমের একেবারেই নিজস্ব স্থানীয় পাখিটি। এই সারসকে সব চেয়ে রাজকীয় মনে হয় এর প্রজনন মৌসুমে যখন মাথার লাল অংশটি আরো টকটকে হয়, আর পুরুষ পাখিগুলো অদ্ভুত সুন্দর জটিল সব নাচ দেখায়, সঙ্গে চলে এক রকম গানও; স্ত্রী পাখিও সাথে সাথে পায়ে তাল ঠোকে।

জিয়াহুতে বন্য পাখি শিকারের প্রধান লক্ষ্য হলো এই সারস। তবে এই সারসকে ওরা তাদের আচার-বিশ্বাসের মধ্যেও একটি বড় গুরুত্ব দিয়ে থাকে— সারসের মত নাচা, সারসের মত সুর তোলা, সারসের মত তাল ঠোকা— একে এসব ওরা সৌভাগ্য আনে বলে মনে করে। শুধু সারস শিকারে নয়, অন্য শিকার-

সংগ্রহ-চাষ সব কাজের মধ্যে সারস তাদের অনুকরণীয়। বাঁশির প্রয়োজনীয়তাটি এখানেই।

শুধু বাঁশি হলেই হবেনা— এই বাঁশিকে হওয়া চাই সারসের ডানার হাড়ে তৈরি বাঁশি। সব পাখির মত ডানা সংযুক্ত সামনের বাহুর যে জোড় হাড় (মানুষের সামনের বাহুতেও যেমন) তার একটা দিয়েই তৈরি হয় এই বাঁশি। দুই প্রান্তের সামান্য অংশ বাদ দিলে প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা ফাঁপা এই হাড় সুন্দর বাঁশির কাজ করে। মুখে দেবার প্রান্তটি তেরচা করে কেটে নেয়া হয় আর এর গায়ের ওপর করা হয় পর পর কিছু ছিদ্র— আঙ্গুল দিয়ে যেখানে চেপে ধরে বা ছেড়ে দিয়ে বাঁশিতে নানা সুর তোলা হয়। সব শেষে বাঁশির পুরো গা'টি চেঁছে সুন্দর মসৃণ করে তোলা হয়। হাড়কে কাটা, ছিদ্র করা, মসৃণ করা ইত্যাদি কাজের জন্য পাথরে তৈরি চমৎকার করাত, ড্রিল, ছুরি ইত্যাদি রয়েছে এদের। কী সুর তুলবো, কেমন করে তুলবো এগুলোর একটি ধারা রয়েছে। সেটি না জেনে যে কেউ এ বাঁশি তৈরি করতে পারেনা, সুরের সঙ্গে বাঁশির গঠনের সম্পর্ক নিয়ে যে বিশেষজ্ঞ তার পক্ষেই শুধু এটি সম্ভব। আমাদের ওস্তাদ তাই শুধু বাঁশিতে সুরের খেলা করেন না সেই বাঁশি তৈরিও করেন।

বাঁশি তৈরি শেখা সবার কম্মো নয়, তবে ওস্তাদের খাস সাগরেদ তিন জন এটিও শিখছে। সাধারণ যারা বাঁশি বাজাতে শেখে তাদের জন্য ওস্তাদ তৈরি করেন পাঁচ ছিদ্রের বাঁশি। এক একটি ছিদ্র খোলা রেখে সেটির জন্য বাঁশির কার্যকর দৈর্ঘ যা দাঁড়ায় তাতে পাঁচ ছিদ্রের পাঁচ খাদের সুর ওঠে। আর সবগুলো ছিদ্র বন্ধ রেখে পুরো বাঁশির জন্য আরেকটি খাদের সুর পাওয়া যায়। এভাবে মোট ছয়টি খাদের সুর সৃষ্টি করার কথা এ বাঁশিতে। কিন্তু সারগাম (অক্টেভ) সংক্রান্ত জটিলতায় আসলে মৌলিক সুর আসে মোটে চার রকমের। সেগুলোও অনেক দূরে দূরের খাদ। এতে কাজ চলে তবে মন কেড়ে নেয়া সুর-বৈচিত্র সৃষ্টি হয় না।

ওস্তাদের বানানো সব চেয়ে মূল্যবান বাঁশি হলো সাত ছিদ্রের। এতে এমন সূক্ষ্ম সুর-পরিমাপের মধ্যে তিনি ছিদ্রগুলোর দূরত্ব ঠিক করেছিলেন যে এর থেকে আটটি বিশুদ্ধ খাদের সুর সৃষ্টি হয়— পুরোটার খাদ বিস্তার এবং পর পর দুটি খাদের মধ্যে সুরের সমদূরত্ব ইত্যাদি তাঁর তৈরি এই মানের সব বাঁশিতে নিখুঁত ভাবে একই হয়। এ জন্য ওস্তাদ খুব হিসেবনিকেষ করে একটি মূল বাঁশি বানিয়েছেন যেটির নকল করে ঠিক এর মত অন্যগুলো তিনি তৈরি করেন। ওই মূল বাঁশিটি তাঁর কাছে অসম্ভব মূল্যবান। একবার এর দুটি ছিদ্রের মাঝের সরু ছোট অংশটি আঘাত লেগে ভেঙ্গে গিয়েছিলো। কী যত্নে যে তিনি এটি মেরামত করেছেন তা দেখলে বোঝা যাবে ওটি তাঁর কাছে কী মূল্যবান। খুব কাছে এনে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ভাঙ্গা টুকরাটি ঠিক জায়গায় বসিয়ে ফাটলের দু'পাশে অনেকগুলো ছিদ্র করা হয়েছে জোড়ায় জোড়ায়। এ ছিদ্রগুলোর ভেতর দিয়ে সূক্ষ্ম সুতা চালিয়ে পুরো ফাটলেই দুদিকের হাড় সেলাই করার মত করে

সুন্দর জোড়া দিয়ে দেয়া হয়েছে— যাতে মূল বাঁশিটি আবার হুবহু বরাবরের মত সুর তুলতে পারছে। এর থেকে নকল করে এর যে সব কপি তৈরি করা হচ্ছে তার কোন কোনটিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাতে প্রথম ছিদ্রটির একটি পরীক্ষামূলক ছিদ্র খুব ছোট আকারে করে তার সুর পরীক্ষা করা হয়েছে। ওটি মনের মত না হওয়াতে একটু দূরে সঠিক জায়গায় চূড়ান্ত ছিদ্র করে পরীক্ষামূলক ছিদ্রটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মনে করার কারণ নেই যে ওস্তাদ শুধু বাঁশির কারিগরি কাজেই নিজকে ব্যস্ত রাখেন। বরং অধিকাংশ সময় মানুষ তাঁকে দেখেন বাঁশিতে সুরের মূর্ছনা তুলতে। তবে সেটি তিনি বাঁশিতে মুখ দিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থেকে সাধারণত করেননা— করেন নেচে নেচে বাউলের মত কিংবা আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে ওই সারস পাখির নাচনের মত। আসলে সারসের হাড়ের তৈরি বাঁশি বাজিয়ে এবং সারসের মত নেচে, সে রকম জটিল সুর তুলে তিনি এ সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আচার সম্পূর্ণ করছেন। তাঁর এই নাচে আরো একটি আচার ধারা যুক্ত হয়। জিয়াহুতে কচ্ছপকেও একটি বিশিষ্ট প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হয়— ওরা নিজেদের রহস্যময় কিছু চিহ্ন ইত্যাদি আঁচড়ে দেবার জন্য কচ্ছপের শক্ত খোলসটি ব্যবহার করে, মৃতকে কবর দেবার সময় তাতে অন্য মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে কচ্ছপের খোলস দিয়ে দেয়। ওস্তাদ একটি একটি দুই পাশ বন্ধ খোলসের মধ্যে কিছু পাথরের নুড়ি নিয়ে একটি ঝুমঝুমি ব্যবহার করেন নেচে নেচে বাঁশি বাজাবার সময়। সাধারণ পোষাকের ওপর উদ্ভিজ তৈরি আঁশের লম্বাটে সুন্দর আলখাল্লা পরে ওই কচ্ছপের খোলসের ঝুমঝুমিটা কোমরে বেঁধে নেন। নাচের তালে তালে ওটি শব্দ করতে থাকে বাঁশির সঙ্গে সঙ্গত করে। তাঁর ছাত্ররা এসব শেখে। শেখানোর কাজে প্রধান তিন সাগরেদ সহায়তা দেয়। তাঁদের তৈরি বাঁশি গ্রামের অনেকে ব্যবহার করে— এসব জিয়াহুর আচার অনুষ্ঠান সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। একদিকে এর উজ্জ্বল তারকা অন্য দিকে সৌম্যমূর্তি এই প্রবীণ মানুষটি তাদের সংস্কৃতির একজন শ্রদ্ধাভাজন পুরোহিত।

জিয়াহুর গ্রামবাসীদের প্রিয় শিকারের পাখি সারস হলেও ওখানকার গাছ-গাছালি সমৃদ্ধ তৃণভূমিতে তাদের জন্য আরো নানা রকম শিকারের প্রাণী রয়েছে। পশুর মধ্যে বেশি রয়েছে— নানা রকম হরিণ, বুনো শূয়োর, খরগোস, র‍্যাকুন; আর পাখির মধ্যে নানা বন-মোরগ। এগুলো শিকারের মোক্ষম অস্ত্র তীর-ধনুক। ওই যে গ্রামের মাঝখানে বড় কারখানার মত ঘর সেখানে পাথরের তীরাগ্র, হাড়ের হারপুন, বর্শাগ্র সব সময় তৈরি করছে এর ওপর দক্ষ বেশ কিছু মানুষ। তবে চাষবাসের সরঞ্জামগুলোও বেশ দেখার মত— বিশেষ করে সুন্দর বাঁকা চাঁদের মতই বাঁকানো পাথরের কাস্তে। এর ভেতরের কিনারায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত কেটে ধান কাটার কাস্তের যে ধারালো অংশ তৈরি করা হয় আর বাঁকা পাথরের এক প্রান্তের সঙ্গে কাঠের হাতল ফিট করা হয় সেগুলো অবাক হবার মত। তাছাড়া কোদাল,

বেলচা, শাবল, খন্তা সবই পাথর দিয়ে দিব্যি তৈরি হচ্ছে এখানে— ধান চাষ এদের কাছে মূল্যবান কাজ বলে কথা।

অবশ্য ওই সুন্দর বৃক্ষ, নদী, হ্রদ, জলা শোভিত তৃণভূমি থেকে মনের মত অনেক খাবার শুধু কুড়িয়েই আনা যায়, অথবা অল্প আয়াসেই পাওয়া যায়।হ্রদ ও জলাতে মাছ ধরা হয় হ্যাম্প আঁশের দড়ি দিয়ে বানানো জাল দিয়ে— রুই জাতীয় মাছ এবং হেরিং এই দুটিই প্রধানত পাওয়া যায়। তাছাড়া কচ্ছপ, নরম খোলসের কাছিম, ঝিনুক, শামুক, ছোট ঘড়িয়াল ইত্যাদি এর সঙ্গেই প্রচুর পাওয়া যায়। তবে হ্রদের, জলার, উদ্ভিজ খাবারগুলো আরো সহজে কুড়িয়ে নেয়া যায়— শাপলা, পানিফল ইত্যাদি। তৃণভূমির গাছ-গাছড়া থেকে হাজেল নাট বাদাম, ওকবীজ, নাশপাতি, বন্য ধান, বন্য শিম, পুষ্ট শিকড় এসবও মোটামুটি সহজলভ্য মূল খাবার না হোক মিষ্টিমুখ করার জন্য আরো রয়েছে বন্য আঙুর আর হথোর্ন ফুলের মৌ। তা ছাড়া তৃণভূমিতে এত রকম ফুলের মেলা যে অনেক গাছে সেগুলোর মৌ-নির্ভর মৌচাক মেলে যা ভেঙ্গে ওরা মধুও সংগ্রহ করে প্রচুর।

পশু-পাখি শিকার করে খাওয়া জিয়াহুর মানুষের জন্য খুব জরুরি নয়, কারণ ওরা এখন অনেক পোষা পশুপাখি লালন পালন করছে তার মধ্যে প্রধান হলো কুকুর আর শূয়োর। এগুলোর পোষ মানাবার মত প্রজাতি বহুদিন ধরে এখানেই গড়ে তুলেছিলো আজকের জিয়াহুবাসীদের পূর্বপুরুষরা। কুকুর আর শূয়োর উভয়কেই ওরা খায় বটে তবে খোঁয়াড়ে যে প্রচুর পোষা শূয়োর পালে ওরা সে তুলনায় খাদ্য হিসেবে কুকুর বেশি নয়। পোষা কুকুর অবশ্য ওদের নিত্য সঙ্গী তা সে বহুতরো কারণে। সব চেয়ে বড় কথা কচ্ছপের মত কুকুরকেও ওরা পবিত্র ও মূল্যবান মনে করে— তাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে কবর দেবার সময় সেখানে কুকুর বলি দিয়ে তা সঙ্গে দেয়া হয়। আরো যে প্রাণীগুলোর পোষা প্রজাতি তাদের হাতে আছে তা হলো গরু এবং হাঁস-মুরগি। অবশ্য এগুলোর অল্প কিছুকে এভাবে সম্পূর্ণ গৃহপালিত করে রাখা যাচ্ছে— শূয়োর বা কুকুরের মত নিজেদের জীবনে অঙ্গীভূত করতে পারেনি।

গ্রামে একবার ঘুরে এলেই এতো রকম জীবিকার সর্ব কর্মকান্ড, সব ব্যস্ততা পরিস্কার বোঝা যায়। আসলে গ্রামটার গঠন বৈশিষ্টগুলোও কম নয়, একটি সুন্দর শৃঙ্খলা রয়েছে এদের সমাজে। সবগুলো গুচ্ছের বাড়িগুলো যেন একটি পাড়া- সব বাড়ির দরজা ভেতরের দিকে পাড়ার উঠানের দিকে মুখ করে। উঠানে রয়েছে বাড়ির বাইরের চুলা— অধিকাংশ রান্নাবান্না, বড় আগুন জ্বালিয়ে রোষ্ট করা, যাবতীয় ধোয়ার কাজ এখানেই চলেছে। পুরো পাড়ার জন্য ময়লা আবর্জনা ফেলার একটি বড় গর্ত রয়েছে তা উঠান থেকে একটু দূরে। তেমনি কিছুটা দূরে রয়েছে পটারির চুলাটি। কাছেই একটি ঘরে কাঁচা পটারির জিনিসগুলো তৈরি করে জমানো হচ্ছে, উঠানে রোদে শুকাতে দেয়া হচ্ছে। পাড়ার অনেক কাজ সবাই এক সঙ্গে উঠানে করছে— ধোয়া-মোছা, সংরক্ষণের জন্য খাবার দাবার শুকানো,

কাপড় শুকানো ইত্যাদি। মেয়েদের ও শিশুদের অনেকটা সময় এই উঠানেই কাটে। তবে বাইরে গিয়ে ফল-ফলারি, বন্য শস্য ইত্যাদি সংগ্রহ করার দায়িত্বও মেয়েরাই বেশি পালন করে, প্রয়োজনের সময় ধানের জমিতে কাজ করার দায়িত্বও।

শিকার করা বা খোঁয়াড়ের থেকে আনা মৃত পশু পাখি কাটা-চেরা করে চুলোতে আনার কাজটি হচ্ছে পাড়ার থেকে একটু দূরে আলাদা জায়গায়। পুরো গ্রামটিকে যথাসম্ভব ছিমছাম ও সুরক্ষার রাখার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা তারা নিয়েছে। বাইরের তৃণভূমি থেকে অবাঞ্ছিত পশু-পাখি যাতে গ্রামে ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থাও করেছে— যেমন শেয়াল এসে যেন মুরগি নিয়ে না যেতে পারে। এজন্য পুরো গ্রামকে ঘিরে বেড়া দেয়া হয়েছে আবার ঠিক তার বাইরে কাটা হয়েছে বেশ চওড়া করে কাটা একটি পরিখা। যাতে সব সময় পরিখাতে পানি থাকে সেজন্য কাছের একটি হ্রদের সঙ্গে একে যোগ করে দেয়া হয়েছে।

সমাজের শৃঙ্খলাটি আরো উপলব্ধি করা যায় ওস্তাদের মত মানুষদের কাছে। তিনি যে এত জনকে বাঁশির সুর শেখাচ্ছেন সেটি কিন্তু এখানকার সংস্কৃতির একটি ভিত রচনা করছে। তেমনি আর কিছু ভিত রচনা করছে অন্যরা— যেমন পটারি সৃষ্টিরত কুমোররা যারা পটারির গয়ে সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের বাস্তবায়ন করছে। আর এক দল মানুষ রহস্যময় কিছু আঁকিবুকি করে আঁচড় কাটে কচ্ছপের খোলসের ওপর, এবং কখনো কখনো পাথর অথবা পটারির ওপরও। এটির একটি আচারগত তাৎপর্য আছে যা বংশানুক্রমে ওরা অনুসরণ করে যাচ্ছে। সেটি যে সবাই বোঝে তাও নয়, তবুও সবার কাছে এসব চিহ্ন যথেষ্ট সম্মান ও গুরুত্ব পায়। আরো একদল মানুষ আছে যারা ওখানকার বিশিষ্ট অলঙ্কারগুলো তৈরি করে। এর মধ্যে সব চেয়ে বিশিষ্ট হলো জিয়াহুর বিখ্যাত টরকুইজের খোদাই কাজ। টরকুইজ হলো ফিরোজা (নীল-সবুজ) রঙের চমৎকার রত্নপাথর যা বেশ শক্ত— কিন্তু তবুও সঠিক হাতিয়ার দিয়ে একে ফাটানো যায়, এর ওপর খোদাই করা যায়, একে ঘষে পালিশ করে খুব মসৃণ করা যায়। জিয়াহুর কাছে এ পাথরটি পাওয়া যায়, আর এখানকার কিছু মানুষ এর থেকে পুঁতির মালা, হারের লকেট তৈরি থেকে শুরু করে এর আরো জটিল খোদাই কাজে দক্ষ হয়ে পড়েছে। এসবও তাদের সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

তবে জিয়াহু সংস্কৃতির সব চেয়ে বড় অবদান বোধ হয় পানীয় ও বিনোদনের রাজ্যে মদিরার আবির্ভাব ঘটানো এবং একে সাধারণ সামাজিকতার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। এখানে সাদামাটা কোন দাওয়াতের খাবারেও কিছুটা এই শর্করা গাঁজানো (ফার্মেন্টেশন) পদ্ধতিতে তৈরি মদ সহযোগ ছাড়া শেষ হয়না। বড় ভোজ, উৎসব, আচার অনুষ্ঠান এসব এই পানীয় ছাড়া চিন্তাই করা যায়না। মূলত এটি চাল থেকে তৈরি বিয়ার। সঠিক আকার-আকৃতির পটারিতেই এর সকল পদ্ধতি চলে এবং শেষ পর্যন্ত বৈশিষ্টমত পটারিতেই এর সংরক্ষণ ও পরিবেশন হয়। তবুও একে

সোজাসুজি চালের তৈরি হাড়িয়া মদ বললে ফুরিয়ে যায়না। গাঁজানোর কাজটি সম্পন্ন হয় চালের সঙ্গে আঙ্গুর এবং মধু সহযোগে— কখনো মধুর বদলে হথোর্ন ফুলের মৌ। আঙ্গুর রস ও তার ছিলকায় থাকা ঈষ্টের একটি বড় ভূমিকা আছে এর পদ্ধতিতে এবং সেদিক থেকে একে বিয়ার আর ওয়াইনের একটি মিলিত রূপ বলা যায়। বলা বাহুল্য জিয়াহুর এই নতুন পানীয় ওই গ্রামের সংস্কৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা এই পুরো অঞ্চলের বৈশিষ্টে পরিণত হয়েছে। এখানকার অনেক মানুষের কাছে জিয়াহুর পটারি, জিয়াহুর এই পানীয়, এবং বাঁশি বাজিয়ে জিয়াহুর সঙ্গীত ও নৃত্য একই সূত্রে গাঁথা। ওদের জানাশোনা জগতে এর প্রত্যেকটিই হলো অনন্য।

ওস্তাদ হঠাৎ করে মারা গেলেন তাঁর বয়স ছত্রিশ বছরে পড়ার আগেই। বহুদিন ধরেই শরীর ভাল যাচ্ছিলনা— ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলেন রক্তশূন্যতায়। বড় রকমের অসুখ যাদের থাকেনা তাদের অনেককেই জীবনের শেষ দিকে এরকম ফ্যাকাশে হয়ে যেতে দেখা যায়। ওস্তাদের মৃত্যু পুরো গ্রামের জন্য ছিল একটি মহা দুঃসংবাদ। খবরটি মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যাওয়ার পর দলে দলে মানুষ তাঁর বাসায় আসতে লাগলো। তাঁর দুই ছেলে ও স্ত্রী বাসায় ছিলো বটে কিন্তু সব কিছু তাঁর সাগরেদরাই সামাল দিলো। জিয়াহুতে এরকম বিখ্যাত কোন মানুষের শেষকৃত্যের আয়োজন করা সহজ কাজ নয়। কবর দেয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক রকম আনুষ্ঠানিকতা। প্রত্যেক পাড়ার নিজস্ব কবরস্থান আছে পাড়া থেকে কিছুটা দূরে। গ্রামের কিছু কেন্দ্রীয় কবরস্থানও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে কবর দেয়ার জন্য। সাধারণ পাড়ার কবরস্থানগুলোতে একই কবরে পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের অন্যান্যদেরকেও কবর দেয়া হয়। কিন্তু ওস্তাদের মত মানুষের একক কবরই থেকে যায়। তাঁর জন্য মাটি খুঁড়ে আয়তাকার কবর তৈরি করা হলো। কবরে তাঁর সঙ্গে কী কী দেয়া হবে এটিই ছিল প্রধান বিবেচ্য। বিশিষ্ট জনের ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার— সবাই মিলে চিন্তা করে ঠিক করে।

গ্রামের গণ্যমান্য মানুষগুলো সবাই এসেছে। তাছাড়া সাধারণ মানুষেরও দারুণ শ্রদ্ধা এই প্রতিভাবান ব্যক্তিটির জন্য তাই গ্রাম ভেঙ্গে পড়েছে কবরস্থানে। ইতোমধ্যে ওস্তাদের পরিবার ও ঘনিষ্ঠতম সাগরেদ তিন জন আলোচনা করে ঠিক করেছে বেশ কিছু কচ্ছপের খোলস এবং টরকুইজের অলঙ্কার কবরে দেয়া হবে। সাধারণত জীবদ্দশায় যে কাজের জন্য যার সুনাম তার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু নিদর্শন কবরে দেয়া হয়। বাঁশিই ছিল ওস্তাদের জীবনের সব কিছু। সেদিক থেকে অনেক বাঁশি দিতে হয় তাঁর কবরে। কিন্তু সাগরেদরা ঠিক করলো অনেক নয় মাত্র দুটি বাঁশি দেয়া হবে— তাঁর সেই মেরামত করা মূল বাঁশিটি যেটি তিনি কখনোই হাতছাড়া করতেন না, সেই সঙ্গে আর একটি বাঁশি যেটি মূল বাঁশির মতই যাদুকরী সুর সৃষ্টি করতে পারে। সবার আগে অবশ্য দেয়া হলো পবিত্র কচ্ছপ ও কচ্ছপের খোলস। কিছু কিছু খোলস একক ভাবে আবার কিছু কিছু ওপর নিচ ডাবল করে

দেয়া হলো। প্রত্যেকটির নিচে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি রাখা হলো— বিভিন্ন সংখ্যায়। এর একটি জটিল নিয়ম আছে সেই হিসেবে গুণে গুণে নুড়ি দিতে হয়, এসবও কবর দেবার আচারের মধ্যে পড়ে। নেচে নেচে বাঁশি বাজাবার সময় ওস্তাদের কোমরে বাঁধা থাকতো যে ঝুমঝুমি— সেই কচ্ছপের বদ্ধ খোলের মধ্যে ভরে দেয়া ছোট ছোট পাথরের নুড়ির ঝুমঝুমি— সেটিও দিয়ে দেয়া হলো কবরে। ওস্তাদের কোন পোষা কুকুর ছিলনা, তাই একটি কুকুর বলি দেয়া হলেও সেটিকে কবরে রাখা হলোনা। বাঁশি তৈরির পাথুরে সরঞ্জাম কিছু দেয়া হলো। টরকুইজের কিছু মালা, তাঁর প্রিয় কিছু অলঙ্কার এসবও দেয়া হলো। সব শেষে বাম পায়ের দু'পাশে ওই নির্বাচিত বাঁশি দুটি দিয়ে কাজটি শেষ করা হলো।

বিশিষ্ট মানুষের কবর না হলে এতো কিছু করা হয়না। মহিলাদের প্রায় সব সময় সাদামাটা ভাবে কবর দেয়া হয়— সে যেমন পরিবারের মহিলাই হোক। এর কারণ মহিলাদের দাম খুব একটি দেয়া হয় না জিয়াহু সমাজে- তা তাদের কেউ কেউ যতই প্রতিভা বা সাফল্যের অধিকারী হোক না কেন। ছোট শিশুদের কবর দেয়ার সময় একমাত্র যে ব্যতিক্রমটি করা হয় তা হলো বড় পটারি পাত্রের মধ্যে মৃতদেহ রেখে ওই পাত্র সহ কবর দেয়া হয়।

সন্ধ্যার আগে আগে ওস্তাদের অন্ত্যেষ্ঠির আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো। অন্যেরা যখন মাটি দিয়ে কবরটি ভরাট করে দিচ্ছিলো তখন তাঁর তিন সাগরেদ মূল্যবান তিনটি হাড়ের বাঁশি থেকে করুণ সুর বাজিয়ে যাচ্ছিল, আর রাতের অন্ধকার নেমে আসছিলো ধীরে ধীরে।

* * *

জিয়াহুর প্রত্নতাত্ত্বিক স্থলটি আবিষ্কৃত হয়েছিলো ১৯৬২ সালে। তখন থেকে ১৯৮০ এর দশক পর্যন্ত খনন কাজ চলে। দ্বিতীয় দফায় আবার খনন কাজ শুরু হয় ২০০৩ সালে। এসব খনন কাজে উদ্ঘাটিত প্রধানত কবরস্থান, আবর্জনা জমা স্তুপ ও গর্ত থেকে মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিভিন্ন স্তরের খননে প্রায় ১১ হাজার বছর থেকে ৮ হাজার বছর আগের পর্যন্ত বসতের নিদর্শনগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। যদিও এদের মধ্যে সংস্কৃতির এক রকম ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা গেছে তুলনামূলক ভাবে পরের দিকের প্রায় ৮ হাজার বছর আগের জীবনযাত্রাকেই আমরা এখানে ধরার চেষ্টা করেছি। এই সময়কার পাওয়া নিদর্শনগুলো ক'টি অনন্য বিষয়ের প্রমাণ দিয়েছে, যেগুলো খুব সম্ভব এখানেই প্রথম দেখা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে বন্য ধান থেকে প্রথম কৃষির ধানের চাষ, হাড়ের তৈরি এমন বাঁশি এখনো যা বাজিয়ে সুর তোলা যায়, পটারির ব্যাপক ব্যবহার, ধান-আঙ্গুর ইত্যাদি গাঁজানো প্রথম এলকোহল পানীয়।

৮ হাজার আগের জিয়াহুর গ্রামের বাড়িগুলোর চিহ্ন এখন শুধু তার থামগুলোর গর্ত থেকেই প্রধানত বোঝা যাচ্ছে, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাড়ির মেঝের ও দেয়ালে অবস্থান থেকে। বড় বাড়ির থামের গর্ত অনেক বড়, সে গর্তের নিচে পটারির টুকরা দেয়া আছে যেন থাম দেবে না যেতে পারে। একই কারণে এ গর্তের কিনারায় পোড়া মাটির উঁচু

ডিবির মত করে দেয়া হয়েছে থামকে ঠেস দিয়ে রাখার জন্য। এসব থেকে বাড়িগুলোর বিন্যাস বোঝা যাচ্ছে। উঠানে রান্নার চুলা, পটারি পোড়ার চুলা ইত্যাদির সঙ্গে আরো নিদর্শন রয়েছে— এখানে হাতিয়ারের, পটারির, তৈজসের, হাড়ের ও অন্যান্য পোড়া খাদ্য দ্রব্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব সব চেয়ে বেশি পাওয়া গেছে আবর্জনার স্তূপে। এসব থেকেই উদ্ঘাটিত হয়েছে সেদিনের উদ্ভিদ, প্রাণী, শিকার করা বা সংগ্রহ করা খাদ্য। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রাচীন পরাগরেণু গবেষণার মাধ্যমে অনেক কিছু উদ্ঘাটিত হয়েছে।

এখানে কিছুটা অঙ্গার হওয়া অবস্থায় কৃষিতে ব্যবহৃত প্রজাতির পূর্ণাঙ্গ ধানের শস্য অবিকৃত পাওয়া গেছে। তাছাড়া রান্নার হাড়িতেও মাটিতে সংলগ্ন অবস্থায় ধানের কোষের সূক্ষ্ম পাথুরে নমুনা ফাইটোলিথ পাওয়া গেছে। তার আনুবীক্ষণিক গবেষণাও এই রকম ধানকে সনাক্ত করেছে। একই রকম ফাইটোলিথ থেকে কৃষিতে ব্যবহৃত অন্য শস্য বজরা এবং বন্য ধান সহ বিভিন্ন বন্য শস্য ব্যবহারেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। তৃণভূমিতে ধান চাষের খেতের যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে বোঝা গেছে যে ওরা আগেকার ঝুম চাষের রীতি পরিবর্তন করে স্থায়ী খেতে ধানের চাষ করছিল।

নানা প্রমাণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এখানকার মানুষ কৃষিজাত ধানকে তাদের প্রধান খাদ্য করে নিয়েছিলো এবং সে জন্য শিকার-সংগ্রহ থেকে কৃষির ওপর বেশি নির্ভর করা আরম্ভ করেছিলো। তা ছাড়া গৃহপালিত শূয়োর, কুকুর, এমন কি মুরগি ও গরুর নিদর্শন যে ভাবে পাওয়া গেছে তাতে এসব পোষা পশুপাখির ওপর নির্ভরশীলতাও দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে বন্য শূয়োরের থেকে গৃহপালিত শূয়োরে বিরাট রূপান্তরের ব্যাপারটি ধীরে ধীরে এ জায়গাতেই প্রথম হয়েছিলো বলে মনে হচ্ছে। এখান থেকেই এরা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা জায়গায় তখনই ছড়িয়েছে এমনটিই আন্দাজ করা হচ্ছে।

জিয়াহুর পুরো গ্রামের চারিদিকে বেড়া ও পরিখার প্রমাণ মিলেছে। বিশেষ করে পরিখায় এক সময় পানি থাকাটি এখন খুব স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে।

এখানকার নদী হ্রদ ও জলাগুলোর অস্তিত্ব এবং সেখানে নানা হাঁস ও বিশেষ করে লাল মাথা সারস পাখির আধিক্য ও এর সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার সম্পর্কটি এদের হাড়ও পালকের নিদর্শন থেকে স্পষ্ট হয়েছে। এই সারসের ডানার সামনের বাহুর জোড় হাড়ের একটি থেকে পাঁচ, ছয়, সাত ছিদ্র পর্যন্ত বাঁশির অনেকগুলো নমুনা পাওয়া গেছে। উন্নত রকম বাঁশি পাওয়া গেছে ২৪ টি তার মধ্যে ১৫টিই পুরো বাঁশিই অভগ্ন অবস্থায়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এর মধ্যে বেশ কয়েকটি আজকের শিল্পীরা অবলীলা ক্রমে বাজিয়ে মূল সম্ভাব্য সুরের অধিকাংশই এতে তুলতে পেরেছেন। তাছাড়া আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করে এ বাঁশির নানা ছিদ্রের তোলা সুরের খাদ, টোন ইত্যাদি বিভিন্ন ছিদ্রের মধ্যে এ সবের ব্যবধান ইত্যাদি সূক্ষ্ম ভাবে মেপে আট হাজার বছর আগের এ বাঁশির নির্মাতাদের কুশলতা ও সুরজ্ঞান প্রমাণিত হয়েছে।

এসব বাঁশির মধ্যে খুবই উন্নত দুটি বাঁশি পাওয়া গেছে খননে উদ্ঘাটিত একটি কবরে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মৃত একজন মানুষের কঙ্কাল ও তার কবরে দেয়া অন্যান্য নানা উপাচারের সঙ্গে। এই দুটি বাঁশির একটি সামান্য ভেঙ্গে গিয়েছিলো বলে সূক্ষ্ম সেলাইয়ের মাধ্যমে টুকরাটি নিখুঁত জোড়া দিয়ে আবার তাকে সুর তোলার উপযোগী করা হয়েছে। অন্য বাঁশিটি হুবহু এটির মত। এই মানুষটিই আমাদের কাহিনীতে ওস্তাদ, আর

মেরামত করা বাঁশিটিই তাঁর মূল্যবান মূল বাঁশি। আরো প্রাচীন কালের এমন ছিদ্রওয়ালা হাড়ের বাঁশি ইউরোপে দু'একটি জায়গার প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া গেছে বটে, তবে তার কোনটি থেকে এখন সুর তোলা যায়না। এখানেই জিয়াহুর বাঁশিগুলোর অনন্যতা। সাধারণত সে সময়ও ওই জায়গায় এমন বাঁশি বাঁশ দিয়ে তৈরি করাটাই ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু ওরা হয়তো সারসের সঙ্গে অদ্ভুত সম্পর্কের কারণে কষ্ট করে এ বাঁশি সারসের হাড় দিয়ে তৈরি করেছিলো। আমাদের সৌভাগ্য যে ওরা তা করেছিলো, বাঁশ দিয়ে করলে রক্ষিত হতো না, পচে যেতো। আমরা তাদের সুরের খবর পেতাম না।

জিয়াহুতে পাওয়া পটারি নমুনার ব্যাপকতা লক্ষ্য করার মত। গ্রামের নানা পাড়ায় দশটির মত পটারি চুলার নিদর্শন পাওয়া গেছে, আর বেশ কিছু সম্পূর্ণ আর অসংখ্য ভাঙ্গা পটারির নমুনা। এগুলো জাপানের জামোন সংস্কৃতির পটারি পদ্ধতিই প্রধানত অনুসরণ করেছে— কাদার কয়েল পেচিয়ে পেচিয়ে তৈরি, গায়ে রশির ছাপ দেয়া— ইত্যাদি। তবে ব্যবহারের আর ডিজাইনের বৈচিত্র অভাবনীয়। কচ্ছপের খোলের ওপর আঁচড় কাটা কিছু বিশেষ ধরনের আঁকিবুকি বার বার দেখা গেছে। পটারির ওপরও এসব আঁচড় দেখা গেছে। মনে হয় সব ক্ষেত্রে আঁকের ডিজাইনগুলোর মধ্যে একটি মিল রয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এর দু'একটির সঙ্গে আজকের চীনা ভাষার লিপি মিলে যায়— বিশেষ করে 'সূর্য' এবং 'চোখ' বোঝাতে চীনা লিপির সঙ্গে। তবে চীনা ইতিহাসে শাং রাজ বংশের কালে লিপি নয় এমন যে সব ভাগ্য গণনামূলক চিহ্ন ব্যবহৃত হতো তার সঙ্গে তার আরো বেশি মিল। হয়তো বা লিপির বহু পরবর্তী ইতিহাসের ওপর ওদের ওই সব আঁকিবুকির একটি প্রভাব পড়েছে।

পটারির একটি বড় ব্যবহার ছিল রান্নাবান্নার হাঁড়ি হিসেবে এবং আর একটি ব্যবহার ছিল পানীয় তৈরির পাত্র আর পানীয় সংরক্ষণের জন্য। উভয় ক্ষেত্রে পটারির সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে যে উপাদানগুলো ঢুকেছে তার অনেকটা এই আট হাজার বছর রক্ষিত হয়ে গেছে। এগুলোর সূক্ষ্ম রাসায়নিক বিশ্লেষণে এবং আরো সূক্ষ্ম আণবিক বিশ্লেষণে বিভিন্ন খাদ্যের উপাদানের 'ক্যামিকাল চিহ্ন' থেকে ওরা কী রান্না করতো তা জানতে পেরেছি। একই রকম পরীক্ষায় ধরা পড়েছে তাদের পানীয়ের যে উপাদান পটারির ছিদ্রে ঢুকেছে তাতে এলকোহলের চিহ্ন— সেটি ধানের, আঙুরের, মধুর এলকোহলের বিশেষ রকম চিহ্ন। এটিই দুনিয়ার প্রাচীনতম এলকোহল পানীয়ের প্রমাণ।

জিয়াহুর খনন কাজে সব চেয়ে বেশি তথ্য এসেছে খননে উদ্ঘাটিত অনেকগুলো কবর ও সংরক্ষণের গর্ত থেকে। অনেক পটারি, তৈজস ইত্যাদি ওসব গর্তে সংরক্ষিত হয়েছে। কবরের গুরুত্ব হলো সমাধিস্থ করার ক্ষেত্রে প্রচুর আনুষ্ঠানিকতা থাকায় গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ মৃতদেহের সঙ্গে বহু রকমের সামগ্রী সঙ্গে দেয়া হয়েছে— এর মধ্যে অপচনশীলগুলো এখনো রক্ষিত আছে। ওদের সমাজে কচ্ছপের ও কুকুরের বিশেষ মূল্য এভাবে বোঝা গেছে— প্রচুর কচ্ছপের খোলস (পাথরের নুড়ি সহ) ও কুকুরের কঙ্কাল কবরে পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে বহু রকম হাতিয়ার, তৈজস আর পটারি। সব চেয়ে মূল্যবান অলঙ্কার ও শিল্পকর্মগুলোও কবরের মধ্যেই পাওয়া গেছে— যেমন ফিরোজা রঙের সুন্দর রত্ন পাথর টরকুইজের খোদাই করা নানা অলঙ্কার।

যেহেতু এভাবে উদ্ঘাটিত কবরের সংখ্যা অনেক— তাই কঙ্কালগুলো পরীক্ষা করে যেদিনের স্বাস্থ্য, গড় আয়ু ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য জানা গেছে। ত্রিশের কোঠার বয়সের

বেশি মানুষ মারা গেছে। সাধারণ পুস্টি অবস্থা খারাপ বলা না গেলেও দেখা গেছে অধিকাংশ মানুষ রক্তশূন্যতায় ভুগেছে। সাধারণত ভাতের মত প্রধান খাদ্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করলে রক্তশূন্যতা হতে পারে, কারণ ভাতে ধাতব উপাদানের মধ্যে লোহা বিশেষ নেই। একটি জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে কারো আঘাতে, অস্ত্রের আক্রমণে অথবা অন্য কোন অপঘাতে মারা যাওয়া মৃতদেহ তেমন দেখাই যায়নি— হাড়ের মধ্যে যার চিহ্ন থাকার কথা। এতে মনে হয় এই অঞ্চল দীর্ঘকাল শান্তিপূর্ণ ছিল— পরস্পরের মধ্যে সংঘাত কম ছিল। কিন্তু আবার ওদের কিছু কিছু কবরে— খুব সম্ভব অধিক গণ্যমান্যদের ক্ষেত্রে— কবরে রাখার পর মৃতদেহের প্রত্যন্ত দু'একটি অঙ্গ (মাথা, হাত, পা) কেটে বিশেষ ভাবে তা কবরে স্থাপনের রীতি ওই কঙ্কালেই ধরা পড়েছে।

দীর্ঘ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জিয়াহুর একটি সুস্পষ্ট মানব সংস্কৃতি চমৎকার ভাবে ফুটে ওঠেছে। তবে চীনের ওই অঞ্চলে ব্যাপকতর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে জিয়াহুর বাসিন্দাদের সঙ্গে যথেষ্ট দূরবর্তী লোকালয়ের আসা- যাওয়া ও লেনদেন ছিলো। বিশেষ করে কৃষির দুটি শস্য ধান এবং বজরা বেশ ব্যাপক ভাবেই চালু ছিলো ওই পুরো অঞ্চলে। একই কথা গৃহপালিত প্রজাতির শূয়োর পালনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। খুব সম্ভব জিয়াহুর প্রভাব এক্ষেত্রে বেশি কাজ করেছে।

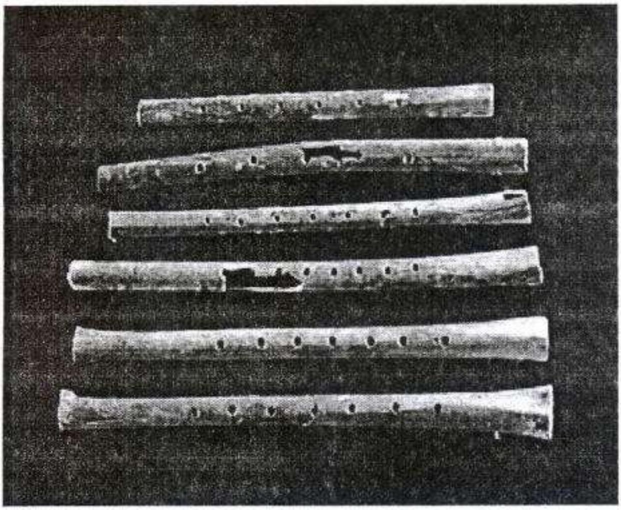

সারসের হাড়ের বাঁশি

তিন পায়ে বসানো পটারি

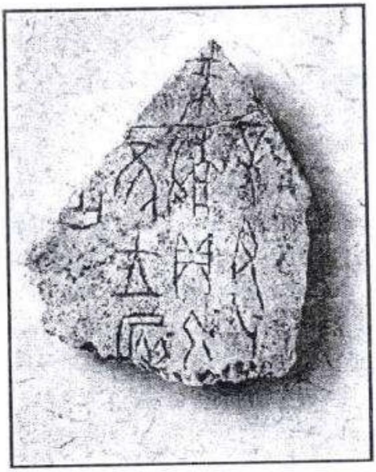

জিয়াহুর সেই চিহ্নগুলো

পটারির কলসি ও কুঁজো

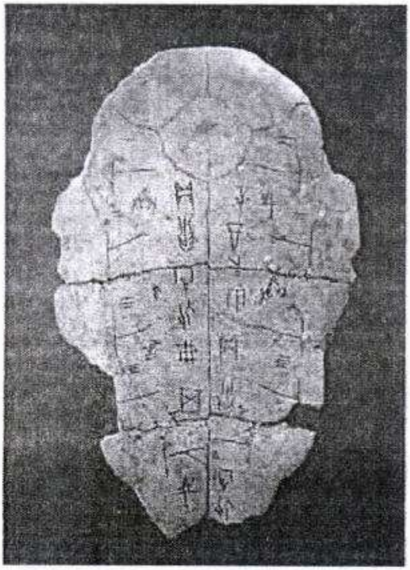

কচ্ছপের খোলে নানা চিহ্ন চিত্রণ

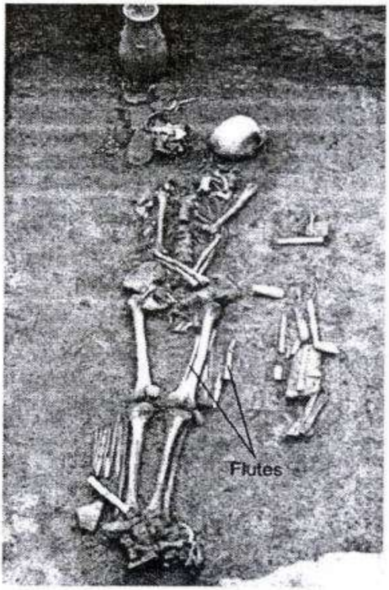

বংশী বাদকের কবরে পায়ের কাছে
তাঁর দুটি বাঁশি ও অন্যান্য সামগ্রী

নাইজারের গোবেরোর রাখাল ঃ সাত হাজার বছর আগে

অল্প দূরত্বের মধ্যেই আবহাওয়া আর ঘাস-পানির যোগান ক্রমে বদলাচ্ছে। তাই এই পরিবারগুলোকে নিজেদের শিকার ও সংগ্রহের খাতিরে ক্রমেই জায়গা বদল করতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে রাখালকেও চরাবার পোষা গরুর পালকে নিয়ে যেতে হচ্ছে সেখানে। এই গো-চারণ তাদের জন্য জীবিকার চেয়েও যেন সংস্কৃতির অংশ হয়ে পড়েছে বেশি, কারণ গোষ্ঠির যে কোন মানুষের মৃত্যুতে জেয়াফতের জন্য এখান থেকে বেশ কিছু গরুর প্রয়োজন হয়।

নাইজার দেশটির মাঝামাঝি জায়গায় সাহারা মরুভূমির প্রায় দক্ষিণ প্রান্তে গোবেরো নামের জায়গাটি এখন ধূধূ বালির মরুভূমি। সাত হাজার বছর আগের যখনকার কাহিনী বলছি তখন চিত্রটি খুবই অন্য রকম ছিল। সেদিনে গেলে দেখি এখানে মাটিতে সবুজ উঁচু জায়গাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে পানি জমে অগভীর হ্রদ, স্থানে স্থানে গাছের কুঞ্জ— নানা প্রাণী আর মানুষের জন্য যথেষ্ট অনুকূল একটি জায়গা। হ্যাঁ আরো আগের সময়ের মত সবুজ তৃণের সমারোহ, গভীর হ্রদ এবং হাতি জিরাফ থেকে শুরু করে বড় বড় তৃণভোজীর স্বর্গরাজ্য আর নেই বটে, তবে যা আছে তাতে এক রকম খুশি এখানকার মানুষ; অবশ্য আবহাওয়া এখন অনেক বেশি শুষ্ক এবং অনিশ্চিত। তবুও ওরা এখনো শিকার করার মত মেলা পশু পায়, অগভীর হ্রদেও পায় নিত্য ধরার মত মাছ, ঝিনুক ইত্যাদি পায়, কুড়াবার মত বন্য-শস্য ও ঝোপের ছোট ফল ফলারি। তবে এই সব কিছুতে রয়েছে বেশ কিছুটা অনিশ্চয়তা। একই জায়গায় বেশি দিন থাকার যো নেই; এক জায়গায় ক'দিন আর্দ্রতা ভাল তো একটু পর অতিরিক্ত শুকনা। এসবের মধ্যে তারা আর একটি বাড়তি জীবিকার ওপর মোটামুটি নির্ভর করতে পারে— তা হলো গরুর পাল নিয়ে ঘাসের ও পানির খোঁজে নানা জায়গায় ঘুরে সেগুলোকে চরানো। একটি বৃহত্তর পরিবারের কথা বলছি যার সবাই নানা ভাবে এই সব কটি কাজের সঙ্গে জড়িত আছে। তবে এ পরিবারে একজন আছে যে কখনো ওদের গরুর

পালের সঙ্গ ছাড়েনা— সে হলো আমাদের রাখাল। গরু-অন্ত প্রাণ হওয়াতে ওই নামটি সে সবার কাছে পেয়েছে।

বন্য গরু এ অঞ্চলে আছে। কিন্তু যে গরু চরাবার কথা বলছি সেগুলো একেবারে আলাদা— একেবারে শান্তশিষ্ট, দলের সঙ্গে চলে, রাখাল যেখানে নিয়ে যায় সেখানে যায়। এখানকার কাছাকাছি জায়গাতেই বহু কাল ধরে নিজেদের প্রচেষ্টাতে বন্য গরুকে মানুষ পোষ মানিয়েছে। বন্য গরুর মধ্যে বাছাই করতে করতে এখন একেবারেই পোষা গরু মানুষ পেয়েছে। বন্য গরুর কিছু গুণও একাজে সহায়ক হয়েছে। বন্য অবস্থাতেও ওরা দল বেঁধে চলে, দলের নেতাকে অনুসরণ করে, এক জায়গায় আবদ্ধ থাকতে হলে অস্থির হয়ে পড়েনা, দলের মধ্যে অন্য দলের গরু থাকলেও মারমুখী হয়না। এসব গুণকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েই মানুষ তাদের মধ্য থেকে এখন গৃহপালিত গরুর একেবারেই ভিন্ন প্রজাতি পেয়েছে। দল বেঁধে চলার আগের অভ্যাস অবশ্য যায়নি, শুধু গরু নেতার বদলে এখন রাখালের মত মানুষ নেতাকে অনুসরণ করছে।

রাখালদের বৃহত্তর পরিবারে জনা দশেক সদস্য— ছেলে-বুড়ো-স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে। আর তাদের গরুর পালে রয়েছে বাচ্চাকাচ্চা সহ বিশটার মত গরু। যাযাবর জীবনে গোবেরো জায়গাটি ওদের খুব পছন্দ। সম্পর্কিত অন্যান্য পরিবারও এখানে প্রায়ই এসে থাকে, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা হয়। এখানকার হ্রদে সারা বছর পানি থাকে, মাছ ভাল পাওয়া যায়— বিশেষ করে তেলাপিয়া আর মাগুর মাছ এবং বিভিন্ন রকমের কিছু ছোট মাছ। তাছাড়া এ হ্রদের শামুক-ঝিনুক এবং কচ্ছপ তাদের প্রিয় খাবার। তবে সমস্যা হলো জায়গাটি সবার প্রিয় বলে সব সময় এখানে জনসমাগম বেশি— সবাই গরুর পাল নিয়ে কাছাকাছি জায়গায় চরাচ্ছে। তাই ঘাস বেশিদিন টেকেনা এখানে, শিকারের পশুতেও টান পড়ে।

তাই কিছুদিন থেকে আবার রাখালদেরকে বেরিয়ে পড়তে হয় তাদের গরুর পাল নিয়ে— দূরে যেখানে গোবেরোর মত এতটা না হলেও পানির মোটামুটি উৎস আছে, এবং ঘাস এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এরকম এক একটি জায়গায় গিয়ে তাঁবু গাড়ে ওরা কিছুদিনের জন্য। আশপাশে শিকারের পশু কেমন আছে তারও একটু খবর নেয়। এই তৃণভূমিতে হরিণ আর গাজেল ভালই পাওয়া যাওয়ার কথা— মাঝে মাঝে বন্য গরুও। মাছের ভাল জলাশয় না পেলে এই শিকারের ওপরেই তাদের দৈনন্দিন নির্ভর করতে হয়— সেই সঙ্গে ঘাসের মধ্যে বন্য শস্য, ফলমূল যা পাওয়া যায়। শিকারের সব অস্ত্র, বিশেষ করে তীর-ধনুক তাদের সব সময় তৈরি থাকে। তীরের আগায় লাগানোর পাথরের তীক্ষ্ণ অংশটি যত্ন করে তৈরিতে ওরা অনেক সময় ব্যয় করে। সেই সঙ্গে শিকারের আনুসঙ্গিক পাথরের সব হাতিয়ারই মজুদ রাখে প্রয়োজনে তৈরি করে— যার মধ্যে রয়েছে ছুরি, কোরানি, কুড়াল সব কিছু। এর একটি বড় অংশ ওরা তৈরি করে গোবেরোতে থাকার সময়।

পরিবারের একটি বড় উদ্বেগ ও পরিশ্রম চরাবার গরুগুলোকে নিয়ে হলেও, গরুগুলোর তেমন কোন ব্যবহার ওরা নিয়মিত করেনা। নিজেদের পালের গরু

সচরাচর মেরে খায়না ওরা। সেগুলোতে হাত দিতে হয় সংকটের সময় যখন শিকার দুর্লভ হয়ে পড়ে। কিন্তু আরো একটি সময়ে ওরা পালের গরুতে হাত দেয়— মনে হয় এ ভাবে গরু পালার ওটিও একটি কারণ। সে সময়টি হলো বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে বহু মানুষকে ভোজ খাওয়াবার সময়। এমন আচারের প্রয়োজনীয়তা এদের প্রায়ই দেখা দেয়। যেমন দূর সম্পর্কের কেউও যদি মারা যায় তা হলে সবাইকে গোবেরোতে আসার জন্য দাওয়াত করা হয়, এবং অন্তত আত্মীয় ও বন্ধুদেরকে আসতেই হয়। গোবেরো হলো তাদের সবার গোষ্ঠিগত কবরস্থান। কবর দেবার আনুষ্ঠানিকতা উপলক্ষে যে ভোজ হয় শিকার করা প্রাণীর ওপর তার জন্য নির্ভর করা চলেনা। তখন নিজেদের পালের গরু থেকে প্রচুর গরু জবাই দেয়া হয়। গোবেরোতে বেশি আসতে হবার এটিও একটি কারণ।

অধিকাংশ সময় অবশ্য রাখালদেরকে দূরে দূরান্তে ঘুরতে হয় গরুর পাল চরাতে চরাতে, খুঁজতে হয় কোথায় একটু ভাল ঘাস, ভাল শিকার পাওয়া যাবে। পালের গরুর দিকে খেয়াল রাখাটি খুব জরুরি। রাখাল যে অন্য কোন দিকে আর মনোযোগ দিতে পারেনা এটিই তার কারণ। গরুর খাবার নিশ্চিত করা চাই, গর্ভবতী গাভীর যত্ন ও তার বাচ্চা হবার ব্যবস্থা করা চাই— কাজগুলো কম নয়। দুটি সতর্কতার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। সব গরুকে দিনে অন্তত একবার ভাল করে পানি খাওয়াতে হয়। দিনের অন্য সময় যেখানেই থাকুক না কেন, ওসময় পানির এরকম একটি উৎসের কাছে গরুকে নেয়া চাই। আর একটি সতর্কতা এখানকার নিজস্ব একটি সমস্যা। গরুকে খুব লম্বা ঘাস বা ঝোপঝাড়ের জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবেনা। আবহাওয়া ও পরিবেশের তারতম্যে এখানকার অনেকগুলো জায়গায় এরকম লম্বা ঘাস আর ঝোপ রয়েছে। এমন জায়গায় সীসী মাছির প্রাদুর্ভাব থাকে যেগুলো গরুকে কামড়াতে পারে। এই মাছি ক্ষতিকর এক রকম পরজীবি বহন করে যা গরুর দেহে গেলে তার মারাত্মক ঝিমানি রোগ হতে পারে। কাজেই ঘাসের খোঁজে কোথায় যাওয়া যাবে তার একটি সীমা আছে। কিছু বৃষ্টিপাত ঘাসের জন্য ভাল— কিন্তু যেখানে কিছু অধিক বৃষ্টির ফলে ঘাস উঁচু হয়ে গেছে, ঝোপ গজিয়েছে, সেখানে যাওয়া যাবেনা।

এসব বুঝেসুঝে চলাটি হলো রাখালের বিশেষ দক্ষতা। পরিবারের অন্যদের নানা কাজ— মাছ ধরা শিকার ইত্যাদি তো রয়েছেই; রান্না, খাবারের আয়োজন, অন্য গেরস্থালি কাজ এসবও কম নয়। এতগুলো গরুর দায়িত্বটি রাখালের জন্য কম কাজ নয়। তবে ছোটবেলা থেকে এ কাজে তার আনন্দ। ছোট ছোট গরুর বাচ্চার সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি খেলাধূলা করে তার কত সময় তখন কেটেছে। আর তখন থেকে পালের গরুগুলো তাকেই যেন বিশেষ ভাবে চেনে, তার প্রত্যেকটি ইশারা বোঝে। চরতে চরতে ঘাস খেতে খেতে গরুগুলো নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লে তার এক ডাকে সবাই গাদাগাদি করে এক জায়গায় এসে হাজির হয়।

গো-চারণ সত্ত্বেও শিকার যেহেতু জীবিকার প্রধান অবলম্বন তাই শিকারের অস্ত্র তৈরিতে এবং তার কাঁচামাল সংগ্রহে ওদেরকে খুব যত্নবান হতে হয়। ভাল অস্ত্র ও

কাটাকুটির হাতিয়ার বানাতে হলে এ কাজের ভাল পাথর প্রয়োজন। সব চেয়ে ভাল যে পাথর তারা ব্যবহার করতে চায় সেগুলো কিন্তু গোবেরোর কাছে পাওয়া যায়না। ওরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে সুন্দর সবুজ ফেলসাইট অথবা চের্ট পাথর দিয়ে তৈরি তীরের আগা শিকারকে আঘাত করে ভাল মত আহত করে, আঘাতে সহজে ভেঙ্গে যায়না, বার বার ব্যবহারও করা যায়। কিন্তু এই পাথর পেতে হলে এর খোঁজে শ'খানেক মাইল দূরেও যেতে হয় বিশেষ বিশেষ জায়গায়। অন্য দিকে গোবেরোতে ও তাদের চারণ ভূমিগুলোর কাছেই পাওয়া যায় নানা রকম কোয়ার্টজ পাথর আর পাথর হয়ে যাওয়া প্রাচীন উদ্ভিদ ইত্যাদি। এগুলো দিয়ে তীরের মাথা বানালে শিকারকে সহজে ঘায়েল করা যায়না, পাথরটিই অনেক সময় ভেঙ্গে যায়। এরকম তীরে তাই বিষ মাখাতে হয়, কার্যকর করার জন্য। বিশেষ গাছ গাছড়ার বিষ তাদের চেনা রয়েছে।

যেমন তীরই হোক শিকারকে দুই একটি তীর বিদ্ধ করলেই সরাসরি সেটি মরে যায় না। আহত হরিণ যা গাজেল ওই তৃণভূমি দিয়ে পালিয়ে অনেক দূর চলে যেতে পারে। রক্তের চিহ্ন এবং পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে অনেক্ষণ ধরে তাকে অনুসরণ করে তবে এটিকে খুঁজে পাওয়ার আর মারার আশা করা যায়। তীর যদি মোক্ষম পাথরে মোক্ষম ডিজাইনে তৈরি হয় তাহলে এ কাজটি সহজ হয় বৈ কি!

এক পাল গরু নিয়ে যাদেরকে নিত্য এত ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে তাদের পক্ষে এক জায়গায় থিতু হয়ে কিছুদিন থেকে সুন্দর হাতিয়ার বানানোর কথা বেশি ভাবা যায়না। কিন্তু ওরা সে ভাবে চিন্তা করেনা। অল্পদিন থাকলেও সব জায়গাতেই তারা সুন্দর বসত রচনা করে মনের আনন্দে সব কাজ করে— গেরস্থালী, কুশলী কাজ, আনন্দ ফুর্তি, ভোজ কিছুই বাদ দেয়না। ওই পাথর কাঁচামালগুলো কষ্ট করে এমনি এমনি যোগাড় করেনা— এগুলো দিয়ে সুন্দর হাতিয়ার গড়ে তোলে। হাতিয়ার তৈরির হাতিয়ার ঠুকে ঠুকে এসব তৈরি করতে গিয়ে পাথুরে বর্জ্য যেমন হয় তেমনি কাজে লাগাবার মত বাড়তি পাথরও হয়। দেখতে সুন্দর ফেলসাইট পাথর দিয়ে তারা অলঙ্কারও তৈরি করে— যেমন করে শামুক-ঝিনুক-কচ্ছপ খাওয়ার পর তাদের খোলস থেকে। গলার লকেট, মালা, হাতের ব্রেসলেট, মাথায় পরার অলঙ্কার কিছুই বাদ যায়না। তবে আসল দামী অলঙ্কার তৈরি তারা করে যে জিনিস দিয়ে সেগুলো দূর দূরান্তের সব পশুর দেহ থেকে আসে; যার মধ্যে আছে জলহস্তীর দাঁত ও হাড়, বন্য দাঁতালো শূয়োরের দাঁত, উটপাখির হাড় ইত্যাদি। এসব কাঁচামাল থেকে নিজেরা অলঙ্কার বানায়, আবার তৈরি অলঙ্কারও বিনিময় করে নানা ভ্রমণকারী দলের কাছ থেকে। অলঙ্কার তারা নিজেরা যথেষ্ট গায়ে পরে। তবে অলঙ্কারের প্রয়োজনটি আরো বোধ হয় তীব্র হয় পারলৌকিক কারণে, মৃতদেহকে সাজিয়ে দেবার জন্য।

আরো ঐতিহ্যগত ভাবে তাদের কুশলতা ও নান্দনিকতা প্রকাশ পায় তাদের পটারিতে। বহুকাল ধরেই এখানকার বিশেষ বিশেষ ডিজাইনের পটারির ঐতিহ্য গড়ে ওঠেছে। হয়তো যে সময় সুজলা সুফলা আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে এক

জায়গায় স্থায়ী হয়ে গেরস্থালী করেছে বলে এই ঐতিহ্য গড়ে ওঠেছিলো। এখন যাযাবর জীবনেও এটি ছাড়তে পারেনি— নইলে ঘুরে বেড়াবার জীবনে পাটারির চর্চা করা যেমন দুরূহ, ভঙ্গুর পটারির ব্যবহারও তেমন সহজ নয়। সেই দুরূহ কাজটি তারা এখন করছে। অন্তত গোবেরোতে যে সময় থাকে তখন পটারির চর্চা তাদের করা চাইই— এও যেন তাদের এক রকমের আচার অনুষ্ঠানের মত। তাছাড়া হাড়িতে রান্না করে খেতে যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাদের উপায়ই বা কী?

ওদের জন্য পটারি মানে কিন্তু সাদামাটা পটারি নয়— বরং এর গায়ে নানা রকম ডিজাইনের কারুকার্য করা পটারি। নেহাত রান্না করা বা জিনিসপত্র সংরক্ষণের জন্য এই কারুকার্য দরকার ছিলনা। গোবেরোর মানুষরা আসলে পটারির চর্চা করে একটি শিল্পকর্ম হিসেবে। হ্রদের পার থেকে কাদামাটি এনে তা পটারির জন্য তৈরি করে কুচি কুচি করা শুকনো ঘাস ইত্যাদি উদ্ভিদ আঁশ মিশিয়ে। একে হাতে সরু দড়ির মত করে নিয়ে তাকেই কয়েল পেঁচানোর কায়দায় নানা রকম আকৃতির পটারিতে রূপ দেয়। গা মসৃণ করে নেবার পর নানা পদ্ধতিতে ডিজাইনগুলো নরম কাদার পটারির গায়ে ফুটিয়ে তোলে। মূল দুটি পদ্ধতিই ওরা অনুসরণ করে— একটি হলো সীল মারার মত ছাপ দিয়ে দিয়ে পরপর একই ভাবে পুনরাবৃত্তি হওয়া ডিজাইনের একক উপাদান দিয়ে পুরো ডিজাইন ফুটিয়ে তোলা, অথবা আঁচড় কেটে কেটে ডিজাইনটি এঁকে দেয়া। প্রথম পদ্ধতিটিই বেশি দেখা যায়। আগুনে পোড়ার পর এই পটারি যারাই দেখে তারাই টের পায় এই গরু চরানো, শিকার করা, মাছ ধরা মানুষগুলো কেমন শিল্পী মনের অধিকারী হতে পারে।

রাখালরা এখন বেশ কিছুদিন হলো গোবেরোতে আছে, এ সময়টা এখানে আবহাওয়া ভাল, বৃষ্টি কিছু হওয়াতে ঘাস-পাতাও ভাল, হ্রদের পানি টইটুম্বুর। পরিবারের দশ জন মানুষের জন্য চারটি তাঁবু গোল করে খাটানো হয়েছে— হরিণের চামড়া সেলাই করা সুন্দর তাঁবু। এর মধ্যে একটি তাঁবুতে হাতিয়ার তৈরি আর পটারির কাজ চলছে। রাখাল যে এসব কাজ একেবারে পারেনা তা নয়, তবে তার বৌ আর তার মেয়ে পটারি অনেক ভাল গড়ে , আর তার ভাই নিজে যেমন পাকা শিকারি তেমনি শিকারের হাতিয়ার গড়তেও পটু। রাখাল এখানেও তার নিজের জগত নিয়ে থাকে বেশির ভাগ সময়। তাঁবুগুলোর পাশেই একটি গোয়ালের মত খাড়া করেছে ওরা— গোয়ালঘর না বলে হয়তো খোঁয়াড় বলাটাই বেশি ভাল হবে। এখান থেকে গরুগুলো কখনো চরাতে নিয়ে যায়, কখনো হ্রদের ধারে পানি খাওয়াতে। যত বেশি দিন এখানে থাকে, কাছে ছাইপাশ অনেক বর্জ্য জমতে থাকে— রান্না করার বর্জ্য, খাওয়ার বর্জ্য, পাথর ভেঙ্গে ভেঙ্গে হাতিয়ার তৈরির বর্জ্য, ভাঙ্গা পটারির বর্জ্য, শিকারের পশুর বর্জ্য। ওরা যথাসম্ভব ওগুলো এক জায়গায় ফেলার চেষ্টা করলেও হ্রদের কাছাকাছি অল্প জায়গায় অনেকগুলো পরিবার এভাবে থাকে বলে কিছু বর্জ্য যত্রতত্র গড়াগড়ি খায়। তবে বেশির ভাগই একটি বড় গর্তে ফেলে। কাছাকাছি এলাকায় গর্ত ভর্তি হয়ে এক একটি ডিবির মত হয়ে ওঠেছে এগুলো।

এসব থেকে আরো একটু দূরে ওই হ্রদের ধার ঘেঁষেই রয়েছে গোবেরোর বেশ কয়েকটি কবরস্থান। কিছু আছে নতুন কবরস্থান, আর কিছু বহু পুরানো— কতকালের যে পুরানো তা এখনকার কেউ বলতে পারেনা। রাখালদের পরিবার গোবেরোতে থাকতে থাকতেই দু:সংবাদ নিয়ে এখানে এসেছে তার এক বন্ধু। এ বন্ধুর বাবা হঠাৎ করে মারা গেছে, ওরা এখান থেকে মাইল দশেক দূরে ক্যাম্প করে ছিলো, গরুর জন্য ওদিকে বেশি ঘাস আছে বলে। ওই অবস্থায় হঠাৎ বাবা মারা গেলো। এখন কবর দিতে গোবেরোতে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। রাখালদের মত ওদের আরো আত্মীয় ও বন্ধু কেউ কেউ এখন গোবেরোতে আছে। বাকিদেরকে খবর দেয়া হয়েছে দ্রুত আসতে। গোবেরোতে বেশ কিছু কবরস্থানের মধ্যে একটি ওদের বৃহত্তর পারিবারিক গোষ্ঠির জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। সেখানেই কবর হলো।

কবরে মৃতদেহ কোনদিকে কোন পাশে ফিরিয়ে রাখা হবে, হাতের-পায়ের পজিশন কী হবে সে সবের চুলচেরা হিসেব রয়েছে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আচার-অনুষ্ঠানের সবই সুনির্দিষ্ট। ওসময় গোবেরোতে যারা ছিল সবাই এসেছে ওখানে— কেউ বাদ যায়নি। মৃতের পরিবার মূল্যবান সব অলঙ্কারে মৃতদেহকে সাজিয়ে দিল; কিছু কিছু অলঙ্কারের সঙ্গে পরকালে ভাল থাকার সম্পর্ক আছে বলে ওরা মনে করে— সে জন্যই এগুলোর ওপর এতো গুরুত্ব দেয়া। গোবেরোতে কবরের স্থান, থাকার স্থান, কাজের স্থান এসব এতো কাছাকাছি যে ওখানকার সর্বত্র মাটির ওপর ও মাটির সঙ্গে বহু দিনের কুচি কুচি ভাঙ্গা হাড়, পটারির ভাঙ্গা টুকরা, পাথরের হাতিয়ারের পরিত্যক্ত অংশ বা ছোট গোটা হাতিয়ার ইত্যাদি মিশে আছে। কবর দেয়ার পর যে মাটি দিয়ে এটি পূর্ণ করা হলো তাতেও প্রচুর এরকম ছোট ছোট পরিত্যক্ত অংশ চলে গেলো।

কবর দেবার কয়েক দিনের মধ্যে অনেক আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুরা সপরিবারে এবং গরুর পাল সমেত হাজির হলো। এবার মৃতের কল্যাণার্থে ভোজের পালা। ওই পরিবারের পালের গরু বেশ ক'টি ভোজের কাজে লাগলো, অনেক নিকটাত্মীয়রা তাদের পাল থেকেও কয়েকটি গরু দিলো। সব সময় গোবেরোতে ফিরে এসে মৃতের কবর দেয়া আর তার জন্য পুরো গোষ্ঠিশুদ্ধ খাওয়াবার জন্য জেয়াফতের মত ভোজের আয়োজন এদের সংস্কৃতির একটি বড় অংশ। এই যে গরুর পাল নিয়ে ঘোরা হয়তো এই কারণেই এটি শুধু খাদ্য নিরাপত্তার জন্যই জরুরি তা নয়, বরং জেয়াফতের প্রয়োজনে ওটিও সংস্কৃতিরই অংশ হয়ে গেছে।

রাখালদের পরিবার ওই সময় গোবেরোতে থাকায় এই পুরো অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া আর ভোজের শরিক ওরা হতে পেরেছে। গোবেরোতে তাদের সময়ও কাটলো বেশিদিন— এবার আবার বেরিয়ে পড়ার সময়। শোনা যায় উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এখন ভাল আবহাওয়া, কচি ঘাসে মাঠ ভর্তি। ঘাসের কারণে হরিণের আনাগোনাও ওদিকে বেড়েছে। গরুর পাল নিয়ে এবার ওদিকেই পা বাড়ালো এই পরিবার।

* * *

২০০০ সালে কিছুটা দৈবক্রমেই আবিষ্কৃত হয় সাহারা মরুভূমির মধ্যে গোবেরো প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা। এরপর থেকে কিছুদিন থেমে থেমে এর খনন কাজ এবং গবেষণা চলছে। এর ফলে উদ্ঘাটিত হয়েছে অবাক করে দেবার মত বেশ কিছু তথ্য। দেখা যাচ্ছে এখন যেটি সাহারা মরু এখন থেকে ১০ হাজার বছর আগে থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে পর্যন্ত যথেষ্ট সবুজ সুজলা সুফলা ছিল— আজকের সঙ্গে কোন মিলই ছিলনা। পরবর্তীতে গুরুতর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ওই সবুজ অবস্থায়ও মাঝে জলবায়ুর অবনতি হয়ে এটি খুব শুষ্ক ভাবে ধারণ করেছিল আট হাজার বছর আগে, তারপর শুষ্কতায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। তথ্যগুলো এসেছে মূলত ফলপ্রসু প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কয়েকটি জায়গা পেয়ে যাওয়ার ফলে। এর মধ্যে প্রধান হলো প্রাচীন হ্রদের চিহ্নের পারে পারে বেশ কটি কবরস্থানের সন্ধান এবং এগুলো খনন করে কবরের মধ্যে বিভিন্ন কালের অনেক ক'টি কঙ্কাল ও বহু নিদর্শন উদ্ধার। আর খননের অন্য কিছু জায়গা হলো বিভিন্ন সময়ের আবর্জনা স্তূপগুলো— এগুলোও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে খুবই সমৃদ্ধ।

স্তরে স্তরে বিভিন্ন যুগের পাওয়া এই সব নিদর্শনের গবেষণা থেকে বোঝা গেছে যে খুবই অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশে দশ থেকে আট হাজার বছর আগে পর্যন্ত এটি শিকারি-সংগ্রাহক মানুষের এক রকম স্বর্গরাজ্য ছিল— হাতি, জলহস্তি ও কুমিরের মত বড় প্রাণী থেকে শুরু করে অসংখ্য শিকারযোগ্য প্রাণী এবং হ্রদের মাৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ এই এলাকায় রমরমা স্থায়ী মানব বসত গড়ে ওঠেছিলো। আট হাজার বছর আগে আবহাওয়া যথেষ্ট রুক্ষ হয়ে ওঠলে এখানে এ অবস্থার অবসান ঘটে। তবে সাড়ে সাত হাজার বছর আগে নাগাদ পরিস্থিতি আবার বদলে যায়। এবার অন্য একটি গোষ্ঠির মানুষ ওই এলাকায় গোবেরো ও তার আশপাশে জীবনযাত্রা শুরু করে। কিছুটা শুষ্ক, কিছুটা আর্দ্র, কিছুটা অনিশ্চিত এই পরিবেশে আগের তুলনায় কম সমৃদ্ধ শিকারি-সংগ্রাহক থেকেও মানুষ গৃহপালিত গরুর পাল চরাবার কাজেও অভ্যস্ত হয় এবং স্থায়ী বসবাসের বদলে যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত হয়। বড় প্রাণীরা আগেই চলে যাওয়ায় এবার ছোটখাট শিকার আর ছোটখাট উদ্ভিজ সংগ্রহের ওপরেই তাদেরকে নির্ভর করতে হয়।

ওই মানুষদের খাদ্যাভ্যাস বুঝতে পারা গিয়েছে আবর্জনা স্তূপে পাওয়া পশুর হাড়, দাঁত, অঙ্গারের পরিণত উদ্ভিদ ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে। আবর্জনা স্তূপ ছাড়াও কবরের ভেতরের মাটিতেও একই ধরনের এসব নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিশেষ করে আবর্জনা স্তূপে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে পরিমাণ পশুর হাড়, বিশেষ করে পোষ মানানো প্রজাতির গরুর হাড় পাওয়া গেছে, তাতে জনসংখ্যার হিসেবে দৈনন্দিন খাবার কারণে এতটা হতে পারে বলে মনে হয়নি। তার থেকেই সন্দেহ করা হয়েছে যে সময় সময় অনেক আগন্তুকের ভোজের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। আবার কবরের সংখ্যাও অস্বাভাবিক রকম বেশি হওয়াতে এটিই পুরো এলাকার মানুষের মৃতদেহ ফিরিয়ে এনে কবর দেয়ার জায়গা ও সে উপলক্ষে অন্ত্যেষ্ঠি ভোজের জায়গা ছিল এমনটিই মনে হয়েছে। আর যাযাবর জীবনে খাদ্যের অনিশ্চয়তা দূর করা ছাড়াও এই ধরনের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের ভোজের প্রয়োজনীয়তাও তাদেরকে গরুর পাল চরানোর কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে বলে মনে হয়।

এখানে গৃহপালিত প্রজাতির গরুর হাড় পাওয়া গেছে— সেটি গরু পালার একটি প্রমাণ। তবে এটিই একমাত্র প্রমাণ নয়। অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে যে

আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এ সময়ের যথেষ্ট আগে স্থানীয় বন্য গরুকে পোষ মানাবার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। যদিও এটি মধ্যপ্রাচ্যে, চীনে অথবা আরো কোথাও কোথাও আলাদাভাবে হয়েছে, আফ্রিকার তখনকার গৃহপালিত গরু ওসব কোথাও থেকে আসেনি, কারণ এরা স্পষ্টত এখানকার স্থানীয় বন্য গরুর বিবর্তিত রূপ। কাছে ঠিক কোথায় মানুষের হস্তক্ষেপে এই বিবর্তনটি ঘটেছে তা স্পষ্ট জানা না গেলেও প্রায় সাড়ে দশ হাজার বছর আগে মিশরের পশ্চিমের মরু অঞ্চলে নাবাতা, বির কেসাইবা এলাকায় এটি ঘটেছে বলে আন্দাজ করা হয়। ঠিক গোবেরোতে না হলেও এর থেকে খুব বেশি দূরে নয় এমন স্থান নাইজার, মালি, দক্ষিণ লিবিয়া, দক্ষিণ আলজেরিয়ায় বেশ কিছু স্থানে সমসাময়িক বেশ কিছু পাথুরে পাহাড়ের গায়ে আঁকা চিত্রে অন্যান্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানুষ, গৃহপালিত গরু, গরু চরাবার দৃশ্য ইত্যাদি পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে নানা বন্য প্রাণী শিকারের দৃশ্যও আঁকা দেখা গেছে। গোবেরোর সঙ্গে এখানকার মানুষের অন্যান্য সাংস্কৃতিক মিল লক্ষ্য করলে (যেমন হাতিয়ার, পটারি) এখানেও গরু চরানোটিই স্বাভাবিক হবার কথা। শিকার-সংগ্রহ-পশু চারণের এই একত্র চর্চার সংস্কৃতি ওই এলাকার অনুকূল আবহাওয়ায় তখন সাধারণ সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল।

গোবেরোতে কবরের ভেতরে এবং আবর্জনা স্তূপে উভয় জায়গায় প্রচুর ভাঙ্গা পটারির টুকরা পাওয়া গেছে এবং এর ওপর যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। টুকরাগুলোর সমন্বয়ে গোটা পটারি পাত্র সম্পর্কেও ভাল ধারণা পাওয়া গেছে— এর প্রস্তুত প্রণালী, অলঙ্করণ পদ্ধতি ইত্যাদি সবকিছু। মনে হয়েছে পটারির পেছনে তাকে আটপৌরে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য যেমন ছিল তেমনি এর নান্দনিক রূপ, আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহার এসবও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। পটারির টুকরা থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া যায় তা হলো তার কাঁচামাল কাদার সঙ্গে মেশানো উদ্ভিদ আঁশ ও এর সঙ্গে আসা বীজ, শস্য ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। এর থেকে ওই অনতি-উচ্চ তৃণ-ভূমির ঘাসগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে, তবে খাদ্য হিসেবে বন্য শস্যের কোন নমুনা এতে আসেনি।

কবরে এবং আবর্জনা স্তূপে ছোট ছোট পাথরের হাতিয়ার বা তার ভাঙ্গা অংশ এবং অলঙ্কারের উপাদান অসংখ্য পরিমাণে পাওয়া গেছে। তার থেকে একদিকে শিকারের আয়োজনের বিষয়গুলো বোঝা গেছে, অন্যদিকে শিকারের উন্নত অস্ত্রের খাতিরে বহু দূর থেকে ফেলসাইট ও চেরট পাথর যে ওরা এনেছে তা বোঝা গেছে। আবার ভাল অলঙ্কারের জন্য আফ্রিকায় আরো অনেক দক্ষিণের জায়গা থেকে জলহস্তী, দাঁতালো শূয়োর ইত্যাদির দাঁত ও হাড় আনার প্রমাণও পাওয়া গেছে। এর থেকে তাদের কারো কারো ভ্রমণ, ব্যবসা ইত্যাদির ব্যাপ্তিটিও বোঝা যাচ্ছে।

আজকের সাহারায় সেদিনের গোবেরোর চিহ্নগুলো

গোবেরোর কাছে সমসাময়িক পাথুরে চিত্র
(গবাদি পশুর আধিক্য লক্ষনীয়)

গোবেরোর কবরস্থানে খনন কার্যক্রম

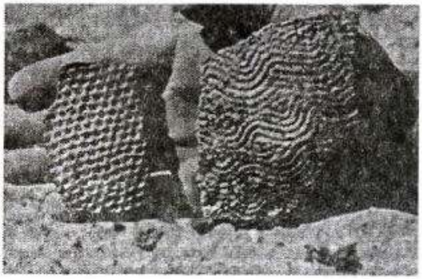

চিত্রিত পটারির টুকরা

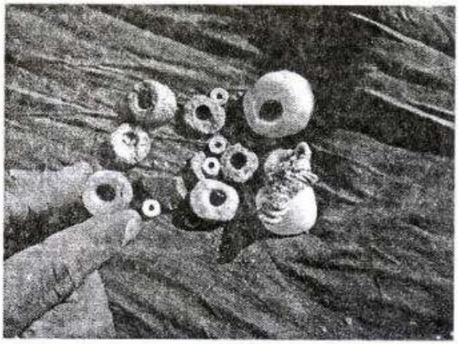

গোবেরোর অলঙ্কার

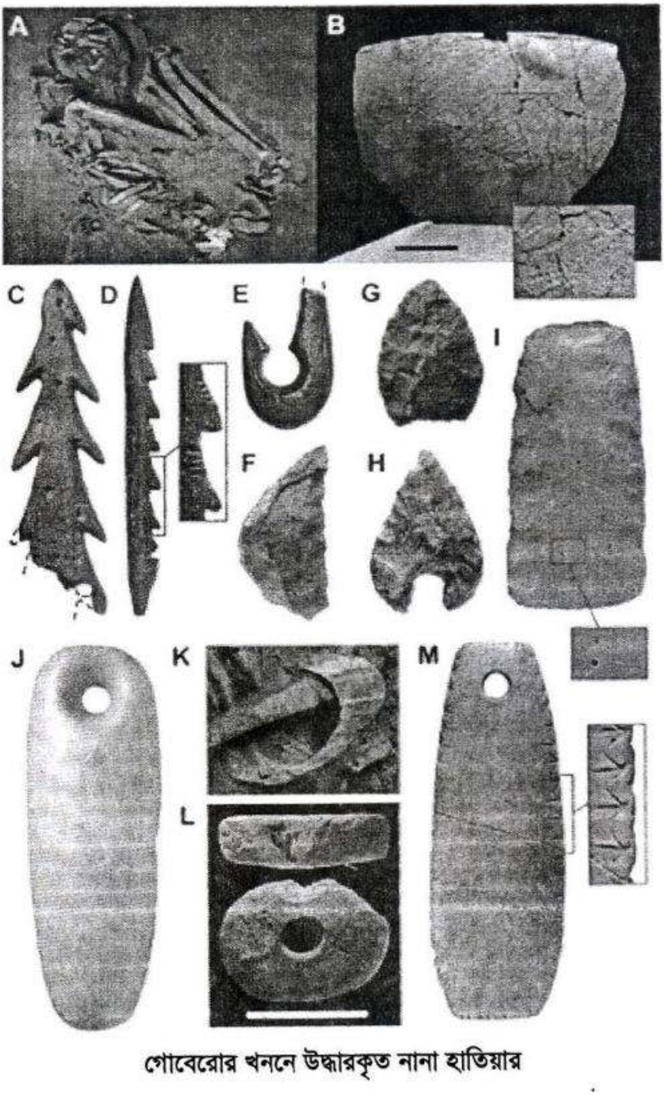

গোবেরোর খননে উদ্ধারকৃত নানা হাতিয়ার

জাপানের টোকিও উপকূলের কুমোর ঃ
সাত হাজার বছর আগে

কাছের সমুদ্র ওদেরকে খুবই সমৃদ্ধিতে রেখেছে। ওখানে ঝিনুক কুড়িয়ে, মাছ ধরে এবং কখনো কখনো বড় তিমি শিকার করে এসেছে ওদের খাবারের প্রাচুর্য। তবে ওদের জীবনযাত্রাকে ও শিল্পবোধকে তুঙ্গে নিয়ে গেছে ওদের পটারি। এ পটারির জন্য নাম-ডাক কুমোর নামের একজন মহিলা ও তার গ্রামের। পোড়া মাটির পটারি আরো বহু আগে থেকে এদেরই পূর্বপুরুষরা প্রথম সৃষ্টি করেছে।

টেকিও উপসাগর নামের যে সমুদ্র অংশটির কাছে আজকের টোকিও মহানগরী, সাত হাজার বছর আগের দিনগুলোতে রয়েছে তার পারে পারে কিছুটা খোলা জায়গাও গাছপালাসহ তৃণ-ভূমি এবং এর পরেই শুধু বন আর বন। অবশ্য সে বনেও মাঝে মাঝে ফাঁক আছে— বিশেষ করে নদী উপত্যকাগুলোতে। আরো দূরে পাহাড়ি জায়গাগুলোতেও বন কিছুটা ভিন্ন রকমের, ওখানেও মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢালে অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গা। এ সব জায়গায় কোথাও কোথাও মানুষের বসত রয়েছে। বহু বছর ধরে ভাল আবহাওয়া এবং বনের সমৃদ্ধির কারণে ওখানে জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এখনো অধিকাংশ মানুষ থাকে সমুদ্রের অথবা নদীর পারে পারে ছোট বড় গ্রামে। টোকিও উপসাগরের উত্তর-পূর্ব কোণের সমুদ্র পারের খুব কাছের এই জায়গাতে সব সময় দেখা যাচ্ছে নারী-পুরুষ-শিশু সব রকম মানুষের একটি নিত্য ব্যস্ততা। যদি লক্ষ্য করেন আসলে ব্যস্ততাটি কী নিয়ে— দেখতে পাবেন এটি ঘুরে ফিরে ঝিনুক, শামুক, কাঁকড়ার মত শক্ত খোলের খাবার সংগ্রহ, আর মাছ ধরার কাজে। অবশ্য এগুলোকে খাবার উপযুক্ত করতে বা সংরক্ষণ করতে আরো যা যা করতে হয় সেগুলোও ব্যস্ততার কম অংশ নয়।

সমুদ্রের কাছেই একের সঙ্গে অন্যটির খুব অল্প অল্প দূরত্বে ৫০-৬০ টি গোল গোল বাড়ি আর সামনের সমুদ্রের বেলাভূমি এই দুইয়ের সমন্বয়েই তাদের এই গ্রাম। সমুদ্রের পার ধরে হেঁটে আরো দশ বারো কিলোমিটার গেলে প্রায় একই

রকম আরো গ্রাম মিলবে; তারপর এভাবে আরো। এ দিকটায় এমন ঘন বসতি এই সমুদ্রের কল্যাণেই; সমুদ্র থেকে দূরে গেলে এমন ঘন বসতি বিরল।

গোল গোল ওই বাড়িগুলোকে দেখতে শুকনো খড়ের চালার ঝুপড়ির মত মনে হয়। চালাগুলো উল্‌টো ফানেলের মত নিচের দিকে নেমে এসে বাড়িকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। আসলে বাড়িটির অনেকটা হচ্ছে একটি গর্তের মধ্যে— গোল পাঁচ-সাত মিটার ব্যাসের মিটার খানেক গভীর গর্ত, তারই ভেতর চারিদিকে দেয়ালে গাছ-বাঁশের খুঁটিও বেড়া লাগিয়ে মজবুত করে নেয়া হয়েছে, ওপরে আছে সেই প্রায় ঢেকে ফেলা খড়ের চাল। মাঝখানে বেশ মোটা একটি প্রধান থাম আর তার চারিদিকে পাঁচ ছয়টা অপেক্ষাকৃত সরু থাম পুরো চালাটি ধরে রেখেছে। গোলাকৃতি মেঝটা ভাল করে দুরমুস করা মাটির, কোন কোন বাড়িতে তাতে সমতল পাথরও পাতা আছে। চালা থেকে বৃষ্টির পানি যেখানে পড়ছে সেখানে পানি নিষ্কাশনের জন্য সরু গোল নালা কেটে দেয়া হয়েছে।

এগুলোকে বলা যায় গর্ত-বাড়ি— পুরো গ্রামটাই এরকম গর্ত-বাড়ির গ্রাম। এ বাড়িতেই বাসিন্দাদের সারা বছর কাটে। ওরা গল্প গুজবে শুনেছে আগেকার দিনে তেমনটি ছিলনা, ভরা গরমের দিনে এবং শরতকাল পর্যন্ত এখানে কাটিয়ে তারপর চলে যেতে হতো বনের ভেতরে অন্যত্র অস্থায়ী ঝুপড়ির ক্যাম্প করে। কারণ তখন সমুদ্র থেকে পাওয়া খাবারে কুলোতনা, আবার বনেরও এক জায়গায় কুড়িয়ে বা শিকার করে বেশি কিছু পাওয়া যেতোনা। এখন কিন্তু সে অবস্থা নেই; সমুদ্রে সব কিছু রমরমা, আবার বনও সমৃদ্ধ আর তা বেশ হাতের কাছেই। কাজেই গ্রামের অবস্থাও রমরমা; আশপাশের গ্রামগুলোর সঙ্গে ভাল যোগাযোগ এবং তাদের সঙ্গে ভাল মন্দ খাবার, সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ইত্যাদির বিনিময় বাণিজ্যও ভালই চলে।

গ্রামের দিনকাল যে ভাল, সব দিকে যে একটি সমৃদ্ধির ভাব যাচ্ছে এটি সব চেয়ে ভাল বোঝা যায় কুমোরের বাড়িতে গেলে। কুমোর আসলে একজন মাঝবয়সী নারীর নাম, তাঁর হাতে চমৎকার সব মাটির ঘটিবাটি তৈরি হয় বলেই গ্রামের সবাই তাকে এ নামেই ডাকে, বেশ দূরের গ্রামেও এই গ্রামের কুমোর মহিলাটি বেশ পরিচিত, যদিও ওরা যে তাঁকে সবাই দেখেছে তা নয়। তাঁকে না দেখলেও তাঁর হাতের কাজ ওরা সব সময় দেখে কারণ প্রায়ই ওর হাতে গড়া বাছা বাছা ঘটিগুলো তারা কিনে নেয়। এসব পোড়ামাটির কাজ অর্থাৎ পটারির কাজ অনেকেই করে বটে, তবে সবার হাতে এমন ঘটি হয়না। এক কথায় যদি শত শত কিলোমিটারের এই পুরো অঞ্চলের— দীর্ঘ উপকূল আর নানা দ্বীপে গড়া জায়গাটিতে অনেক গ্রামের সব মানুষের-সাধারণ সংস্কৃতির স্বরূপ কী বলতে চাই তা হলে বলতে হবে এটি হলো পটারির সংস্কৃতি। ওরা সব সময় বলে এটি শুধু আজকের ব্যাপার নয় বহু হাজার বছর ধরে এই পটারি শিল্প এখানে চলছে যখন থেকে তাদের পূর্বপুরুষরা এটি উদ্ভাবন করেছে (বহুকাল পর আজকের মানুষ একে স্মরণ করে এর নাম দিয়েছে জামোন সংস্কৃতি)। নিত্যকার ব্যবহারের মামুলি

কিছু তৈজসকে তারা নিজেদের সংস্কৃতির সম্মান কেন দিয়েছে তার কারণ ওদের শিল্পী মন। অবশ্য এটি মানতে হবে যে পোড়ামাটির ঘটিবাটি ওদের জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে, খাবার দাবারকে উপাদেয় করেছে। কিন্তু ওই কাজে লাগাকে ছাড়িয়ে ওদের শিল্পী মন কিন্তু বেশি নজর দেয় ওই ঘটির আকৃতির ওপর, কেমন বক্র রেখায় এটি গড়ে ওঠেছে, এর কিনারাটি কেমন করে বেঁকে এসেছে, এর গায়ে কী রকম প্যাটার্ন খোদিত হয়ে আছে, তার নান্দনিক মূল্যটি কী? আর এ জন্যই টোকিও উপসাগরের উত্তর-পূর্ব কোণের বেশ ক'টি গ্রামের মধ্যে এই সাধারণ গ্রামটির একটু বেশি পরিচিতি রয়েছে এখানকার একজন মহিলার হাত যশের কারণে।

কুমোরের স্বামী অন্য কাজে বাইরে ব্যস্ত থাকেন। দুই মেয়ের বড়টি বিয়ে করে অন্য বাড়িতে চলে গেছে। ছোট মেয়ে ও ছেলের বৌকে নিয়েই কুমোরের যাবতীয় শিল্পকর্ম। ছেলে তাঁর পটারির বেচাকেনার ব্যাপারটি দেখে বটে কিন্তু অধিকাংশ সময় অন্যদের সঙ্গে মাছ ধরতেই ব্যস্ত থাকে সে, কখনো কখনো বনে গিয়ে শিকারে। কাজেই কুমোরের পটারির মূল কাজটি মূলত মেয়েদের দখলেই রয়েছে। তিনটি গর্ত-বাড়ি নিয়ে কুমোরের পরিবার থাকে— একটিতে ছেলে, ছেলে বৌ ও তাদের শিশু কন্যা; আরেকটিতে কুমোর আর তাঁর স্বামী। অন্য ছোট ঘরে তাঁদের ছোট মেয়েটি থাকে। কুমোরের ঘরটি তার পটারির কারখানাও বটে। অন্যদিকে পরিবারের হেঁশেলটি ছেলের ঘরে। উভয় ক্ষেত্রে অবশ্য সংসারের অনেক কাজ বাড়ির বাইরেই চলে— তা সে পটারি তৈরির, শুকানোর আর পোড়ার কাজই হোক; অথবা মাছ, ঝিনুক, শিকার অথবা পশুর কাটচেরা করে রান্নার আয়োজনই হোক। বসবাসের গর্ত-বাড়ি ছাড়াও ওদের ছোট ছোট আরো দুটো ঘরের ব্যবস্থা আছে— যা দেখতে হুবহু গর্ত-বাড়ির মতই— ও ভাবেই চালা দিয়ে ঢাকা। এগুলো সংরক্ষণের জায়গা— পটারি, খাবার দাবার ইত্যাদি নানা জিনিস জমিয়ে রাখার জন্যই তৈরি হয়েছে সেগুলো।

ওদের পটারির মূলত একই রীতি (আধুনিক ভাষায় জামোন রীতি)। জামোন কথাটির মানে হলো উদ্ভিদের আঁশ পাকানো দড়ি। কাদার পটারি পোড়ার আগে যখন নরম থাকে তখন কুমোর পটারির গায়ে এই দড়ির ছাপ দিয়েই নানা রকম প্যাটার্ন ওখানে সৃষ্টি করে যা পোড়ার পর পটারির গায়ে পাকাপোক্ত হয়ে যায়। তখন একে দেখতে আর ছুঁতে অন্য রকম লাগে। কুমোর বলেন ওই দড়ির ছাপ দেবার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য হলো পোড়ামাটির জিনিস হয়েও পটারির গা'টাকে যেন দেখতে কিছুটা উদ্ভিজ জিনিসে তৈরি ঝুড়ির মত দেখায় দড়ির উদ্ভিজ আঁশের ছাপের কারণে। শুধু দেখতেই নয়, যখন এই ঘটিবাটি হাতে তুলবো, নাড়াচাড়া করবো তখন হাতের অনুভূতিটিও যেন কিছুটা হয় উদ্ভিজের ঝুড়ির স্পর্শের মতো। অর্থাৎ বাঁশ বেতে তৈরি ঝুড়িকে পাত্র হিসেবে ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় ওই ঝুড়ি বা বাস্কেটের ভাবটা বজায় থাকে অথচ ঝুড়ির মত সছিদ্র নয় বলে এতে

তরল রাখা যায়; পোড়ে না বলে এতে পানি সেদ্ধ করা যায়, এর মধ্যে পোকা মাকড়ও ঢুকে পড়তে পারেনা।

কুমোরের জীবনে এখন দুটি আনন্দ— তাঁর পটারি আর তাঁর ছোট নাতনি, যে সারাক্ষণ তার সামনে বসে দাদীর কাজ দেখে। সে দেখে আর তাঁকে অনুকরণের চেষ্টা করে। কুমোরের খুব ইচ্ছে আর একটু বড় হলে নাতনিকে নিজের মতই বড় শিল্পী করে গড়ে তুলবেন। তাঁর গর্ত-বাড়ির সামনেই একটি জায়গায় এর জন্য প্রয়োজনীয় কাদামাটি আগে থেকেই তৈরি করে রাখা হয়েছে। এই কাদামাটি খুব বিশেষ কিছু নয়, এখানে মোটামুটি পাওয়া যাওয়া মাটিই যথেষ্ট একটু যত্ন করে খুঁজে নিতে হয় ঠিক কোন মাটিটি অধিক যুৎসই হবে। মিহি কণার খয়েরী—কালো রঙের মসৃণ মাটি খুঁজে চালুনিতে চেলে নিয়ে পানি মিশিয়ে বার বার দলাই মলাই করে পটারির মাটি তৈরি করা হয়েছে এটি ঘরের বাইরে একটু গর্ত করে সেখানে স্তুপ করে ঢেকে রাখা হয়েছে। এখান থেকে অল্প অল্প করে এনে কুমোর এতে কাজ করেন। হাত দিয়ে সে রোল করে করে কাদার একটি লম্বা দড়ির মত তৈরি করলেন এবং সেই কাদার দড়িটিকে বৃত্তাকারে পেচিয়ে পেচিয়ে ঘটির আকারে ওপরের দিকে গড়ে তুললেন ঘটিটি ওপরের দিকে ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে এমন ভাবে গড়ছেন বলে কুমোর কাদার দড়িটি পেচাবার সময় একটি বৃত্তের ওপর পরবর্তী বৃত্তকে একটু বড় করে নিচ্ছেন, তারপরেরটি আর একটু বড়। এ ভাবে অবশ্য এমনটি ছাড়াও নানা আকৃতির ঘটি গড়া যায়। একেবারে ওপরে কিনারা পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেলে একে ভেতরে বাইরে আরো কাদা লেপে চাপ দিয়ে, হাত বুলিয়ে মসৃণ করে নেবার পালা। ওপরে কিনারাটিতে আঙ্গুলের চিমটা কেটে একটু বাঁকা ও সামান্য ডিজাইনও করে নেয়া হলো কলসীর গলার মত। নাতনিও কিছু কাদা নিজের জন্য নিয়ে নিয়েছে। দাদী যা করে সেও হুবহু তা করার চেষ্টা করে— এই পটারি গড়াই তার জন্য শিশুর খেলাঘর। আবার ওই কাদা দিয়ে সে তার মনের আনন্দে নানা পুতুল গড়ে, দাদীকে দেখায়। এখানে দাদী এই ছোট শিশুকেও মাঝে মাঝে দেখিয়ে দেন পুতুলের হাত পা কেমন হলে তার প্রতিসাম্য থাকে, দেখতে ভাল লাগে। এখন থেকেই নাতনিকে তিনি মৃৎ-শিল্পী বানাবার স্বপ্ন দেখেন। কুমোর এখন যেটি তৈরি করছে— সেটি একটি সরল ঘটি তলাটি গোল হয়ে বেঁকে কিছুটা সরু হয়ে গেছে আর ওপরের দিকে সোজা ক্রমে প্রসারিত। এগুলো চুলার ওপর ফিট করে বসিয়ে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। চাহিদা অনেক বলে প্রচুর বানাতে হয়। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিস সংরক্ষণের জন্য চেপটা তলী জারের মত অথবা প্রশস্ত গোলতলী ঘড়ার মতো পটারিও প্রচুর তৈরি হচ্ছে রান্না করা খাবার রাখা, পানি রাখা ইত্যাদি কাজের জন্য।

কাদার কাঁচা পটারি একটু শুকিয়ে এলে তখনই সেই দড়ির প্যাটার্ন তোলার কাজ। এর আগের সব কাজ এখন কুমোরের মেয়ে, ছেলে বৌ সবাই করে থাকে। কিন্তু এই প্যাটার্নের কাজটি কুমোর সব সময় নিজে করার চেষ্টা করেন— কারণ

পটারির আকার আকৃতি যেমনই হোক গায়ের প্যাটার্নটি সূক্ষ্ম ও সুন্দর না হলে কারো মন ভরে না। এ জন্য উদ্ভিদ আঁশের দড়ি পাকিয়ে রাখা হয়েছে যাকে পটারির গায়ে চেপে দিয়ে দিয়ে পর পর দড়ির ছাপ ফেলে ফেলে প্যাটার্ন তৈরি হয়। কিন্তু তার মধ্যেই বহু বৈচিত্র, বহু সৌন্দর্য সৃষ্টি করার সুযোগ আছে। পাত্রের সুন্দর আকৃতির ডিজাইন, আর ওপরে এসব নান্দনিক ছাপের ডিজাইন— এই সব মিলিয়েই কুমোরের হাতযশ, এ জন্যই গ্রামে ও গ্রামের বাইরে তার নাম ডাক।

অবশ্য সব এরকম মামুলি পটারিতে সীমাবদ্ধ থাকলে এত নামডাক হয়তো হতোনা। মাঝে মাঝে সময় নিয়ে কুমোর আসল কিছু কাজ করেন। প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ও গতানুগতিক রীতির ডিজাইনের জন্য যতটুকু দরকার তার অতিরিক্ত কিছু করে। পাত্রের মূল আকৃতির ডিজাইনে বৈচিত্র এনে, দড়ির ছাপ নেবার সময় সুকৌশলে একে বৃক্ষ কিংবা শঙ্খ কিংবা হরিণের শিং ইত্যাদি নানা জিনিসের আদলে নতুন প্যাটার্ন দেবার চেষ্টা করেন— আর ওই খানেই তিনি বাজিমাত করে দেন। এমন একটি পটারি পাওয়ার জন্য তখন অন্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। যে কোন পটারির জন্যই পোড়ানোটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। পোড়ানোর চুলাতে তাপ ঠিক মত সব জায়গায় সমান ভাবে না লাগলে অনেক অঘটন ঘটতে পারে। হাজার বছর ধরে এই মানুষগুলোর তো এখানেই বাহাদুরি; নইলে নরম কাদা দিয়ে, তাকে রোদে শুকিয়ে কত জিনিসই কত জায়গার মানুষ তো তৈরি করেছে। কিন্তু পোড়ামাটির পটারি— সে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা; ভঙ্গুর হলেও এটি যত্নে থাকলে পাথরের মত অক্ষয় হতে পারে। কুমোরদের পটারিগুলো পোড়া হয় বাড়ির সামনে একটি গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে। এই খোলা আগুনের মধ্যে আগে থেকে সাজানো পটারি ধীরে ধীরে পোড়ে। সঠিক তাপের অভাবে কিছু পটারি ফেটে যায়, কিছুর রঙ ঠিক আসেনা। কিন্তু কুমোরের তত্ত্বাবধানে হলে এমনটি বেশি ঘটার উপায় নেই।

পটারি এখন প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক পরিবারের ঘরে ঘরে। বেশির ভাগই খাদ্য সংক্রান্ত কাজে— হয় তা রান্নার পাত্র হিসেবে, নয় খাবার সংরক্ষণের জন্য, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে খাবার খাওয়ার পাত্র হিসেবে। ওদিকে গ্রামের মানুষের দিনমান কাটে এই খাদ্য যোগাড় করতে। এই সমুদ্র উপকূলে যোগাড় করার মত খাদ্যের কোন কমতি নেই আর তার অধিকাংশ আসে সাগর থেকে। এজন্যই কুমোরের স্বামী পটারির কাজে সাহায্য না করে অন্যান্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে সমুদ্রের বেলাভূমিতে কাটান বেশির ভাগ সময়। কুমোর আর কুমোরের স্বামী এই দু'জনের ব্যক্তিত্বে বিরাট ফারাক। তিনি বাস্তববাদী খেটে খাওয়া মানুষ। সারা জীবন সাগরের সঙ্গে লড়াই করেছেন। সাগর এখন যত উদার বরাবর তা ছিলনা। এখন পরিবার সমৃদ্ধির সুখ দেখেছে— তবুও তিনি আগের মতই খাটেন। তাঁর স্ত্রী যে শিল্পী ও ব্যবসায়ী হিসেবে অনেক নামী মানুষ এতে তিনি মনে মনে গর্ব অনুভব করেন, কিন্তু তা খুব বেশি প্রকাশ করেননা। পটারির ডিজাইন নিয়েও তাঁর তেমন কোন উচ্ছাস নেই।

ওদের সব চেয়ে প্রিয় খাদ্য হলো নানা রকম ঝিনুক— সব চেয়ে নিত্য খাবারও বলা যায়। প্রত্যেক বার ভাটার সময় সাগরের পানি সরে গেলে যে বিস্তীর্ণ বেলাভূমি উম্মুক্ত হয়ে পড়ে সেখানেই মেলে অসংখ্য ঝিনুক, কুড়িয়ে নিলেই হলো। এগুলো হরেক রকমের— ককল, মাসেল, ক্লাম, ওয়েস্টার— নানা আকার-আকৃতি, নানা স্বাদ, কিন্তু সবই উপাদেয়, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভাটার সময় বেলাভূমিতে তাই অনেক মানুষের মেলা দেখা যায়। উদ্ভিজ আঁশের তৈরি বড় বড় ঝুড়িতে ওরা এসব জমা করতে থাকে। তাছাড়া ওখানে এ কাজ করতেই ওরা কিছু কিছু শামুক ঝিনুক টাট্‌কা কাঁচা খেয়ে নেয়। এমন খাওয়ার স্বাদই আলাদা। একটিই সমস্যা এর দুইটি শক্ত খোল খুলে ভেতরের খাওয়ার উপযুক্ত নরম অংশটি বের করতে হয়। এখন বোঝা যাচ্ছে যে গ্রামে ওই অনেকগুলো গর্ত-বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে কিছু দূরে দূরে থাকা স্তুপগুলো আসলে কী। এর অধিকাংশই ওখানে জমা করা ঝিনুকের খোল, সেই সঙ্গে মিশেছে অন্য নানা শক্ত বর্জ্য যেমন হাড়, আর অজান্তে আরো নানা জিনিস— সবই মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত। ভাটার সময় সমুদ্রের বেলা ভূমি থেকে শুধু ঝিনুকই নয় শামুক, চিংড়ি, কাঁকড়ার মত অন্যান্য সমুদ্র-খাদ্যও প্রচুর পাওয়া যায়— এগুলোও সব শুধু কুড়িয়ে আনলে চলে। সাগর থেকে ধরা যায় বিচিত্র রকম মাছ— বিশেষ করে ছোট একটি নদী গ্রামের কাছে সমুদ্রে এসে পড়ে মুখে যে অগভীর খাঁড়ির সৃষ্টি করেছে সেখানে পারের কাছেই জাল দিয়ে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক অনায়াসে ধরা যায়— সার্ডিন, মেকেরোল ইত্যাদি। ওরা গাছের গুড়ি খোদাই করে খোলের মত সরু নৌকা তৈরি করে। এমনি নৌকা নিয়ে খাড়ির একটু মাঝখানে গেলেই জাল ফেলে আরো বড় মাছ রেড স্ন্যাপার, ব্ল্যাক স্ন্যাপার, সী ব্যাস, সোল, অথবা প্লাইস, হেলিবাটের মত চেপ্টা মাছ পাওয়া যায়।

জাল তৈরি করার উদ্ভিজ আঁশ এখানকার বনে প্রচুর রয়েছে। বিশেষ করে অনেকটা পাট সদৃশ হেম্প আঁশের কথা বলা যায়— পানিতে পচিয়ে এর আঁশ আলাদা করতে হয়। এই আঁশ থেকেই তৈরি হয় জাল, দড়ি এবং গায়ের পোষাক। এই আঁশের সূতাকে টানা ও আড় সূতা হিসেবে তাঁতের মত ব্যবস্থায় ব্যবহার করে গরমের দিনে পরার কাপড় বোনা হয় ও পোষাক তৈরি হয়। আর মালবেরি গাছের ছালকে পাথরের ওপর পিটিয়ে আঁশ আলাদা করে তা দিয়েও একই কাজ করা হয়।

কাছের খাঁড়িতে মাছ ধরা ছাড়াও কুমোরের স্বামীর মত কিছু মানুষ রয়েছে যাদের কাছে দূর সমুদ্রের হাতছানিটা আরো বড়। মাঝে মাঝে তিনি পড়শী কয়েকজনকে নিয়ে একটি ছোটখাট মাছ শিকারি দল তৈরি করে নেন। তারা কয়েকটা নৌকা নিয়ে একটু গভীর সাগরে যায়। এজন্য গাছের গুড়ির নৌকার ওপর নির্ভর না করে কাঠের তক্তা জুড়ে জুড়ে বানানো নৌকা নিয়েই সাধারণত যায়। জাল, হারপুন, বর্শা সব কিছু ব্যবহার করে ধরে আনে টুনা এবং স্যামনের

মতো রীতিমত বড় মাছ, যেগুলো তাদের জন্য রীতিমত ভোজের খাবার। তার চেয়েও আরো লোভনীয় শিকার হলো সীল, ডলফিন আর তিমির মত বড় ও বিশাল সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী। অধিকাংশ সময় বেশ কয়েকটি নৌকায় এগুলোকে ঘিরে ফেলে তাড়িয়ে সমুদ্রের বেলাভূমিতে এনে তোলে। যত বড় ও শক্তিশালীই হোক কেন পানি ছেড়ে এলে বা খুব অল্প পানিতে থাকলে এরা কাবু হয়ে পড়ে। বহু মানুষের এক সঙ্গে ভোজের সুযোগ করে দেয় সমুদ্রের এ সব বড় প্রাণী। এ গেলো সমুদ্রের মহা হৈচৈ তোলা শিকার; আবার এর বিপরীত চিত্রও আছে। এ গ্রামে একটু বয়স্কদের মধ্যে বেশ ক'জন আছে যারা হৈচৈ পছন্দ করেনা। কুমোরের ছেলে-বৌয়ের বাবা অর্থাৎ তাঁর বেয়াই এমনি একজন মানুষ। খাঁড়ি থেকে যে ছোট নদী বনের দিকে চলে গেছে তার কিছুটা উজানে গিয়ে শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে অনেক সময় তিনি একাকী বা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বড়শি ফেলেন, ভাল সুস্বাদু মিঠা পানির মাছ পান— বিশেষ করে ট্রাউট মাছ। যুৎসই আকৃতির হাড়কে বড়শির রূপ দিতেও তিনি ওস্তাদ। কুমোরদের বাড়িতে মাঝে মাঝে নিকটাত্মীয়দের আড্ডা হয়— বিশেষ করে তাঁর স্বামী যখন একটি সমুদ্রযাত্রা শেষ করে ফিরেন। তখন নানা মনোভঙ্গির মানুষের মধ্যে গল্পটি বেশ মজার হয়। কুমোর শিল্পী মানুষ। তাঁর স্বামী অভিযানের পেছনে ছোটা হৈচৈ করা মানুষ। তাঁদের বেয়াই-বেয়াইন দু'জন শান্ত সমাহিত জীবন পছন্দ করেন। কুমোরের ছেলে-বৌ কিন্তু বনে বাদাড়ে ঘুরে শাক পাতা বাদাম ইত্যাদি সংগ্রহ করতে ভালবাসে।

বড় বড় গাছের নিচে যে ফার্ন, ঝোপ ইত্যাদি আছে সেখানেই মেলে প্রচুর শাক-পাতা, ইয়ামের মত পুষ্ট শিকড়। তবে মজাদার জিনিস হলো নানা বাদাম ওই চেষ্টনাট, বীচ, ওক ইত্যাদি বড় গাছ থেকে আসা। ওকের বীজগুলোও (একর্ন) চমৎকার বাদামের মত। এসব বাদাম হামানদিস্তায় গুড়ো করে ডলফিনের চর্বিতে তা মেখে চুলার ওপর পোড়ামাটির চেপ্টা খোলাতে এক রকম মজাদার বিস্কুটও তৈরি করে কুমোরের ছেলে-বৌ। এই বিস্কুট না হলে পারিবারিক আড্ডাটি মোটেই জমেনা। এই তরুণীর এমনিতেও রান্নার হাত চমৎকার। এর কিছু কৃতিত্ব অবশ্য দিতে হবে পটারিকে আর পটারির বড় শিল্পী ও কারিগর কুমোরকে।

আসলে খাবারের পুরো সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছে এই পটারির হাড়ি-পাতিল, বয়াম, জার ইত্যাদি এসে। আগুনে ঝলসিয়ে মাছ মাংস সবাই খেতে পারে। কিন্তু কুমোররা ও এখানে তাদের পূর্বসূরীরাই পেরেছে হাড়িতে মাছ মাংস তরকারির ঝোল রেঁধে খেতে, স্যুপ করে খেতে। তা ছাড়া হাড়ির মধ্যে তেলে পটরোষ্ট করাটার মজাই আলাদা। বিশেষ করে অয়েস্টার, মাসেল, ক্লাম ইত্যাদি উপাদেয় ঝিনুকের নরম অন্তর্ভাগ কষ্ট করে খোল খুলে কাঁচা খাওয়া যায় বটে, কিন্তু একে হাড়িতে সেদ্ধ করলে যে সুন্দর ভাবে খোলগুলো অনায়াসে খুলে যায়

রান্না হয়ে ভেতরের মজাদার অংশ যে আরো মজা হয় সেই স্বাদ এরাই আবিষ্কার করতে পেরেছে পটারির কল্যাণে। আর পটারি শুধু আজকের টাটকা ভাল খাবারের ব্যবস্থা করেনি, বরং আগামী জন্য খাবার ভাল মত জমিয়ে রাখার জন্যও চমৎকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে— যার পূর্ণ সুযোগ তারা নিয়েছে। পটারিতে তৈরি সংরক্ষণ পাত্রে বাতাস ঢোকেনা, পানি ঢোকেনা, ক্ষুদ্র পোকা মাকড় কিছুই ঢোকেনা এ খাবার নষ্ট করতে। বিশেষ করে ওদের মত যারা সারা বছর একই জায়গাতে বাস করছে— কিছুই যাযাবরের মত বহন করে বেড়াতে হচ্ছেনা তাদের জন্য এটি সুবর্ণ সুযোগ। সারা বছর বিভিন্ন মৌসুমে খাবারের যোগাড়ের জন্য ওরা কী করছে সেটি তাদের আড্ডার একটি প্রধান আলোচ্য।

গ্রীষ্মের শেষের দিকে একটি বড় কাজ হলো ব্যাপক আকারে ঝিনুক সংগ্রহ। এটি করার জন্য গভীর ভাটার সময় ককল, অয়েস্টার জাতীয় যে সব ঝিনুক অগভীর সাগর তলে কলোনী বানিয়ে থাকে ও অসংখ্য বংশ বিস্তার করে সেগুলো খুঁজে নিয়ে সেগুলোকে একেবারে মাটি চেঁছে তোলে। এই ঝিনুকগুলো তোলা হয় তাদেরকে খুলে ভেতরের মাংসকে রোদে শুকিয়ে শীতকালের জন্য সংরক্ষণ করতে। পটারির বড় বড় ঘড়া তৈরি করা হয় যাতে এসব রোদে শুকানো ঝিনুকের মাংস তাতে রেখে ঢাকনি দিয়ে বন্ধ করে বহুদিন রেখে দেয়া যায়। শীতে তাজা ঝিনুক সংগ্রহ কঠিন কাজ— সংরক্ষিত ঝিনুকেই চলতে হবে। শরত কালেও শীতের জন্য অতিরিক্ত সংগ্রহের কাজ চলে— তবে এখন এটি চলে প্রধানত বনের বাদামের জন্য। গাছে এবং গাছের তলায় এখনো প্রচুর বাদাম— এখনই জমিয়ে না ফেললে বনে পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাবে। শীত এসে যাওয়ার পর কাজের প্রকৃতি বদলে যায়। ইচ্ছে হলেই অনায়াসে একটু ঘুরে এসে ঝিনুক, মাছ, অথবা শাক-পাতা শিকড় বা বাদাম নিয়ে আসলাম তার সুযোগ এই মৌসুমে কম। এখন প্রধান কাজ হলো শিকার, শিকারের জন্য সময়টি ভাল। যদিও বনে হরিণ, বুনো শূয়োর ইত্যাদি সব সময় কিছু পাওয়া যায় শিকার করাও হয়, তবুও এই শীতের সময় পশুগুলো দলেবলে ঝাঁকে থাকে— বড় আকারের শিকার করার এটিই সময়। একই ভাবে সমুদ্রে একটু দূরে গিয়ে তিমি শিকারেরও এটি ভাল সময়। এসবের মাংস খেয়েই শীতকাল প্রধানত কাটে, সেই সঙ্গে সংরক্ষিত ঝিনুক-শাঁস, বাদাম, শেকড় খাদ্য স্বাদ বদলের জন্য। তাছাড়া তিমির তেলটুকুও বড় বড় পটারি বয়ামে জমিয়ে রাখা হয়— সারা বছর এটি রান্নার কাজে লাগবে।

কুমোর পরিবারের গর্ত-বাড়ির মধ্যে পটারির নানা জার, বয়াম ইত্যাদি লক্ষ্য করলে আর এগুলো রাখার জন্য বানানো একই রকমের ছোট গর্তগুলো দেখলে বোঝা যায় খাদ্য সংরক্ষণ ও পটারির ভূমিকা কত বড়। কোন সময়েই তাদের কিন্তু খাদ্যাভাব হয়না— মৌসুমী পরিবর্তন যতই হোক। গ্রামের কারোই হয়না। কিন্তু বয়োজৈষ্ঠরা এখানে প্রায়ই বলেন তাঁদেরও আগের গুরুজনদের থেকে শুনে এসেছেন এমন প্রাচুর্য আগে বরাবর ছিলনা। আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে এক

সময় বনের পশু এবং সমুদ্রের মাছ ও ঝিনুক উভয়েরই খুব টানাটানি ছিল, অথচ এদিকটায় লোকসংখ্যা কম ছিলনা। তখন একই জায়গার খাদ্য সম্পদ নিয়ে খুব কাড়াকাড়ি ছিল; ঝগড়া ফ্যাসাদ লেগে থাকতো। গ্রামে গ্রামে, গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে যুদ্ধ লাগাবারও তখন অজুহাতের অভাব হতোনা। নিয়মিত এসব যুদ্ধে মানুষের প্রাণ যেতো। আজকের এমন শান্তির গ্রাম এবং আশপাশের সবার সঙ্গে সৌহার্দ, জিনিসপত্রও অলঙ্কার বিনিময় ব্যবসা দেখে কেউ তখন কল্পনাও করতে পারেনা যে এমনো একদিন গেছে। আজ কুমোরের মত শিল্পীমন, তার স্বামীর মত হৈচৈ করা মন, বেয়াই দম্পতির মত শান্ত সমাহিত মন, আর তাদের মেয়ের মত গেরস্ত মনের মানুষ নিয়ে চমৎকার পরিবার শান্তির গ্রামের একটি ভাল পরিচয়।

* * *

জাপানে অন্তত ত্রিশ হাজার বছর আগের মানব বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। ১৪ হাজার বছরের আগের বরফ যুগের সময় সমুদ্রে পানির তল নেমে গেলে জাপান কোরিয়ার সঙ্গে এবং তার মাধ্যমে এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল, জাপানের বিভিন্ন দ্বীপগুলোও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। পরে পানির তল উঁচু হলে নিচু জায়গাগুলো ডুবে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে চলে আসে। জাপানেই প্রথম পটারির অর্থাৎ পোড়ামাটির হাড়ি পাতিলের প্রচলন হয়েছে তার প্রমাণ রয়েছে— এবং তার সব চেয়ে আগের নমুনাও পাওয়া গেছে সেই ১৪ হাজার বছর আগেই। তখন থেকে মাত্র আড়াই হাজার বছর আগের সময় পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় জাপানের পটারি শিল্প, এর নির্মাণ কৌশল, এর ওপরের চিত্রণ মোটামুটি একই ধারা অনুসরণ করে গেছে যাকে জামোন ধারা বলা হয়— ওই চিত্রণের ভঙ্গির কারণে। শুধু পটারি নয় ওখানকার মানুষের জীবন-জীবিকার সংস্কৃতিও তখন মূলত এক ধারায় চলেছে যেটি প্রধানত সমুদ্র নির্ভর শিকারি-সংগ্রাহকের ধারা, যদিও এই দীর্ঘ কালের একেবারে শেষের দিকে ধান চাষের কৃষি কিছু কিছু প্রবর্তিত হয়েছিল। জাপানে পটারি এসেছে সবার আগে অথচ কৃষি এসেছে অনেকের বহু পরে। অথচ অন্য অধিকাংশ জায়গায় পটারি, কৃষি, এবং নির্দিষ্ট জায়গায় স্থায়ী বসবাস এগুলোর উন্মেষ প্রায় একই সময়ে ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। জাপান এদিক থেকে ব্যতিক্রম। কৃষি না থাকলেও আমাদের আলোচ্য সাত হাজার আগেও মানুষ এখানে স্থায়ী ভাবে এক জায়গায় বাস করেছে। সমুদ্র সম্পদ ও বন সম্পদ এতই কাছে এতই প্রাচুর্যে ছিল যে শিকারি-সংগ্রাহক হয়েও তাদেরকে ঠাঁই বদল করতে হয়নি।

সাত হাজার বছর আগের মধ্য প্রস্তর যুগের জাপানের অনেকগুলো মানব বসতের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কার হয়েছে— আসলে জামোন সংস্কৃতির কালের পুরো সময়েরও এরকম অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা রয়েছে। বিশেষ করে টোকিও উপসাগরের কাছের এলাকায় এরকম অনেকগুলো খনন ও গবেষণা ঘটেছে— যার ভিত্তিতে আমরা কুমোরদের কাহিনীটি খাড়া করেছি। তথ্যগুলো এখানকার কোন একটি বিশেষ খনন-এলাকা থেকে পাওয়া যায়নি বরং ওই সময়কালীন নানান খনন এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে যোগ করেই পাওয়া গেছে— প্রায় একই জামোন সংস্কৃতি এদের সব জায়গায় দেখা গেছে। বেশ কিছু এরকম বসতের নিদর্শনের মধ্যে পাথরের হাতিয়ারগুলো তো বটেই পটারিরও নানা টুকরা বা

সমগ্র নমুনা পাওয়া গেছে। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত বিখ্যাত 'জামোন পট'টি এর চমৎকার নিদর্শন। এটি ছোট একটি বালতির আকৃতির পোড়া মাটির টবের মত— ছয় ইঞ্চির মত উঁচু, তলা সমতল। আর এর গায়ে রয়েছে উদ্ভিদ আঁশের দড়ির ছাপ দেয়া সেই বিখ্যাত জামোন চিত্রণ। ঠিক এমনি চিত্রণযুক্ত আরো নমুনা বিশেষ করে গোলতলি সুচালোতলি রান্নার হাড়ি বেশ কিছু প্রায় অক্ষত পাওয়া গেছে। সাত হাজার বছর আগের এগুলো বেশ সাদামাটা, জামোন সংস্কৃতির পরবর্তী কালের মত বাহারি ডিজাইন করা আকৃতির নয়।

গাছ, বাঁশ, বেতের তৈরি জিনিস, ঝুড়ি, রশি, জাল, ধনুক ইত্যাদির কিছু কিছু নমুনাও সংরক্ষিত পাওয়া গেছে; হাড়ের ও শিঙের তৈরি হারপুন ইত্যাদিও। তবে খাদ্য, পশু, মাছ, ঝিনুক, উদ্ভিদের প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য পাওয়া গেছে বসতের চিহ্নের কাছাকাছি থাকা ঝিনুকের খোলও অন্যান্য আবর্জনার প্রাচীন স্তুপ থেকে। এর নানা স্তরের বিশ্লেষণে অমূল্য সব খবর পাওয়া গেছে। যেমন গাছের গুড়ির রিঙের মত আবর্জনা স্তুপে পাওয়া ঝিনুকের খোলের ওপর যে বৃদ্ধির রিং দেখা যায় তার থেকে বোঝা গেছে কোন মৌসুমে ওটি সংগ্রহ করা হয়েছে। স্তুপের বিভিন্ন স্তরগুলো পর পর বছরের হওয়াতে এর থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাচুর্যের হ্রাস-বৃদ্ধি বোঝা গেছে। হাড় থেকে পশু শিকারের এবং তিমি ইত্যাদি শিকারের নানা তথ্য পাওয়া গেছে। বিভিন্ন হাতিয়ার, পটারি ইত্যাদির টুকরাও অনেক খবর দিয়েছে।

গর্ত-বাড়িগুলোর গঠন জানা গেছে এই গর্ত, তার মধ্যে, থাম ইত্যাদি গাড়ার গভীরতর গর্ত ও সেখানকার অন্যান্য নিদর্শন থেকে। একই ভাবে খাদ্য সংরক্ষণের গর্ত, হেঁশেল, হামানদিস্তা, পাটা ইত্যাদি থেকে অনেক কিছু অনুমান করা গেছে। হেম্পের মত উদ্ভিজ আঁশ থেকে বোনা কাপড়ের নমুনা যেমন দৈবক্রমে সংরক্ষিত হয়ে পাওয়া গেছে, তেমনি নানা রকম অলঙ্কারও— পাথরের, হাড়ের, ঝিনুকের খোলের, শিঙের তৈরি। পটারির, অলঙ্কারের, হাতিয়ারের নমুনা লক্ষ্য করে মনে হয়েছে ওই সময়েও কোরিয়ার বসতগুলোর সঙ্গে এখানকার যোগাযোগ ছিল, এক রকম আদান-প্রদানও ছিল। এটি বেশ অবাক করার মত।

পটারির হাড়ির মধ্যে রান্না করাতে আর একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সুবিধা পাওয়া গেছে। রান্না করার পর হাঁড়ি খুব সম্ভব ভাল করে ধোয়া হতোনা। ফলে হাঁড়ির ভেতরের গায়ে পাতলা হয়ে লেগে থাকা বিভিন্ন খাবারগুলো স্তরের স্তরে জমেছে এবং আগুনের আঁচ লেগে সেগুলো কিছুটা অঙ্গার (কার্বনাইজড) হয়ে গেছে এবং তার ফলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্য এক রকম সংরক্ষিত হয়ে গেছে। এগুলো থেকে ঘটনার বয়স নির্ণয় করা যেমন অনেক সহজ হয়ে গেছে (কার্বন ডেইটিঙের মাধ্যমে)। তেমনি রান্না করার সময় খাবারের বিভিন্ন উপাদান পটারির ভেতর শোষিত হয়ে ওর সঙ্গে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। এই সব উপাদানের প্রকৃতি, অনুপাত ইত্যাদি থেকে মূল খাবারটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সেই হাঁড়িতে সেই সাত হাজার বছর আগে কী কী রান্না হয়েছিলো— কী রকম শাক, কী রকম বাদাম, কী রকম মাছ ইত্যাদির খবর এখন প্রত্নতাত্ত্বিকদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ল্যাবোরেটরি গবেষণায় উদ্ঘাটিত হতে পারছে।

জামোন পটারি
(বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত)

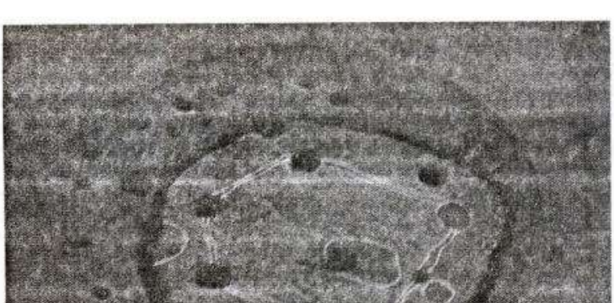

জামোন সংস্কৃতিতে গর্ত-বাড়ির
উদ্ঘাটিত ভিত্তি-চিহ্ন

পাপুয়া-নিউগিনির কুক জলাভূমির খামারি ঃ ৬ হাজার ৫ শত বছর আগে

খামারি নামের মানুষটি এঁদো জলার পানি নিষ্কাশন করে তাকে পরিণত করেছে সেচ দেয়া চাষের জমিতে। সেখানে বহু নালা কেটে তার ছিপছিপে পানিতে লাগিয়েছে কচু; আর মাঝখানের মাটি তোলা উঁচু ঢিবিগুলোতে কলা, আখ আর ইয়ামের চাষ করছে। এগুলো অনন্য ঘটনা।

পাপুয়া-নিউগিনি দেশটাই গঠিত কিছু খুব নিচু জায়গা আর কিছু খুব উঁচু জায়গা নিয়ে। দ্বীপটির দক্ষিণে যে উঁচু জায়গাটি অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশের কাছাকাছি রয়েছে সেখানকারই একটি স্থান কুক জলাভূমি। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় দেড় হাজার মিটার ওপরের জায়গা হলেও সাড়ে ছয় হাজার বছর আগের এই দিনেও ওটি একটি এঁদো জলা। পর্বত থেকে আসা একটি নদীর পানি জালের মত অনেকগুলো শাখা প্রশাখা দিয়ে দক্ষিণে নিচে প্রবাহিত হতে গিয়ে এখানে এই জলা সৃষ্টি করেছে। পরে শাখা প্রশাখাগুলো একত্রিত হয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। অবশ্য জলাটির কিনারায় সব দিকে একে ঘিরে রেখেছে বিচিত্র গাছ আর উদ্ভিদের ঘন আকর একটি রেইন ফরেষ্ট বা বাদল বন। সেদিনের পাপুয়া নিউগিনির কোন কোন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে কিছু মানব বসতি রয়েছে সেখানকার শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ প্রধানত এরকম বনের ওপরেই জীবিকার জন্য নির্ভর করে। কিন্তু সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও যুক্ত হয়েছে ভিন্ন রকম জীবিকা কৃষিকাজ।

কুক জলার কাছে যে বিশ-পঁচিশ ঘর মানুষ বাস করে ওরা এই কৃষির জীবিকার দিকে অনেক খানিই ঝুঁকে পড়েছে বলতে হবে। কারণ প্রায় এক কিলোমিটার বিস্তৃত এই জলার মধ্য থেকে কিছু কিছু জায়গায় ভূমি উঁচু করে ওখানে তারা বাগান করেছে। চারিদিকের জলা থেকে পানি সেচের ব্যবস্থার মাধ্যমে এ বাগান থেকে তারা নিয়মিত তাদের প্রধান খাদ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। অবশ্য একেবারে নতুন ব্যবস্থা এটি নয়। তাদের আগে এখানে যারা

থেকেছে তারাও এরকম ব্যবস্থা করে গেছে— বংশ পরম্পরায় তারা শুনে এসেছে হাজার হাজার বছর ধরেই নাকি এটি প্রচলিত ছিল।

আসলে এখানকার দু'একটি পরিবারের ক্ষেত্রে একে বাগান না বলে রীতিমত খামার বলা উচিত; কারণ ওরা জীবিকার অন্য দিকগুলোকে অর্থাৎ বনে শিকার করা, বন থেকে উদ্ভিজ খাবার সংগ্রহ করা— এসব প্রায় বাদ দিয়ে এই জলার মধ্যে খাদ্য উৎপাদনে পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করেছে। ওদের মধ্যে একজন আছে এই কারণে যার নামই হয়ে পড়েছে খামারি। এই নাম সে এমনি এমনি পায়নি। এখানকার প্রায় সব পরিবারই কম বেশি তার খামারের সঙ্গে জড়িত। তবে যে খাদ্য এখান থেকে তৈরি হয় তাতে ওদের সবার খাদ্যের পুরো চাহিদা মেটেনা বলে অন্যদেরকে একটা বড় সময় শিকারি-সংগ্রাহকের কাজ করে যেতে হচ্ছে। কিন্তু খামারির ব্যাপারটা আলাদা। সবাই জানে ভূমি উদ্ধার করে বাগান রচনা, ওই খামার গড়ে তোলা কী ভাবে তার পুরো দেহমন দখল করে রেখেছে। তার আর এক নেশা খামারে বেশ কয়েকটি পোষা শূয়োর পালা— এটি কিন্তু বেশ নতুন ধরনের ব্যাপার এখানে। সব কিছু মিলে ওদের পরিবারের সবাই, বিশেষ করে খামারি নিজে, খাদ্য উৎপাদনের কাজে মনে হয় রাত দিন একেবারে ডুবে আছে। তাই তার বাবা-মা প্রদত্ত নামটি এখন সবাই ভুলতে বসেছে; সবার কাছে সে খামারি এই নামে পরিচিত।

খামারির বয়স বেশি নয়— পঁচিশ পেরুলো মাত্র। কিন্তু এর মধ্যেই কলা, কচু, ইয়াম, আখ এই ক'টি বিশেষ রকম ফসল চাষের নাড়ী নক্ষত্র আয়ত্ব করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, বাড়িতে কাউকে দাওয়াত দিলে সেখানে শুধু তার খামারের থেকে আসা ফসলগুলো দিয়ে এমন চমৎকার খাবার পরিবেশন করে যে মেহমানরা ধন্য ধন্য করে। এর জন্য বেশি কৃতিত্ব অবশ্য খামারির বৌয়ের। ওদের আট বছর বয়সী ছেলে সহ ওরা দু'জনকে প্রায় সারাদিন দেখা যায় জলার বাগানের মধ্যে কাজে ব্যস্ত। সাথে থাকে প্রায় তরুণী বয়সের খামারির এক বোন। ননদ ভাবী দুজনেই দারুণ খাটতে পারে জমিতে। অবশ্য খামারির এক চাচা যার যথেষ্ট বয়স হয়েছে তাকেই বলা যায় এই খামারের আসল গুরু। এই নতুন ধরনের জীবিকার ওপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করতে হলে এতে অভিজ্ঞতার যে কী প্রয়োজন তা তাঁকে দেখলে বোঝা যায়। কোন ফসলের কখন ঠিক কতখানি পানি পাওয়া দরকার, কখন গাছের গোড়ায় আরো মাটি তুলে দিতে হবে, কখন গাছ পরিস্কার করে দিতে হবে— এসব অভিজ্ঞতা তাঁর এক দিনে হয়নি। সব চেয়ে বড় সাফল্য হলো ঘন বাদল বনের চিরন্তন পরিবেশের মধ্যে এখানকার ক'জন মানুষ জলার প্রকৃতিতে নিজের হাতে পরিবর্তন এনে তাকে সমৃদ্ধ তৃণভূমির মত করে তুলেছে। মোজাইকের মত এখানে কিছুটা এই ফসল, ওখানে কিছুটা ওই ফসল, এ রকম পরিকল্পিত বাগান ওরা রচনা করেছে। এতে খামারি, তার চাচা ও তাদের পুরো পরিবারের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। সবকিছু যদিও বংশানুক্রমে আগের ধারাবাহিকতায় হচ্ছে, তবুও নতুন কিছুও যোগ হচ্ছে।

এই জায়গাগুলো সবই এক সময় বনের মধ্যে ছিল, আস্তে আস্তে বনের কিনারা থেকে কিছু কিছু জায়গা উন্মুক্ত করে এই জলা বাগান তৈরি করা হয়েছে। খামারি নিজেও এটি করেছে— পাথরের তৈরি কুঠার দিয়ে বনের গাছ কেটেছে, তারপর বনে আগুন দিয়েছে বাগানের জন্য জায়গা পরিস্কার করার জন্য। এখন ওই ভাবে বন থেকে সম্প্রতি উদ্ধার করা কিছু নতুন জায়গাকে তারা চাষের জন্য তৈরি করছে। ভোর থেকে কয়েকটি পরিবারের বয়স্করা কাদার মধ্যে মাটি কাটার ও মাটি তোলার কাজ করছে। সবার হাতে রয়েছে এ কাজের জন্য 'বেলচা'। কাঠের তৈরি এই বেলচা তারা গাছের শক্ত লাঠির আগাটাকে চেপটা ও ধারালো করে নিয়ে গড়ে নিয়েছে। এটি বার বার কাদা মাটির মধ্যে চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে ওরা নালা খুঁড়ছে, আবার এটি দিয়েই মাটি তুলে তুলে তার পাশে উঁচু জমির ঢিবি তৈরি করছে। গরম, আর্দ্র পরিবেশে কাদাপানির মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করছে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকে। শুধু খড়-পাতার তৈরি একটি খাটো স্কার্ট দ্বাড়া তাদের শরীর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। কঠিন কাজটি হচ্ছে মূল নিষ্কাশন-নালাটি তৈরি করা, যা এখানকার অতিরিক্ত পানি বের করে বাগানের বাইরের ছোট নদীতে নিয়ে ফেলবে। নালাটি অনেক দূর সোজা চলে যাবে এক মিটারেরও বেশি গভীর হয়ে কাজেই মাটি কাটার ও তোলার কষ্টটি প্রচণ্ড। বাগানের ভেতরটা অবশ্য অন্য রকম— অগভীর সেচ নালা কেটে কেটে তার মাটি জমিয়ে মাঝখানে বৃত্তাকার উঁচু জায়গা ছোট ছোট দ্বীপের মত তৈরি করা হয়েছে। এখন দেখলে মনে হয় চারিদিকে ওই অগভীর নালার জালের মাঝে মাঝে এগুলো যেন উঁচু দ্বীপের বাগান।

দিনের পর দিন রোদ-বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে এত কঠিন কাজ তারা করছে কেন? তাদের সমসাময়িকদের অনেকেই তো বনের মধ্যে শিকার-সংগ্রহে ব্যস্ত থেকে বেশ ভালই আছে। না আসলে এখন ব্যাপারটি ঠিক তেমন নেই। আবহাওয়ার পরিবর্তনে এ দিকটার বনের সমৃদ্ধি অনেক কমে গেছে, শিকার-সংগ্রহের নিশ্চয়তা আগের মত তেমন আর নেই। কোন কোন শিকারের প্রাণী তো বলতে গেলে উধাও হয়ে গেছে। অন্যদিকে যে ফসলগুলোর চাষের ব্যবস্থা তারা এত কষ্ট করে করছে খাবারের জন্য এগুলোর ওপর ওরা ক্রমেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এভাবে বাগান করে এদের প্রাপ্তি অনায়াসে নিশ্চিত করতে পারলে প্রধান খাদ্যের যোগানের দুশ্চিন্তাটি দূর হয়ে যায়। এগুলো থেকে বছর জুড়ে প্রচুর ফসল পাওয়া যায়, সহজে সেগুলো খাবার জন্য তৈরিও করা যায়, খেতে ও বেশ— প্রত্যেকটির নিজস্ব আলাদা বিশেষ স্বাদ আছে। এগুলোর প্রত্যেকটির চাষে অবশ্য প্রচুর পানি লাগে, যার জন্য শুধু বৃষ্টির ওপর নির্ভর করার উপায় নেই। তাইতো এত কষ্ট করে সেচ নালা, নিষ্কাশন নালার এতো আয়োজন। বনের মধ্যে শিকারের পেছনে ঘোরার চেয়ে খামারিদের কিন্তু অনেক বেশি ভাল লাগে এভাবে নিজের তৈরি জমিতে খাটতে। বৌকে সব সময় সে বলেঃ 'দেখ আমরা ভবিষ্যতের জন্য গড়ছি, শুধু মেরে খেয়ে ফেলছিনা; এতে আনন্দ অনেক বেশি'।

ফসল বেড়ে ওঠার পর বাগানগুলোকে দারুণ সুন্দর লাগছে। খামারি পরিবারে কাজ এখন একটু সহজ হয়ে গেলেও, তা কিন্তু ফুরিয়ে যায়নি। ওরা এখন ওই গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে হেঁটে আগাছা তুলে ফেলছে, মরা পাতা বা মরা ডাল-পাতা ছেঁটে দিচ্ছে, পোকা মাকড় দেখতে পেলে তা আঙ্গুল দিয়ে তুলে মেরে ফেলছে। পুরো জায়গাটায় যেখানেই বেশ খানিকটা জুড়ে ডিবির মত একটি উঁচু জায়গা সেখানে সারি সারি কলা গাছ। এগুলো বনে বাদাড়ের অযত্নে হওয়া কলা নয়, চাষের জন্য কাছেধারের মানুষের বাছাই করা, কালক্রমে চাষের ও খাবার জন্য সব চেয়ে উপযুক্ত নতুন প্রজাতি হয়ে ওঠা কলা। খামারি এখানে লাগাবার জন্য চারা যোগাড় করেছে অন্যত্র চাষীদের থেকেই। নিউগিনিতেই নানা চাষের বাগানেই সযত্নে এরা বংশ বৃদ্ধি করে এসেছে বেশ কিছু বছর ধরে। এখন কাঁচা অবস্থায় সবজি হিসেবে পুড়ে খাবার জন্য আর পাকা অবস্থায় ফল হিসেবে খাওয়ার জন্য দারুণ সুবিধাজনক এই কলা সারা বছর হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে।

অনেকগুলো ডিবিতে কলা লাগালেও বাকি বেশ ক'টিতে ওরা লাগিয়েছে ইয়াম এবং অল্প কিছুতে আখ। মিষ্টি আলুর মত দেখতে ইয়াম যেন মাটির কাছে তার গাছকে ঠেকনা দিয়ে রেখেছে। শক্ত মোটা এ গাছের কাণ্ড সোজা উঠে গেছে আর সুন্দর পেচানো পাতাগুলো ওখান থেকে বের হয়ে নিচের দিকে ঝুলছে। বনের মধ্যেও এরকম গাছ আছে— কিন্তু ওগুলোর সঙ্গে এই বাগানের গাছের তুলনাই হয় না। সেগুলোর কাণ্ড দেখতে তো রোগা বটেই গোড়ার ইয়ামগুলোও পুষ্ট কিছু নয়। এও অতীতে এখানকার অন্য মানুষ বার বার বাছাই করে ওরকম পুষ্ট গাছের পুষ্ট শিকড়রূপী কৃষিজ ইয়ামের প্রজাতিতে পরিণত করেছে। এই ইয়াম পুড়ে খেতে উপাদেয়, এবং সারা বছর পেট ভরার মত প্রচুর পরিমাণে এই বাগান থেকে পাওয়া যাচ্ছে। অল্প কিছু ডিবিতে লাগানো হয়েছে আখ— বনে বাদাড়ের পাওয়া দুর্বল আখের আকারের শক্ত ঘাস থেকে বাছাই করে চাষের উপযুক্ত আখ এই নিউগিনির মানুষরাই উন্নয়ন করেছে। খাবার হিসেবে আখের ব্যবহারটি একটু ভিন্ন, এ তাদের মিষ্টিমুখের জিনিস— মুখে ছিবড়া ছিলে চিবিয়ে রস খায়।

পাকা কলা আর আখ— এই দুটি জিনিস এখানকার অতিথি আপ্যায়নের ধরনটিই পাল্‌টে দিয়েছে। খামারির বোন এখন পূর্ণ তরুণী। বিবাহযোগ্যা হয়েছে। প্রধানত কনে হিসেবে তাকে দেখতেই নানা অজুহাতে দূর সম্পর্কের আত্মীয়, বন্ধু ওরা আসছে। বাড়িতে বা বাগানে বসে আলাপ করে ওরা। আলাপ যেখানেই হোক খামারির বৌ আতিথেয়তা করতে কোন ত্রুটি করেনা। চট্‌ করে নিয়ে আসে এক কাঁদি পাকা কলা, আর কেটে আনে খানিকটা আখ। টুকরা টুকরা করে আখটি সবাইকে দেয় চিবোতে। খেতে খেতে আলাপ চলে। সরাসরি বিয়ের সম্পর্কের কথা এখনো পাড়েনা বটে, কিন্তু কনে দেখে যায়, সে সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে যায়।

কুক জলার ওই বাগানে সব চেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক ফসলটি হলো কচু (টারো)। বলা যায় এখানকার সব মানুষ এর প্রেমে পড়েছে। প্রচুর পরিমাণে কচু বছর জুড়ে পাওয়ার ব্যবস্থা হবার পর মনে হয় আর কিছুতে তাদের রসনা আর রোচেনা। ওই নালা কাটা বাগানের অন্য সব ফসলের মধ্যে এই কচুটাকে দেখতে দারুণ লাগে। মনে হয় আর সব কিছুকে চারিদিকে দিয়ে ঘিরে রেখেছে এর লম্বা নরম রসালো কান্ডের ওপর বড় বড় হার্ট আকৃতির পাতা। কারণ এগুলো ডিবির ওপর নয় বরং লাগানো হয়েছে সারা বাগান জোড়া ওই অগভীর নালাগুলোর ভেতরেই ছিপছিপে পানির মধ্যে; পুরো নালার জালকে কচু পাতার জন্য দেখাই যাচ্ছেনা। কচুর সুবিধা হলো এর জন্য শুকনা মাটি লাগেনা— দিব্যি পানির মধ্যেই গজাচ্ছে এটি। আরো বড় কথা এর এই বড় পাতা, মোটা মোটা রসালো কাণ্ড সব খুবই মজার খাদ্য, আর গোড়ার আসল কচুটাতে তো প্রচুর খাদ্য। পাতা, ডগা, গোড়ার কচু সব অংশকে আলাদা ভাবে তৈরি করা হয়। হামানদিস্তায় পিষে বা গুড়ো করে তা কলাপাতায় ভাল করে মুড়ে আবদ্ধ করে আগুনের আচে অথবা উত্তপ্ত পাথরের মধ্যে রেখে রান্না করা হয় খাওয়ার উপযুক্ত করতে।

কচুর প্রত্যেক অংশের আলাদা অনুভূতি মুখের মধ্যে, আলাদা স্বাদ; কোনটিই সাদামাটা কিছু নয়; মিষ্টি, কটা, ঝাঁজালো, মুখে ধরা সে অপূর্ব মিশ্র স্বাদ মুখে খবর করে যায়। এখানকার মানুষ এমনি এমনি এর প্রেমে পড়েনি; সবকিছু খাওয়া যাচ্ছে, পরিমাণেও অনেক, বলতে গেলে কুক জলার মানুষের এখন প্রধান খাদ্যই কচু। বিশেষ করে খামারি পরিবারে আটপৌরে প্রতিদিনের খাবারের মধ্যে এটি প্রতিদিন তো থাকা চাইই, আবার বিশেষ বিশেষ দিনে অথবা অতিথি আপ্যায়নে কচুর কত রকম পদ পরিবেশন খামারির বৌ করলো তার ওপরেই গিন্নি হিসেবে তার সুনাম আরো বাড়ে।

জলা বাগানের সঙ্গেই লাগানোই এই গ্রামের মানুষের বিশ পঁচিশটা ঘর। খুবই সাধারণ ভাবে তৈরি ঘর। এই জায়গাটাকেও সম্প্রতি ওরা বন কেটে তৈরি করেছে— যথারীতি গাছগুলো কেটে এবং ঝোপঝাড়ে আগুন দিয়ে। প্রত্যেকটি ঘরে গাছের লম্বা সরু ডালকে বাঁকা করে করে একটি গম্বুজের মত কাঠামো করা। তারপর তাকে ছেয়ে দেয়া হয়েছে কলাপাতার আচ্ছাদনে আগাগোড়া। মোটেই খুব শক্ত-সমর্থ ঘর নয়; ঝড়-বৃষ্টিতে খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। তবে কলাপাতার আচ্ছাদনে ফাঁক দেখা দিলে দ্রুত বাগান থেকে আরো কলা পাতা এনে চট্ করে মেরামত করে ফেলা যায়। আসলে এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাদের জন্য এগুলো হলো তাদের খামারবাড়ি। চারিদিক খোলামেলা, যথেষ্ট জায়গা, সামনেই চাষের বাগান। বাগানের কাজটাই যখন প্রধান তখন এখানেই থাকে ওরা। তাছাড়া অবকাশের সময়, উৎসবের সময়, ভোজের সময় সবাই এখানেই থাকে, এখানেই সব কিছু আয়োজন হয়। বাকি সময় তারা চলে যায় বনের ভেতরে একটি পাথুরে আশ্রয়ের অঞ্চলে। সেটি অনেক বেশি সুরক্ষিত বাসস্থান, গুহার মত জায়গাকে আশ্রয় করে ডালপাতার বেড়া দিয়ে আরো বাসযোগ্য করে নেয়া হয়েছে। একে বলা যায় প্রধানত তাদের শিকার-সংগ্রহ কালীন আবাস। এ

সময় বনের পশু-পাখি প্রচুর শিকার করে ওরা, খাওয়া দাওয়াও প্রধানত মাংস-নির্ভরই হয়। খামার বাড়িতে থাকা কালেও যে শিকার একেবারে করে না তা নয়, তবে ওই পাথুরে আশ্রয় থেকেই গভীর বনের শিকার সুবিধাজনক। শিকার করা পশু-পাখি কাটাচেরা করে খাওয়ার ব্যবস্থাও সেখানেই ভাল।

খামারবাড়ি কিন্তু নেহাত বাগানের কারণেই খামারবাড়ি হয়নি। এখানকার ওই বাড়িগুলোর মাঝে মাঝে কিন্তু আরো একটি জিনিস আছে তা হলো গৃহপালিত শূয়োরের খোঁয়াড়। বুনো শূয়োরদের থেকে ওরা যথেষ্ট আলাদা। চেহারা অনেকটা এক রকম হলেও স্বভাব কিন্তু উভয়ের এক নয়। এরা মোটেও মারমুখী নয়, বেশ বাধ্য— একটি গেলে বাকিরাও সুড়সুড় করে গিয়ে দেয়া খাবার খেয়ে নেয়; শরীরে মাংস-চর্বি বেশি। আসলে বুনো শূয়োর থেকেই বেছে পোষা শূয়োরের নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজটি ঠিক এখানে হয়নি কিন্তু এখন এখানেও এদের পাওয়া যাচ্ছে। এখানে সব চেয়ে বেশি শূয়োরের মালিক হলো খামারির পরিবার। চারিদিকে ভাল করে বেড়া দেয়া খোঁয়াড়ে বাচ্চাকাচ্চা সহ অনেক ক'টা শূয়োর তার। ওদিকে বাগানের কাজ; আবার এসব শূয়োরকে নিয়মিত খেতে দেয়া, ঠিক মত আটকিয়ে রাখা; এ নিয়ে খামারির বৌ ও অন্যান্য আত্মীয়রা খুব ব্যস্ত থাকে। এ পরিবারের জন্য খামারবাড়িই সব, শিকারের জন্য অন্যত্র থাকতে যাওয়া তাদের কখনোই ঘটেনা। শূয়োর পালার ব্যাপারেও তারা কিছুটা অনন্য, কারণ গ্রামের অন্যদের শূয়োর বেশি নেই। বাগানটির কারণে শূয়োর পালার অবশ্য সুবিধা হয়। বাগান ও গেরস্থালি থেকে শূয়োরের খাবারও আসে। উৎসবাদি বা বিশেষ ভোজ ছাড়া এই পোষা শূয়োর খাওয়া হয়না কারণ এখনো এখানে ওরা অনেক দামী। শূয়োর পালার একটি বিড়ম্বনা হলো এদেরকে খুব সাবধানে আটকিয়ে রাখতে হয়, কোন রকমে ছাড়া পেয়ে বাগানের দিকে যেতে পারলে গাছপালা খেয়ে দ্রুত অনেক কিছু উজাড় করে দিতে পারে। তবে বাড়িতে কতগুলো পোষা শূয়োর আছে এটি এখানকার পরিবারগুলোর জন্য একটি গর্ব করার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাগান-জমি যতই থাক পোষা শূয়োর হলো একরকম নগদ সম্পদ থাকার মত। খামারির বোনের বিয়ের সম্পর্ক নিয়ে যখন খোঁজ খবর করা হচ্ছে তখন দেখা গেল এই গ্রাম ও দূরের গ্রাম থেকে অনেক সম্পর্ক আসছে। সবার ক্ষেত্রে একটি বড় আকর্ষণ হলো এই পরিবারে পোষা শূয়োরের সংখ্যা।

এখানে খুব বিচ্ছিন্ন সব বসত হলেও কুক জলার এই গ্রামের সঙ্গে কিন্তু বেশ দূরের দূরের অন্যান্য বসতের যোগাযোগ রয়েছে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্ন ভূমি অঞ্চলের মানুষের সঙ্গেও। ও ভাবেই শুরুতে নানা চাষের চারা, পোষা শূয়োর ইত্যাদি তারা অন্যদের কাছ থেকে কিনেছিলো, এখন এসব বিক্রয়ও করতে পারে। শামুক, ঝিনুক, দামী পাথর, ইত্যাদিরও চাহিদা এরা মেটায় অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে। আর বিয়েশাদির জন্যও যোগাযোগের ব্যাপারটা তো রয়েছেই। এই ছোট গ্রামে বিয়ের সম্পর্ক করার মত উপযুক্ত পাত্রপাত্রী মেলা ভার। তাই খোঁজ চলে দূরের আরো আরো গ্রামে।

কুক জলার সত্তর-আশি জন মানুষ এক দিক থেকে মোটামুটি একই জায়গাতে স্থায়ী ভাবে থাকছে, অন্যদিক থেকে ওরা ওদের খামার বাড়ি আর পাথুরে বাড়ির মধ্যে সব সময় ঠাঁই বদল করছে; আর ফসল বাগানের পরিচর্যা ও শিকার-সংগ্রহের মধ্যে কাজ বদল করছে। তাই ওদের জরুরী আসবাবগুলোও এই দুই জায়গাতেই আনা নেয়া হয়, এমন কি কখনো কখনো পোষা শূয়োরকেও খামার বাড়ি থেকে পাথুরের বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়, দু'একটি মেরেও খেতে হয়। তবে পাথুরে বাড়িতে থাকার সময় নানা রকম শিকার করা পশু দিয়েই তাদের রুচি বদলায়। এসবের কাটাচেরা করার জন্য পাথরের, কাঠের ও হাড়ের তৈরি নানা হাতিয়ার এসব বাড়িতে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। তাছাড়া হাতিয়ার রয়েছে নানা রকম বাদাম, শিকড়, শস্য ইত্যাদিকে খাওয়ার উপযুক্ত করে নেবার জন্য। রয়েছে বড় পাথরের কুঠার যার ধারালো অংশটি বেশ প্রশস্ত— সঙ্গে কাঠের হাতল। আবার ছোট ছোট নানা হাতিয়ারও রয়েছে। এরকম কতগুলো হাতিয়ার বেশ একটু ব্যতিক্রমী— পাথরের কাটার হাতিয়ারের একদিকে ধারালো কিনারা, মাঝখানে চাপা যেন মানুষের কোমরের মত, আর ঠিক ওই জায়গায় সংলগ্ন আছে কাঠের হাতল। হেঁশেলের পাশে প্রায় সময়েই মেয়েরা ব্যবহার করছে দুটি বড় তৈজস— হামানদিস্তা আর যাঁতা। হামানদিস্তাটি খামারবাড়িতে কচু, ইয়াম ইত্যাদি গুড়ো করা বা পেষার জন্য হরদম ব্যবহৃত হচ্ছে, আর পাথুরে বাড়িতে বাদাম, শেকড়, শস্য ইত্যাদির জন্য। পাথরের এই হামানদিস্তাটি বেশ বড়সড় জিনিস— বড় পাথরের মধ্যে বেশ গভীর করে গর্ত করা, গর্তটির ভেতরটা বেশ মসৃণ সমান সিলিন্ডার আকৃতির করে নেয়া হয়েছে। পাথরের যে মুগুর দিয়ে এর ভেতর পেষা হয় তাও বেশ সুন্দর, বড়সড়। যাঁতাটি অবশ্য কালেভদ্রে ব্যবহৃত হয়— বন্য শস্য বীজগুলো যখন এক এক সময় যথেষ্ট সংগ্রহ করা হয়।

যে বনের ভেতরে ওই পাথুরে বাড়িগুলো রয়েছে তা কিন্তু নিখাদ রেইন ফরেষ্ট— বাদল বন, তার সকল বৈশিষ্ট নিয়ে। বেয়াড়া রকম লম্বা হওয়া সব গাছ তাদের মাথার ডাল পাতাগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে তৈরি হয়েছে শামিয়ানা। প্রত্যেক গাছের গা বেয়ে নানান রকম লতা, গোড়ায় ঝোপ ও ফার্ন তারো নিচে মাটি কামড়ে থাকা গুল্ম। এখান থেকে ওরা খুঁজে নেয় দারুণ সব প্যান্ডানাস বাদাম এবং আরো হরেক রকম বাদাম। এখানকার খাওয়ার মত ফলফলারিও বিচিত্র রঙীন, রসালো। বিশেষ করে ব্রেড ফ্রুট নামের বড় ফলের বীজগুলো এদের প্রিয় খাদ্য। খামারির পরিবার তাদের বাগান ছেড়ে বনের পাথুরে বাড়িতে যায় কালেভদ্রে। কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েরা, ভাইয়ের বৌ এবং ভাইপো ভাইঝি'রা মুখিয়ে থাকে কখন সেখানে যাবে। ওদের লোভটি হলো বনে বাদাড়ে ঘুরে বাদাম ও ফল খোঁজা আর পাখি আর ছোট ছোট প্রাণী শিকার। এতে ঘোরার আর শিকারের উন্মাদনা যেমন আসে, তেমনি খাবারের স্বাদেও দেখা যায় দারুণ বৈচিত্র। ওই বাদল বনের গাছের ডালে, গায়ে, গোড়ায় এসব শিকার মেলে। পাখির বৈচিত্রই তো কত! খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়না কারণ এখানকার অধিকাংশ পাখিই অদ্ভুত রকম রঙচঙে— নানা জাতের তোতা,

কাকাতুয়া আর সব চেয়ে মনোহর লম্বালেজী বার্ড অব প্যারাডাইস। তা ছাড়া শিকারের জন্য ঘুঘু আর বুনো পায়রা রয়েছে দেদার— সবই গুলতি অথবা ছোট তীর ধনুক দিয়েই অল্প-বয়সীরাও কুপোকাৎ করতে পারে। কিশোর কিশোরীদের লক্ষ্য অবশ্য শুধু পাখি নয়, এ লক্ষ্য বাদুড়, ব্যাং, টিকটিকি, ইঁদুর এমনকি সাপও। বয়স্ক পুরুষ শিকারিদের নজর অবশ্য আরো বড় শিকারদের দিকে। ছোট ছোট দু'তিনজনের দলে ওরা পিছু নেয় বুনো শূয়োরের— এই বনের বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ এই শূয়োর, যদিও শিকারটি সহজ নয়।

অন্য এক ধরনের প্রাণী ওরা শিকার করছে সেগুলো খুবই আলাদা রকম ভাবে একান্তই ওই অঞ্চলের— অর্থাৎ পাপুয়া নিউগিনির এবং আর তার খুব কাছের অস্ট্রেলিয়ার। এগুলো খুবই ক্ষুদ্র বাচ্চা জন্ম দেয়া স্তন্যপায়ী, জন্মের পর বহুদিন যাদের বাচ্চা মায়ের পেটের থলেতে থাকে, সেখানে দুধ খেয়ে বড় হয়। কুক জলার কাছের বনে এদের যারা আছে তাদের অনেকগুলো ক্যাঙ্গারুর মত হলেও সাইজে ছোট— ব্রাউনি, গেছো ক্যাঙ্গারু। আর আছে ওয়ালাবি, পোসাম, আর কুসকুস। তীর ধনুক, হারপুন এসব ব্যবহার করে এদের শিকার চলে। তবে ওই সময়টায় বনের মধ্যে কেন জানি এই সব রকম প্রাণী খুব কষ্ট করে খুঁজে পেতে হচ্ছিল। গুরুজনদের কাছে ওরা আগেকার দিনে এদের সহজলভ্যতার কথা শোনে— কী ভাবে তাদের ওই পাথুরে বাড়ির আশপাশেই এরা ধরা দিতো। আর আজ বনের মধ্যে মাইলের পর মাইল হেঁটে অনেক খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ হঠাৎ এদের কোন কোনটির দেখা মেলে। আর এজন্যই এখন তারা তাদের খামার বাড়ির ওপর অধিক জোর দিচ্ছে— আরো কিছু বন পরিস্কার করে কলা, কচু, ইয়ামের বাগানগুলো আরো কিছু বাড়াবার কাজে, এবং পোষা শূয়োর পালনের কাজে।

তবে শিকার পাওয়া যতই কষ্টকর হোক কুক জলার মানুষদের সবার এক সঙ্গে বড় ভোজের ব্যবস্থা করার জন্য অজুহাতের অভাব হয়না। ওসব ভোজে পুরো গ্রামের মানুষের এক সঙ্গে দারুণ খাওয়া হয়; নাচ গান উৎসবেরও কমতি যায়না। শিগ্‌গির এমন একটি সুযোগ এসে গেলো খামারির ছোট বোনের বিয়ে উপলক্ষে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে ঠিক হয়েছে কুক জলা থেকে অনেক দূরের এক গ্রামে, ওখান থেকে বর ও তার আত্মীয়স্বজন এসেছে কনেকে নিয়ে যেতে। এই সেই বিয়ের ভোজ। এ সব আনুষ্ঠানিক ভোজগুলো সবই সাধারণত বাগানের কাছের খামারবাড়িতে হয়। খোলামেলা এ জায়গাটি অনেক মানুষ সমাবেশের উপযুক্ত জায়গা আর পরিবেশ এখানেই ভাল। তাই বিয়ের ভোজটাও হলো খামারির বাড়ির সামনে। এর আগেই বেশ কয়েকটি শিকারি দল বনে আঁতিপাতি করে শিকার করেছে খুব বিশিষ্ট কিছু শিকার— বিয়ের ভোজ বলে কথা। এর মধ্যে আছে এখানকার সুপরিচিত বিশাল পাখি কাশোয়ারি। উটপাখির মতই বড় ও শক্তিশালী এই পাখি উড়তে না পারলেও দারুণ জোরে দৌড়তে পারে, তবে দক্ষ শিকারির হাতে এও মারা পড়ে। অন্য বিশেষ শিকারটি মোটেই তেমন বড় না হলেও নিভৃতচারী এই অদ্ভুত প্রাণীটি খুব উচ্চাঙ্গের

মজাদার খাবার বলে পরিচিত— মেহমানের পাতে না দিতে পারলে মান-সম্মান থাকেনা। এটি হলো সারা গা সজারুর মতো কাঁটায় ভর্তি কাঁটাওয়ালা পিপীলিকাভূক— অদ্ভুত এ জন্য যে এটা সরীসৃপের মতো ডিম দেয় অথচ স্তন্যপায়ীদের মত বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায়; আর এর লম্বা ঠোঁট অনেকটা পাখির মত (প্লাটিপ্লাস এবং এটি নিউগিনি ও অষ্ট্রেলিয়ার নিজস্ব একই গোষ্ঠিভুক্ত এমন দুটি প্রাণী)। আর বড় জন্তুর মধ্যে ভোজের জন্য শিকার হয়ে এসেছে বিশাল বুনো দাঁতালো শূয়োর। কাটাকুটির আগে এই বিশেষ শিকারগুলোকে বেশ কিছুক্ষণ জনসমক্ষে রাখা হলো সবার প্রশংসা কুড়োবার জন্য। বিশেষ করে বরযাত্রীদেরকে মুগ্ধ করাটি খুব প্রয়োজন। তারা বুঝুক খামারিরা শুধু নিজের খামারের ওপর নির্ভর করেনা, বনের যে কোন বড় পশু শিকার করে ভোজ দেবার সামর্থ তাদের আছে। বড় ভোজের জন্য মাংসের বড় যোগানটি অবশ্য আসলো শিকার থেকে নয়, খামারির খোঁয়াড়ের যথেষ্ট সংখ্যক পোষা শূয়োরের থেকে। আগুন জ্বালানো হয়েছে মাংসের বড় বড় খন্ডকে শলায় গেঁথে এর ওপর ঝলসানো হবে বলে।

ভোজের খাবার তৈরি করার সরঞ্জামেও কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। সাধারণ যে হামানদিস্তায় রোজকার কচু পেষা হয় ভোজের কাজে সেটা দিয়ে চলবেনা। এর জন্য তোলা রয়েছে বাহারি হামানদিস্তা। এতে যেটির ভেতরে পেষা হয় হামানদিস্তায় সেই পাত্রটি খুবই মসৃণ পাথরের একেবারে সাইজ করা ব্লকের মাঝখানে গভীর গর্ত করে তৈরি; বেশ ব্যতিক্রমী। তবে সত্যিকারের বাহারি অংশ হলো পাথরের মুগুরটি যেটি দিয়ে পেষা হয়। জিনিসটি বেশ লম্বা— দেড় ফুটের মতো। নিচের অংশটি মসৃণ গোলগাল ক্রিকেট বলের সাইজের একটি বলের মত। পেষার সময় ঘষাঘষিটা এর ওপর দিয়ে যায় বলে সামান্য ক্ষয় পাওয়া। এর থেকে সোজা দণ্ডের মত অংশটা উঠে গেছে। পেষার সময় এখানেই যুৎসই ভাবে মুঠ করে ধরা যায়। কিন্তু তার ওপরেই রয়েছে এর আশ্চর্য অংশ যার সঙ্গে পেষার কাজের কোন সম্পর্ক নেই, অথচ দেখতে ভারি সুন্দর। এই অংশে মুগুরের পাথরটি সুন্দর ভাবে খোদাই করে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি পাখির দুটি ডানা যার থেকে লম্বা সরু চমৎকার গলা বাড়িয়ে রেখেছে যার ওপর মাথাটি সরু হয়ে এসেছে। কচু বা ইয়াম পেষার মত সাধারণ কাজ করার জন্য যে হাতিয়ার এর জন্য এমন সুন্দর শিল্পকর্ম না করলেও চলতো, কিন্তু তারা এটি সৃষ্টি করেছে অদ্ভুত সৌকর্যে। কাজের জিনিসটিকে দেখতে সুন্দর করার জন্য তারা যে এত পরিশ্রম করেনি সেটি বোঝা গেল যখন দীর্ঘ সময় প্রার্থনার মাধ্যমে তারা পেষার কাজটি শুরু করলো। এসব তাদের বিয়ের আচারের অন্তর্ভুক্ত। পাখি দেবতাকে সব ভাবে তুষ্ট রেখে তবেই চলতে পারে ভোজের বাকি কাজ এবং বর-বধূকে আশীর্বাদ।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভোজের শুরু হিসেবে কলাপাতায় সুন্দর ভাবে মোড়ানো গরম খাবার এসে গেল। একটু আগে ওই পাখি দেবতার মুগুর দিয়ে যে কচু পেষা হয়েছে কলাপাতায় ওই অবস্থায় তা উত্তপ্ত পাথরের মধ্যে রাখাতে এখন তার থেকে ভাপ উঠছে। এরপর আখের টুকরো চিবিয়ে মিষ্টিমুখ করে শুরু হবে ভোজের আসল পর্ব—

উপাদেয় সব মাংসের পর্ব। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে আবার আসছে ভাপ ওঠা সেই কচু আর ইয়াম এবং স্বাদ বদলাবার জন্য পাকা কলা। এমন ভোজনের যোগানের জন্যই যেন এত চাষবাস, বাগান করার, আর শূয়োর পালার সার্থকতা। এ যদি না করা হতো তা হলে শিকার করা মাংস হয়তো পাওয়া যেত, বন থেকে যোগাড় করা কিছু ফলমূলও আসতো, কিন্তু গ্রামশুদ্ধ মানুষের ভুরি ভোজনের জন্য এত দেদার রকম মজার খাবার পাওয়া যেতনা। যেন এদের গ্রাম-ভোজের সংস্কৃতির জন্যই এ সময় এখানে কৃষি সংস্কৃতির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো।

* * *

আমাদের মত মানুষ হোমো সেপিয়েন্সদের কেউ কেউ তাদের উৎস ভূমি আফ্রিকা থেকে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে নিউগিনিতে পৌছে গিয়েছিলো অন্তত ৫৫ হাজার বছর আগে। সমুদ্রে পানির তল তখন অনেক নিচে থাকাতে নিউগিনি ও উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার মাঝখানে খুবই সামান্য পানির ব্যবধান ছিল, এমনকি উভয়ের স্থল কিনারা থেকে একে অন্যকে দেখা যেতো। নিউগিনি থেকেই তাই মানুষ তখন অষ্ট্রেলিয়ায়ও পৌছে গিয়েছিলো। তাদের পরবর্তী ইতিহাস নিয়ে প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে।

১৯৭০ এর দশকে নিউগিনির কুক জলা অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু হয়। ওখানে খননের একটি কারণ ছিল যে অপেক্ষাকৃত অনেক সাম্প্রতিক সময়েও বেশ ব্যাপক ভাবে সেচ নালাকে ঘিরে কৃষিজীবি মানুষের একটি নিরবিচ্ছিন্ন বসবাস ওখানে ছিল, তবে মনে হচ্ছিল যে ওই নালা সিষ্টেমগুলো অনেক প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে। খননে দেখা গেল মূল সেচ নালাগুলো অত্যন্ত প্রাচীন— বলতে গেলে নয় হাজার বছর আগে থেকেই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। বিশেষ ভাবে এই নালা সিষ্টেমের সঙ্গে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছর আগের প্রাচীন গর্ত, সরু জলধারার চিহ্ন, খুঁটি গাড়ার মত সরু গর্ত ইত্যাদি এমন ভাবে পাওয়া গেছে যা স্পষ্টত পরিকল্পিত বাগানের আভাস দেয়। ওখানকার জলা পরিবেশে এবং ক্রমাগত পানির আগমন-নির্গমনের মধ্যে জৈব নিদর্শনের কিছু অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। এখানে কী চাষবাস হতো তার কোন নিদর্শনও নয়, এমন কি পাথরের তৈরি হাতিয়ার ইত্যাদিও কম পাওয়া গেছে। তবুও নালার তলায় জমা পলির গভীর অভ্যন্তরে আটকা পড়া কিছু কিছু পাথরের হাতিয়ার থেকে এখানকার কৃষির কাজকর্মের একটি ধারণা পাওয়া গেছে। বিশেষ করে হামানদিস্তা ও দুই পাথরের যাঁতার মতো জিনিস কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াকরণের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আরো সূক্ষ্ম গবেষণা হয়েছে প্রাচীন উদ্ভিদ তত্ত্বের আওতায়। এর একটি দারুণ সফল পদ্ধতি হলো প্রাচীন ফাইটোলিথের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা। ফাইটোলিথ বা 'উদ্ভিদ পাথর' হলো উদ্ভিদের কোষের মধ্যে থাকা সিলিকার মতো পাথুরে জিনিসে গড়া অতি সূক্ষ্ম কিছু অংশ। কোন কোন জাতের উদ্ভিদে এগুলো বেশি থাকে, কোন কোনটিতে কম। তবে প্রত্যেক উদ্ভিদের কিছু নিজস্ব প্রকৃতি তার ফাইটোলিথের মধ্যে থেকে যায়। প্রাচীন উদ্ভিদ পচে গেলেও তার ফাইটোলিথ যেহেতু পাথুরে জিনিস তা থেকে যায়, অনেক সময় ওই উদ্ভিদের ওপর ব্যবহার করা হয়েছে এমন হাতিয়ারের গায়ে এবং ওই জায়গার মাটিতে এর ফাইটোলিথ পাওয়া যায়। এরকম ফাইটোলিথের পরীক্ষা করে প্রাচীন উদ্ভিদ তত্ত্বের গবেষকরা নিশ্চিত

হয়েছেন যে সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে এখানে কচু, ইয়াম, কলা, আর আখের চাষ হতো, আর সেই ফসলগুলো মানুষের বাছাই করা 'গৃহপালিত' ধরনের কৃষি ফসলের প্রজাতি, বুনো প্রজাতি নয়।

এভাবে সব কিছু থেকে দেখা যাচ্ছে সেদিন এখানে সত্যিকারের কৃষিকাজ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। মানব গবেষণায় এটি ছিল একটি খুব বড় খবর— কারণ এতদিন মনে করা হতো ইরাক-জর্দানের উর্বর সরু চাঁদ এলাকায় হাজার দশেক বছর আগে প্রকৃত কৃষি শুরু হবার পর এখান থেকেই এই বিদ্যাটি ধীরে ধীরে অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়েছে। কিন্তু নিউগিনির কুক জলার আবিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে যে কৃষি দুনিয়ার বহু প্রান্তেই প্রায় একই সঙ্গে উদ্ভাবিত হয়েছে। কুক জলার ফাইটোলিথ ইত্যাদি নিদর্শন থেকে পর পর বিভিন্ন যুগের ওপর পরীক্ষায় দেখা গেছে কী ভাবে ধীরে ধীরে বন্য ফসল থেকে বাছাই করে করে একই ফসলের গৃহপালিত সুবিধাজনক রূপ সেখানেই পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যখন প্রথম কৃষি এসেছে তা ছিল গম, বার্লি ইত্যাদি শস্যের ওপর। আর কুক জলার বা তার আশে পাশে কৃষি এসেছে কলা, কচু, ইয়াম, আখ এসবের ওপর। এই কৃষির প্রারম্ভ এবং বিশেষ করে মানুষের নিজের গড়া সেচ নালা সিষ্টেমের মাধ্যমে আদিতম একটি সেচ ব্যবস্থার সূচনার জন্য কুক জলাকে ইউনেস্কো একটি বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট) হিসেবে নির্বাচিত করেছে।

আরেকটি চমকপ্রদ বিষয় হলো কুক জলায় পোষা শূয়োরের প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। শূয়োরের প্রথম গৃহপালিত রূপ অবশ্য দেখা গিয়েছে আরো কিছু আগের চীনের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়— খুব সম্ভব এই প্রজাতি সৃষ্টির কৃতিত্ব সেখানকার কৃষকদেরই। সেখান থেকে ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি জায়গায় এদের দেখা গিয়েছে আরো কিছু পরের সময়ে। এখন দেখা যাচ্ছে সাড়ে ছয় হাজার বছর আগের কালে এদেরকে কুক জলায়ও পাওয়া যাচ্ছে— এক্ষেত্রে মানুষের দ্বারাই এখানে নিয়ে আসাটিই স্বাভাবিক কিছুটা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে।

অষ্ট্রেলিয়ার একেবারে কাছে নিউগিনিতে এভাবে দেখছি কৃষি আর পোষা পশুপালন বহু আগে থেকেই চালু হয়ে গিয়েছিলো। অথচ কয়েক শ' বছর আগে ইউরোপীয়রা যখন অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম এসেছে ওরা সেখানকার আদিবাসীদের মধ্যে কৃষিকাজের বা পশুপালনের কোন চিহ্নও দেখতে পায়নি। ওরা এখনো আপাদমস্তক শিকারি-সংগ্রাহক, বর্শা হাতে ও তাদের বিশেষ হাতিয়ার বুমেরাং হাতে শিকার করে বেড়িয়ে আর সংগ্রহ করা ফলমূল খেয়েই তাদের দিব্যি চলেছে। নিউগিনির পাকা কৃষকদের এত কাছে থেকে কৃষিকাজ না শেখাটি খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই মনে হয় খুব সম্ভব ব্যাপারটি তা নয়। হয়তো এক সময় ওরা কৃষি জানত, কৃষিপণ্যের সঙ্গে পরিচিতিও ছিল। কিন্তু দেদার শিকার সংগ্রহের সুযোগ থাকায় কৃষির দিকে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি, সেভাবে কোন দিন এক জায়গায় বসতের জন্য থিতুও হয়নি।

আমাদের কুক জলার মানুষগুলোও কৃষিতে এত আত্মনিয়োগের পরও সেই সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে নিখাদ কৃষিজীবী ছিলনা। এই যে সেচ নালা সমৃদ্ধ বাগান তার কাছেই তাদের কলাপাতা ছাওয়া ঝুপরি ঘরগুলোর আভাস পাওয়া গেছে শুধু খুটির গর্ত ইত্যাদি এবং ঘরের মধ্যেকার হেঁশেল ইত্যাদিতে পাথরের তৈজসের নিদর্শন থেকে। ওই বসতের জায়গা যে বন কেটে ও পুড়ে করা হয়েছে— পোড়া অঙ্গার থেকে তা বোঝা গেছে। তবে এ শুধু তাদের খামারবাড়িই ছিল। এখানে তাদের খাওয়া হাড় ইত্যাদি তেমন না পাওয়া গেলেও কিছু দূরেই বনের ভেতরে পাথুরে আশ্রয়ের মত জায়গায় তাদের পাথুরে অন্য বসতের স্পষ্ট

প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া গেছে। জলার তুলনায় এখানে নিদর্শনগুলো অনেক বেশি স্থায়ী হয়েছে। এমনকি কাঠের তৈরি বেলচা ও শূয়োর বাঁধার দড়ির আভাসও পাওয়া গেছে। এখানে পাওয়া গেছে বিভিন্ন পশু-পাখির হাড়ের টুকরা। ওই বসতের মধ্যে মানুষ যা কেটেছে, খেয়েছে, পাথরের অস্ত্র ও হাতিয়ার সমেত তার নমুনা পাওয়া গেছে, পোড়া অঙ্গারের মধ্যেও পাওয়া গেছে। হাড় থেকে বোঝা যাচ্ছে ওই বনে কী কী শিকার তখন ছিল, কী কী তারা খেয়েছে— বুনো শূয়োর পোষা শূয়োর থেকে শুরু করে কুসকুস, গেছো ক্যাঙ্গারু, পোসাম, বাদুড়, পশমী ইঁদুর, বাড়ির ইঁদুর, ব্যাং, নানা পাখি ইত্যাদি কত কী! ডিমের খোসা, বাদাম ফলমূলের চিহ্নও বাদ যায়নি। বড় উটপাখির মত না ওড়া পাখি কাশোয়ারি এবং অদ্ভুত ছোট জন্তু কাঁটা-ওয়ালা পিপীলিকাভূকের হাড় সে তুলনায় অল্প পাওয়া গেছে। এর একটি কারণ হতে পারে উভয়েই ইতোমধ্যে বেশ বিরল হয়ে পড়েছিলো। অন্য কারণ হতে পারে শিকার করা কঠিন এই উপাদেয় খাদ্যগুলো খাওয়া হতো শুধু ভোজের সময়, আর ভোজগুলো হতো এই পাথুরে আবাসে নয়, বরং খামারবাড়িতে যেখানে হাড়গুলো স্থায়ী হয়নি।

ভোজের প্রসঙ্গে উল্লেখিত সেই বাহারি হামানদিস্তার পাথরের মুগুরটি যার ওপরের দিকটি হাতল হয়ে ক্রমে ডানা, লম্বা সরু গলা, সুচালো মুখ সমেত একটি সুন্দর পাখির মূর্তি ধারন করেছে সেটি খননে পাওয়া গেছে। নিচের বলের মত অংশটির কিছুটা ক্ষয়িত অংশ দেখেই বোঝা গেছে এটি হামানদিস্তার মুগুর। অবশ্য এটি কুক জলা থেকে পাওয়া যায়নি। নিউগিনিরই অন্য এলাকা থেকে পাওয়া গেলেও এটি কুক জলার আমাদের খামারিরই সমসাময়িক; আর এর ভাস্কর্য খচিত রূপ দেখে বোঝা যায় এটি খামারির বোনের বিয়ের মত কোন আনুষ্ঠানিক ভোজের ব্যবহারের জন্যই তৈরি হয়েছিলো; অথবা হয়তো কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপাচার মিশ্রণের জন্য। এই মুগুরটি এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

কুক জলার বর্তমান ছবি

কুক জলার প্রাচীন সেচ ব্যবস্থা

পাখির আদলে তৈরি পাথুরে
হামানদিস্তার বাহারি মুগুর
(বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত)

মেক্সিকোর গুইলা নাকুইজ গুহার ওহাকা ঃ
আট হাজার বছর আগে

চাষের ভুট্টা, শিম, আর কুমড়া— এগুলোই তাদের প্রধান ভরসা। সেই চাষ হয় গরমের দিনে নিচের উপত্যকায় খামারবাড়িতে। শরত কাটে পাহাড়ের গুহায় যেখানে ওই ফসল জমা করা হয়। শীতে ওটা ছেড়ে যেতে হয় পাহাড়ের আরো ওপরে। সবকিছুতে পরিবারটির কর্তৃত্ব থাকে বড় গিন্নি ওহাকার হাতে। এতো ঝকমারির মধ্যেও বড় বড় ভোজ, মেহমানদারি আর আমোদ ফুর্তির অভাব নেই। তাদের সমৃদ্ধির মূলে ওই ভুট্টা-শিম-কুমড়া ত্রয়ী।

মেক্সিকোর সর্ব দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যের নাম ওহাকা। ওহাকা উপত্যকা তার একটি প্রধান অঞ্চল, তার আধুনিক রাজধানী নগরীটির নাম ওহাকা, আর এরই কাছের মিটলা শহরের পাহাড়ের ওপর গুইলা নাকুইজ গুহার একজন বাসিন্দার নামও আমরা দিয়েছি ওহাকা— স্থানীয় নাহুয়াটি ভাষায়। এই বাসিন্দা সে গুহায় অবশ্য বাস করতেন আজ থেকে প্রায় আট হাজার বছর আগে। তেমনি একটি দিনে আমরা ওই গুহায় থাকা পাঁচ জনের পরিবারটির গৃহকর্ত্রী হিসেবে দেখছি ওহাকাকে। গৃহকর্ত্রী মানে সত্যিই কর্ত্রী, শুধু গৃহকর্তার স্ত্রী হিসেবে নয়, দুই মেয়ের মা হিসেবে নয়, তাদের চাচার ভাবী হিসেবে নয়; বরং পরিবারটির একমাত্র স্থায়ী ঠিকানা এই গুইলা নাকুইজ গুহার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্রধান রক্ষাকর্তা হিসেবে এবং পরিবারটি নিয়ে নানা মৌসুমে নানামুখি তৎপরতায় প্রধান পরিকল্পনাকারী হিসেবে।

গৃহকর্ত্রীর এই সব রকম ভূমিকার খুব প্রয়োজন রয়েছে বৈকি। কারণ এই মানুষগুলো একই সঙ্গে শিকারি-সংগ্রাহক এবং এক রকম কৃষকও বটে— দুই কাজেই ওদেরকে সিদ্ধহস্ত হতে হয়। খুবই পরিবর্তনশীল মৌসুমের সঙ্গে তাল রেখে তাদেরকে চলতে হয়। গরমের দিনগুলোতে আর্দ্রতা বেশি, পাহাড়ে, নিচে বনে, নদীর ধারে সব জায়গায় সবুজের সমারোহ বেশি— ওটি ওখানে ওদের শিকার, সংগ্রহ, চাষ সবকিছুর জন্যই ভাল। সে সময় তাই নিচে উপত্যাকায় নানা জায়গায় ক্যাম্প করে থেকে যত পারে খারাপ দিনগুলোর জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে।

এই সঞ্চয় নিয়ে শরতে ওরা গুহায় ফেরে। ওদের প্রতিবেশীরাও তাই করে। ওই গুইলা নাকুইজ গুহা তাই ওহাকো পরিবারের শরতকালীন ঠিকানা।

এর পরে পরেই এই দিকটি খুবই শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে যায়, এমন শুষ্ক যে যত খাবারদাবার গুহায় এনে জমিয়েছে পুরো শীত ও বসন্তে তা নষ্ট হতে পারেনা। কিন্তু তাই বলে বসে বসে খেলে এতে বেশিদিন চলবেনা। তাই এই শুষ্ক মৌসুমে ওরা চলে যায় আরো ওপরে, আরো দূরের উচ্চ ভূমিতে অপেক্ষাকৃত আর্দ্র জায়গার সন্ধানে। এখানে তখনো ঘাস আছে, শিকার আছে, জীবিকার উপায় আছে। আবার যখন তাদের সেই ফেলে আসা বন, নদী পারের চাষের জমির ডাক আসে তখন সেখানে ক্যাম্পিং করে থাকার শুরুর কিছুদিন জমা খাবারটি কাজ দেয়। এত সব হিসাব নিকাশ করে চলতে নেতৃত্ব দিতে হলে ওহাকাকে সম্পত্তির ভাল রক্ষাকর্তা এবং সারা বছরের ভাল পরিকল্পনাকারী উভয়ই হতে হয় বৈকি।

হিসাব নিকাশ একটু করতে হলেও খাবারের পরিমাণ বা বৈচিত্র কোন দিক থেকে ওরা কষ্টে নেই। এর একটি কারণ হলো ওই কৃষির ব্যবস্থা। গরমের দিনগুলোতে নিজেদের চাষ করা অন্তত তিনটি ফসলের ওপর তারা নির্ভর করতে পারে— ভুট্টা, শিম, আর কুমড়া। আশপাশের অঞ্চলে এই তিনটারই যে বন্য রূপ তারা ঝোপঝাড়ে দেখে তাদের এই চাষ করা ফসলের সঙ্গে ওগুলোর কোন তুলনাই চলেনা। এ ফসলগুলো যেন তাদের রসনার জন্যই যুৎসই করে তৈরি হয়েছে, আর এক ফসলের বীজ নিয়ে পরের মৌসুমের জন্য খেতে তারা নিজেরাই লাগায়। বীজগুলো তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ তাদের কাছে। প্রয়োজনে বীজ ধার করে, বিনিময় করে, এমনকি এজন্য অনেক দূরের দূরের মানুষের সঙ্গেও লেনদেন করতে সেখানে যায়। নিজেরা অথবা এই দূরের মানুষরা প্রথম এ বীজ কোথায় পেয়েছিলো এ নিয়ে ওদের মধ্যে নানা কিংবদন্তী আছে— তবে এ নিয়ে তারা খুব মাথা ঘামায়না। এটি ঠিক যে তাদের ফসলের মধ্যে বীজ ভেদে তারা যে পার্থক্যগুলো দেখে সেটি খুব লক্ষ্য করে তারা। যেগুলোর ফসল ভাল হয়েছে, বড় হয়েছে, বেশি হয়েছে সেগুলো রেখে বাকিগুলো বাদ দিতে চায় । এ ধরনের কাজে পরিবারে ওহাকার মতো তৎপর মানুষের প্রয়োজন হয়। কৃষির দিক থেকে তাঁর যেন জহুরীর চোখ। ভুট্টা, শিম, কুমড়া যেটিই হোক তিনি জানেন কোনটি কেমন করে ফলালে ভাল হয়, তারপর কোনটি কেমন করে তৈরি করলে স্বাদ হয়, আর কোনটি কেমন করে সংরক্ষণ করলে আগামীতে তার অভাব হবেনা। এসব তিনি লক্ষ্য করেন, প্রয়োগ করেন, বাকিদেরকে শেখান।

ভুট্টার কথাই ধরা যাক। তিয়োসিন্তে নামে এক ধরনের বন্য ঘাসের সঙ্গে এর গাছের ও ফলের কিছুটা মিল আছে। এখানে জনশ্রুতি আছে যে এক সময় এখানকার মানুষও তিয়োসিন্তের ছোট ছোট দানাগুলোর ছোট গুচ্ছ খেতো। কিন্তু এখন তাদের কৃষিজাত ভুট্টা খাওয়ার জন্য অনেক বেশি যোগ্য। এই ভুট্টার মোচার ওপর থেকে খোসাগুলো ছাড়িয়ে নিলে প্রায় ইঞ্চি-দেড় ইঞ্চি লম্বা ছোট মোচাটি

পাওয়া যায়। ছোট ছোট দানাগুলো মোচা থোক ছাড়াতে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তা ছাড়ানো যায়; তা ছাড়া আগুনে পুড়লে সরাসরি মোচা থেকে খেতেও বেশ। ওই যে দানাগুলো সহজে ছাড়ানো যায়না সেটি বরং একটি মস্ত সুবিধে— তিয়োসিন্তের সঙ্গে তুলনা করলে। তিয়োসিন্তেকে বন্য অবস্থা থেকে এনে চাষ করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খুব কঠিন— কারণ এদের অধিকাংশ গাছে থাকতেই বীজগুলো নিজ থেকেই ঝরে যায়। আর প্রায় একই রকম শস্য কৃষির ভুট্টা মানুষের হাতে এসে পড়া অবধি মানুষের সাহায্য ছাড়া একে ছাড়ানো যায়না। কাজেই মানুষের পক্ষে খাবার জন্য পেতে, নিজের নিয়ন্ত্রণে চাষ করতে পারার জন্য এ ভুট্টাই অনেক ভাল, বন্য তিয়োসিন্তে নয়। একেই তো বলে মানুষের পোষ মানানো কৃষি শস্য। ওহাকারা অন্তত গরমের মৌসুমে তাদের চাষের বাগান থেকে যথেষ্ট ভুট্টা এভাবে পায়— যা মোচা থেকে আগুনে পুড়ে খায়, দানা গুড়ো করে সেটি ভেজে খায়— যখন খুশি তখনই। কারণ এগুলো বছরের ফসল হিসেবে জমিয়ে রাখার ব্যবস্থাও করেছে ওরা। ওহাকারা যখন তাদের ভুট্টাকে দারুণ খাবার মনে করছিলো তখন তারা জানতোনা একদিন এই ভুট্টার আকার প্রকার কত বড় হবে, কত বিচিত্র হবে, এই অঞ্চলে সমৃদ্ধ সভ্যতা সৃষ্টির পেছনে কত বড় শক্তি যোগাবে।

বীন বলে পরিচিত শিম জাতীয় গাছের বিচির বন্য রূপ এ অঞ্চলে বরাবর ছিল— তা খাওয়াও হতো। কিন্তু গুইলা নাকুইজে ওটি রীতিমত একটি নিয়মিত খাদ্যে পরিণত হয়েছে— অনেকটা ভুট্টার মতই। এর কারণ এটি আসে তাদের নিজেদের বাগান থেকে, বন্য শিমের বিচির থেকে এগুলো অনেক বেশি পুরুষ্টু, তাছাড়া বন্যগুলোর মত গাছে থাকতেই শুটি ফেটে গিয়ে বিচি ছড়িয়ে যায় না— বরং ওরা বাগান থেকে সংগ্রহ করে আনার পর নিজেরাই শুটি ভেঙ্গে বিচি বের করে আনে। এর মানে অন্য কৃষি শস্যের মত এও মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে নিজেদের বংশ বিস্তারের জন্যও। মানুষ শুটি ছাড়িয়ে কিছু বিচি খাবে, কিছু বীজ হিসেবে তার বাগানে আবার লাগাবে তবেই তার বংশ বৃদ্ধি হবে, নইলে নয়। ওহাকাদের পরিবার বা তাদের পাড়াপড়শীর কেউ এমন নির্ভরশীল শিমের গাছ প্রথম সৃষ্টি করেনি, তারা বংশ পরম্পরায় এবং অন্যদের থেকে এমন শিমের বীজই পেয়েছে— এখনো পায়। গুইলা নাকুইজের মানুষরা তাদের বাগানে ভুট্টা গাছের সঙ্গেই লাগিয়ে দিয়েছে তাদের এই পোষা শিম— প্রয়োজনে যেন ভুট্টা গাছকেই লতিয়ে উঠতে পারে তার গাছ।

ভুট্টার আর শিম গাছ আইলের মত একটু উঁচু মাটির সারিতে লাগিয়ে দুই সারির মাঝখানে তারা লাগায় কুমড়া— তাদের অন্য আরেক ভাল ভাবে পোষা ফসল। বন্য কুমড়ার জাতভাই এগুলো— কিন্তু ওদের বাগানেরগুলো দেখতে ছোট মিষ্টি কুমড়া আকারের হলেও বন্যটির চেয়ে অনেক বড় ও রসালো। বন্য কুমড়ার যে পাতলা চামড়া, চিমসানো শাঁস— এগুলো মোটেও তা নয়। তা ছাড়া বাগানের এই কুমড়ার রঙও টকটকে কমলা রঙের— বন্যগুলো কখনো তার সবুজ রঙ

ছাড়েনা। যেভাবে বাগান রচনা তারা করে সেটি পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ। যখন ওরা পাহাড়ে গুহায় না থেকে নদীর ধারের ক্যাম্পিঙের মধ্যে থাকে তখন পরিবারে অন্ত ত ওহাকাকে সব সময় দেখা যায় বনের ফাঁকে তৈরি তাদের বাগানে কাজ করতে। এখানকার তৃণভূমির কিছু জায়গা সাফ করে ওরা এখানে ওই তিন ফসলের বাগান তৈরি করেছে। ওহাকা তাঁর পরিবারের জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা চান— আর এর একমাত্র উপায় হচ্ছে বাগানের ফসলকে নিশ্চিত করা। শিকারের বা বন্য খাবার কুড়িয়ে আনার জিনিস যে এখানে কম নেই সেটি তিনিও মানেন, তবে তা দরকারের সময় কোথায় কতখানি পাওয়া যাবে তা বলা মুশকিল। বনের অবস্থার ওপর ওদের কোন হাত নেই, সে তুলনায় বাগানের অবস্থার ওপর অনেক বেশি হাত আছে। তাই এ যেন তাদের একরকম বীমা ব্যবস্থা— অন্য খাবারের সংগ্রহে টান পড়লে এই ভুট্টা-শিম-কুমড়ার ওপর নির্ভর করা যায়।

শরতকালে গুইলা নাকুইজে ফেরার সময় বাগানের এসব ফসল ওখানে কতখানি জমাতে পারলো তা নিয়েই ওহাকার প্রধান আনন্দ। শরত ও শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় এগুলো ভাল থাকবে। পরের মৌসুমে আবার চাষ শুরু করার আগে এগুলোর ওপর শুধু নির্ভর করা যাবে না, গুহা ছেড়ে যাবার আগে দু'একটি ভোজের আয়োজনও করা যাবে। একটু বাড়তি থাকলে অন্যদের সঙ্গে বিনিময় করে জরুরি নানা জিনিস যোগাড় করার সুযোগও রয়েছে। বিশেষ করে ওহাকা চান তাঁর মেয়ে দু'টা সব সময় সুন্দর অলঙ্কারে সেজেগুজে থাকুক। নানা সুন্দর পাথর, হাড় ও ঝিনুকের তৈরি এ অলঙ্কার এমনি বিনিময়ের মাধ্যমেই তারা যোগাড় করে।

বাগান থেকে যে খাবার আসে তা কিছুটা নিশ্চিত খাবার হলেও মৌসুম ভেদে ওহাকাদের খাবারের বৈচিত্র কিন্তু কম নয়। বসন্তের শেষ দিকে ওরা গুহা ছেড়ে পাহাড়ের নিচে উপত্যকায় চলে আসে। অধিকাংশ সময় এখানেই গিয়োশিহ নামের জায়গায় ছোট ছোট অস্থায়ী ঘর বানিয়ে নেয়। গুইলা নাকুইজ গুহার পরিবার ছাড়াও তখন পাহাড় থেকে আসা আরো বেশ কিছু পরিবার এখানে ডালপাতা দিয়ে কুটির তৈরি করে। সবারই চাষের বাগান আছে এখানে ভুট্টা, শিম আর কুমড়ার, সেখানে মেলা কাজ। তা সত্ত্বেও সময়টা খুবই উপভোগ্য, বেশ আর্দ্র ভাল আবহাওয়া, অনেকের কাছাকাছি থাকা হয় বলে কাজের পর আমোদ ফুর্তির ভাল আয়োজন হয়। এখানে এ সময় হ্যাকবেরি গাছে প্রচুর লাল লাল বেরি ফল আসে— প্রায় সারা মৌসুম ধরে। একই ভাবে শরত, শীত, আর বসন্তের প্রচণ্ড শুষ্ক খরা উপেক্ষা করে এখানে বেশ ঝাঁকড়া হয়ে হয়ে আছে অনেক মেসকাইট গাছ— বড় তেতুল গাছের মত গাছের ফলগুলোও বড় আকারের তেতুলের মত দেখতে। ওরকম শুষ্ক আবহাওয়াতে ভাল ভাবে টিকে থাকার জন্য মেক্সিকোর মেসকাইটের তুলনা নেই। ওই যে অনেক বড় আকারের তেতুলের মত ফল তার স্বাদ কিন্তু মোটেই তেতুলের মত টক নয় বরং বেশ মিষ্টি। এতে বড় বড় বিচিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যে নরম শাঁস তাই মিষ্টি স্বাদের খাবার— ওরা এটি বের করে, গরম করে সুজির মত খায়।

অনেকে বেশ কষ্ট করে শক্ত বিচিগুলোকেও পাথরে গুড়ো করে ভেজে খায়। এভাবে বন-বাদাড়ের খাদ্যগুলো ওরা খুব ফুর্তি করে দু'হাতে গ্রহণ করে।

এ সময়ের শিকারগুলোও ওরা কিছুটা ফুর্তি করেই করে— প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলো কালো কাঁটা-লেজ ইগুয়ানা যাদের সংখ্যা এদিকে প্রচুর। ইগুয়ানা নামের কুমীর সদৃশ এই বিরাট গিরগিটিটি লম্বায় মিটার-দেড় মিটার পর্যন্ত হয়— হারপুন দিয়ে সহজে শিকার করা যায়। ওহাকার স্বামী যেদিন কাজের শেষে মস্ত একটি ইগুয়ানা মেরে এনে কাঠ কয়লার গনগনে আগুনে রোষ্ট করতে দেন সেদিন ফুর্তির সীমা থাকেনা। সাধারণত এরকম ইগুয়ানা ভোজে আত্মীয় ও বন্ধু স্থানীয় আরো দু'একটি পরিবারকে দাওয়াত করে ওরা। অমন ভোজ প্রতি রাতে না হলেও কোন না কোন রকম অন্যান্য গিরগিটি ইত্যাদির মাংস পাতে থাকবেই, অথবা নিদেন ইঁদুর বা কাঠবিড়ালি।

তাদের আসল চেষ্টা থাকে কত তাড়াতাড়ি ভুট্টা, শিম আর কুমড়ার ফসল কিছু কিছু ঘরে আনা যায়। গ্রীষ্মে বৃষ্টি কিছু হলে এর সুবিধা হয়। তেমন ভাল দিন এলে ওরা বেশ একটু সাহসী হয়েই শুধু ভাল ভাল গাছগুলো রেখে বাকিগুলো উপড়ে ফেলে — এ ভাবে পরবর্তী বীজগুলোর মান আরো বাড়িয়ে দেয়। মাটি বেশি শুকিয়ে গেলে কুমড়ার খেতে ওরা পানি দেয়— যেই পাত্রে পানি নিয়ে যায় তাও ওই তাদেরই চাষ করা এক রকমের কুমড়া (লাউ) যার খোলটি শুকিয়ে পানির পাত্র তৈরি করেছে।

এই গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট কুটির বানিয়ে যে অস্থায়ী গ্রাম উপত্যকায় গড়ে ওঠেছে ওখানে এখন প্রায় সব রাতই ভোজের, ফুর্তির রাত কারণ কুমড়ো ফসল এখন প্রায়ই ওঠানো যাচ্ছে, অন্য ফসলগুলোও কিছু কিছু। শুধু খাওয়া দাওয়াটাই উপলক্ষ নয়, এমন বারোয়ারি সমাবেশে নিজেদেরকে সব চেয়ে ভাল ভাবে দেখানোও একটি উপলক্ষ— বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে। ওহাকার মেয়ে দুটি বসন্তের শুরু থেকেই নিজেদের অলঙ্কারগুলো সাজিয়ে তুলছে। এবার গাছ গাছড়ার আঁশ থেকে তৈরি দড়িতে গিট্টু দিয়ে দিয়ে নতুন এক প্রস্ত স্কার্টের মত পোষাক বানিয়ে নিতে ব্যস্ত ওরা। স্কার্টের ওপরের জামাটা তৈরি করেছে একই আঁশের সুতায় কাপড় বুনে— বেশ রংবেরঙের কাপড়। এই পোষাক তো মোটামুটি সব সময় ওরা পরে। কিন্তু ভোজের সমাবেশের আয়োজন যখন হয় তখন এর ওপর পরে নেয় পাথর-ঝিনুকের সেই অলঙ্কারগুলো যার অধিকাংশ এসেছে শস্য বিনিময় থেকে। তাছাড়া বুনো ফুল আর পাখির রঙবেরঙের পালক দিয়ে করা হয় আরো কিছু অঙ্গসজ্জা ওই পোষাকের ওপরেই। পাখির পালক আর ফুলের সাজে নিজকে সাজাবার এই বিষয়টি বেশ জমকালো হতে পারে। অবশ্য সাদামাটা অন্য পাখির পালক দিয়ে ওরা মূল পোষাকও তৈরি করে, আবার শীতের সময় সেটি করে পশুর চামড়া দিয়ে, চামড়া দিয়ে জুতাও তৈরি করে।

পোষাকে-আষাকে যেমন লোক দেখানোর চেষ্টা আছে তেমনি বড় ভোজের খাবারের আয়োজনেও তা আছে। রোষ্ট করার জন্য কাঠকয়লার গনগনে আগুনে

চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আস্ত একটি পেকারি শূয়োর, আর বেশ কয়েকটি ইগুয়ানা। গ্রীষ্মে এদিকে পেকারি খুব পাওয়া যায়না, তাও ভোজের উপলক্ষে একটি শিকার করা গেছে। এসব মূল খাবারের সঙ্গের অন্যান্য বিচিত্র খাবারগুলোই বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আছে উজ্জ্বল কমলা রঙের সব চেয়ে বড় বড় কিছু কুমড়া— নিজেদের বাগানের সেরা কুমড়াগুলো; রঙীন মিষ্টি বন্য ফল— যার মধ্যে আছে তরমুজের মত রসালো ফলও। ডাশা ডাশা ভুট্টাগুলো নিজেদের বাগানের সব চেয়ে ভাল অংশ থেকে বেছে আনা হয়েছে গোটা পুড়ে খাবার জন্য। ওদিকে হামানদিস্তায় গুড়ো করে মেশানো ও গরম গরম ভাজা ভুট্টা গুড়া, মেসকাইটের শাঁস ইত্যাদির যোগান রয়েছে। লাল টকটকে ইঞ্চি খানেক লম্বা ফলের মতো কিছু খাবার উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল যেগুলো তৃণভূমিতে বন্য হিসেবে পাওয়া যায়। দেখা গেল এগুলোকে সবাই খুব সমীহ করে খাচ্ছে, কারণ এগুলো বুনো মরিচ— এর সম্পূর্ণ ভিন্ন ঝাল-স্বাদ বাকি সবকিছুর খাওয়াকে প্রাণবন্ত করে তোলে। নিজেদের অজান্তেই যেন এখানকার মানুষরা এই অদ্ভুত স্বাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলো— যা চোখে পানি ঝরায়; মুখে লালা ঝরায়, কিছুটা যাতনায় কাতরাতে হয়।

এই বড় ভোজের একটি কারণ হলো এবার গরমে আরো দূরের উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল তেহুয়াকান থেকে মেহমানরা এসেছে। ওখানেও ভুট্টা, শিম আর কুমড়া চাষের বেশ ধূম পড়েছে। ওদের আসার পেছনে উদ্দেশ্য হলো এসবের আরো ভাল বীজ বিনিময়, ওখানে বেশি পাওয়া যায় এমন সব পাথরের অলঙ্কার বিক্রি এবং ভ্রমণ। তবে আরো একটি বড় উদ্দেশ্য রয়েছে তা হলো বিয়েশাদি। বরাবরের মত এবারো তারা এদিকে এসেছে বৌ পছন্দ করবে বলে, এখানকার মানুষও ওখানে গিয়ে তাই করে। এই ভোজ এবং মেলামেশার ব্যবস্থা সেই সুযোগটিও করে দিয়েছে। বলতে গেলে এটিই ছিল গরমের শেষ ভোজ— একত্র হবার শেষ অনুষ্ঠান। গুইলা নাকুইজ গুহা এলাকা থেকে থেকে যে দশ বারো পরিবার এই উপত্যকায় এসেছে এবার তারা এখানকার সব ফসল তুলে ফেলে তৃণভূমি ও গাছ-গাছড়া থেকে সংগৃহীত সব জমানো শস্য আর ফল-ফলারি নিয়ে পাহাড়ে গুহায় ফিরে যাবে। আর তাদের সঙ্গে তেহুয়াকান থেকে যে জনা দশেক মেহমান গরমের শেষ দিকে যোগ দিয়েছিলো তারাও এ ভোজের পর নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। তবে তাদের সঙ্গে আসা এক তরুণ পছন্দ করে নিয়ে যাচ্ছে ওহাকার বড় মেয়েটিকে, যে মেয়েটি প্রথম থেকেই এই তরুণের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। ওহাকারও বেশ পছন্দ ছেলেটিকে— বিশেষ করে চাষবাসে তার উৎসাহ এবং ইতোমধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতার জন্য। ওই ভোজ সভা তাই রূপান্তরিত হলো এই বিয়ের উৎসবে— অস্থায়ী গ্রামটির সব বাসিন্দা আর আগত মেহমানরা কেউ এর নাচ, গান ফুর্তি থেকে বাদ গেলোনা। ওহাকার পরিবার যখন শরত কালের শুরুতে গুইলা নাকুইজের গুহায় ফেরত আসলো তখন তাদের একটি মেয়ে কিন্তু সঙ্গে নেই। তবে তাদের আশা আছে শীতের সময় একবার তেহুয়াকানে গিয়ে মেয়েকে দেখে আসবে।

গুইলা নাকুইজে গিয়ে ওহাকারা যে গুহায় খুব পরিপাটি করে থাকতে পারছে তা নয়। খুব বড় গুহা এটি নয়। উপত্যকা থেকে অনেক ওপরে পাথুরে পাহাড়ের বিশাল একটি শিলা সামনের দিকে ছাদের মত এগিয়ে এসেছে। তারই ছায়ায় গুহার সরু প্রবেশ পথ যার সামনে কিছুটা চত্বরের মত জায়গা রয়েছে। গুহার ভেতরে অপরিসর জায়গায় বড় জোর চার পাঁচ জন মানুষ গৃহ-পরিবেশে থাকতে পারে। এখন উপত্যকা থেকে এতো খাবার দাবার রসদ তারা নিয়ে এসেছে যে গুহার অনেকখানিই সেগুলোর স্টোর রুমে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরতকালটি পরিবার এখানেই কাটাবে বলে গেরস্থালী কাজের কোন কমতি নেই— ওসবের জন্যও জায়গা করতে হয়েছে কিছু কিছু গুহার বাইরে, বাকিসব ভেতরে। শরতকালীন এই গুহাবাস কিন্তু অল্প সময়ের জন্য— বড় জোর ১৫-২০ দিন কি এক মাসের জন্য। ইতোমধ্যেই শুকনা আবহাওয়া শুরু হয়ে গেছে। শীতের অতি শুষ্ক সময় এখানে দেখা দেয়ার আগেই আরো জরুরী সব রসদ গুহায় জমা করতে হবে। পাহাড়ী বেশ কয়েকটি ঝরণা যে একটি নদীর রূপ নিয়েছে সেটি এখান থেকে খুব কাছে, আর এর জন্যই গরমে আর শরতে এ গুইলা নাকুইজ এলাকাটি খুব আকর্ষণীয়। নদীই বলি, আর ঝরণাই বলি— শেষ অবধি পানির প্রবাহের স্বল্পতার কারণে একে একটি লম্বা পুকুরের মতই মনে হয়— কিন্তু তাও এখানকার পরিবেশকে বেশ সজল ও সজীব রাখে অন্তত শরতের এই সময়টা পর্যন্ত। সুবিধা হলো এরকম পুকুরে ও কাছের জলায় কাছিম যথেষ্ট পাওয়া যায়, আর এটি ওহাকাদের প্রিয় খাদ্য। পুরো কাছিমটা এর পিঠের খোলস সহ তারা কাঠকয়লার আগুনে রেখে রোষ্ট করে, তারপর ওই খোলসটিকে পাত্রের মত ব্যবহার করে সেখান থেকেই খায় রোষ্ট করা কাছিমের মাংস।

উদ্ভিজ খাবার, বিশেষ করে পুরুষ্টু শিকড়, বন্য তরমুজ, বন্য লতানো শিম বেশ পাওয়া যায় গুহার আশপাশেই। এসব খাওয়ার জন্য আসা পেকারি শূয়োর, সাদালেজ হরিণ আর খরগোস ইত্যাদি শিকারেরও অভাব হয়না। তাছাড়া এখানকার বৈশিষ্ট হলো শিকার করার মত উপযুক্ত বেশ কিছু পাখি— কে য়েল, ঘুঘু, কবুতর। তীর-ধনুক দিয়ে বাচ্চারাও ঘায়েল করতে পারে এদের। অন্য শিকারগুলোর জন্য পাথরের অস্ত্রগুলো মেরামত করার, নতুন বানানোরও এটিই সময়— তাই গুহার মধ্যে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে হাতিয়ার তৈরির আয়োজন। রয়েছে পাথর দিয়ে তীরের বা বর্শার অগ্রভাগ, গাছের ডালের ধনুক, বর্শার লাঠি, হাড়ের হারপুন ইত্যাদি; আর কাটা ছেরার জন্য পাথরের বা হাড়ের ছুরি, কোরানি এসবতো বটেই।

ইতোমধ্যে দ্রুত শীত ও শুকনা আবহাওয়া ধেয়ে এসেছে। যা ছিল ঝরণা আর নদী তা এখন সামান্য ভেজা মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। এবার ওহাকা পরিবার বাঁধাছাদা করে তৈরি হয় দূরের পথে যাওয়ার জন্য। এযাত্রা নিচের উপত্যকায় খামারবাড়ির ক্যাম্পিং করা নয়, বরং দূরে আরো উচ্চ ভূমিতে অপেক্ষাকৃত কিছু আর্দ্র জায়গার সন্ধানে যাওয়া— যেখানে একটি ভাল আশ্রয় খুঁজে নিয়ে শীতটা কোন রকমে পার করা যায়। আর ওখানে কিছুটা আর্দ্রতার কারণে যেমন যতটি পারা যায়

শিকার-সংগ্রহের মাধ্যমে খেয়ে পরে বাঁচা যায়। কিছু খাবার সঙ্গে নিয়েছে, ওখানে পৌছে গেলে বাদবাকি সময়ও খাবারের জন্য খুব বেশি কষ্ট পেতে হবেনা। গুইলা নাকুইজ গুহা থেকে এই দূরে পাহাড়ে থাকার সময়টিই তাদের জন্য সব চেয়ে বেশি কষ্টকর। তবে সেটি খুব দীর্ঘ সময় নয়, বসন্তের প্রথম আভাসেই ওরা আবার গুইলা নাকুইজে ফিরে আসে। এ সময় পাহাড়ের ওপর একটু একটু করে বৃষ্টির ফলে ওই ঝরণাগুলোতে আবার পানির রেখা দেখা যায়, শিগ্গির ওই 'পুকুর'গুলোতে পানি এসে তাদের গুহার আশপাশে আবার সবুজের ছোয়া লাগে। গুহায় ফিরে তারা তাদের জমিয়ে রেখে যাওয়া খাবারের সদ্ব্যবহার করে আর পরিকল্পনা করে শিগ্গির উপত্যকায় খামারবাড়িতে ফিরে এবার চাষের আয়োজনটি কীভাবে করবে।

ওহাকার পরিবারের জন্য এই শরত ও শীতটি বেশ একটু ভিন্ন ভাবে কেটেছে তার মেয়ে কাছে নেই বলে। ওর অভাব পরিবারের সবাই খুব টের পেয়েছে। তাছাড়া শীতে যেখানে গিয়েছিলো সেখানকার শীতের প্রত্যাশিত বৃষ্টি হয়নি বলে খাবারের অভাব কিছুটা তাদেরকে তাড়া করেছে। তাই তেহুয়াকানে, মেয়ের শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার চিন্তা স্থগিত রাখতে হয়েছে। তবে তাদের জোর বিশ্বাস সামনের গরমে উপত্যকার যখন চাষবাসের মৌসুম শুরু হবে আর দিন মান উৎফুল্ল হয়ে উঠবে তখন মেয়ে আর মেয়ে-জামাই আত্মীয় স্বজন নিয়ে এবারো সেখানে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আপাতত ওহাকা কাছের দিনগুলোর এই স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু স্বপ্নেও তিনি ভাবতে পারেননা যে এই যে আজ নিজেদের মত করে ভুট্টা, শিম আর কুমড়া ফলাচ্ছেন, আর সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে এগুলোই ঠিক এইখানে সৃষ্টি করবে সমৃদ্ধ এক নাগরিক সভ্যতার। বিশেষ করে এই ভুট্টা আকারে প্রকারে দশাসই হবে, জন্ম দেবে এক অদ্ভুত সমৃদ্ধির, ভুট্টা দেবী হবে তাদের পূজায় সব চেয়ে বড় আরাধ্য দেবী। সেই সমৃদ্ধির অন্যান্য প্রকাশগুলোর মধ্যে থাকবে অসংখ্য রকমের বীন্স বা শিমের বিচি— আকারে-আকৃতিতে যার বৈচিত্র অবাক হবার মত, থাকবে ছোট থেকে প্রকান্ড নানা অদ্ভুত আকৃতির লাউ-কুমড়া এবং প্রায় একই বৈচিত্র ও সমারোহ নিয়ে লাল-সবুজ অনেক আকার-আকৃতির মরিচ। ওহাকার বর্তমান গুহাবাসের খুব কাছেই পাহাড়ের ওপর কিছু সমতলে গড়ে ওঠবে বিখ্যাত জাপোটেক সভ্যতার রাজধানী নগরী যেটি সেন্ট আলবান নামে পরিচিত হবে। আর এর হাজার বছর পরেও আধুনিক পর্যটকরা ভিড় করে তা দেখতে যাবে।

*   *   *

প্রত্নতত্ত্ববিদরা ১৯৬৬ সালে গুইলা নাকুইজ গুহাটি আবিষ্কার করেন এবং গবেষণায় বুঝতে পারেন যে এখানে ১০ হাজার বছর আগে থেকে ৮ হাজার বছর আগে পর্যন্ত সময়ের কয়েকটি বিভিন্ন যুগে নিয়মিত কিন্তু অস্থায়ী ভাবে মানুষ বসবাসের চিহ্ন রয়েছে। এর মধ্যে ৮ হাজার বছর আগের পরিবারের হাতিয়ার ইত্যাদির সঙ্গে আশ্চর্যজনক ভাবে সে যুগের ভুট্টা, কুমড়া ও শিমের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ভুট্টার ক্ষেত্রে প্রায় পুরো ভুট্টার মোচা পাওয়া

গেছে যদিও সে কালের এই ভুট্টা ছোট— মাত্র দেড় ইঞ্চি খানেক লম্বা। কুমড়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বীজ সহ কুমড়ার বাকল ও শাসের অল্প কিছু অংশ এবং শিমের ক্ষেত্রে গোটা কিছু দানা পাওয়া গেছে। পরে জেনেটিক তথ্য সহ নানা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই তিনটির প্রত্যেকটি মানুষের কৃষির উপযুক্ত হয়ে ওঠা প্রজাতি অর্থাৎ মানুষের পোষ মানানো প্রজাতি, বন্য প্রজাতি নয়। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব চেয়ে প্রাচীন কৃষিজাত পোষ মানানো ভুট্টা ও কুমড়ার নিদর্শন এই গুইলা নাকুইজ গুহাতেই পাওয়া গেছে- এদিক থেকে গুহাটি অনন্য।

এর মানে অবশ্য এই নয় যে ওই আট হাজার বছর আগেই এই শস্যগুলোকে পোষ মানানো হয়েছে। এ কাজটি খুব সম্ভব আরো কয়েক হাজার বছর আগে এ অঞ্চলে সম্পন্ন হয়েছিলো— কিন্তু তা নির্দিষ্ট ভাবে বলার উপায় নেই। কুমড়ার ক্ষেত্রে এই গুইলা নাকুইজ গুহাতেই ১০ হাজার বছর আগের কিছু আংশিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। গবেষণার সর্বশেষ ফলাফলে যা বোঝা যাচ্ছে তা হলো এই তিনটি ফসলকেই মানুষ পোষ মানিয়েছে গুইলা নাকুইজের থেকে আরো বেশ খানিকটা উত্তরে মধ্য মেক্সিকোতে। ওই অঞ্চলেই এদের প্রত্যেকটির বন্য প্রকারের বেশ প্রাচুর্য ছিল। এটিও ওই সিদ্ধান্তের একটি প্রমাণ। দীর্ঘ আট হাজার বছর ওই পচনশীল ফসলগুলোর নিদর্শন গুইলা নাকুইজে অবিকৃত থাকার কারণ হলো এখানকার অভাবনীয় রকমের শুকনা আবহাওয়া। এ অঞ্চলের পাহাড়েও উপত্যকায় তখনকার মৌসুমী আবহাওয়া বৈচিত্র ওখানকার মানুষদের জীবনযাত্রা বুঝতে সহায়তা করেছে।

ওই গুহায় পোষ মানানো ফসল ছাড়াও বহু রকমের বন্য উদ্ভিজ খাবারও পাওয়া গেছে, সেই সঙ্গে পশু-হাড় ইত্যাদিও শিকার ও সংগ্রহের চিত্রকে বেশ কিছু পূর্ণতা দিয়েছে। যে পাহাড়ে এই গুহা রয়েছে তার নিচে উপত্যাকা অঞ্চলটির তখনকার গ্রীষ্মকালীন আর্দ্রতা, গাছ-গাছড়ার সঙ্গে তৃণভূমি ইত্যাদি পরিবেশ বলে দিচ্ছে যে তাদের ফসলের বাগান ছিল এখানেই। তাছাড়া তখনকার গিয়োশিহ নামের জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এখানকার গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প বা খামার বাড়ির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে— যদিও এসব কুটিরের তেমন কোন বিস্তারিত নিদর্শন প্রত্নতত্ত্বে ধরা পড়েনি। এইটুকু বোঝা গেছে যে ওই ভুট্টা-কুমড়া-চাষী মানুষগুলোই গরমের দিনের অনুকূল আবহাওয়ার সদ্ব্যবহার এখানে কৃষিকাজের মাধ্যমে করেছিলো। এখানকার শিকার-সংগ্রহ, ইগুয়ানা ইত্যাদির মাধ্যমে ভোজনের আয়োজন এ সবের কিছু কিছু নমুনা এই অস্থায়ী ক্যাম্পের পরিসরে পাওয়া গেছে। এখানে যে সব হাতিয়ার ও তৈজসের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা প্রায় হুবহু গুইলা নাকুইজ গুহায় পাওয়া নিদর্শন গুলোর মতই। তাতেই মনে হয় একই মানুষগুলো কখনো গুহায়, কখনো এই অস্থায়ী খামারের কুটিরে থেকেছে। শরতে গুহায় ঘরে ফিরে উদ্ভিজ খাবারের একটি বড় সঞ্চয় গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়ভাবে শিকারও করতো। এখানে তাদের হরিণ, শূয়োর, পাখি শিকারেরও নানা নমুনা রয়ে গেছে।

এই দক্ষিণ মেক্সিকোতে ওহাকা অঞ্চলে আরো পাঁচ হাজার বছর গড়ে ওঠেছিলো বিখ্যাত জাপোটেক সভ্যতা। বর্তমান রাজধানী শহর ওহাকার ঠিক ওপরে সেন্ট আলবান পাহাড়ে রয়েছে সেই জাপোটেক সভ্যতার বড় নগরের ধ্বংসাবশেষ— যার সব পাথরে গড়া দালানকোঠা ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা এখনো প্রায় অবিকৃত রয়েছে। জায়গাটি গুইলা নাকুইজ গুহার খুবই কাছে। স্পষ্টত ওই ভুট্টা, শিম আর কুমড়ার সমৃদ্ধি এ সবের পেছনেও কাজ করেছে।

গুইলা নাকুইজ গুহার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

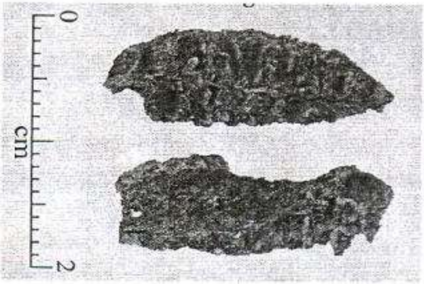

গুইলা নাকুইজ গুহায় আবিষ্কৃত প্রথম
দিকের কৃষিজ ভুট্টার অংশ

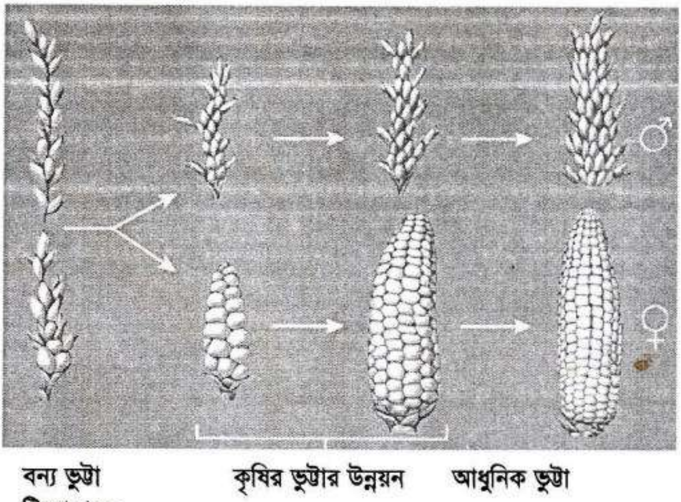

বন্য ভুট্টা টিয়োসান্তে　　কৃষির ভুট্টার উন্নয়ন　　আধুনিক ভুট্টা

মিশরের এল্-আমরার পন্ডিত ঃ
সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে

শিল্প সামগ্রীর আমদানী ও রপ্তানী এই শহরের একটি বড় বৈশিষ্ট। শহর থেকে যাওয়া-আসার পথে দেয়ালের ফটকে বৈধতার সীল মোহর দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এসব ব্যবস্থার অধিকাংশ পারলৌকিক আচার-বিচার সংক্রান্ত। এখানকার বাসিন্দাদের এবং তাদের পুরোহিত-নেতা পন্ডিতের প্রধান ভাবনা মনে হয় পারলৌকিক তত্ত্ব নিয়েই।

এল্-আমরা জায়গাটি মিশরের কিছুটা দক্ষিণ অঞ্চলে অর্থাৎ নীল নদীর অপেক্ষাকৃত উজানে 'উচ্চতর মিশরে', ওই নদীর অববাহিকাতেই উর্বর ভূমিতে। যদিও কৃষি ও পশু পালনের গ্রামীণ অর্থনীতিতেই এখানে বহু কালের বসত গড়ে ওঠেছে, এল্-আমরাকে এখন আর গ্রাম বলা যায়না। এটি রীতিমত একটি শহর এবং এর সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক আগাগোড়া নীল নদের অববাহিকার। এর কাছেই রয়েছে মরু অঞ্চল, এবং কিছু দূর উত্তরে রয়েছে নীল মোহনার শত শাখায় বিভক্ত নদীজালে ভর্তি বদ্বীপ অঞ্চল। তার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এই শহরটির; এমনকি এই সম্পর্ক বিস্তৃত হয়েছে মিশর ছাড়িয়ে আরো দূর দেশে। অথচ যে সময়ের কথা বলছি সেই সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এখনো এল্-আমরা বা মিশরের কোন জায়গা কোন রাজ্যের অংশ নয়, কোন রাজবংশের উদ্ভবও হয়নি। অতীতের চিরকালের মত এখানকার মানুষ নিজেরাই নিজেদের দেখাশোনা করছে, জীবন-জীবিকার সংগ্রামে ব্যস্ত থাকছে। কিন্তু এর মধ্যেই ব্যবসায়িক ও আচার-অনুষ্ঠানের এমন এক ব্যাপক সংস্কৃতি এখানে গড়ে ওঠছে যা মিশরের সব জায়গাকে একই সাংস্কৃতিক বন্ধনে নিয়ে এসে শিগ্‌গির এক রকম রাষ্ট্র ও রাজ্য গড়ার পথে তাদেরকে যেন নিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে এটি বড় ধরনের নাগরিক সভ্যতা গড়ার দিকে দিকেও একটি প্রবণতা সৃষ্টি করছে।

এর কিছু কিছু আলামত এখনই এল্-আমরাতে পাওয়া যাচ্ছে তার নিজস্ব এক রকম ধর্মীয় প্রশাসনিক কাঠামোতে। এই কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো

আমাদের পন্ডিত। জ্ঞানী আধ্যাত্মিক মানুষ হিসেবেই তিনি পন্ডিত আখ্যাটি পেয়েছেন, এখানে তিনি সর্বশ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তি। আচার-বিচার সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ ও তাঁর নির্দেশকে শেষ কথা বলে মনে নেয় সবাই। তবে এ সব আচার-বিচারের মধ্যে ইহলোকের চেয়ে পরলোকের অর্থাৎ মৃতকে সমাধিস্থ করার বিষয়েই বেশি মনোযোগ থাকে। তিনি এই বিষয়েরই বিশেষজ্ঞ, এল্-আমরার ধর্মীয় প্রশাসনিক কাঠামোর অনেকটা এই দিকেই ন্যস্ত। এমনকি এখানকার যে অনেক শিল্পকর্ম, অন্যান্য জায়গার সঙ্গে যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক,তারও অনেকটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই বিষয়টি। এর কথায় পরে আসছি।

এল্-আমরার লোকালয়টির দিকে প্রথমে নজর দেয়া যাক। এখানে দুই রকমের বাড়ি রয়েছে যার সবই খুব ঘন-সংবদ্ধ ভাবে রয়েছে— যা গ্রামের দৃশ্যের চেয়ে শহরের দৃশ্যই বেশি মনে করিয়ে দেয়। এক রকম বাড়ি হলো পাথরের ওপর পাথর গেঁথে চৌকোনা বাড়ি। পাথরগুলোর মাঝখানে ব্যবহার করা হয়েছে নীল নদ থেকে তোলা কাদা। পাথর গেঁথে দেয়াল ওঠার পর কাদার পলেস্তরার আস্তরণ দিয়ে দেয়াল ঢেকে দেয়া হয়েছে। অন্য রকম বাড়িগুলো রোদে শুকানো মাটির ইট দিয়ে তৈরি। এগুলোর মধ্যে চৌকোনা বাড়ি যেমন আছে, তেমনি আছে ডিম্বাকার কিছু বাড়ি। প্রায় সবগুলো বাড়িতে মেঝেতে মিটার খানেক ব্যাসের জায়গা পাথরে ঘিরে তার মধ্যে চুলারও ব্যবস্থা রয়েছে; যার চারিদিকে ঘরকন্নার নানা ব্যবস্থা— পটারের হাঁড়ি, নানা রকম খাবার আয়োজন, পাথরের তৈজস সবই। এই আয়োজন থেকে এখানকার সমাজের কৃষিজীবী চরিত্রটি সুন্দর বোঝা যায়। গম ও বার্লি প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় সরঞ্জাম— যাঁতা, হামানদিস্তা বাড়ি বাড়িতে রয়েছে। তবে আরো ভেতরের কিছু বাড়ির আয়োজন দেখলে বোঝা যায় এগুলো নেহাত থাকার জন্য তৈরি হয়নি। এর মধ্যে গার্হস্থ্য পর্যায়ে এটি সেটি তৈরি নয়, বরং তার চেয়ে ব্যাপক উৎপাদনের জন্যই ছোটখাট এক একটি শিল্প কারখানার আদলেই এদের আয়োজন।

ওই বাড়িগুলোকে গুচ্ছাকারে কয়েকটি ভাগ করা হয়েছে এবং তাদের মাঝে মাঝে বেশ কিছু জায়গা রয়ে গেছে। পুরো এলাকার মাঝামাঝি জায়গায় প্রায় দুই মিটার ব্যাসের একটি ডিম্বাকার পাথুরে ব্যবস্থা আছে যার মধ্যে পটারি, ভাঙ্গা পটারি, আর কাঠ কয়লা রয়েছে। সেটি হলো কেন্দ্রীয় পটারি পোড়ার চুলা। এর চারিদিকে পটারি তৈরির যে ব্যাপক আয়োজন তাতে বোঝা যায় যে একে রফতানীযোগ্য শিল্প হিসেবে নেয়া হয়েছে, শুধু এল্-আমরার মানুষের চাহিদা মেটাতে নয়। এমনি ভাবে পাথরের হাতিয়ারের, এবং তার চেয়েও বেশি বিভিন্ন অলঙ্কার ও নান্দনিক শিল্পকর্মের কারখানা রয়েছে। কোন কোন বাড়িতে রয়েছে পাথরের হালকা চাকার মাঝখানে আটকানো কাঠের টাকু— ফ্ল্যাক্স আঁশ ও পশম থেকে সুতা কাটার জন্য; আর রয়েছে হাতে বোনার তাঁত। স্পষ্টত এসব জায়গায় যারা কাজ করছে তারা সবাই বিশেষজ্ঞ কারিগর এবং ওই কাজকেই তারা নিজেদের পেশা হিসেবে

নিয়েছে। বসত বাড়ি, কারখানা বাড়ি, সব বাড়ির গুচ্ছগুলো ঘিরে রয়েছে প্রায় মিটার খানেক চওড়া দেয়াল যা পুরো শহরকে ঘিরে রয়েছে। মাটির তৈরি এই দেয়ালটি কোন নির্দিষ্ট আকৃতি নেয়নি, যখন তৈরি হয়েছিলো তখন শহরের ব্যাপ্তি যেভাবে ছিল সেভাবেই কিছুটা এঁকেবেঁকেই এটি তৈরি হয়েছে। এই দেয়ালের দু'একটি মাত্র বড় ফটক রয়েছে, এবং সে ফটকে রয়েছে আসা যাওয়ার সময় কিছু নজরদারি, কারো কারো জন্য কিছু প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতার ব্যবস্থা।

স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে অনিষ্টকারী বনের পশুকে ঢুকতে বাধা দেয়ার জন্য অন্যত্র কোন কোন গ্রামের চারিদিকে দেয়াল দেয়া হয় এখানে ব্যাপারটি তা নয়। এটি অনেকটাই এখানকার উৎপাদন, আমদানী-রপ্তানী, কর ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে করা হয়েছে। বিশেষ করে এল্-আমরার উৎপাদিত যে সব দ্রব্যের গায়ে যথাযথ আনুষ্ঠানিক সীল দেবার কথা সেই সীল দেবার জন্য। অবশ্য এটি তেমন কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়, নগরের বাসিন্দাদের সৃষ্ট ব্যবস্থা মাত্র। আর এই সীল দেয়া আনুষ্ঠানিকতাটির মূল উদ্দেশ্য জীবন-যাত্রায় ব্যবহারে এদের মান নিয়ন্ত্রণ নয় বরং কবরে মৃতের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য সঠিক আচার ও নিয়ম রক্ষার সঙ্গে এগুলো সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তার নিশ্চিতকরণ। আর এখানেই পন্ডিতের আসল কর্তৃত্ব।

পন্ডিত নিজে যে এক্ষেত্রে একজন আমলার মত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন তা নয়, বরং তিনি তা করেন একজন দার্শনিক বা ধর্মীয় নেতার ভঙ্গিতে। তিনি এবং তাঁর কয়েকজন উচ্চ পদের সহকর্মীর কথা, বক্তৃতা, পরামর্শ শুনলে মনে হয় তাঁদের যোগাযোগ শুধু জীবন্ত মানুষের সঙ্গে নয়; বরং মৃতের রাজ্যে কী ঘটছে, কী ঘটতে পারে তা নিয়েই তাঁদের উদ্বেগ। এসব নিয়ে বহু দিন ধরে এ এলাকায় যে সব বিশ্বাস, আচার, আর নিয়ম কানুন গড়ে ওঠেছে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেয়াই পন্ডিত ও তাঁর সহকর্মীদের কাজ। এল্-আমরায় যখনই কেউ মারা যায় এঁদের পৌরিহত্যেই সম্পন্ন হয় তার অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া। এই অন্ত্যোষ্ঠি ক্রিয়া হয় খুবই দীর্ঘ, বিস্তারিত; এবং মৃতের সঙ্গে কবরে যায় এখানে উৎপাদিত এবং আমদানী করা অনেক সামগ্রী যার জন্যও সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন গড়ে ওঠেছে। এ ভাবেই দেখা যায় এল্-আমরার শিল্প উৎপাদন এবং এর আমদানী রপ্তানী ব্যবস্থার সঙ্গে রয়েছে মৃতের জগতের একটি গূঢ় সম্পর্ক; আর ওভাবেই আমাদের পন্ডিত চলে আসেন এখানকার জীবনের অনেক কিছুরই কেন্দ্র বিন্দুতে। উচ্চতর মিশর জুড়ে বিশেষ করে কাছাকাছি জনপদগুলোর সঙ্গে এখানকার বাড়ি, সেগুলোর বিন্যাস, বাইরের দেয়াল এসবের ভাল মিল রয়েছে। এ অঞ্চলে নাকাদা উত্তর শহর ও নাকাদা দক্ষিণ শহর নামে পরিচিত দুটি জায়গার যে সংস্কৃতি তার সঙ্গে এর খুবই মিল।

এল্-আমরার বেশ কিছু মানুষ বিশেষজ্ঞ কারিগর হলেও, ওরা শিল্পকর্মে নিয়োজিত থাকলেও, এখানকার অধিকাংশ মানুষ কিন্তু কৃষি এবং পশু চারণের সঙ্গে জড়িত। তাদের কাজের অনেকখানিই শহরের দেয়ালের বাইরের উর্বর চাষের খেতে এবং সবুজ চারণ ভূমিতে। তাদের কেউ কেউ থাকেও ওখানেই খামারবাড়িতে;

তবুও তারা সব দিক থেকে এল্-আমরার মানুষ শুধু নয়, এল্-আমরার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। এমার গম এবং ছয় সারি শস্যের বার্লি— যা বহুকাল আগে মধ্যপ্রাচ্যে গৃহপালিত প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে, তাই হলো এখানকার প্রধান শস্য। এর সঙ্গে এখনো পুরোপুরি গৃহ-পালিত না হয়ে ওঠা ডাল এবং মটর শুঁটিও কৃষিতে যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। সুতা ও কাপড় তৈরির জন্য ফ্ল্যাক্সের চাষটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিয়মিত খাদ্যের মধ্যে অবশ্যই শস্যগুলোই প্রধান— তবে নানা রকম রসালো শিকড়ও এখানে বেশ যত্ন সহকারেই লাগানো হচ্ছে যদিও ওগুলো একেবারেই বুনো গোষ্ঠির।

নীলনদ নিজেই কিন্তু এখানকার খাদ্যের একটি বড় উৎস। কচ্ছপ এবং কুমির এখান থেকে প্রচুর ধরা হয়, আর ধরা হয় নানা রকম মাছ, যার মধ্যে বড় বড় পার্চ মাছ হলো প্রধান। নীল নদের অববাহিকায় ভাল চারণ ক্ষেত্রে গৃহ পালিত পশু চারণ চলছে বহুকাল ধরেই— এল্-আমরার মানুষের এটি একটি বড় কাজ। ছাগল আর ভেড়া চারণ প্রচুর হয়, অপেক্ষাকৃত কম হলেও পোষা শূয়োরও পালা হয়। তবে এখানকার সমৃদ্ধির একটি বড় কারণ হলো গরু পালন, গোচারণ এখানে অনেক মানুষের নিয়মিত পেশা। এসব ব্যপারে নীল নদ অববাহিকার প্রায় সর্বত্রই মোটামুটি একই চিত্র। মৃতদেহ সংস্কারের রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে উচ্চতর মিশরের সঙ্গে মোহনার কাছে বদ্বীপ সহ নিম্ন মিশরের অতীতে প্রচুর তফাত থাকলেও, কৃষি ও পশু চারণ নির্ভর জীবিকার যে সংস্কৃতি তা উভয় জায়গায় আগে থেকেই একই রকমের। এখন উভয় দিক থেকে এরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি। জীবিকার ঐক্য, সংস্কৃতির ঐক্য এবং আরো সাম্প্রতিক কালে পারলৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের ঐক্য— এই বিস্তৃত এলাকার মানুষের মধ্যে একটি অদ্ভুত সংযোগ রচনা করছে যার মধ্যে এল্-আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটিই আবার ধীরে ধীরে এক ধরনের একীভূত নিয়ম-নিগড়ের মধ্যে পুরো এলাকাকে নিয়ে আসছে।

গো-চারণের বিষয়ে কতগুলো ব্যাপার লক্ষণীয়। এখানে যে গরু পালা হয় তার সঙ্গে এ অঞ্চলের সম্পর্ক বহুকালের। এখানকার কাছেই মরুময় কিছু জায়গায় বন্য গরু থেকে পোষ মানিয়ে এই গৃহ পালিত গরুর সৃষ্টি হয়েছিলো তাও আজ বহুকাল হয়ে গেল। এই গরুই এখানে এবং সংলগ্ন বিশাল সাহারা ও সাহেলে কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ চরিয়ে এসেছে— যখনই আবহাওয়া এখানে গোচারণের সহায়ক হয়েছে। এখানকার গরুগুলোর বৈশিষ্ট হলো শিং সোজা সামনের দিকে অনেকটা নিচে থেকে মাথার সামান্য ওপর দিয়ে সামনের দিকে। পিঠ সমতল, কোন কূঁজ নেই। অনেক পরিবারেই এরকম গরুর পাল রয়েছে যেগুলো ওরা চরায়। ঠিক মাংস খাওয়ার জন্য যে তা করে সেটিও নয়, কারণ দেখা যায় যে গরুর যথেষ্ট বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তই তারা এদের রেখে দেয়। চাষাবাদে বা অন্য কোন কাজেও এদেরকে লাগায়না।

এভাবে গরুকে রেখে দিয়ে পালার কারণ গাভীর দুধ খাওয়া তাও কিন্তু নয়; কারণ মানুষের শিশু বয়সের পর দুধ হজম করার ক্ষমতা এ মানুষদের নেই। এখানে

গো-চারণের একটি বড় কারণ হলো জীবন্ত গরুর বিশেষ রক্ত নালী কেটে সেখান থেকে রক্ত নিয়ে তা পান করা- এটি বেশ পুষ্টিকর পানীয়, গরুরও যে বেশি কোন ক্ষতি হয় তা নয় (কেনিয়ার মাসাইরা একুবিংশ শতাব্দীর আধুনিক কালেও তা করে)। তাছাড়া এই গরুর পাল তাদের জন্য একটি খাদ্য নিরাপত্তাও বটে। যখন কোন কারণে খাদ্যাভাব দেখা দেয় তখন এই গরুর পালের ওপরই তাদের ভরসা থাকে। গরুর বয়স বেশি হলেও, কিছুটা খেতে বিস্বাদ হলেও, তখন পুরো মন্দার কালটি তারা এক এক করে গরুর পাল থেকে জবাই দিয়ে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে।

আমাদের পন্ডিত তাঁর সহকর্মীদের কাজের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক আছে এখানকার শিল্প উৎপাদনের এবং শিল্প সামগ্রীর আমদানী-রপ্তানীর সঙ্গে। পন্ডিত ছোটবেলা থেকে গুরুর যে দীক্ষা নিয়েছেন তাতে পারলৌকিক শাস্ত্রের সঙ্গে ইহলৌকিক উৎপাদিত দ্রব্য এবং এর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যগুলো শিখতে হয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটির জন্য তার যে বিশেষ সীল চিহ্ন, এ চিহ্নের অধিকারী হতে হলে সামগ্রীর কী কী গুণ থাকতে হয় এও ছিল তাঁর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

এল্-আমরার শিল্প কারখানাগুলোর দিকে তাকালে দুটি বড় শিল্পের কাঁচামালে তারা প্রায় স্বনির্ভর— কাপড় ও পটারি। কাপড়ের জন্য ফ্ল্যাক্স আঁশের চাষ থেকেই সুতা তৈরির কাঁচামাল আসে— এর থেকেই লিনেন কাপড় তৈরি হয়। এদিয়েই কিছুটা সাদামাটা পরনের কাপড় ওরা তৈরি করে। পটারি কিন্তু মোটেই সাদামাটা নয়। পটারি ওদের কাছে এক দিকে যেমন গেরস্থালী প্রয়োজনে কাজের জিনিস, অন্যদিকে এটি তাদের সংস্কৃতির প্রকাশ এবং পরকালের সঙ্গী। অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়ার যে জটিল আচার গড়ে ওঠেছে বিশেষ বিশেষ রকমের পটারি তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এই যে বিশেষ বিশেষ ডিজাইনের পটারির নির্মাণ কৌশল এর সব কিন্তু স্থানীয় নয়; কিছু কিছু স্থানীয়, আবার কিছু কিছু অনেক দূরের জায়গার। এভাবে এখানে নিম্ন মিশরের এবং আরো উত্তরের সিরিয়া-লেবানন অঞ্চলের ডিজাইন বৈশিষ্টময় পটারি দেখা যায়। অন্য দিকে দক্ষিণের দূর নুবিয়া অঞ্চলের পটারিও দেখা যায়, যেগুলো প্রাচীন আফ্রিকান বৈশিষ্টময়। মজার ব্যাপার হলো এর প্রায় কোনটিই ওসব দেশে উৎপন্ন হয়ে আসেনি, এখানে এল্-আমরার কুমোররাই এই পটারি তৈরি করছে। এভাবে স্থানীয় ও বিদেশী ডিজাইনের পটারি প্রচুর তৈরি হচ্ছে। এখানে যেমন ব্যবহৃত হচ্ছে, তেমনি প্রচুর রপ্তানীও হচ্ছে। এর কারণ বিশাল অঞ্চলে এর চাহিদা— একই সংস্কৃতির কারণে এবং একই ধরনের আচার অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জন্য। এর অধিকাংশেরই কোন আটপৌরে ব্যবহার নেই— বরং ওই আচার অনুষ্ঠান, পারলৌকিক কাজ ইত্যাদির জন্য পটারির একটি বিরাট চাহিদা রয়েছে। এগুলো সবই অত্যন্ত যত্ন সহকারে অলঙ্কৃত করা— যাঁর খানিকটা পটারি তৈরির সময় ওর সঙ্গে আত্মীভূত করে, আর তার চেয়েও বেশি রঙীন মাটির রঙ দিয়ে ওপর চিত্রনের মাধ্যমে।

বিশেষ বিশেষ ধরনের পটারির পাত্রের সঙ্গে খাদ্য ও পানীয়তে আরো কিছু বৈচিত্র আনার ব্যাপারটি সম্পর্ক রয়েছে— সেটি হলো গাঁজানো (ফার্মেন্টেশন) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। রুটির খামিরাতে ঈষ্ট দিয়ে গাঁজিয়ে ওরা ফুলে-ওঠা রুটি তৈরি করছে, আর বার্লিকে গাঁজিয়ে বিয়ার তৈরি করছে। এই উভয়েই কিন্তু নানা আচার ও অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে যথেষ্ট জড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে ঠিক পটারি না হলেও কিছুটা পোড়ামাটির ছোট মূর্তি তৈরি এখানকার আর একটি সুন্দর শিল্পকর্ম যাও প্রধানতঃ ওই আচার অনুষ্ঠানের প্রযোজনেই যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হচ্ছে। এসব মূর্তির বিষয়বস্তু হলো প্রধানত দুটি— যে সব প্রাণীর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সে সবের মূর্তি গড়া, আর নানা গুরুত্বপূর্ণ পেশার কাজে রত মানব-মানবীর মূর্তি গড়া। প্রায় সব মূর্তিই কিন্তু আকারে খুব ছোট— ওই ছোট পরিসরে বিষয়বস্তুগুলোকে ফুটিয়ে তোলাটাই মনে হয় ওদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ওর মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর কোন কোনটির মনে হয় আনুষ্ঠানিকতার জন্য বিশেষ চাহিদা রয়েছে।

এরকম একটি ছোট মূর্তি হলো— পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চারটি গরু ঘাস খাচ্ছে, তারা দাঁড়িয়ে আছে এক চিলতে ঘাসেঢাকা জমির ওপর। ওই জমিটুকুর আকার সাধারণ একটি বাসনের সমান হবে। আর এর ওপরের গরুগুলোর উচ্চতা তিন চার সেন্টিমিটারের বেশি হবে না। এই ছোট্ট অবয়বে এখানকার একটি অতি পরিচিত দৃশ্য তুলে ধরেছেন শিল্পী শুধু কয়েকটি কাদার দলাকে রূপ দিয়ে এবং তাকে হালকা ভাবে পুড়ে নিয়ে। পোড়ার পর অবশ্য গরু চারটার গায়ে সাদাকালো রঙ ছোপ ছোপ লাগিয়ে নেয়া হয়েছে প্রকৃত রঙের কাছাকাছি নিয়ে আসতে। ঠিক এই দৃশ্যের এই সাইজের মূর্তি বেশ কিছু বানানো হচ্ছে, এবং প্রয়োজন মতো ব্যবহার হচ্ছে। এর ব্যবহার হলো অন্ত্যেষ্ঠির সময় মৃতের সঙ্গে কবরে সাজানো জিনিসপত্রের সঙ্গে দিয়ে দেয়া। নেহাত একটি পরিচিত দৃশ্যের শিল্পকর্ম হিসেবে যে এর মূল্য নয় সেটি বোঝাই যাচ্ছে। ওদের সমাজে গরুর একটি আলাদা আধ্যাত্মিক মূল্য আছে, আর এই মূল্যই তাকে পরলোকের সাথী হওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

কাপড় আর পটারি শিল্পের জন্য কাঁচামাল স্থানীয় ভাবে পাওয়া গেলেও, অন্যান্য শিল্প যেমন পাথরের হাতিয়ার, অলঙ্কারের জন্য পাথর বা তামা এবং অন্যান্য কাঁচামালের জন্য ওদেরকে দূরের নানা উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়; কাঁচামাল আমদানী করতে হয়। এখানকার লোক এ জন্য বড় একটি সুবিধার মধ্যে আছে— তা হলো নীল নদকে কোন রকম প্রাকৃতিক বাধাহীন দীর্ঘ নানা অঞ্চলের যোগাযোগের একটি চমৎকার পথ হিসেবে ব্যবহার করতে পারা। উত্তরে নীল নদের মোহনা হয়ে প্যালেষ্টাইন ও আনুসঙ্গিক এলাকা, আর দক্ষিণে সুদানের কাছে নুবিয়া পর্যন্ত তাদের আমদানী রপ্তানীর বিরাট সুবিধা। তা ছাড়া এল্-আমরার খানিকটা পূর্বে গেলে যে বিস্তীর্ণ মরুভূমি তাতেও কিছু দূর পরপর মরুদ্যান আছে বলে মরু পথে সেদিকেও যাওয়া যায়। কাঁচামালের জন্য ওটিও গুরুত্বপূর্ণ কারণ খনিজের

জন্য সেটি ভাল একটি উৎস। নীল নদ দিয়ে দীর্ঘ পথে কাঁচামাল আনে ওরা, আবার তাদের হাতের কুশলতায় সমৃদ্ধ হয়ে নানা শিল্প সামগ্রী হিসেবে ওই পথেই এগুলো ফেরত যায় রপ্তানী রূপে। এখানকার চেপ্টা দুই পিঠের ধারালো ছুরি, অলঙ্কার তৈরির হাতিয়ার, রত্ন-পাথরের সুন্দর সুন্দর নানা আকৃতির পুঁতি, লকেট, এগুলোর প্রচুর চাহিদা ওখানে। এল্-আমরা কাছে কোথাও তামা বা তামার আকরিক পাওয়া যায়না। সুদূর সিনাই থেকে অথবা নুবিয়া থেকে তা আনা হয়। এই তামার মাধ্যমেই অল্প ধাতুর তৈরি কিছু অলঙ্কারের ব্যবহার এখানে শুরু হয়েছে। অবশ্য সোনাও কিছুটা পাওয়া যায় যদিও তার পরিমাণ খুবই কম। তামার ছোট ছোট পুঁতি, পিন প্রভৃতিই বেশি তৈরি হয়। এইটুকু তামা সাধারণত প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ তামা হিসেবেই পাওয়া যায়। বেশি পরিমাণে পাওয়ার জন্য তামার আকরিককে খুব উচ্চ উত্তাপে উত্তপ্ত করে তার থেকে তামাকে আলাদা করার কৌশল ওরা প্যালেষ্টাইন অঞ্চলের মানুষ থেকে শিখেছে। ওভাবে তামার আর একটু বড় অলঙ্কারও তারা তৈরি করতে পারছে। তবে হাতিয়ার বা অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা খুব সফল হয়নি, কারণ তামা এ সবের উপযুক্ত নয়— অতি মাত্রায় নরম ও নমনীয়। মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন জায়গায় টিনের সঙ্গে মিশিয়ে ব্রোঞ্জ করে তামাকে ব্যবহারের কথা শুনলেও ওরা এই প্রযুক্তি নিজেদের এখানে চালু করতে পারেনি।

এই সব ব্যবসায়িক ও নেহাত কারিগরি জিনিসের সঙ্গে দার্শনিকের মত আধ্যাত্মিক মানুষ পন্ডিত ও তাঁর সহকর্মীরা জড়িত হয়ে যাচ্ছেন শুধুমাত্র এগুলোর পারলৌকিক গুরুত্বের কারণে। ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য, পরলোকের সঠিক পথ-বেঠিক পথ ইত্যাদির বিচার করতে গিয়ে বিচারের উপাচার হিসেবে যে সামগ্রী— তা মূর্তি, পটারি, ব্যবহার্য জিনিস, অলঙ্কার যাই হোক না কেন— তারও একটি অত্যন্ত গূঢ় অর্থ গিয়ে দাঁড়ায়। এগুলোর কাঁচামাল, প্রাপ্তি স্থান, নির্মাণ শৈলী ইত্যাদির হেরফেরে বিচারেও হেরফের ঘটে যায়। এটি যেন না ঘটতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই পন্ডিতের মত মানুষকে সামনে রেখে এল্-আমরায় একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে— সামগ্রীর আমদানী, রপ্তানী, উৎপাদন সবই যার আওতায় এসে পড়ে। যেহেতু উচ্চ মিশর ও নিম্ন মিশরে নীল অববাহিকার সব জায়গা নিয়ে একটি যৌথ বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব চলছে— এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যেকটি জনপদই নিজ নিজ প্রক্রিয়ায় শরিক হয়ে পড়েছে। এতে যার যার স্বকীয়তা রক্ষার জন্য এসেছে কর্তৃপক্ষীয় সীল মোহরের ব্যবহার। পোড়া মাটির তৈরি এসব বিশেষ বিশেষ সীল মোহর বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সীলের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব হলো পন্ডিতের এবং তাঁর দফতরের।

তাঁদের আওতায় থাকা সীল মোহরের মধ্যে রয়েছে চেপ্টা সীল যা ছাপ মেরে লাগানো হয় সাধারণত নরম কোন কিছুতে— কাদা, মোম ইত্যাদির ওপর। আর রয়েছে বেলনাকার সীল যা নরম জিনিসের ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গড়িয়ে নিয়ে গেল একই ছাপ বার বার পড়তে থাকে। এল্-আমরা শহরের দেয়ালের ওপর এমন সীল

ব্যবহার করা হয়েছে, আর নিত্য হচ্ছে পটারির তৈরি বাক্স, পাত্র ইত্যাদিতে। কাদামাটির ওপর এই সীল লাগিয়ে তাকে শুকিয়েও এক রকম প্রশাসনিক বৈধতা দেয়া হচ্ছে যাচাই বাছাইয়ের পর। পন্ডিতকে এ জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর আলাদা আলাদা যে আরাধনা-তত্ত্ব তার প্রত্যেকটির আচার নিশ্চিত করতে হয়। এসব আরাধনা তত্ত্ব ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জটিল রূপ নিয়েছে যার ফলে সব দেবদেবীর সন্তুষ্টি বিধানে পন্ডিতকে ব্যস্ত থাকতে হয়।

পন্ডিতের দফতর বিশেষ ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে যখন কোন মৃত্যুর ঘটনা এখানে রিপোর্ট করা হয়। এমন ক্ষেত্রে এখানে আসতেই হয় তার কারণ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার খুঁটিনাটি আয়োজন নইলে ঠিক মত হবে না। নানান রকম উপাচারের এবং সমাধি-উপহারের আয়োজন একেবারে নিয়ম মাফিক হতে হয়। যে সব বিশেষ বিশেষ পাথর, যে সব বিশেষ পটারি ডিজাইন, যে সব বিশেষ অলঙ্কার প্রয়োজন তার সব ঠিক ঠাক হতে হয়। মৃতের সঙ্গে হয়তো দিতে হয় নানা রত্ন পাথরের অলঙ্কার, পারলৌকিক আরাধনা-তত্ত্বের সব খুঁটিনাটি মিলিয়ে বিশেষ বিশেষ ছোট মূর্তির চাহিদা দেয়া হয়— যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে চার গরুর ঘাস খাওয়ার মূর্তি, বিশেষ বিশেষ প্রাণীর মাথার আদলে খোদাই করা মাথাযুক্ত পটারির বেটন(ছোট লাঠি), পটারির তৈরি পবিত্র বাক্স— এমনি আরো কত কি! শুধু সুন্দর মূল্যবান পটারি, মূর্তি, অলঙ্কার এসবই দিতে হয় তা নয়, বরং অদ্ভুত সব জিনিস যেমন ছাগলের পায়ের ছোট ছোট কিছু হাড় দিতে হয়। এই সব কিছুর পেছনে নিশ্চয়ই কোন না কোন আচার সম্পর্কিত নিয়ম কানুন রয়েছে।

বহু পরিশ্রমী মানুষের, বহু গুণী মানুষের অবদানে সমৃদ্ধ এই এল্-আমরা। কিন্তু নানা আরাধনা তত্ত্বের বিধানের মাধ্যমে এর ভবিষ্যত ঠিক করে দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন আমাদের পন্ডিতের মত মানুষ। শুধু এখানকার ঘরবাড়িগুলো বা শিল্প কারখানাগুলো এখানে নাগরিক জীবনের সূচনা করেনি, করেছে তত্ত্বগুলো দিয়ে সমাজকে একই নিগড়ে আবদ্ধ করার মাধ্যমে ওই আধ্যাত্মিক নেতারা। এর জন্যই গড়ে ওঠেছে নাগরিক জীবনের এক রকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার জোরটি দৈহিক শক্তির ওপর নয় বরং আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল। সেটি প্রায় একই ভাবে সৃষ্টি হয়ে চলেছে এল্- আমরায়, নাকাদায়, এবং এভাবে এক এক করে নীল নদ অববাহিকায় উচ্চ মিশর এবং নিম্ন মিশরের সব শহরগুলোতে। ফলে সবগুলোকে নিয়ে আরো বহুদিন পর এক সময় গঠিত হতে পেরেছে রাষ্ট্র— আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় বিষয় হাতে নিয়ে।

* * *

এল্-আমরার সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের কিছু কবরখানা প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেন ১৯০০-১৯০১ সালের খনন কাজের মাধ্যমে। এখানকার বিভিন্ন কবরে মৃতদেহের কঙ্কালের সঙ্গে পাওয়া সামগ্রী থেকে এল্-আমরার বসত ও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে তখনই

অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি কবর থেকে পাওয়া বস্তুগুলোর তালিকাটি প্রত্নতত্ত্ববিদরা এভাবে লিখেছেন: 'পুরুষ মানুষের দেহ। পোড়ামাটির ব্যাটন লাঠি যার দণ্ড-মুণ্ডের ওপরটা প্রাণীর মাথার আদলে পোড়ামাটিতে গড়া। পটারির তৈরি লাল রঙের চার দেয়ালের ছোট বাক্স— প্রত্যেক দেয়াল ৯ ইঞ্চি×৬ ইঞ্চি। ছোট প্রাণীর পায়ের কয়েকটি হাড়। কিছু ঘটি- বাটি। চারটি পোড়া মাটির গরু।'

এই যে ওপরের তালিকায় চারটি পোড়ামাটির গরুর কথা বলা হয়েছে সেটি প্রত্নতত্ত্ববিদদের ওই উদ্ঘাটনের পর থেকে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও— কারণ এটি বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। ছোট ছোট খেলনা গরুর মত চারটি গরু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে— এল্-আমরার এই দৃশ্য মানুষ সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পরও দেখতে পাচ্ছে। ঠিক এরকম গরুর ছোট মূর্তি এখানকার আরো বিভিন্ন কবরে পাওয়া গেছে। এভাবে প্রাচীন কবরেরই বিভিন্ন নিদর্শন থেকে সে যুগের চাষবাস, পশুপালন, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানা গেছে।

বিংশ শতাব্দীর ওই শুরু থেকে এল্-আমরার আশপাশে আরো বেশ কিছু সমসাময়িক শহরের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতাত্ত্বিকরা খননের মাধ্যমে উদ্ঘাটন করেছেন। ওখানকার কবরে পাওয়া নিদর্শনগুলোর সঙ্গে এল্-আমরারগুলোর প্রচুর মিল যে রয়েছে আর ওদের সবার যে একই সংস্কৃতি তা বোঝা যায়। এই অন্য জায়গাগুলোতে অবশ্য কবর ছাড়াও বসত ভিটার স্পষ্ট আকার আকৃতি, গড়ন; পটারি, পাথরের হাতিয়ার, শিল্পকর্মের আরো বিস্তারিত সব নিদর্শন পাওয়া গেছে— যেখান থেকে মানুষের জীবিকা, খাদ্যাভ্যাস এবং সংস্কৃতি অনেকখানি অবহিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। এর ফলে এল্-আমরায়ও যে একটি শহরের জীবন এবং নাগরিক সভ্যতা উচ্চ মিশর ও নিম্ন মিশরের নীল নদ অববাহিকার নানা জায়গার মত গড়ে উঠছিলো, এবং তাতে পারলৌকিক বিশ্বাস ও আচারের একটি বড় ভূমিকা ছিল তা বেশ বোঝা যাচ্ছিলো। সাম্প্রতিক কালে এল্-আমরায় আবার কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এসব আরো ভাল ভাবে প্রমাণিত হয়েছে— যে অনুসন্ধানগুলো খুবই আধুনিক কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশলের ও প্রযুক্তির মাধ্যমে চালানো হয়েছে।

২০০৭ সালে প্রাথমিক ভাবে এল্-আমরার পুরো এলাকায় ভূ-চৌম্বক জরীপের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালানো হয়। এটি অনেকটা এক্সরে করে অদৃশ্য ভেতরের জিনিস দেখার মত, বরং আরো সঠিক ভাবে আলট্রা-সনোগ্রাফ করে ভেতরের বিভিন্ন ঘনত্বের জিনিস আলাদা করে জিনিসগুলোর অবস্থান বোঝার মত। কারণ বিভিন্ন জিনিসের অবস্থান ও ঘনত্বের কারণে ঠিক তার ওপরে পরিমাপকৃত ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মানে খুব সামান্য তফাত দেখা দেয়— যার ম্যাপিং করে জিনিসগুলোকে আন্দাজ করা যায়। এভাবে ভূমিতে গাড়া উপরটা সম্পূর্ণ মাটিতে আবৃত অবস্থায় দুটি বসবাস এলাকা ও সংলগ্ন একটি উৎপাদন এলাকা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে— যাতে বাড়ির দেয়াল, কাঠকয়লা ও অঙ্গার সহ বাড়ির চুলা, কেন্দ্রীয় পটারির চুলা, পাথরের হাতিয়ার তৈরির কারখানা, এবং এলাকার বহির্দেয়াল ও অন্তর্দেয়াল ইত্যাদি স্পষ্ট চিহ্নিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে খনন কাজের ফলে এই সব কিছু উন্মোচিত করা সম্ভব হয়েছে, এবং এখানে নানা ধরনের নিদর্শন উদ্ধার হয়েছে। পটারির যে অসংখ্য নমুনা তার সঙ্গে পুরো মিশরের পটারির মিল পাওয়া গেছে— এমনকি খড়ের মেশাল সহ। শক্ত করার জন্য পটারিতে কাদা এবং খড়ের মেশালে অনুপাত পর্যন্ত সব জায়গায় একই। প্রাণীর ও মানুষের নানা রকম ছোট মূর্তি, পাথরের হাতিয়ার, কৃষি সরঞ্জাম, পাথরের

ও তামার অলঙ্কার এমনি বহু নিদর্শন ওই সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সরাসরি ভাবে তুলে ধরেছে। এখানে যে এসবের ব্যাপক উৎপাদন হতো তাও প্রমাণিত। কিছু জিনিস অল্প পরিমাণে পাওয়া গেলেও তার তাৎপর্য কিন্তু অনেক বেশি। এর মধ্যে আছে ষ্টাম্প করে ছাপ দেবার সীল মোহর, গড়িয়ে ছাপ দেবার বেলনাকার (সিলিণ্ড্রিকাল) সীল মোহর, নানা কিছুতে এগুলোর ছাপ। এগুলো প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতার প্রমাণ দেয়।

কাদার তৈরি চারটি গরুর ছোট মূর্তি
(বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত)

চিত্রিত পটারি

ভূ-চৌম্বক জরীপের মাধ্যমে মাটির
নিচের শহর আবিষ্কার

ইরাকের উরুকের কেরাণী ঃ
পাঁচ হাজার বছর আগে

এই বড় নগর-রাষ্ট্রের একজন ছোট আমলাকে সবাই ডাকে কেরাণী নামে। সেচ- নির্ভর কৃষির ভাল ফলনের উদ্বৃত্ত থেকে বেতন দেয়া হচ্ছে শিল্প কর্মীদের। কেরাণী সেসবের হিসেব পরীক্ষা করছেন আর কাদার ওপর আঁচড় কেটে রেকর্ড করা সেই হিসেবের নথিতে সরকারী সীল দিচ্ছেন।

দক্ষিণ ইরাকে বর্তমান ইউফ্রেটিস নদী যেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাঁচ হাজার বছর আগে সেটি বইতো আরো পূর্বের বর্তমানে লুপ্ত একটি খাত দিয়ে। তার তীরে আজকের আস সামাওয়াহ শহরের ৩০ মাইলের মত পূবে সেদিনের উরুক নগর। নগর মানে সত্যিকার নগর, পৃথিবীর আদিতম বড় নগরই হয়তো বা এটি হবে— এই পাঁচ হাজার বছর আগেও ইতোমধ্যে কয়েকশ' বছরের পুরানো নগর। এখন প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষের একটি অত্যন্ত ঘন ও ব্যস্ত বসতি। নগরতো বটেই, একে একটি নগর-রাষ্ট্রও বলা যায়— কারণ রাষ্ট্রের সব রকমের উপাদান এতে রয়েছে। একজন রাজা, তার শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ সবই রাষ্ট্রের মত; এমনকি আশপাশের অন্যান্য কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট নগরের ওপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে এ রাষ্ট্র। এই রাজা আবার ধর্মীয়ও প্রধানও বটেন, কারণ তিনি শাসন করেন এ নগরের আরাধ্য দেব-দেবীর সঙ্গে এখানকার প্রজাদের যোগাযোগের প্রধান সূত্র হিসেবে। শাসনের জন্য তাঁর যে আমলাতন্ত্র ধর্মীয় পুরোহিতরাই তাতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তার নীচেই অবশ্য রয়েছে ধাপে ধাপে আরো আমলা— এমনি একজন ছোট আমলার নাম কেরাণী। কথাটি তাঁর পদমর্যাদার সূচক হলেও আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে যাদের সঙ্গে তাঁর নিত্য কারবার তারা সবাই তাঁকে কেরাণী নামেই ডাকে।

এখানে আমলাতন্ত্রের একটি বড় প্রয়োজনীয়তাই হলো প্রজাদের নানা বিষয়ের হিসেব রাখা ও সেই মত ব্যবস্থা নেয়া— যেমন উৎপাদনের হিসেব, শ্রমিকের বেতন দেয়ার হিসেব, উদ্বৃত্ত খাদ্য বন্টনের হিসেব, সেচ ব্যবস্থায়

মেরামতের হিসেব ইত্যাদি। এসব হিসেব কোন রকম লিপিতে না হলেও এক ভাবে লিখে রাখার পদ্ধতিও এই এখানেই সাম্প্রতিককালে গড়ে ওঠেছে— যদিও খুব অল্প কিছু মানুষ তার ব্যবহার এখনো জানে। কেরাণী সেই গুটিকতেক মানুষের একজন, তাই যথেষ্ট ক্ষমতাশালী। আমলাতন্ত্রে নিম্ন পদে হলেও তাঁর একটি স্থান হয়েছে। সেদিক থেকে নগরের অনেক মানুষের মধ্যে তাঁর একটি বিশেষ অগ্রগণ্যতা আছে বৈকি।

উরুক নগরের কেন্দ্রস্থল হলো তার প্রধান মন্দির। এটি এমন বিশাল উঁচু একটি স্থাপনা যে নগরের সব জায়গা থেকে একে দেখা যায়। এর যে নিচের ভিত্তির অংশটি তাও বেশ দশাসই— ধাপ ধাপ একটি স্তুপের মত চুনা পাথরের গাঁথুনিতে গড়া; তার ওপর নানা কারুকার্য করা। এই ভিত্তির চূড়ায় যথেষ্ট জায়গায় সমতল— সেখানেই আসল মন্দির। ঐ উঁচু সমতলটি আকাশের দেবতা আনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ওখান থেকে সাদা রঙের মন্দির ওপরে উঠেছে বলে একে শ্বেত মন্দিরও বলা হয়। মন্দিরটিও চুনা পাথরের বড় বড় খণ্ডকে মাঝখানে আলকাতরা দিয়ে গেঁথে তৈরি হয়েছে। তারপর চুনের মশলা দিয়ে সারা গায়ে পলেস্তরা দেয়া হয়েছে। দূরে থেকে সাদা রঙ চক্চক করে বলে দেখা যায়ও ভাল।

পুরো উচ্চতাটি একুশ মিটারের মত হবে। এই উচ্চ স্থাপনাকে অক্ষত খাড়া রাখার জন্য বাইরে থেকে পাথরের তেরচা সবা গাঁথুনি একে ঠেকনা দিয়ে রেখেছে যা একে দেখতে আরো জবরদস্ত করে তুলেছে। মন্দিরের ভেতরে মাঝখানে বিশাল হল ঘরটি হলো এর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কক্ষ। তার দুপাশে করিডর আর সেই সঙ্গে দু'পাশেই ছোট ছোট অনেকগুলো কক্ষ। এখানে হলো রাজার, উচ্চ পুরোহিতের, আর উচ্চ আমলাতন্ত্রের অধিষ্ঠান। কালেভদ্রে বড় কিছু কাজ পড়লে কেরাণীর ওখানে ডাক পড়ে উচ্চ আমলাদের দফতরে। কারণ মন্দির শুধু ধর্মীয় প্রধান কেন্দ্র নয়, নগর-রাষ্ট্রেরও প্রধান কেন্দ্র। তবে কেরানীর নিজের দফতর মন্দিরের কাছে অন্য একটি ভবনে। সেটি চুনাপাথরে নয় বরং আরো নানা ভবনের মত রোদে শুকানো মাটির ইটে তৈরি। এই দফতরে দৈনন্দিন অফিস করা ছাড়া কেরাণীকে কাজের উপলক্ষে আরো নানা জায়গায় যেতে হয়।

সাধারণ ভাবে দক্ষিণ ইরাকে এই পুরো জায়গাটি মরুময়, গাছপালার পরিমাণ খুব কম। থাকার মধ্যে আছে শুধু বালি; এমনকি পাথরও খুব দুর্লভ, দূরের কিছু জায়গায় চুনাপাথরের কিছু সঞ্চয় মাত্র রয়েছে। আর আছে নদীর কারণে বেশ কিছু জলা যাতে প্রচুর বেত, শন এ জাতীয় খুব লম্বা লম্বা কাঠির মত উদ্ভিদ। নদীতে এবং জলায় ইট তৈরির জন্য ও পটারির জন্য কাদা পাওয়া যায়— নির্মাণ সামগ্রী বলতে এইটুকুই। উরুক অঞ্চলটিতে খাল কাটার মাধ্যমে জলার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে; আর ওখানেই গড়ে ওঠেছে নগরটি এবং তার আশপাশের অনেক জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে কৃষি জমি। এ যেন বাইরের

জলা ও মরুর মাঝখানে উর্বর একটি দ্বীপ। চাষের জমিতে পানি সেচ দেয়ার জন্য নদী থেকে পানি এখানে আনার মত অনেক খাল কাটা হয়েছে। কিছু খাল ঢুকে গেছে নগরের সীমানা প্রাচীর ভেদ করে এর ভেতরে; কাজেই উরুককে এক রকম খালের নগরীও বলা যায়। এ খালের এমন নাব্যতা যে সোজা নগরের নিজের ঘাটগুলো থেকেই পণ্য বা যাত্রীবাহী বড় নৌকা নদীপথে এক দিকে সমুদ্রে, অন্য দিকে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী হয়ে ইরাকের সর্বত্র যেতে পারে। এসব জায়গায় নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠেছে আরো নগর, আরো শহর।

ওই যে জলা থেকে পানি নিষ্কাশন, খাল খনন, সেচ ব্যবস্থা— এসব বড় বড় প্রকল্প নগরের সবার উপকারের জন্য নেয়া। কেন্দ্রীয় একটি কর্তৃপক্ষ না থাকলে এসব নেয়া যেতনা। এর অনেক কিছু অতীত আমল থেকে রয়েছে বটে, কিন্তু বর্তমান কর্তৃপক্ষকে সব সময় এর মধ্যে নতুন খাল যোগ করতে হচ্ছে, এতে নানা রকম মেরামত করতে হচ্ছে— সেও এলাহি ব্যাপার, বহু মানুষের একযোগে শ্রম দেবার ব্যাপার। সেচ ব্যবস্থাটি চালু না থাকলে নগরের এত মানুষের খাদ্য জুটতোনা, এর সমৃদ্ধির মূল উৎস কৃষি থাকতো না, আর এত মানুষের কর্ম সংস্থানও হতোনা। আমাদের কেরাণীর মতো বড় ছোট আমলারা এই উদ্যোগগুলোকে চালু রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে মূল ভূমিকা নিচ্ছেন। নগরের বাইরে জমিতে যারা চাষ করছে কিংবা খাল খনন ও মেরামত ইত্যাদিতে শ্রম দিচ্ছে তাদেরও অধিকাংশ নগরের মধ্যেই থাকে।

নগরীতে যত মানুষ থাকে তার মধ্যে একটি অংশই শুধু সরাসরি চাষের কাজে আছে। নদী অববাহিকার উর্বর মাটি, সেচের পানি, এবং বার্লি, গম, ডাল, মটরশুটি ইত্যাদির ভাল বীজের সুযোগ নিয়ে ওরাই পুরো নগরের জন্য প্রচুর উদ্বৃত্ত শস্য ফলাতে পারে। বাকি মানুষ নানা রকম পেশায়, নানা রকম ব্যবসায় নগরীতে বিচিত্র কর্মকান্ডের সৃষ্টি করতে পেরেছে। তবে একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে অত্যন্ত বৈষম্যমূলক একটি সমাজ যা ধনে ও প্রতিপত্তিতে উঁচু থেকে নিচ অনেকগুলো স্তরে বিভক্ত। এর মধ্যে উঁচু তলার মানুষদের মধ্যে আছে অভিজাতরা— রাজা, পুরোহিত, আমলাতন্ত্রের উঁচু মহলের সঙ্গে যাদের কাজ কারবার। তা ছাড়া এই দলে আছে বড় বড় ব্যবসায়ীরা নগরীর অধিকাংশ উৎপাদন, আমদানী-রপ্তানীর মালিকানা যাদের দখলে। তারা মন্দিরের খুব কাছে থাকে বিরাট বিরাট প্রাসাদে। আরো কিছু মানুষ ঠিক প্রাসাদে না থাকলেও মন্দিরের কাছাকাছিই বেশ আরামপ্রদ বাড়িতে থাকে। তারা হলো উচ্চ পেশাদার মানুষ— স্থপতি, নির্মাণ প্রকৌশলী, আমলা, হিসাব রক্ষক। আমাদের কেরাণী তাদের মধ্যেই পড়েন। তিনি যে উচ্চ বংশে জন্মেছেন তা নয়, বরং অল্প বয়স থেকেই তিনি কষ্ট করে হিসাব রক্ষণের কাজটি শিখেছেন। শত শত মানুষের হিসেব কী ভাবে করতে হয়, কীভাবে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হয়, তাদের কাজের হিসেব রাখতে হয় এগুলো তিনি আয়ত্ব করেছেল। এসব বিদ্যা এখানেই উদ্ভাবিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। এসবের

পারদর্শী আরো যে অল্প বিস্তর মানুষ আছেন তাঁরা শিক্ষক হিসেবে মেধাবীদেরকে এটি শেখাচ্ছেন। এই শিক্ষকরাও উচ্চ পেশাদার হিসেবে সবার কাছে খুব সম্মানিত। কেরাণী আমলাতন্ত্রের মধ্যে ঢুকেছেন এই বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমেই। তাঁর কাজের কথায় পরে আসছি।

কেরাণী যে বাড়িতে থাকেন তা রোদে শুকানো মাটির ইটে তৈরি। অভিজাতরা কেউ কেউ পোড়া মাটির ইট তাঁদের প্রাসাদে ব্যবহার করলেও সেটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কারণ এই পরিমাণ ইট পোড়ার জন্য যে জ্বালানি দরকার উরুকের ধারেকাছে তা মোটেই নেই; আর পাথর যা কাছে আছে তা দিয়ে মন্দির, রাজপ্রাসাদের মত দু'একটি স্থাপনার কাজে ছাড়া অন্য ব্যবহার সম্ভব নয়। রোদে পোড়া মাটির ইট দিয়েই তৈরি সুন্দর সব বাড়ি উরুকে রয়েছে— বিশেষ করে নগরীর কেন্দ্রস্থলে মন্দিরের কাছাকাছি জায়গাগুলোতে। কেরানীর বাড়িটিতে চার পাঁচটি বড় বড় কামরা আছে। বাড়ির ভেতরের দেয়ালের পলেস্ত-রার ওপর সুন্দর রঙ করা, দরজাটির ওপর কাঠের কাজের সুন্দর কারুকার্য। এখানে কাঠের খুব অভাব রয়েছে বলে বাড়িতে খোলা বাঁধার জানালার সংখ্যা কম। তাছাড়া বছরের অধিকাংশ সময় বাইরের প্রচন্ড গরম বাতাস ও রোদ থেকে আত্মরক্ষাটিই জরুরী, আর শীতকালে কনকনে শীতের থেকেও। মন্দিরের কাছাকাছি এলাকায় এরকম উঁচু তলার মানুষদের বাড়িতে একটি চমৎকার সুবিধা সম্প্রতি সৃষ্টি করা হয়েছে যা আগে কখনো ছিলনা— তা হলো মূল বাড়ির ভেতরেই গোসল ও পায়খানার ব্যবস্থা, এবং তার সঙ্গে পুরো এলাকায় কেন্দ্রীয় ভাবে পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থা। এজন্য পোড়া ইটে ঢাকা নালা তৈরি করে বাড়ির মানব- বর্জ্য তার মাধ্যমে সরানো হচ্ছে। ক্রমে কিছুটা ঢালু হয়ে যাওয়া এই নালার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত নদীর সংযোগ ঘটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যদের বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা অবশ্য সেকেলে এবং মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

উচ্চ মূল্য সত্ত্বেও কেরাণীর একটি ঘরে কিছু কাঠের আসবাব রয়েছে— চেয়ার, টেবিল, কাঠের তাক। তাঁর যে পেশা তাতে এগুলো বিলাসিতা নয়, কাজের জন্যই দরকার। তিনি যে আমলাতন্ত্রের ও সুশিক্ষিত নাগরিক সমাজের অংশ তা তাঁর বাড়ির সাজসজ্জা, বিশেষ করে সুন্দর বিভিন্ন শিল্পকর্ম সাজিয়ে রাখার মধ্যে বোঝা যায়। এসব শিল্পকর্মের মধ্যে এমন সব মূর্তি রয়েছে যাতে দেবদেবীর এবং মানুষের মুখের আদলগুলো একেবারে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে— চোখ, ভ্রু, কপালের কুঞ্চন, গালের টোল— সব কিছু। তবে অন্য দিকে থেকে কেরাণীর জীবন অভিজাতদের মত মোটেই বিলাসীর জীবন নয়। এই বড় বাড়িতে তিনি তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছেলে একটি মেয়ে নিয়ে থাকেন। ছেলে দুটি তাঁর কাছেই হিসাব রক্ষণের বিদ্যাটি শিখছে। মেয়েটি অবশ্য তা করেনা, কারণ এখানকার রীতি অনুযায়ী তাকে মায়ের কাছে ঘরকন্নার কাজে তালিম নিতে হয়। কেরাণীর বাড়িতে নানা সরবরাহকারীরা এসে নানা জিনিসের যোগান দিয়ে গেলেও

ওখানে চাকর বাকর কেউ নেই। মেয়েকে নিয়ে তাঁর বৌকেই ঘরের সব কাজ করতে হয়।

অবশ্য আমলাতন্ত্রে যে সব উপরিওয়ালার অধীনে কেরাণীকে কাজ করতে হয় আর বড় বড় অভিজাত ব্যবসায়ীদের যে সব বাড়িতে তাঁকে যেতে হয় সেখানে চাকরবাকররা সারাক্ষণ সেবা করছে সবাইকে, খাবার-পানীয় এনে দিচ্ছে, খাবার সময় গান গেয়ে ও গল্প শুনিয়ে তাদের মনোরঞ্জন করছে, গায়ে বাতাস করছে, ঘর পরিস্কার করছে, রান্না করে দিচ্ছে, শীতের দিনে তাদের সুন্দর সুদৃশ্য আমদানী করা পাথরের হীটারগুলোর মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে, ওতে জ্বালানী দিচ্ছে— আরো কত কি! এসব চাকর-বাকরদের কেউ কেউ আবার ওই মালিকের কেনা দাস— দেনার দায়ে, বড় অপরাধের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে দাসত্ব বরণ করতে হয়েছে। কেরাণীর বাড়িতেও শীতে ঘর গরম করার ব্যবস্থা আছে, তবে তা কামরার মেঝেতে একটি অগভীর গর্তে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি, পোড়া ইটের মধ্যে শুকনা বেত-শন ইত্যাদির জ্বালানিতে আগুন জ্বালিয়ে— সাধারণ মানুষের সবার এই ব্যবস্থা। উভয় ক্ষেত্রে অবশ্য রাতে আলোর জন্য তিশির তেলের প্রদীপ জ্বালানো হয়। তিশি এখানে চাষ হয়। প্রাসাদ ও বড় বাড়িগুলোতে পাথরের তৈরি বাহারি বাতি, আর সাধারণ মানুষের খোলা প্রদীপ— এইই পার্থক্য। তাছাড়া প্রাসাদগুলো হয় বহু বাতিতে উজ্জ্বল।

খেটে খাওয়া মানুষের সংখ্যাই উরুক নগরীতে সর্বাধিক। ওদের প্রায় সবাইকেই সমাজে নিচু তলার মানুষ বলেই গণ্য করা হয়, যদিও ওদের মধ্যে অত্যন্ত গুণী শিল্পী কুশলীরাও অন্তর্ভূক্ত— যাদের সুনামে উরুকের উৎপন্ন দ্রব্যের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই তথাকথিত নিচু তলার মানুষদের মধ্যে চাষী, বাঁধ শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, নৌকার মাল্লা, ইউফ্রেটিসে মাছ ধরার জেলে, ছাগল-ভেড়া পালার রাখাল, হাঁস পালক, ইট শ্রমিক, ঠেলা গাড়ি ও গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, গাজেল হরিণ বা পাখি শিকারি সবাই রয়েছে। নগরীর আটপৌরে সব লিনেন সুতা তৈরি থেকে সাধারণ ও অতি দামী বস্ত্র বয়ন শিল্পীরা; কাঠের আসবাব, পটারি ইত্যাদি তৈরির কুশলীরা; পাথরের ও ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরির ও সে সবকে নানা রত্ন-পাথর, সোনা ও রূপার পাতের সাজ দেবার ভাস্কররা; অলঙ্কার শিল্পীরা; বাদ্য যন্ত্রের কুশলী নির্মাতা ও সঙ্গীতজ্ঞরা; উরুকের বিখ্যাত বার্লির বিয়ার মদের গাজনকারীরা এবং এ মদের দোকানের মালিক ও পরিবেশনকারীরা; নানা বিনোদন ব্যবসার সঙ্গে জড়িতরা, বিভিন্ন কাঁচামাল ও বিশেষ করে বিলাস দ্রব্য আমদানীর সঙ্গে ও উরুকের শিল্পদ্রব্য রপ্তানীর সঙ্গে জড়িত কর্মীরা, এমনকি স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার বহু চিকিৎসকদেরকেও সাধারণ ভাবে এই নিচু দলের মধ্যেই গণ্য করা হয়।

এর মধ্যে যাঁরা কাজ উপলক্ষে অভিজাতদের সঙ্গে দহরম মহরম করে তাদের ঘনিষ্ঠতা লাভ করে তাদের অবস্থা বেশ ভাল— তাদের অনেকেই রোদে পোড়া

কাঁচা ইটের দালানেই থাকে, ওখানেই তাদের পেশার বা উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যায়। এ সব জায়গা অভিজাত এলাকায় অর্থাৎ মন্দিরের খুব কাছে না হলেও খুব দূরেও নয়। কিন্তু বাদবাকিরা নগরের একটু প্রান্তিক জায়গায় থাকে বেত-শনের কাঠির গোছা দিয়ে তৈরি সাধারণ বাড়িতে। এগুলোও এখানে বেশ সুন্দর করে বানানো বাড়ি— কুড়েঘর না বলে কুটির বলাই সঙ্গত হবে। ওরকম খুব লম্বা লম্বা বেত-শনের কাঠির টইট করে বাঁধা গোছা তৈরি করে মাটির মধ্যে গর্তে তার এক প্রান্ত ভাল করে গেড়ে নেয়া হয়। তারপর পরস্পর কিছু দূরে স্থাপিত সামনা সামনি দুটি গোছাকে বাঁকিয়ে তাদের দুটি আগাকে একযোগে বেঁধে বাঁকা গেইটের মত করা হয়। এরকম জোড়ায় জোড়ায় এদের অনেকগুলো গায়ে গায়ে লাগিয়ে তৈরি করে ঘরের দেয়াল ও ছাদের কাঠামো তৈরি হয়ে যায়। ওপরটা একই রকম বেত-শনে তৈরি মাদুর দিয়ে ঢেকে দিলে ছাদটিও বেশ কার্যকর হয়ে ওঠে। এমনি একটি মাদুর ওরকম ফাঁক রাখা গেইটের সামনে ঝুলিয়ে ঘরের দরজা তৈরি হয়। খুব সাধারণ জিনিস দিয়ে তৈরি এই কুটিরগুলো কিন্তু উরুকের আবহাওয়ায় বেশ চলে যায়— যদিও প্রায়ই মেরামত করতে হয়। ওদিক থেকে অবশ্য কাঁচা ইটের তৈরি বিলাসী বাড়িগুলোতেও বছর বছর কম মেরামত করতে হয়না— ওতে নির্মাণ শ্রমিকদের কাজ লেগেই থাকে।

উরুকের রাজার যে প্রশাসন তার প্রধান কাজই হলো এর বেশ ব্যাপক উৎপাদন ব্যবস্থার শৃঙ্খলা রক্ষা করা— উৎপাদন যেন ভাল হয়, সবাইকে যেন এর জন্য নিয়মিত বেতন দেয়া যায় অথবা মূল্য দেয়া যায় অন্তত খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মত, এসব নিশ্চিত করা। এ জন্যই তাঁর বেশ বড়সড় আমলাতন্ত্র থাকতে হয় এবং বড় ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়। অবশ্য রাজার নিজেরও একটি আনুষ্ঠানিক ভূমিকা আছে এতে। বছরের বিশেষ দিন নগরীর সব রকম নাগরিকের কয়েক হাজার প্রতিনিধির একটি শোভাযাত্রা মন্দিরের সামনের বড় রাস্তা ধরে মন্দিরে যায়। সেদিন রাজা ওদের কাছ থেকে যার যার উৎপাদিত পণ্যের কিছু প্রতীকী উপহার গ্রহণ করেন, প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে মিলে কিছু আনুষ্ঠানিকতা করেন, একটি বড় ঝুড়ি মাথায় নেন এটিই বোঝাতে যে নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সন্তুষ্টি বিধানে এখানকার প্রজাদের মঙ্গলের সব দায়িত্ব তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন।

সত্যিকারের অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট জমকালো হলেও একে আরো জমকালো করে তাদের শিল্পকর্মে সাধারণত তুলে ধরে এখানকার ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীরা, কারণ এই অনুষ্ঠানটি রাজা প্রজা উভয়ের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূণ। শিল্পে একে একটি মায়াবী রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। যেমন মন্দিরে সংরক্ষিত একটি বড় ফুলদানির আকৃতির খুবই সুন্দর পাথরের পাত্রের কথাই ধরা থাক। আলাবাস্টার পাথরে তৈরি এই পাত্রের গায়ের ওপর যে ভাস্কর্য খোদাই রয়েছে এটিই একে অতি মূল্যবান করে তুলেছে। প্রায় ৩ ফুট উঁচু এবং ওপরের দিকে ১ ফুট ব্যাসের ওই

পাত্রের গায়ে সবার নিচের স্তরে স্থানীয় পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, বিশেষ করে বেত-শন ইত্যাদির জলা-বন, শস্যের চাষ ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তরে দেখা যাচ্ছে নানা রকম পশুর একটি মিছিল— বড় বড় গরু আর কিছু ভেড়া ও ছাগল। তৃতীয় স্তরে দেখা যাচ্ছে মানুষের একটি মিছিল তবে তারা সবাই পুরুষ এবং উলঙ্গ এদের সবার হাতে উপহার সামগ্রী ভর্তি নানা আকার আকৃতির পাত্র। উলঙ্গ মানুষ চিত্রিত করাটি এখানে প্রতীকী— উরুকের সব মানুষের বেশ ভাল পরিধেয় বস্ত্র থাকে অধিকাংশরেই পশমে বোনা কাপড়ের, উঁচু মহলের মানুষের ক্ষেত্রে লিনেন কাপড়ের, যার সব এখানেই বোনা। পুরুষ মহিলা সবাই লম্বা জোব্বার মত কাপড় পরে। তবে কর্মী পুরুষরা নিম্নাঙ্গে স্কার্টের মত পোষাকও পরে কাজের সুবিধার জন্য। শীতকালে ছাগলের চামড়ার তৈরি পোষাকও পরে সবাই। ওই ফুলদানির ভাস্কর্যে সবার ওপরের এই স্তরে দেখা যাচ্ছে মিছিলের সামনে বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখানো যে উলঙ্গ পুরুষ মানুষটি মন্দিরের সামনে দাঁড়ানো দেবী ইনানার কাছে একটি বড় পাত্র ভর্তি ফল-ফলারি, শস্য ইত্যাদি উপহার দিচ্ছে। দেবীর পেছনে লম্বা বেত-শনের দুটি গোছা যার ওপরটি বিশেষ ভাবে বাঁকানো— রাজা তাঁর পুরোহিতের পাশে দেবীর ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন। এমনি ভাবে কিছুটা কাল্পনিক দৃশ্যের মাধ্যমেই শিল্পী রাজা-প্রজা-দেবীর সম্পর্কগুলো তুলে ধরেছেন। মন্দির হলো সব কিছুর শীর্ষ কেন্দ্র— পূজা অর্চনার তো বটেই। কিন্তু এটিই আবার উচ্চতম প্রশাসনিক কেন্দ্র— কৃষকদের থেকে সংগৃহীত তাদের সকল উদ্বৃত্ত শস্য এখানে সংরক্ষিত হয়, এখান থেকেই তা বাকি নাগরিকদের মধ্যে পুনর্বন্টনের ব্যবস্থা করা হয় বেতন, পণ্য মূল্য ইত্যাদি হিসেবে।

খাদ্য উৎপাদন অবশ্যই উরুকের একটি প্রধান কাজ এবং এটি ঠিক রাখতে হলে প্রয়োজন এখানকার সেচ ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে চালু রাখা। চাষের জমির বেশির ভাগই ব্যবহৃত হচ্ছে বার্লি চাষে, এবং কিছুটা গম চাষে। বার্লি শুধু প্রধান খাদ্য শস্য নয়, প্রধান পানীয়েরও উৎস বটে, কারণ বার্লি থেকে তৈরি বিয়ার মদ এখানে সব শ্রেণীর মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। বিয়ার গাঁজানোর কাজেও নিয়োজিত আছে অনেক মানুষ। একে তারা বিনোদন-মূলক পানীয় শুধু মনে করেনা, বরং পুষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সাধারণ প্রয়োজনীয় পানীয় মনে করে। পানীয়টি এত জনপ্রিয় যে শ্রমিকের বেতনও অনেক সময় বিয়ারের হিসেবে দেয়া হয়। বার্লি আর গম ছাড়া বাকি জমিতে প্রচুর সবজিও চাষ করা হয়। ডাল ও মটরশুটি প্রধান সবজি। জমির আর একটি ব্যবহার হচ্ছে ফলের বাগান— খেজুর, বরই সহ বেশ কয়েক রকম ফল। বলতে গেলে শস্য, বিয়ার, ফলমূল ও সবজি এইই সাধারণ নাগরিকদের নিত্য খাদ্য, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ হয় পোষা ছাগল অথবা ভেড়ার মাংস, এবং ইউফ্রেটিসের মাছ।

উরুকের বাড়তি সমৃদ্ধি এবং খ্যাতিটি আসছে তার শিল্প উৎপন্ন দ্রব্য থেকে যার অনেকটাই রপ্তানী হয়। এ সব উৎপাদন বেশি হয় কেন্দ্রীয় উৎপাদন কেন্দ্রেই

যেগুলো বড় বড় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগেই পরিচালিত হয়। উৎপাদনের আরেকটি অংশ হয় শিল্পী কুশলীদের বাড়িতে বাড়িতে। সরকারী আমলাতন্ত্র কিন্তু সবগুলোর ওপর নজর রাখে, সব কিছুর হিসেব-নিকেশ রাখে এবং সবার দেনা-পাওনা নিশ্চিত করে। এখানেই কেরাণীর কাজের সঙ্গে একদিকে এসব উৎপাদন কেন্দ্রের যোগাযোগ, অন্যদিকে মন্দিরের উচ্চ প্রশাসন কেন্দ্রের যোগাযোগ। কতজন মানুষ কাজ করছে, তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ ও মান কী, তাদের কত প্রাপ্য হয়েছে এসব হিসেব তাৎক্ষণিক ভাবে জানা ও লিপিবদ্ধ করা যেমন তাঁর কাজ, তেমনি এই তথ্যগুলো কী ভাবে কতখানি ব্যবহৃত হলো সেটি জেনে মন্দিরের উচ্চ আমলাতন্ত্রের কাছে রিপোর্ট করাও তাঁর কাজ।

মজার ব্যাপার হলো বেশির ভাগ উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল বলতে কিছুই উরুকে বা উরুকের কাছে ধারে নেই— সবই প্রায় আমদানী করতে হয় দূর দূরান্ত থেকে। এর ব্যতিক্রম হলো শুধু পটারির কাদা, ঝুড়ি ইত্যাদি নির্মাণের বেত, কাপড় বুনোনির সুতার জন্য পশম ও ফ্ল্যাক্স, আর নানা নির্মাণের জন্য স্থানীয়ভাবে পাওয়া আলকাতরা। এখানে ব্রোঞ্জ ধাতু তৈরি করা হয় তামা আর টিন মিশিয়ে। তামা আসে পারস্য উপসাগর তীর ও তুরস্ক থেকে, তুরস্ক থেকে টিনও আসে। শুধু তামা দিয়ে বড়সড় অলঙ্কার, মূর্তি বা অন্য কোন কাজ তেমন করা যায়না এটি খুব নরম বলে। নয় ভাগ তামা আর এক ভাগ টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করাটি উদ্ভাবন করার পর এখন এই উরুকেই ব্রোঞ্জের অলঙ্কার, ভাস্কর্য এমনকি হাতিয়ার ও অস্ত্র প্রচুর তৈরি হচ্ছে। কম হলেও অলঙ্কারে ও ভাস্কর্যে সোনা ও রূপার ব্যবহার হচ্ছে— ধাতুগুলো আমদানী করা প্রধানত হয় সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চল থেকে, সোনা মিশর ও নুবিয়া থেকেও যথেষ্ট আসে, সেখান থেকে তামার ছোট ছোট দানাও আসে। উরুকের স্বর্ণকাররা ইতোমধ্যে বেশ বড় একটি কুশলী শ্রেণী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। দক্ষিণে সাগর পার থেকে শঙ্খ-ঝিনুক আসে যার ওপরও এখানে প্রচুর কাজ হয়। আফগানিস্তান থেকে ঘন নীল রঙের রত্নপাথর ল্যাপিজ লুজুলির বড় বড় ব্লক নিয়ে আসা হয় এখানে, আর গোটা হাতীর দাঁতগুলো আসে আফ্রিকা থেকে। ভাল কাঠও আনতে হয় ইরান থেকে। এর প্রত্যেকটি জিনিস উরুকের কারিগরদের হাতে পড়ে উচ্চ মানের শিল্পকর্মে পরিণত হয় যা ইরাক ছাড়িয়েও বিশাল এলাকার চাহিদা মেটায়। উরুক যেন হয়ে পড়েছে উন্নত এসব এলাকার জন্য একটি দামী কারখানা — সবদিক থেকে কাঁচামাল এখানে আসে আর অনেক মূল্যবান শিল্পকর্ম হয়ে আবার চারিদিকে যায়। এই যে ওরা তাদের যাদুর হাতের ছোয়ায় মূল্যবান জিনিসকে আরে মূল্যবান করে তুলতে সক্ষম হচ্ছে এটিই উরুকে নাগরিক সভ্যতার বাহাদুরি। যারা কাজগুলো করছে নগরীর সমাজের নিচু তলায় তাদের অবস্থান হলেও তাদের সৃষ্টির কদর কিন্তু সীমাহীন।

এখানকার শিল্পীদের কিছু কিছু কাজে স্তর বিভক্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়। এমন একটি জিনিস হলো কাহিনী বর্ণনার মত পট-চিত্র। এখানে

শিল্পীরা আয়তাকার এক ধরনের খুব পাতলা বাক্সের মত জিনিসের দুই পাশকে অনেকটা চিত্রকরের পটের মত ছোট ছোট নানা মূর্তিতে সাজিয়ে তোলে। উৎসবাদিতে ব্যানারের মত বহন করার জন্য অনেকে এগুলো খুব পছন্দ করে। লম্বায় দুই ফুটের মত আর চওড়ায় আট দশ ইঞ্চি এই পট দুপাশেই অলঙ্কৃত। এরকম পটে কাঠে তৈরি পাতলা বাক্সের দুপাশে ঝিনুক, শাঁখ, লাল পাথর, ঘন নীল লুজুলি পাথর ইত্যাদিতে তৈরি ছোট ছোট চেপটা মূর্তি সাজিয়ে মোজেকের মত বিচিত্র বিন্যাস গড়া হয়— মানুষ, পশু, নানা দৃশ্য ইত্যাদি নিয়ে। এরকম একটি পটে কিছুটা কৌতুকময় দৃশ্য সৃষ্টি করা হয়েছে এক পাশে একের ওপর এক তিন সারি নানা মূর্তিতে। ছোট পুতুল সাইজের এই চেপটা মূর্তিগুলো বাক্সের গায়ে যার যার স্থানে সাঁটা রয়েছে আলকাতরার সাহায্যে।

মজার ব্যাপার হলো এরকম পটে ক্ষমতাশালীদেরকে সমালোচনা করার বেশ কিছু স্বাধীনতা শিল্পীর রয়েছে। এক পাশের পটে কিছুটা রাজনৈতিক সমালোচনার কার্টুনের মতই সাধারণ মানুষের থেকে কর আদায় করে রাজা ও অভিজাত শ্রেণী কী ভাবে বিলাসিতার মধ্যে থাকছে তা দেখানো হয়েছে। এতে নিচের দুই সারিতে দেখা যাচ্ছে কর্মী মানুষের সারি— কারো পিঠে ও কাঁধে ভারা বাঁধা শস্যের আঁটির বোঝা, কারো কাঁধে ও হাতে অন্যান্য নানা পণ্য বোঝাই ঝুড়ি, কারো সঙ্গে রয়েছে গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি পশু; স্পষ্টত যার যার যা উৎপন্ন দ্রব্য সেগুলোই তারা সঙ্গে নিয়ে চলেছে। সবার ওপরের সারিতে দেখা যাচ্ছে রাজা ও তাঁর পারিষদরা— কিছু পুরোহিত, কিছু অন্যান্য অভিজাতরা— ওই সব খাদ্য দ্রব্যের ভোজ খাচ্ছেন। তাদের অনেকের মুখে ধরা রয়েছে মদের পাত্র, এবং একজন বীণা বাদক ভোজের আসরে বীণা বাজিয়ে তাঁদের মনোরঞ্জন করছে। ওদের মধ্যে রাজাকে আলাদা করে বেশ বোঝা যাচ্ছে প্রধানত তাঁর মূর্তির আকার থেকে। শুধু তাঁর প্রাধান্য বোঝাতেই মূর্তিটি এত বড় করে তৈরি তৈরি করা হয়েছে যে পটের সীমানা ভেদ করে এটি কিছুটা ওপরে চলে গেছে। এটি সমালোচনার জন্য হলেও হতে পারে; কিন্তু এর শিল্পী একটি কঠিন বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলেছে যে উৎপাদনকারীদের দেয়া করের সম্পদে সৃষ্টি হয়েছে একটি একটি অভিজাত শ্রেণী, নগর রাষ্ট্রের পরিচালনার ক্ষমতাও যাদের হাতে। ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ হয়তো এই পটচিত্র পছন্দ করবে। হয়তো কোন কারণে অভিজাতদেরও ভাল লাগে, নইলে এত মূল্যবান সব রত্ন-পাথর দিয়ে এই পটচিত্র এতগুলো তৈরি হবে কেন। হয়তো দেবীর সাহায্য নিয়ে রাজা যে নগরীতে একটি রমরমা সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছেন তাতে সবাই খুশি।

পটের এই পাশটিকে যদি বলা যায় শান্তি ও সমৃদ্ধি, অন্য পাশটিকে বলতে হবে যুদ্ধ। ওই সময় সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠা প্রতিবেশী অন্যান্য কিছু নগর-রাষ্ট্রের সঙ্গে উরুকের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা তো বটেই সহিংস যুদ্ধ বিগ্রহও শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এজন্য এই শক্তির নগরীতেও রাজাকে এখন কিছুটা যুদ্ধের নেতৃত্ব

দেবার কাজেও নামতে হচ্ছে। ওই যুদ্ধ দেখানো পাশের তিন সারি পটচিত্রে রাজার এই দিকটিকেই ফুটিয়ে তুলেছে। তিনি চার চাকার যুদ্ধ-রথের সামনে দাঁড়িয়ে সৈন্য পরিচালনা করছেন পটের মধ্য সারিতে। অন্য দুই সারিতে দেখা যাচ্ছে সৈন্যরা একই রকম রথে চড়ে যুদ্ধ করছে—গায়ে চামড়ার বর্ম, মাথায় চামড়ার হেলমেট, হাতে দীর্ঘ শূলের মত অস্ত্র (ল্যান্স), যা রথের দ্রুত গতিতে গিয়ে শত্রুকে বিদ্ধ করছে। শত্রুদের কারো কারো কারো মৃতদেহ মাটিতে, অনেকে বন্দী— বন্দীরা উলঙ্গ। রথগুলো টানছে পোষমানা গাধা, পোষমানা ঘোড়ার প্রচলন এখনো হয়নি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে সারির গোড়ার দিকের গাধাগুলোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তারা ধীরে এগোচ্ছে, তারপরেরগুলো খুবই জোরে ছুটছে, তারপরেরগুলো শত্রু নিধনের পর থেমে ধীরে যাবার ভঙ্গিতে। স্থির চিত্রের মধ্যেই এটি যেন এক রকম চলচ্চিত্রের ভাব এনেছে। সত্যিকারের যুদ্ধ যতখানিই হোক না কেন এসব পটচিত্র মানুষের কাছে একে তাদের রাজার বড় বীরত্ব ও বড় দায়িত্ব হিসেবেই দেখাচ্ছে। বড় কোন যুদ্ধ উরুকে কোন বড় গোলযোগ বা উত্তেজনা সৃষ্টি করছে মনে হয়না— নগরের দৈনন্দিন কাজ, উৎপাদন, ব্যবসা বরাবরের মতই চলছে। হয়তো এই পটচিত্র এক ভাবে নগর সরকারের পক্ষে প্রচারণার কাজও করছে। এমন পট-অলঙ্করণের বক্তব্য যে সব একেবারে বাস্তবানুগ নয়, অন্তত কিছুটা অতিরঞ্জন যে এতে আছে তা বোঝা যায় এর অন্য দুটি তল দেখলে— বাক্সের সামনের ও পেছনের এক চিলতে সরু যে জায়গা তাতে শুধু অদ্ভুত সব কাল্পনিক জন্তু জানোয়ারের ছবি।

মন্দিরের সেই ফুলদানির মত পাত্রে যে রকম অনেক ভাস্কর্য খচিত পাত্র উরুকে তৈরি হচ্ছে, আর এই দুই পিঠ ওয়ালা অলঙ্কৃত পটের যে বিচিত্র রূপও অনেক সংখ্যায় তৈরি হচ্ছে তাতে অলঙ্করন আর বিন্যাসের চমৎকারিত্ব আছে। কিন্তু এতে বিশেষ করে মানুষের মুখের গড়নে খুঁটিনাটি সঠিক করার কোন চেষ্টা নেই— অনেকটা কাজ চলার মত। অন্য দিকে এখানকার ভাস্কররা এমন কিছু বড় মূর্তি তৈরি করে যাতে নিখুঁত অবয়বের সুন্দর মুখচ্ছবি সৃষ্টিতে তাদের কুশলতার কোন তুলনা হয়না। এমনি একটি মূর্তি স্থান পেয়েছে রাজ প্রাসাদে যাকে সবাই 'উরুকের নারী' বলে চেনে। বেশ বড় মূর্তিতে অতি মূল্যবান সামগ্রী যেন কম খরচ করতে হয় সে জন্য মূর্তির অদৃশ্য বড় অংশটি কাঠ খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে— কিন্তু যে সব অংশ দর্শকরা দেখছে সেগুলোর ওপর মার্বেল পাথর খোদাই করে তৈরি অদ্ভুত সুন্দর ভাস্কর্যের পাতলা আবরণ লাগিয়ে নেয়া হয়েছে। উরুকের নারীর কাঠের মুখমণ্ডলের ওপরও এভাবে লাগিয়ে নেয়া হয়েছে মার্বেলের কাজ করা পাতলা আবরণ, অনবদ্য মুখমণ্ডল ভাস্কর্য যাতে মুখের প্রত্যেকটি রেখা অদ্ভুত বাস্তবানুগ হয়ে ফুটে ওঠেছে। সোনার পাতলা পর্দা আর তামার পাতায় কোকড়ানো চুলের ঢেউগুলো কপাল বেয়ে সামনেও এসে পড়েছে। এই মুখোশের

মত মার্বেলের মধ্যে চোখের ও ভ্রুর যে সব জায়গায় গর্তের মত রাখা হয়েছে তা পূর্ণ হয়েছে যথাযথ স্থানে সাদা ঝিনুকের ও ঘননীল ল্যাপিজ লুজুলির টানা টানা চোখ আর ভ্রু দিয়ে। সব মিলে এই মুখ, এই মূর্তি এতই সুন্দর যে এই উরুকের নারী উরুক নগরীর একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আর সোনা-রূপা, পাথর, ঝিনুকের যে সব দেহ-অলঙ্কারের জন্য উরুক বিখ্যাত তার মধ্যে সব থেকে মনোমুগ্ধকর কিছু দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এই প্রতীকী নারীকে।

আমাদের কেরাণীকে অবশ্য অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতে হয় নগরের সেরা শিল্পকর্ম নিয়ে নয়, বরং যে সব মাঝারি গোছের শিল্পের কাজ এই নগরে প্রতি দিন শত শত সংখ্যায় তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে। আমদানী করা সব সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা, এসব কাজে যারা নিয়োজিত আছে তারা তাদের রেশন বেতন পাচ্ছে কিনা এসবই তাঁর মাথা ব্যথা। কারণ এ নিয়ে প্রচুর তথ্য তাঁকে ওপরিওয়ালাদের কাছে দিতে হয়। তাই প্রতিদিন সকালে তাঁকে দেখা যায় নিজের বাড়ি থেকে বের হয়ে মন্দিরমুখী বড় রাস্তা ধরে এর বিপরীত দিকে হেঁটে যেতে, পাশেই থাকা সোজা খালটির পার দিয়ে। কোন কোন দিন তাঁর সঙ্গে দু'জন সহকারী থাকে কারণ সেই দিনগুলো তাঁর হিসেবের নথি পরীক্ষা করা আর সে সব নথি সংগ্রহ করে আনার দিন। বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে গিয়ে সেখানে যে সরকারী টোকেনগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো তাঁকে পরীক্ষা করতে হবে; যে নথি রাখা হয়েছে তাও পরীক্ষা করতে হবে। এখান থেকে কিছু কিছু বাছাই করে নথি দফতরে নিয়ে আসতে হবে। এ সব কাজে সহায়তা দেবার জন্যই ওই দু'জন সঙ্গে যায়।

কর্মীদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ওই যে টোকেনগুলো দেয়া হয় তা শুকানো কাদা দিয়ে তৈরি। আসলে নথি রক্ষা করার জগতে এবং সে কারণে কেরাণীর কাজের জগতে সব কিছুই কাদা দিয়েই তৈরি। নরম কাদার ছোট ছোট পাটালির মত জিনিসে আঁকিবুকি করেই নথি রাখা হয় (আজকাল যেই আকৃতিকে ট্যাবলেটও বলা হয়, ট্যাবলেট কম্পিউটার যার আকৃতির একটি উদাহরণ)। যখন কাদা নরম থাকে তখন কাঠি দিয়ে আঁকিবুকি করা যায়। এই শুকনা বাতাসের দেশে অল্প সময়েই এটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারলে যতদিন ইচ্ছে ততদিন একে রেখে দেয়া যায়। হাতের তালুতে রেখে আঁকিবুকি করে আবার হাতের তালুতে রেখেই তা দেখতে হয় বলে পাটালিগুলোর সাইজ ওরকম ছোট, তার ভাঙ্গার সম্ভাবনাও কমে। টোকেনগুলো আরো ছোট আর নানা আকৃতির— আকৃতি অনুযায়ী কোনটির মান ১, কোনটির মান ১০, কোনটির ১০০। ওপরে আবার কাঠির আঁচড়ে ১,২,৩ ইত্যাদির চিহ্ন দেয়া থাকে। ১০ সূচক আকৃতির টোকেনে ২ এর চিহ্ন দেয়ার মানে হলো এর মোট মান ২০। তবে যে কেউ এরকম কাদা দিয়ে তৈরি করে দিলেই কি টোকেন হিসেবে তার মান স্বীকার করে নিতে হবে? না, এ জন্য এর ওপর সরকারী সীল দেয়া থাকে। এই সীলটির

রক্ষাকর্তা হলেন কেরাণী। তাই মাঝে মাঝে সীল নিয়ে গিয়ে এর দ্বারা উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য বৈধ টোকেন তৈরির সুযোগ করে দিতে হয় তাঁর সামনেই। এই টোকেন দেখিয়ে কর্মীরা খাদ্য বেতন পায়, অন্যান্য সামগ্রীর রেশন পায়।

এক একটি উৎপাদন কেন্দ্রে কাদার ওপর রেশন বন্টনের যে নথি রাখা হয় কেরাণীকে সীল দিয়ে তাও সত্যায়িত করতে হয়। সীলগুলো ছোট ষ্টাম্পের মত পোড়ামাটির তৈরি যাতে রাজকীয় চিহ্ন দেয়া থাকে। কাঁচা কাদার ওপর এটি দিয়ে চাপ দিলেই তার ছাপ পড়ে যায়। বন্টন ইত্যাদির জন্য যে কাদার নথি তৈরি হয় তাতে সাধারণত যে বস্তুর বিষয়ে বলা হচ্ছে তার ছবির আদলে স্বীকৃত কোন চিহ্ন তাকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। জিনিসটি বার বার এঁকে অথবা একবার এঁকে তার পাশে কয়েকটি দাগ বা ফোটা দিয়ে তার সংখ্যা বোঝানো হয়। এরকম একটি ছবি-চিহ্ন দিয়ে অধিকাংশ সময় একটি জিনিস বা একজন মানুষ বোঝানো হলেও কখনো কখনো তা দিয়ে একটি কাজও বোঝানো হয়- যেমন খাদ্যদ্রব্য দেখিয়ে তা খাওয়া বোঝানো। একের অধিক চিহ্ন একসঙ্গে ব্যবহার করে একটি আইডিয়াও বোঝানো হয়। যেমন একটি মানুষের মাথার ছবির সঙ্গে একটি মদের পাত্র এক সঙ্গে দেখিয়ে জনপ্রতি মদের রেশনের কথা বোঝানো হয়। নরম কাদার ওপর চিকন কাঠি দিয়ে আঁচড় কেটে খুব আঁটসাঁট ভাবে এই ছবি-চিহ্নগুলো আঁকা হয় যাতে একই পাটালিতে অনেক তথ্যের জায়গা হয়। আঁকা হয় একই জিনিসের জন্য হুবহু একই আদলের চিহ্ন। বার বার একই চিহ্ন আঁকার সুবিধার জন্য ধাতব কাঠিটির আগায় চেপ্টা করে ওই চিহ্নের মত করে নেয়া হয় যাতে নরম কাদার ওপর ওটা দিয়ে চাপ দিলে ওই চিহ্নের আকৃতিতে একটি গর্ত হয়। এর ফলে দ্রুত হুবহু একই চিহ্নটি বার বার আঁকা যায়।

একটি উৎপাদন কেন্দ্রে কেরাণী কাদায় লেখা নথি পরীক্ষা করছেন। ছোট একটি শুকানো কাদার পাটালি— দৈর্ঘে ৪ ইঞ্চি প্রস্থে ৩ ইঞ্চি। এর ওপরেই সম্ভব হয়েছে অনেক তথ্য লিখে রাখা। তথ্য হলো শ্রমিকদেরকে দেয়া বিয়ার মদের রেশন সংক্রান্ত। কাদার ছোট পাটালিটির পুরোটাতে লাইন টেনে কয়েকটি খোপে ভাগ করা হয়েছে— তিন সারি খোপ, প্রতি সারিতে পাশাপাশি চারটি খোপ। প্রত্যেক খোপে আলাদা তথ্য লেখা হয়েছে। একটি খোপের মধ্যে প্রথমে ওপর থেকে নিচে পড়তে হয়, তারপর ডান থেকে বামে গিয়ে আরেকটির ওপর থেকে নিচে। বিয়ার মদের চিহ্ন হলো এর সংরক্ষণে ব্যবহৃত পাত্রের ছবি— নিচের দিকে সরু হয়ে আসা। প্রত্যেকের রেশনের চিহ্ন হলো মানুষের একটি মাথার সঙ্গে সংলগ্ন একটি বাটি, যেন মদটি সে পান করছে। খোপের মাধ্য এসব চিহ্নের সঙ্গে কয়েকটি ফোটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে কী পরিমাণ রেশন কত মানুষকে দেয়া হয়েছে। বাস্তব তথ্য থেকে কাদায় এভাবে এগুলো রেকর্ড করা হয়েছে। বেতনের একটি অংশ বিয়ার মদ হিসেবে দেয়া হয় বলে এই নথিটি প্রয়োজন হয়েছে। লেখার পর কাদার পাটালিগুলো রোদে শুকিয়ে আরো শক্ত করে নেয়া হয়েছে।

অনেকদিন সংরক্ষণ করতে হবে এমন খুব গুরুত্বপূর্ণ নথির ক্ষেত্রে সেগুলো পটারির চুলার মত চুলাতে পুড়ে একেবারে শক্ত ও লালচে করে তোলা হয়। সাপ্তাহিক রেশনের নথির মত জিনিসগুলো অবশ্য রোদে শুকালেই চলে।

এসবকে কি লেখা বলে চলে? ঠিক ভাষার লিপি এগুলো না হলেও লিপির দিকে একটি অগ্রগতি তো বটেই। কেরাণী এবং যে আমলাতন্ত্রের তিনি অংশ তার জন্য এই হিসেবের নথিগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই নথির মধ্যেই রয়েছে প্রশাসনের জবাবদিহিতা, শৃঙ্খলা এবং শক্তি। কেরাণীকে এখন এরকম কাদার পাটালিতে লেখা কিছু কিছু নথি মন্দিরের কাছে তাঁর দফতরে নিয়ে যেতে হবে। সহকারীদের সাহায্যে এগুলো বাক্সে ভরে তিনি খালে দাঁড়ানো একটি নৌকায় তুলে নিলেন। বাদবাকি টোকেন, নথি, নানা পণ্যের ওপর কাদার সীল ইত্যাদি বেশ কিছু দিন সংরক্ষণ করতে হবে। কাজেই প্রত্যেক কাজের জায়গায়, দফতরে একটি জায়গা রয়েছে যেখানে কাদার পাটালির অনেক নথি আপাতত সংরক্ষণ করা যায় যতদিন এসব হিসেব নিয়ে কথা উঠতে পারে। বছর ঘুরে গেলে বা আরো কিছু পরে এগুলোর প্রয়োজন ফুরোলে তখন অপ্রয়োজনীয় হিসেবে এগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং কোথাও কোন নির্মাণ কাজে গর্ত ইত্যাদি ভরাট করতে মাটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এই যে কাদার ওপর হিসেব লেখা— কাজটি কিন্তু সহজ নয়, হিসেববিদ্যা তো শিখতে হয়ই তা ছাড়া সঠিক জিনিসের বা কাজের সঠিক চিত্রগুলো জানা সেগুলো অল্প জায়গার ওপর লেখা, এবং তা পড়া এসব সবার কম্মো নয়। এর জন্য কঠিন প্রশিক্ষণ নিতে হয় এবং অল্প কিছু 'লেখক' মানুষই এ কাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠেছেন। আমলাতন্ত্রে প্রবেশের পরীক্ষায় পাশ করার আগে কেরাণীকেও এই প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। অবশ্য তাঁকে এখন বড় দফতরে দেবার মত মোটা দাগের হিসেবগুলোই প্রধানত লিখতে হয়, ওই মদের রেশনের মত নিয়মিত করার প্রচুর হিসেব লিপিবদ্ধ করার জন্য অধস্তন পেশাদার লেখকরা রয়েছেন। তবে লেখক মাত্রই খুব সম্মানের পাত্র, এক ভাবে তাঁরা সবাই এখন কিছুটা উঁচু তলার মানুষ হিসেবে বিবেচিত।

কেরাণীর ছেলে দুই জনের ক্ষেত্রে এসে আমলাতন্ত্রের প্রস্তুতির বিষয়টি বেশ পরিবর্তিত হয়েছে— এখন তাদেরকে রীতিমত স্কুলে যেতে হয়। সেখানে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী শিক্ষকরা— তাঁরা বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। বিষয়গুলো মোটেই সহজ নয়, কিন্তু কেরাণীর ইচ্ছে ছেলেরা এখানে খুব ভাল শিক্ষা পেয়ে আমলাতন্ত্রে একটি উঁচু পদেই ঢুকুক, তাদের বাবার মত একেবারে নিচের দিকে নয়। তাই তিনি ছেলেদের শিক্ষার ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন, সব সময় শিক্ষকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন— এসব শিক্ষক উরুকে সব চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্যতম বলে বিবেচিত। ছেলেদের কাজ দেখে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে কেরাণী যা বুঝলেন ভবিষ্যতে কাদার পাটালিতে লেখা শুধু হিসেবের

মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেনা। নানা জিনিসের জন্য যে চিহ্ন তার সংখ্যা অনেক বাড়ছে, সেগুলোর অর্থের ব্যাপ্তিও বাড়ছে। সব চিহ্ন এখন ঠিক জিনিসটির ছবির মতোও আর থাকছেনা, অনেক সময় মুখে জিনিসটিকে যা বলা হয় সেই শব্দটিকে লেখার জন্যই নানা চিহ্ন তৈরি করা হচ্ছে। অনেকগুলো চিহ্ন তো এত সাদামাটা করে ফেলা হয়েছে যে কতগুলো তীরের মত কোনাকৃতি চিহ্ন বামে, ডানে, ওপরে, নিচে মুখ করে লিখে ও তাদের সমন্বয় করেই নানা রকম জিনিসের নামের উচ্চারণ বোঝানো হচ্ছে। এসব এখনো কেউ ব্যবহার করছেনা। কিন্তু ওই জ্ঞানী শিক্ষকরা ভেবে ভেবে কিছু কিছু বের করছেন, এ নিয়ে অভিধান লিখছেন; আর ছাত্রদেরকে বিষয়গুলো শেখাচ্ছেন। তাঁরা বল্‌ছেন ছাত্ররা যেহেতু আগামী দিনের লেখক ও আমলা হবে, তাই তাদেরকে এখন ব্যাপক ব্যবহার না করলেও অন্তত শিক্ষার জন্য নিজেদের মধ্যে ব্যবহারের জন্য এসব ভবিষ্যতের লেখা শিখতে হবে। এই কঠিন জিনিসগুলোকে ছাত্ররা মজা করে বলে 'তীর-লেখা', বা 'কোণ্-লেখা'— ওই তীরের মাথা বা কোণের মত সব চিহ্নের কারণে নরম কাদার ওপর ওই আকৃতির কাঠির আগা চেপে চেপে যা লিখতে হয়।

ছেলেদের শিক্ষার বিষয় দেখে আরো কিছু জিনিস কেরাণীর কাছে স্পষ্ট হচ্ছে, তা হলো ক্রমে উরুকে সমরবিদ্যার গুরুত্ব বাড়ছে। হবু-আমলা ছাত্রদের মধ্যে বাছাই করে অনেককে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দেবার জন্য তৈরি করা হচ্ছে; আগে কখনো বিষয়টি এত গুরুত্ব পায়নি। অতীতে সব বিষয়ে উরুকের প্রাধান্য প্রশ্নের অতীত হলেও বেশ কিছু দিন যাবত ইউফ্রেটিসের পারে পারে প্রতিবেশী নগরগুলো উরুকের শক্তিশালী প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ ইরাকে কাছাকাছি এরকম নগরের মধ্যে নিপ্পুর, উম্মা, সিপুর, উর, কিশ এগুলো উল্লেখযোগ্য— বিশেষ করে উর আর উরুকের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে এখন একের ওপর অন্যের সামরিক আধিপত্য সৃষ্টির পর্যায়ে চলে গেছে। তা ছাড়া অন্য ছোট প্রতিবেশীগুলো কার বশে থাকবে সেটিও সামরিক শক্তি পরীক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধীরে ধীরে। তাই সেনাবাহিনী গঠন, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও কৌশলের উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য ভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব গড়ে তোলাও জরুরি হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে যারা এই সমর বিভাগের ওপর কর্তৃত্ব পেয়েছে তারা রাজার সর্বোচ্চ পারিষদের মধ্যে গণ্য হতে শুরু করেছে— এমন কি প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কেরাণীর উদ্বেগ হলো ভবিষ্যতে যুদ্ধ বিগ্রহ সত্যি সত্যি বাড়লে, সামরিক নেতারা বেশি গুরুত্ব পেলে, উরুক নগরের এবং আশপাশের অন্যান্য নগরের শান্তি এবং এখানে নতুন লিপি সহ যে সব জ্ঞানও ও শিল্পকলা বিকশিত হচ্ছে সেগুলো বিঘ্নিত হবে কিনা।

* * *

উরুক নগরীর ধ্বংসাবশেষের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু হয়েছিলো প্রাথমিক ভাবে ১৮৪৯-৫৪ সালে এবং আরো ভাল ভাবে ১৯১২ সাল থেকে। তখন থেকে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে ১৯৭৮ পর্যন্ত এখানে অনুসন্ধান চলেছে। এর ফলে দেখা গেছে যে আমরা এ কাহিনীতে পাঁচ হাজার বছর আগের যে উরুক নগরকে পেয়েছি তারও কয়েকশ' বছর আগে থেকে এখানে জমজমাট এক নগর গড়ে ওঠে একটি নগর-রাষ্ট্রের সূচনা হচ্ছিল। অবশ্য তারও হাজার বছর আগে থেকে এখানকার উর্বর মাটিতে কৃষিজীবী ও মৎস্য চাষীদের সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এর সব পর্যয়ের বহু নিদর্শন ও তথ্য কম বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আমাদের বর্ণিত কালের পর আরো প্রায় এক হাজার বছর ধরে এর গর্বিত অবস্থানের নানা পর্যায়ের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্য সব এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সঙ্গে মিলিয়ে সবাই এখন প্রায় নিশ্চিত যে এখানেই সত্যিকার অর্থে নগর সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটেছিলো। আর প্রতিবেশী কিছু নগরের সঙ্গে এই অঞ্চলটাতেই মানুষের প্রথম লিপির ও বিস্তারিত তথ্য লিখে রাখার উপায় উদ্ভাবন হয়েছিলো সেই প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। এরপর দ্রুত এই লিপি সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের লিপিতে পরিণত হয়ে অন্তত এখানকার জন্য প্রাগৈতিহাসিক কালের সমাপ্তির সূচনা করেছিলো।

উরুকের মন্দিরের এবং তার সঙ্গের ধাপ ধাপ স্তুপাকৃতি স্থাপনা সহ অনেক কিছুর প্রায় অক্ষত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে; সেই সঙ্গে ওখানকার নানা নিদর্শন, শিল্পকর্ম ইত্যাদির। তবে রোদে শুকানো ইটের তৈরি ভবনগুলোর অবক্ষয় অত্যন্ত বেশি হয়েছে— কাজেই বিভিন্ন যুগের সে ভবন সরাসরি তেমন কিছু বোঝা না গেলেও ও অন্যান্য আলামত থেকে যথাযথ সময়ের সেসব ভবনের এমনকি বেত-শনে তৈরি কুটির, নগর দেয়াল, খাল ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে নগর পরিকল্পনারও অনেক কিছু ফুটে ওঠেছে। মন্দিরে ও বিভিন্ন প্রাসাদের ধ্বংসস্তুপের সঙ্গে বেশ কিছু শিল্পকর্মের নমুনা খুঁজে পাওয়া গেছে যার কোন কোনটি খুবই পূর্ণাঙ্গ আবার কিছু কিছু ভাঙ্গা অবস্থায়। কবরস্থানগুলো থেকেও এরকম অনেক অলঙ্কার ও শিল্পকর্ম পাওয়া গেছে।

নগরের অর্থনৈতিক কাজকর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, গার্হস্থ্য জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে নানা প্রত্যক্ষ নিদর্শন থেকে যেমন জানা গেছে তেমনি শিল্পকর্মের মধ্যে এ সবের সমসাময়িক চিত্রন থেকেও জানা গেছে— ফুলদানির গায়ে প্রজার কর দেয়ার ছবি, শান্তি ও যুদ্ধের পটচিত্র, ইত্যাদি এর উদাহরণ। 'উরুকের নারী' নামক যে মূর্তির বর্ণনা আমরা দিয়েছি তার কল্পনা করা হয়েছে এই নামে পরিচিত হওয়া খননে প্রাপ্ত একটি মার্বেলে তৈরি মুখোশ থেকে। অন্যান্য শিল্পকর্ম থেকে মনে হয়েছে এই মুখোশটি একটি বড় মূর্তির অংশ ছিলো— আর মুখোশের গঠন, তাতে রাখা ছিদ্র ইত্যাদি থেকেও পূর্ণাঙ্গ মূর্তিটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উরুকের উৎপাদিত পণ্যের যে বৈশিষ্ট সে রকম পণ্য ও শিল্পকর্ম ব্যাপক এলাকায় পাওয়াতে উরুকের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কেও ভাল ধারণা পাওয়া গেছে। উরুকের দালানের অংশ বিশেষ, এর চমৎকার সব শিল্পকর্ম দুনিয়ার বহু বড় বড় যাদুঘরে রক্ষিত আছে যেমন বৃটিশ মিউজিয়াম, বার্লিন মিউজিয়াম, বাগদাদ মিউজিয়াম ইত্যাদি। এভাবে সংরক্ষিত উরুকের ফুলদানি সদৃশ সুন্দর আলাবাস্টার পাথরের পাত্রে রাজা-প্রজা সম্পর্কে নিয়ে যে বিস্তৃত ছবি খোদাই করা রয়েছে তার থেকে শিল্পীর চিন্তা ও উরুকের সমাজ চিত্র জানা সম্ভব হয়েছে। প্রায় অনুরূপ এরকম আরো পাত্র যথেষ্ট পাওয়া গেছে

বেশ সংরক্ষিত অবস্থায়। আবার কোন কোন প্রাপ্ত নিদর্শন এভাবে সংরক্ষিত আছে যা ঠিক উরুকের নয় কিন্তু সমসাময়িক প্রতিবেশী নানা নগরের যেগুলোর সবই মোটামুটি একই রকম সংস্কৃতি বহন করতো। এভাবে প্রতিবেশী উর নগর থেকে পাওয়া ব্যানারের মত পটচিত্রে ('ষ্ট্যান্ডার্ড অফ উর' নামে পরিচিত) চেপটা পুতুল সদৃশ ভাস্কর্যের যে মোজেক গড়া হয়েছে তা শান্তি, সমৃদ্ধি, যুদ্ধ ইত্যাদি নানা বিষয়ে পুরো এলাকাটিরই সমাজ চিত্র বহন করছে।

খুব সাদামাটা জিনিস হয়েও নিদর্শনগুলোর মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করছে অক্ষত ও ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া হিসাব নিকেশের তথ্য সহ অনেক শুকানো কাদার পাটালি (ট্যাবলেট)। ওই এলাকায়, ওই সময় যে ধীরে ধীরে মানুষ ভাষার লিপি উদ্ভাবন করছিলো তা এগুলো দেখলে বোঝা যায়। আমাদের সেই পাঁচ হাজার বছর আগের সময়টির কয়েক শত বছরের মধ্যেই এরই ধারাবাহিকতায় এখানে দৈনন্দিন বার্তা থেকে শুরু করে রাজকীয় ফরমান, সাহিত্য, বিজ্ঞান পর্যন্ত নানা বিষয়ে লেখার মত লিপি প্রবর্তিত হয়েছে। ত্রিভুজাকার তীর চিহ্নের মত অর্থাৎ ছেনি আকারের চিহ্নের আঁচড় নরম কাদার ওপর দিয়ে একই ভাবে যা লেখা হয়েছে। এই কারণে এই লিপিকে কিউনিফরম বলা হয়, যেহেতু ল্যাটিন ভাষায় এটিই ছেনির প্রতিশব্দ। তবে ছবি-চিহ্ন দিয়ে হিসেব রাখার আয়োজন থেকেই এর সূচনা হয়েছিলো।

একটি জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন এবং নগর-রাষ্ট্রের যে বিকাশ তার দিকে উরুক এবং প্রতিবেশী নগরগুলো অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। যেভাবে ব্যাপক হারে সরকারী সীল মোহর ইত্যাদির প্রচলনের নমুনা পাওয়া গেছে তার থেকেও সেটি স্পষ্ট হয়েছে। এর কয়েক শ' বছর পর থেকে কিউনিফরম লিপিতে এখানকার নানা বিষয়ে সত্যিকার বর্ণনাই কিছু কিছু পাওয়া যেতে আরম্ভ করেছে এবং সেই লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হওয়াতে এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসান হয়েছে অথচ ওই সময় এবং তারো অনেক পর পর্যন্ত পৃথিবীর বহু চমৎকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে লিপি প্রচলিত হয়নি, আবার অনেকের লিপি কখনোই আমাদের কাছে পাঠোদ্ধার হয়নি। আমাদের জন্য তারা প্রাগৈতিহাসিক কালেই রয়ে গেছে।

উরুকের খনন

উরুকের প্রধান মন্দির

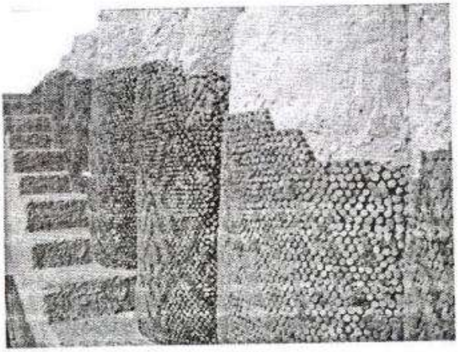

মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনাতে ছোট ছোট টালি
লাগানো কারুকার্য

'উরুকের নারী'
(মার্বেল পাথরের মুখোশ)

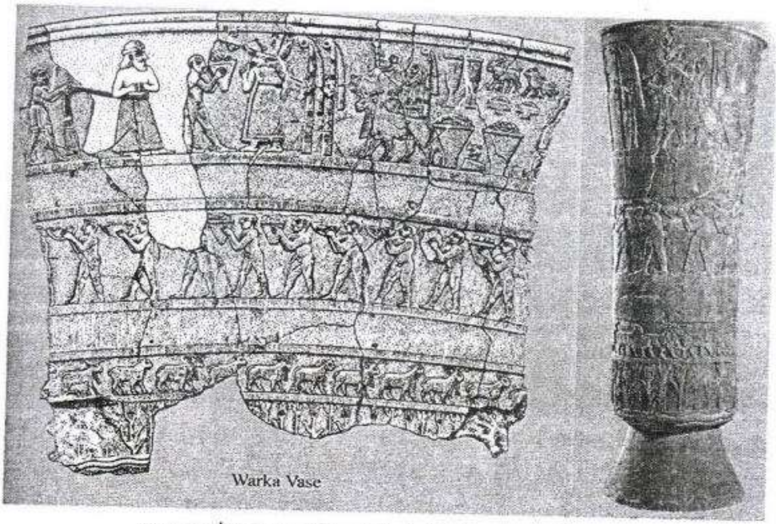

আলাবাস্টার ফুলদানিতে রাজা-প্রজা সম্পর্কের চিত্রায়ণ

পটচিত্রের এক পাশ (শান্তি)

মদের রেশন বন্টনের হিসাব রাখার কাদার পাটালি

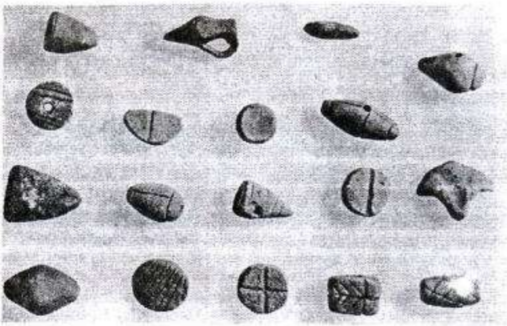

কাদার টৌকেন

পাকিস্তানের হরপ্পার দেবদাসী ঃ সাড়ে চার হাজার বছর আগে

বণিক ও শিল্পকর্মীদের এ নগরে কোন প্রাসাদ কিংবা বড় মন্দির নেই, কিন্তু সবার জন্য নাগরিক সুবিধার কমতি নেই। এখানে বিশিষ্ট জন বলতে বরং হরপ্পা ভবনের মঞ্চে নৃত্যের জন্য খ্যাত এবং দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত জীবনের দেবদাসীকে বলা যেতে পারে।

খুব ছোট বেলায় দেবদাসীর অন্য একটি নাম ছিল, যে নাম এখন সবাই ভুলে গেছে। এর কারণ হরপ্পার দেবদাসী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার পর তার সব পূর্ব পরিচয় এখন মিথ্যে হয়ে গেছে। যে জনাবিশেক ভাগ্যবতী এখন হরপ্পার দেবদাসী তারা এখানকার সব স্তরের মানুষের কাছে দেবতার প্রতি উৎসর্গিত মানুষ হিসেবে অতি সম্মানিত আসনে রয়েছে- যদিও তাদের প্রায় সবারই বয়স ষোল থেকে পঁচিশের মধ্যে। তাই তাদের পূর্ব নামে নয় বরং সবাইকে দেবদাসী বলেই সম্বোধন করাটাই নিয়ম। এই নগরের হাজারো বালিকার স্বপ্ন এই দেবদাসী হতে পারা, কিন্তু হতে পারে ক'জনা? এর জন্য সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন যে গুণ সেই নাচের প্রতিভাটি প্রায় জন্মগত ভাবে না থাকলে দেবদাসী হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য শুধু প্রতিভা নয়, একেবারে চার পাঁচ বছর বয়স থেকে অমানুষিক পরিশ্রম করে ওদেরকে দৈব নৃত্যকলায় পারদর্শী হতে হয়েছে।

আমাদের দেবদাসী খুবই ছোট বেলায় নাচের মুদ্রাগুলো নিজ থেকে এত সুন্দর করে করতো যে অনেক বাবা মা'র মত ওর বাবা মা'রও আগ্রহ জন্মেছিলো চেষ্টা করে দেখতে, তাই নৃত্যকলা মন্দির নামে হরপ্পার সব চেয়ে নাম করা নাচের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলো তাকে। ওখানে যারা দেবদাসী হবার লক্ষ্যে ভর্তি হয় তাদের ব্যাপারটাই আলাদা। তাই আমাদের দেবদাসীকে বাড়ি ছেড়ে স্থায়ী ভাবে স্কুলে চলে গিয়ে কঠিন সাধনা করতে হয়েছে দশ দশটি বছর, তারপর সে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হরপ্পার দেবদাসী হবার সম্মান পেয়েছে। স্কুলে না হলেও এখনো তাকে থাকতে হয় অন্য দেবদাসীদের সঙ্গে নগরের উচ্চ মহলায় বিশাল হরপ্পা ভবনের কাছাকাছি একটি ভবনে। নগর দেবতার উদ্দেশ্যে নানা উপলক্ষে যখন পূজা দিতে হয় শাস্ত্রীয় নাচের মাধ্যমে তার নৈবদ্য সাজাবার দায়িত্ব বর্তায় হরপ্পার দেবদাসীদের ওপরেই।

হরপ্পা নগর এখন এই পুরো সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলের সেরা নগর, যদিও অন্যগুলোর কয়েকটি বেশ সেয়ানে সেয়ানে রয়েছে এর সঙ্গে। সিন্ধুর উপনদী ইরাবতীর পারে বেশ বিরাট পরিধি নিয়ে ইটের তৈরি উঁচু জবরদস্ত নগর-দেয়ালে ঘেরা হরপ্পা। নগরের একটি উচ্চ মহলা আর একটি নিম্ন মহলা রয়েছে। একটু উঁচু বিশাল ডিবিটার ওপরেই উচ্চ মহলা যেখানে রয়েছে সেখানেই ওই হরপ্পা ভবন। আর রয়েছে ইটে বাঁধানো বিশাল নগর চত্বর। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ গণ-স্থাপনা বাদ দিলে রাস্তাঘাট বাড়িঘর, এমনকি জবরদস্ত সব গুরুত্বপূর্ণ জমায়েত কেন্দ্রগুলো উচ্চ ও নিম্ন দুই মহলায় সমানে বিস্তৃত হয়ে আছে। এর মধ্যে বড় বড় বাজারগুলো আছে, আছে বড় বড় চত্বর, নগর সরকারের নানা দফতর, শস্য গোলা ইত্যাদি— উচ্চ মহলা নিম্ন মহলা দু জায়গাতেই। উভয় মহলায় বাড়িগুলোর ক্ষেত্রেও একথা সত্যি— বড় বাড়ি, ছোট বাড়ি দু'জায়গাতেই রয়েছে। বড় বাড়িগুলো পাকা ইটের তৈরি, অধিকাংশ বাড়ির মেঝেও ইট বিছানো এবং জিপসামের পলেস্তরা দেয়া। বাড়ির ছাদগুলোরও সমতল ইটের গাঁথুনি। ইটের ফাঁকে ফাঁকে জিপসামের মশলা ব্যবহার করা হয়েছে।

উচ্চ মহলায় এমনি একটি বড় বাড়িতে দেবদাসী থাকে। ওর অধিকাংশ কাজ পাশেই বিশাল হরপ্পা ভবনের মঞ্চে। অভ্যাগতদের মধ্যে থাকে নগরীর গণ্যমান্যরা, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা। হরপ্পা একটি নগর-রাষ্ট্রের মত কাজ করে বটে কিন্তু এর কোন সরকার-প্রধান স্পষ্ট ভাবে নেই। নগরের ক্ষমতা মোটের ওপর ব্যবসায়ী পরিষদের ওপর। নগরের পঁচিশ হাজারের মত বাসিন্দাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী ও কুশলী শ্রেণীর মানুষ। আর তাদের যারা শিরোমণি সেই অত্যন্ত ধনী ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরাই হলো নগরের হর্তাকর্তা বিধাতা— ব্যবসায়ী পরিষদ। তারাই যৌথ ভাবে কর্তৃত্ব করে। অবশ্য নগরকে খুবই পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে এর নাগরিক সুবিধাগুলো ভাল রাখতে ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। এগুলো জোর খাটিয়ে যতখানি না করা হয়, তার চেয়ে বেশি হয় এক রকম ধর্মীয় আনুগত্য সৃষ্টি করে— নগরের অধিষ্ঠাতা দেবদেবীদের প্রতি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সব সময় লেগে আছে, আর ভক্ত নাগরিকরা এ সবের মধ্য দিয়েই নাগরিক শৃঙ্খলা মিলে চলতে অভ্যস্ত হয়— তেমন কেউ তাদেরকে বাধ্য করতে হয় না। আর এসব আচার অনুষ্ঠানেই দেবদাসীর এত মর্যাদা, এত গুরুত্ব। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত জীবনে সে বাবা-মা-পরিবার, নিজের সংসার করার আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জন দিয়েছে। তার এরকম ত্যাগ নাগরিকদের মধ্যে ভক্তি সঞ্চার করে। এর ফলে তার উপস্থিতিই পরিবেশকে পবিত্র করে বলে মনে করে তারা। তার নৃত্যের ভঙ্গিমাটিও সকল গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন।

ওই সব আচার অনুষ্ঠানের খাতিরে হরপ্পা ভবন ছাড়াও দেবদাসীকে নগরের নানা অঞ্চলে যেতে হয়। অন্য অভিজাতরা যা করে সে রকম দেবদাসীও নগরে

ভ্রমণ করে সুসজ্জিত গরুর গাড়ীতে। গরুতে টানা এই গাড়ি এখনকার হরপ্পার গর্ব— বহু উন্নত সভ্য দেশে যেখানে এখানকার ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়ত করে সেখানে কেউ যাতায়তের জন্য চাকার গাড়ী দেখেনি— যুদ্ধের রথের কথা অবশ্য ভিন্ন। নগরে দেবদাসীর এ রকম একটি গন্তব্য হলো পূণ্য স্নানের পবিত্র চৌবাচ্চার অঙ্গনে। এটি নগরীর নিম্ন মহলায় অবস্থিত— চারিদিকে দেয়ালে ঘেরা একটি বড় চত্বরের মাঝখানে সুইমিং পুলের মত ব্যবস্থায় একটি জলাধার। ১২ মিটার লম্বা ৭ মিটার চওড়া এই জলাধার ইটের গাঁথুনিতে তৈরি একেবারে গায়ে গায়ে ফিট করানো ইটের তৈরি বলে এটি পানি ধারনে সক্ষম। তারপরও আরো নিশ্ছিদ্র করার জন্য আগাগোড়া আলকাতরা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। এর পানিকে মনে করা হয় দেবতার পূণ্য বারি— তাই বড় কোন কাজে নামার আগে নাগরিকরা এখানে ডুব দিয়ে যায়। দুই প্রান্তে দুটি ইটের তৈরি ঘাট ধাপে ধাপে পানিতে নেমে গেছে— ওখানে স্বল্প পানিতে দাঁড়িয়ে ভক্তরা পূণ্য স্নান করে দেবতার কাছে নিজ মনোবাসনা প্রকাশ করে, নিজেকে পবিত্র করে।

প্রায়শ এই পূণ্য স্নানের জলাশয়ে হরপ্পার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আচারগুলো হয় নগরের ভাগ্য নিয়ন্তাদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, প্রকল্প ইত্যাদির ওপর আর্শীবাদের বারি বর্ষণের জন্য। তখন এর চেহারা বদলে যায়। নতুন ভাবে সাজানো হয় জলাশয়ের চারিদিক; ওখানে বসে ভক্তি সঙ্গীতের আসর। সুন্দর বাঁকানো ত্রিভুজ আকৃতির বীণায় ছোট থেকে বড় সাতটি তারের ঝংকারে কেঁপে ওঠে পুরো এলাকা। অনুষ্ঠানের সব চেয়ে আবেগ ঘন মুহূর্ত হলো দেবদাসীদের নৃত্য-নিবেদন। উদ্দেশ্য একটিই— হরপ্পার পরবর্তী নগর-প্রকল্পটি পূণ্য হোক। এই পুরোটা সময় পূণ্যার্থী রথী মহারথীরা জলাশয়ে অংশত ডুবে থেকে প্রণামে পূণ্য বারিতে মাথা নত করে রাখেন। হরপ্পার রাজকার্যের আনুষ্ঠানিক রূপ বলতে হলে এইই মনে হয় চরম জিনিস। আর অন্য কোন রকম জাঁকজমক এখানে নেই। আসলে পুরো নগরটিও ওরকম— প্রয়োজনীয় সবকিছু চমৎকার ভাবে চাই, কিন্তু বাহুল্যের কোন স্থান নেই এখানে। তাই কোন রাজপ্রাসাদ নেই, কোন বিশাল মন্দির নেই, নেই অন্য কোন মনুমেন্ট— স্তুপ, পিরামিড কিংবা মিনার।

প্রয়োজনীয় সব কিছু চমৎকার ভাবে থাকার নমুনা এখানকার যে কোন বাড়িতে ঢুকলেই বোঝা যায়। ঢুকতে হচ্ছে সদর রাস্তা থেকে নয়, কারণ সব বাড়ির দরজাটি পাশের ছোট রাস্তা বা গলির দিকে, এবং বাড়ির মধ্যে যে ভেতরের উঠোন থাকে তার দিকে। কাঠের তৈরি দরজাগুলোও চমৎকার— কিনারায় চারিদিক ঘিরে চৌকাঠ কাঠামো আর দরজার কপাটটিও সুন্দর কাজ করা কাঠের; দরজার কবজাটি তৈরি হয় ইট কেটে ও তাতে ছিদ্র করে যার খিলের মধ্যে দরজার অংশ ঢুকানো থাকে। জানালাগুলোও ও ভাবেই গলির দিকেও উঠোনের দিকে খোলে, এও চমৎকার ভাবে কাঠ দিয়ে তৈরি । এতে রয়েছে কাঠের গ্রিল, এবং কপাটে শাটার। ওই যে ভেতরে উঠোন সেখানে অনেক বাড়িতেই আছে তার

নিজস্ব কুয়া। সেখান থেকে পোড়া মাটির নলের মধ্য দিয়ে পানি গোসলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রত্যেক বাড়িতে গোসলখানা রয়েছে, তেমনি প্রত্যেক বাড়িতে পায়খানাও রয়েছে। গোসলখানা থেকে এবং বাড়ির অন্যান্য জায়গা থেকে ব্যবহৃত ময়লা পানি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একটি ছোট ঢাকনি দেয়া নালা দিয়ে— ইটের তৈরি পাকা নালা। এই ছোট নালা আবার যুক্ত হয়েছে বড় রাস্তার পাশ দিয়ে যাওয়া বড় নালায়, যা আবার একেবারে নগরের বাইরে নদীতে নিয়ে ময়লা পানি ফেলছে। এর থেকে আলাদা ভাবে অন্য নালা দিয়ে একই ভাবে যাচ্ছে বাড়ি বাড়ি পায়খানার বর্জ্য তবে অন্য জায়গায়।

প্রত্যেকটি নালার ওপরটি ইটের খিলানের মত আবরণে ঢাকা— কোন কোনটার ওপর দিয়ে রাস্তাও চলে গেছে। কিছু দূর পর পর নালার আবরণের ব্যবস্থাটি অস্থায়ী, ইট খুলে ওখানটায় নালা পরিস্কার করা যায়। সব কিছুতে ওরা এতই সাবধান যে বড় যে নালা নগর অতিক্রম করে গেছে সেখানে একটি কপাটও দেয়া আছে যাতে কেউ এই বড় ঢাকা নালা দিয়ে অবৈধ ভাবে নগরে ঢুকতে না পারে। মানব-বর্জ্যের নালাগুলো নগরের বাইরে কৃষি-খেতের কিনারায় গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে ছড়িয়ে নির্দোষ হয়ে সার হবে বলে। হরপ্পায় কোন রাজকীয় হাঁকডাক নেই বটে, কিন্তু সব কিছু সুন্দর পরিকল্পনা করে করা হয়, এবং সবার নাগরিক সুবিধাগুলো খুব গুরুত্ব পায়। যেমন প্রায় পুরো নগরের রাস্তা ও দু'পাশের বাড়িগুলো তৈরি হয়েছে উত্তর-দক্ষিণে এবং পূর্ব-পশ্চিমে সোজা রেখায় যেন গ্রাফ পেপারের ছকের মত। এখানে সিন্ধু অববাহিকার অন্যান্য ছোট বড় নগরেও তাই। দেবদাসীর নিত্য কাজের জায়গা হরপ্পা ভবন এবং এর সামনাসামনি তার থাকার ভবন— এই দুটি মনে হয় নগরের সব চেয়ে আদর্শ ভবন, যদিও কোনটাই জমকালো কিছু নয়। হরপ্পা ভবনের গর্ব হলো এর বিশাল হলঘর এবং এর সুদৃশ্য মঞ্চ। যে ধর্মীয় ভক্তি ও সংহতি এখানকার শৃঙ্খলা ও কর্মদ্যোম ধরে রেখেছে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এগুলো তৈরি। এখানেই নগর-দেবতার অধিষ্ঠান ও দেবদাসীর নৃত্যগীত তার প্রতি নিবেদিত করার স্থান। অন্য ভবনটি দেবদাসীদের বাসস্থান এবং ভক্তদের দর্শন দেবার স্থান হওয়া ছাড়াও নগরের জন্য একটি শিল্পকলা একাডেমি ও মিউজিয়ামের মত। দেবদাসীরা হলো একদিকে দেবীত্বের আসনে, অন্য দিকে হরপ্পার শিল্পকলার তারকার আসনে। একাডেমি ও মিউজিয়াম তাই মূলত ওদের জীবন ও ওদের প্রতিভাকে কেন্দ্র করেই। বহু উপলক্ষে অভ্যাগতরা এসব দেখতে যান।

এমন সুন্দর মজবুত বাড়িঘর করতে এবং পোড়া ইট ও পটারি ব্যবহার করে রাস্তা, নালা, পানির নল ইত্যাদি তৈরি করতে একটি জিনিস হরপ্পাকে খুব সাহায্য করেছে— সেটি হলো স্থানীয় ভাবে প্রচুর গাছপালা থাকা, যেখান থেকে কাঠ, জ্বালানি ইত্যাদি নানা কাজের জন্য পাওয়া যাওয়া। হরপ্পার বাড়ির যে এত সুন্দর দরজা-জানালা হতে পোরেছে তা এই কাঠের কল্যাণে। তার চেয়েও বড় কথা

হলো যে বিশাল পরিমাণ পোড়া ইটের প্রয়োজন হয়েছে তা পুড়তে অনেক কাঠ খড়ের জ্বালানি লেগেছে। এই ইট হরপ্পার গর্ব। প্রায় সব ইটই ঠিক একই মাপের ৪:২:১ এই অনুপাতে তার দৈর্ঘ, প্রস্থ, পুরুত্ব। সুলভে ইট পোড়া সম্ভব হয়েছে বলে হরপ্পাতে নানা শ্রেণীর ও নানা আয়ের মানুষের বসত সত্ত্বেও অধিকাংশের পক্ষে পোড়া ইটের বাড়িতে থাকা সম্ভব হয়েছে। তারপরও অবশ্য কিছু মানুষকে রোদে শুকানো ইটের বাড়িতে বাস করতে হয়। কিন্তু বাড়ির গঠন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যথাসম্ভব একই বলে সেগুলোকে নগরে খুব বেমানান বলে মনে হয়না। গাছপালা থেকে জ্বালানি সংগ্রহের সুযোগ থাকাতে আর একটি বড় লাভ হয়েছে যে এখানে ব্যাপক আকারে পটারি শিল্প বিকাশ লাভ করতে পেরেছে। অন্যান্য অনেক সংস্কৃতির মত বিশেষ অলঙ্করণ ও বৈশিষ্ট সম্পন্ন পটারি এখানে শিল্পকর্ম হিসেবে খুবই আদর লাভ করেছে। হরপ্পার বিশেষ পটারির ধরণ ও অলঙ্করণ দেখলেই ব্যবসায়িক ভাবে সম্পর্কিত সর্বত্র মানুষ একে চিনতে পারে। এরকম কোন কোন পটারিতে বিভিন্ন প্রাণীর কিছুটা প্রকৃত কিছুটা কাল্পনিক প্রতিকৃতি ব্যবহার করা হয়, আবার অধিকাংশগুলোতে জ্যামিতিক নানা ডিজাইনের দ্বারাই বিশেষ ধরনের অলঙ্করণ ফুটিয়ে তোলা হয়। কখনো কখনো এসব জ্যামিতিক ডিজাইন খুব সূক্ষ্ম প্রকৃতিরও হয়। কিন্তু একই সঙ্গে হরপ্পায় পটারি একটি বড় নির্মাণ সামগ্রীও বটে। ব্যক্তিগত ভাবে গেরস্থালিতে ব্যবহার ছাড়াও নগরের অনেকগুলো শস্যাগারে বড় বড় পটারির পাত্রে শস্য সংরক্ষণ করা হয়। পানি সরবরাহের জন্য পটারির নলও এর নানা আকারের রিং জোড়া দিয়ে দিয়ে তৈরি হয়। বিশেষ করে কুমারের চাকা ব্যবহার করে পটারি তৈরি হয় বলে ছোট বড় নানা আকারের সরল পটারি তৈরি খুবই দ্রুত ও ব্যাপক ভাবে সম্ভব হয়েছে।

হরপ্পার পোড়ামাটির ছোট মূর্তিগুলোর একটি আলাদা সুনাম দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণত বিভিন্ন ভঙ্গিতে মানুষের প্রতিকৃতিই এসব মূর্তিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পুরুষের মূর্তিগুলো অধিকাংশ সাদাসিদা। কিন্তু অনেক স্ত্রী মূর্তিতে জমকালো চুলের খোপা, গায়ের পোষাক, ফুলেল সুসজ্জা, জড়োয়া অলঙ্কার দেখা যায়।

ইটের ও কাঠের আরো বড় বড় সব ব্যবহার রয়েছে হরপ্পাতে। পুরো নগরীর চারিদিকে ঘিরে রেখেছে ইটের তৈরি বেশ পুরু এবং উঁচু দেয়াল। নগরীর নিরাপত্তা ও বিশেষ করে আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ, শুল্ক আদায় এসবের জন্য দেয়ালের দরকার আছে। তবে তার চেয়েও বেশি দরকার বন্যার পানি থেকে নগরকে রক্ষা করার জন্য। নদীতে প্রায়ই বান ডাকে, কখনো কখনো সেটি বন্যায় পরিণত হয়। একে ঠেকাতে ভাল গাঁথুনি দেয়া ইটের দেয়ালের প্রয়োজন। তার ঠিক বাইরেই নদীর দিকে বাঁকা হয়ে নেমে যাওয়া একটি ভেড়ি বাঁধও রয়েছে একই উদ্দেশ্যে। নগরের নিম্ন মহলার নানা জায়গায় একই রকম ইটের দেয়ালে ঘেরা ছোট ছোট জায়গা রয়েছে— সেগুলো আসলে বাণিজ্যিক কুঠি। অনেকটা

ছোট দুর্গের মত দেখতে এ কুঠিগুলো ব্যবসায়িক দফতর, কিছু উৎপাদন কেন্দ্র এবং গুদাম নিয়ে গঠিত যেগুলোর আলাদা করে বিশেষ নিরাপত্তা দেয়া প্রয়োজন।

হরপ্পার স্থাপনাগুলোর মধ্যে খুবই প্রশংসিত হলো নগর দেয়ালের বাইরে এর নদী বন্দর। বন্দরে বড় বড় নৌকাতে মাল ওঠানামা করার জন্য সুন্দর ডকইয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে— প্রচুর মানুষ সেখানে কাজ করে। এখান থেকে নদীপথে মাল সিন্ধু অববাহিকার সর্বত্র তো যায়ই, আরব সাগর অবধি গিয়ে সেখান থেকে বড় জাহাজে পারস্য উপসাগর হয়ে ইউফ্রেটিস নদী সিষ্টেমে ঢুকে মেসোপোটেমিয়ার বিখ্যাত সব নগরী ও ব্যবসা-কেন্দ্র সমূহে সহজে পৌছে যায়। এখান থেকে মিশরের নগরগুলোর সঙ্গেও হয় যোগাযোগ। এই অতি দূরপাল্লার যাত্রার জন্য আরব সাগরের তীরে হরপ্পার নিজস্ব কিছু ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দফতর রয়েছে যেগুলো নৌকা থেকে মাল খালাস করে জাহাজে তোলার কাজ দেখাশোনা করে। ডক ইয়ার্ডের সঙ্গে রয়েছে ওঠানামার জন্য জেটি। নদীর পানির উচ্চতা হরদম পরিবর্তিত হচ্ছে বলে পুরু কাঠের কপাটের সাহায্যে লক-গেট খালের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। ওই কপাট বন্ধ করে দিলে খালের পানির উচ্চতা আর নদীর পানির উচ্চতার ব্যবধান বজায় থাকে এবং নৌকাসহ খালের পানিকে সব সময় জেটির সুবিধাজনক উচ্চতায় রাখা যায়। যে নৌকায় জন্য এত আয়োজন সেগুলোও যথেষ্ট উন্নত। বড় বড় কাঠের তক্তা নিশ্ছিদ্র ভাবে জুড়ে এসব নৌকার সমতল তলা এবং পাটাতন তৈরি হয়। নৌকার বাকি অংশও এভাবেই তৈরি। মাঝখানে কাঠের উঁচু মাস্তুল এবং তার সঙ্গে তুলার কাপড়ের অথবা উদ্ভিজ আঁশের বোনা পাল খাটানো হয়।

বোঝাই যাচ্ছে পুরো হরপ্পা নগরীটি শিল্প উৎপাদন ও ব্যবসা কেন্দ্রিক। কিন্তু এই পুরো কর্মব্যস্ততায় পুরুষের স্পষ্ট প্রাধান্য রয়েছে। ব্যবসা ও শিল্পকর্মে মেয়েদেরকে খুব একটি দেখা যায়না। তাই বলে মহিলাদের সম্মান যে কম তা বলা যাবেনা। বরং অভিজাত ও ধনী অভিজাত অনেক পরিবারে মহিলারা বেশ কর্তৃত্বের আসনে আছে বলে শোনা যায়। তা ছাড়া দেবতার চেয়ে দেবীরাই এখানে বেশি পূজনীয়। হরপ্পার বাইরে কৃষিকাজেও মেয়েদের ভূমিকা কিছুটা রয়েছে। এখানে শিল্প ও ব্যবসার এই কেন্দ্রীভূত আয়োজন সম্ভব হয়েছে ইরাবতী নদীর পানির বদৌলতে চারিদিকে বিস্তর উর্বর জমি থাকার কারণে। হরপ্পার ২৫ হাজার বাসিন্দার জন্য সারা বছরের জন্য যথেষ্ট খাদ্য উদ্বৃত্ত ফলাতে পারে এর কাছাকাছি গ্রামগুলোর মানুষরা। বার্লি, গম, এবং কিছু ধান— এগুলোই প্রধান শস্য। তবে নানা রকম সবজিও ওরা ফলায় যার প্রায় সবটুকুই নগরবাসীর চাহিদা মেটাতে ব্যয় হয়। বার্লি বা গমের ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এর বড় অংশ নগরের জন্য সংগ্রহ করে বড় বড় ব্যবসায়ীরা এবং যার যার বড় বড় শস্য গোলায় মজুদ করে। বিভিন্ন মৌসুমে সবজিগুলো নগরের কয়েকটি পাইকারি বড় বাজারে সরবরাহ করা হয়। শস্য হিসেবে চালের উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম বলে এটিকে

কিছুটা বিলাসী খাবার হিসেবে গণ্য করা হয়— বড় লোকের পাতের জন্য। খাদ্য শস্য ছাড়া জমির বড় ব্যবহার অবশ্য তুলা উৎপাদনে। তুলাকে পোষ মানিয়ে কৃষি প্রজাতিতে পরিণত করা, ফ্ল্যাক্স থেকে তৈরি লিনেনের বদলে একে কাপড় বোনার প্রধান আঁশ হিসেবে ব্যবহার করা— এগুলো তার বহু আগে এই সিন্ধু অববাহিকার মানুষরাই শুরু করেছিলো। এখন এটি এখানকার একটি বড় কৃষিপণ্য। হরপ্পাসহ এখানকার বড় বড় নগরগুলোতে তুলার বিরাট বাজার তো রয়েছেই, অনেক দূরেও রফতানী হয় এই তুলা।

হরপ্পার শিল্পগুলোর মধ্যে একটি বড় শিল্প হলো ওই তুলা থেকে কাপড় তৈরি। নগরের একটি এলাকাই রয়েছে তাঁতপট্টি— সারাদিন যেখানে চরকা আর তাঁতের শব্দ শোনা যায়। তবে শুধু তাঁতীরা নয় বড় বড় কাপড়ের ব্যবসায়ীরাও এখানেই থাকে, তাদের আড়ত, তাদের দু একটি বাণিজ্যিক কুঠিও এই তাঁতপট্টির আশ পাশে রয়েছে। কাপড় রাঙাবারও বেশ বড় সড় আয়োজন রয়েছে এখানে— রাঙাবার বেশির ভাগ রঙ তৈরি হয় বিভিন্ন বিশেষ উদ্ভিদ, শামুক ইত্যাদি প্রাণী, আর নানান রঙের ও ধরনের মাটি দিয়ে। রঙের এ সব কাঁচামাল বেশির ভাগ আমদানী করতে হয়।

তাঁতপট্টির মত হরপ্পায় রয়েছে পৃথক কাঠপট্টি, জহুরিপট্টি, কুমোরপট্টি ইত্যাদি। এ ভাবে এক একটা এলাকায মোটামুটি এক একটি পেশায় প্রাধান্য। শহরের বাসিন্দাদের মধ্য এবং বাড়ির এলাকার মধ্যে ধনী গরীবের হিসেবেও প্রচুর শ্রেণী বিভক্তি আছে। তবে তাই বলে শহরের চেহারায় তার খুব বেশি প্রতিফলন ঘটেনি— মোটা দাগে সব বাড়ি, সব রাস্তা, সব নাগরিক সুবিধা কমবেশি একই রকমের।

যদিও তামা এবং তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ হরপ্পাতে নিয়মিত তৈরি হচ্ছে কিন্তু এসব ধাতুর ব্যবহার বলতে গেলে অলঙ্কারের জগতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, কিছুটা ছোট ছোট মূর্তি গড়ার ক্ষেত্রে। আটপৌরে ব্যবহারের জন্য ধাতুর ব্যবহার এখানে চালু হয়নি, এর দুষ্প্রাপ্যতা এবং শক্ত কোন কাজের জন্য এসব ধাতু উপযুক্ত না হওয়াটাই এর কারণ। হরপ্পার আচার ও আবেগের বেশ কিছু যে নগরীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিমুখী তার আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় ধাতু পট্টিতে ধাতুর কারিগরদের হাতে সৃষ্ট অলঙ্কার ও উপাচারগুলোকে সর্বত্র জনপ্রিয় করতে হরপ্পা ভবনের চেষ্টায়। দেবদাসীর অংশ গ্রহণ এতে সরাসরি অবদান রাখছে। প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টি দেবদাসীর পোষাকেও, নৃত্যে স্থান পায়। সাধারণ ভাবে ধাতুর ওপর একটি পবিত্রতা আরোপের চেষ্টা রয়েছে, যা উচ্চ উত্তাপে খাঁটি হয়ে মানুষের কাছে আসে, দেবদাসীর সাহচর্যে দৈব নৈকট্য লাভ করে। একটি জিনিস খুব লক্ষ্যনীয়। একেবারে কাঠ-ইটের মত ভারী পণ্য থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র সোনার দানা পর্যন্ত সব কিছু মাপার জন্য সুন্দর মাপের একক ও নানা সাইজের বাটখারা এখানে রয়েছে যার সবই সূক্ষ্মভাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত। বাটখারার প্রকৃত

ওজনের ওপর যথেষ্ট খবরদারি রয়েছে। ব্যবসায়িক শৃঙ্খলা রাখার জন্য হরপ্পাতে যে যথেষ্ট চেষ্টা রয়েছে এটি এক একক, দুই একক, পাঁচ একক, দশ একক, বিশ একক, পঞ্চাশ একক এভাবে সব বাটখারা রয়েছে— তা সে খুব ছোটই আর খুবই বড়ই হোক।

এখানকার ব্যবসায়িক জগতে আরেকটা জিনিসের ব্যবহারের ছড়াছড়ি দেখা যায় তা হলো সীল মোহর। সোপস্টোন, পোড়ামাটি, তামা ইত্যাদি নানা জিনিসে খোদাই করা এ সীলগুলো দেখার মত। নানা জীবজন্তুর ছবিই বেশি রয়েছে এসবে— সত্যিকার জীব জন্তু ষাঁড় ইত্যাদি রয়েছে, রূপকথার কাল্পনিক নানা প্রাণীও রয়েছে। এগুলো নানা পণ্যের ওপর ব্যবসায়ীর ছাপ দিতে ব্যবহৃত হয়, আবার প্রাসঙ্গিক মানুষরা হাতে বা গলায় পরে প্রদর্শনও করে। জীবজন্তু ছাড়া আরো কিছু ছবির দৃশ্য মানুষের, দেবতার— এসব সীল মোহর এখানকার মানুষের সমাজ ও ধর্ম বিশ্বাসের কিছু পরিচয় তুলে ধরে। গর্ব করার মত অলঙ্কার শিল্প আচার-অনুষ্ঠানে নৃত্যের সময় দেবদাসীর পরা অলঙ্কার থেকে বোঝা যায়। তার পরনে বস্ত্র পরিমিত হলেও অলঙ্কারেই গা অনেকটা ঢাকা। তামার বা ব্রোঞ্জের এবং শাঁখের ও মূল্যবান পাথরে তৈরি চুরিতে তার দুই হাতের পুরোটাই প্রায় আবৃত। গলা ও বুক আবৃত একটার পর একটা নেকলেসে। এসব তৈরি নানা পাথরের পুঁতি, লকেট, সোনার পুঁতি ইত্যাদি নানা কিছুর সমন্বয়ে। মাথায়, কোমরে, পায়ে এমনি সব অলঙ্কার। দেবতার প্রতি নিবেদিত তার নাচের সঙ্গে এই অলঙ্কারের একটি সামঞ্জস্য রয়েছে। নাচের নানা মুদ্রায় বিভিন্ন অলঙ্কারের আন্দোলনগুলোও লক্ষ্যনীয়। তবে হরপ্পার অলঙ্কারে যত মূল্যবান বস্তু ব্যবহৃত হয় তার সব কিছু হরপ্পায় পাওয়া যায়না। অনেক কিছুই দূর অঞ্চল থেকে আমদানী করতে হয়। যেমন কার্নেলিয়ান এবং ল্যাপিজ লুজুলি এই দুটি মূল্যবান পাথর বহু দূর থেকে আনতে হয়। কিন্তু এগুলোর ওপর প্রচুর কাজ হরপ্পাতে হচ্ছে। কাছেই সিন্ধু অববাহিকার অন্যান্য কিছু সমৃদ্ধ নগরের সঙ্গে এগুলোর বাজার নিয়ে হরপ্পার প্রতিযোগিতা রয়েছে। এসব নগরের মধ্যে রয়েছে— মোহেনজোদারো, গানেরিওয়ালা (উভয়ে বর্তমান পাকিস্তানে); এবং রূপার, দৌলাভিরা, রাখিগাড়ী (তিনটাই বর্তমান ভারতে) ইত্যাদি। কাছাকাছি এ নগরগুলোর সামগ্রিক লোকসংখ্যা নিয়ে একটি আভ্যন্তরীন বাজার তো রয়েছেই— এই সিন্ধু সভ্যতার উৎপন্ন দ্রব্যগুলোর বাজার সুদূর মিশর, মেসোপোটেমিয়া, ইরান, আফগানিস্তান এসব জায়গাতেও রয়েছে। এ সব জায়গাসহ দূর দূর জায়গা থেকে কাঁচামাল এনে এখানে তাকে শিল্পরূপ দেয়া হয় এবং তাতে মূল্য সংযোজন করা হয় অনেক গুণে; আর সে অবস্থাতেই এসব রপ্তানী হয়।

সিন্ধু সভ্যতার ওই অন্যান্য নগরগুলোর সঙ্গে হরপ্পার অনেক মিল রয়েছে। এদের একের ওপর অন্যের প্রভাব অনেক— অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সব দিক থেকে। তারপরও এদের মধ্যে কোন একীভূত কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে

ওঠেনি। প্রায় প্রত্যেক নগর স্বাধীন ভাবেই যার যার মত চলছে— অনেকটা হরপ্পার মতই একটি বণিক-অভিজাত শ্রেণীর সম্মিলিত নেতৃত্বে। দৃশ্যত কোন একক রাজা সব কিছু কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেনা, বরং সামগ্রিক ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক চেতনা থেকে সবাই নিয়ম মেনে চলে।

হরপ্পার মানুষরা মৃতদেহ সৎকারে কবর দেয়ার চেয়ে দাহ করাটিকে বেশি পছন্দ করে। কাছাকাছি যথেষ্ট উদ্ভিজ জ্বালানি থাকায় ওরা এই নিয়ম বেছে নিতে পেরেছে। বিরল ক্ষেত্রে কেউ কেউ— বিশেষ করে কোন কোন ধনী পরিবারের মানুষ— মৃত্যুর পর কবরে শায়িত হবার ইচ্ছে প্রকাশ করে যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশ আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে মরদেহ দাহ করাটাই নিয়ম, অনেকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ছাই সংগ্রহ করে রাখে, অনেকে ছাই নদীতে বিসর্জন দেয়।

*　　*　　*

হরপ্পা ও তার কাছাকাছি সিন্ধু অববাহিকার অন্যান্য নগরগুলোর ধ্বংসাবশেষ প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৮৪২ সালে। তখন থেকে কিছু কিছু অনুসন্ধান হয়েছে, কিন্তু সত্যিকার বৈজ্ঞানিক ভাবে এর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু হয় ১৯২০ সালে; এবং তারপর থেকে দফায় দফায় খনন ও গবেষণা ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত চলেছে। হরপ্পা নগরীর অনেক কিছু প্রায় অক্ষত ভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে বটে কিন্তু দীর্ঘকাল অরক্ষিত থাকায় এবং সরকারী অবহেলায় উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এর ওপর যথেষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ চলেছে। যেমন এখানকার সুন্দর পোড়া ইট খুলে খুলে নিয়ে স্থানীয় রেলওয়ের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, দালান কোঠা তৈরিতেও।

তারপরও এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে একটি চমৎকার পরিকল্পিত নগরীর নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। এখানকার চমৎকার বাড়ি, ভবন, রাস্তা, নালা, পয়োনিষ্কাশন প্রণালী এ সবের যথেষ্ট নমুনা প্রায় অবিকৃত পাওয়া গেছে ও এখানকার উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপন্ন দ্রব্যেরও বেশ কিছু নমুনা। সংখ্যার ও বৈচিত্রের দিক থেকে এই জিনিসগুলোর মধ্যে বেশি পাওয়া গেছে সোপ ষ্টোনে তৈরি সীল মোহর এবং পটারি সামগ্রী ও তার ভগ্নাবশেষ। নানা রকম অলঙ্কারের পরিমাণও কম নয়। সীল মোহর ও পটারির চিত্রনে ব্যবহৃত ছবি, চিহ্ন ইত্যাদিও সেদিনকার চিন্তা ভাবনার একটি ভাল পরিচয় দেয়। ছোট ছোট যে মূর্তিগুলো ওরা সোনা, ব্রোঞ্জ, পোড়ামাটি, শাঁখ, এগেইট পাথর, সোপ ষ্টোন ইত্যাদি থেকে তৈরি করতো তারও একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহ এখন নানা যাদুঘরে রয়েছে। এর মধ্যে নারী মূর্তির সংখ্যা অনেক, নানা জীবজন্তুর মূর্তি রয়েছে। পুরুষ ও নারী মূর্তিগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে পুরুষেরগুলো সাদাসিদা, কর্মরত। নারীমূর্তিগুলো অনেক বেশি অলঙ্কৃত— চুলের বাহারি সজ্জায়, ফুলের ব্যবহারে এবং জড়োয়া অলঙ্কারে। এর থেকে মনে হয় যদিও কিছু কিছু নারী পরিবারে কর্তৃত্বের আসনে ছিল নগরীর মূলধারার কাজে তাদের উপস্থিতি ছিল ক্ষীণ। একদিকে বিনোদনে অন্যদিকে ধর্মীয় দেবীত্বের আসনে নারীর স্থানটি অবশ্য অনন্য। নারী মূর্তিগুলোর মধ্যে নৃত্যরতা মূর্তি সংখ্যাই বেশি— এ অঞ্চলের নানা নগর থেকে এই ভঙ্গির মূর্তি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে সব চেয়ে খ্যাতি পেয়েছে মোহেনজোদারোতে পাওয়া একটি নৃত্য-রতা নারীর মূর্তি— যেটি 'নটি' (ডান্সিং

গার্ল) নামে পরিচিত হয়েছে। এ মূর্তির নাচের ভঙ্গি, অলঙ্কারে বিভূষিতা তার সজ্জা ইত্যাদির কারণে আমাদের কাহিনীতে দেবদাসীর চরিত্রটি এই মূর্তির দিকে লক্ষ্য করেই কল্পিত হয়েছে। তবে সমাজে দেবদাসীর স্থান নির্ণয় করতে সীল, অন্যান্য চিত্রণ ও মূর্তি থেকে ব্যবসায়িক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা ও বিশ্বাসগুলো সম্পর্কে পাওয়া ধারণাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

একটি দিক থেকে হরপ্পার উন্মোচনে প্রত্নতাত্ত্বিকরা কিছুটা অসুবিধায় ছিলো— তা হলো এখানে কবর ও মৃতদেহ খুব বেশি পাওয়া যায়নি। ফলে কবরের সঙ্গে আনুসঙ্গিক যত নিদর্শন সাধারণত খুব সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায় তা এখানে কম পাওয়া গেছে। এর থেকেই মনে করা হয় যে এখানে মৃতদেহ দাহ করার নিয়মটিই বেশি চালু ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তার প্রায় হাজার খানেক বছরের মধ্যে হরপ্পা সহ এই সভ্যতার নগরগুলোতে অবক্ষয় এসে শেষ পর্যন্ত নগরগুলো পরিত্যক্ত হয়েছিল। এই অবক্ষয় ঘটেছে এখন থেকে তিন হাজার আটশ' বছর আগে থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগের সময়ের মধ্যে। এই অবক্ষয় ও পরিত্যাগের প্রকৃত কারণ সুনির্দিষ্ট ভাবে এখানো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এক সময় মনে করা হতো যাযাবর ইন্দো-ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভূত আর্যদের আক্রমণে এখানকার আদি বাসিন্দারা (কারো কারো মতে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠির) পরাস্ত হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন সেই মত বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছেনা। বরং জলবায়ু পরিবর্তনকেই এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে বেশি। ও সময় মৌসুমী বায়ু প্রবাহ ক্রমে পূর্ব দিকে সরে আসাতে আগের মত আর্দ্র অনুকূল জলবায়ুর বদলে এক ধরনের মরুময়তা এ নগর ও তার আশপাশকে গ্রাস করেছিলো। তাই ভাল আবহাওয়ার খোঁজে ওরা পূর্ব অঞ্চলে সরে গিয়ে ছোট ছোট গ্রাম ও শহরের নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো। সেগুলো এত ছোট এবং দূরে দূরে ছিল যে কোনটাই তেমন করে আর বড় কোন প্রভাব রাখতে পারেনি।

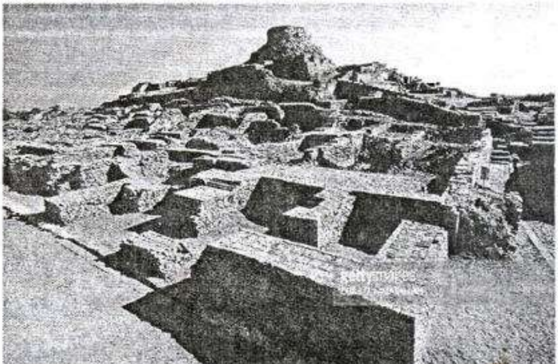

হরপ্পার খনন

হরপ্পা নগরঃ পবিত্র চৌবাচ্চা

সাজগোজ করা নারী
(ছোট মূর্তি)

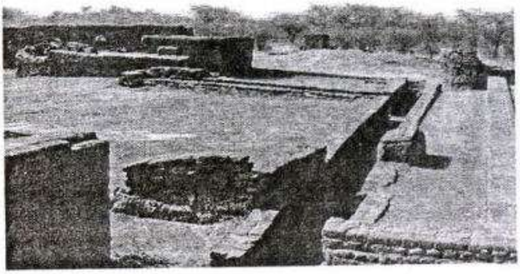

হরপ্পা নগরের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা

হরপ্পার নানা সীল মোহর

হরপ্পার শিল্পকর্ম

রান্নার হাড়ির পটারি

মোহেঞ্জোদারোর 'নটি'
(ছোট মূর্তি)

হরপ্পার মূর্তি

চেক রিপাবলিকের ইউনিটিসের হাঁসুলি কাকা চার হাজার বছর আগে

লোকালয়টি ছোট— একটি কৃষি-নির্ভর গ্রাম বৈ নয়। কিন্তু এটি ব্রোঞ্জ ধাতু তৈরি ও সরবরাহের একটি বড় কেন্দ্র। উৎপাদিত ব্রোঞ্জকে সঞ্চয়ের সুবিধার জন্য খুব ভারী কিছু অলঙ্কারের রূপে তৈরি করা হয়, যেমন গলায় পরার হাঁসুলি রূপে। হাঁসুলি কাকার এটিই কাজ।

আধুনিক প্রাগ নগরীর অল্প কিছু উত্তর-পশ্চিমে বর্তমানের ছোট্ট গ্রাম ইউনিটিস। প্রায় চার হাজার বছর আগে এখানে এবং তার আশপাশে যে বসত গড়ে ওঠেছিলো আমরা চলে যেতে চাই সেখানে। দেখছি নানা দিক থেকে এই বসতটি ইউরোপের ওই পুরো অঞ্চলের সংস্কৃতির এক রকম প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রায় পুরোটাই গ্রামীণ সংস্কৃতি— কৃষি ও পশু পালনই জীবন ধারণের প্রধান উপায়। কৃষিতে লাঙ্গলের যুগ এখানে সদ্য এসেছে। তবে এখন ওরা পাক্কা কৃষিজীবী। খাবারের জন্য শস্যের ওপরেই প্রধানত নির্ভর করে— গম ও কিছুটা বার্লি। এখানকার বাড়িগুলোতে ঢুকলে খুব স্পষ্ট ভাবে যে জিনিসটি নজরে পড়বে তা হলো শস্য ভাঙ্গার যাঁতা; তা ছাড়া শিল-পাটা, হামানদিস্তা, অল্প শস্য জমা রাখার ঘড়া ইত্যাদি মনে করিয়ে দেয় এরা নিতান্তই শস্য-নির্ভর মানুষ, কৃষিই ওদের প্রাণ।

গ্রামটি নেহাত ছোট— কাছাকাছি থাকা ৫০-৬০টি বাড়ি। বাড়িগুলো কাঠের কাঠামোতে তৈরি চারকোনা আকৃতির। ওপর-নিচ এবং আড়াআড়ি এই দুই দিকের ফাঁক ফাঁক করা কাঠের বীম বর্গাকৃতি ছকের মত জুড়ে চার দেয়ালের কাঠামোটি তৈরি হয়েছে। এই কাঠামোটিকে ঢেকে দেয়া হয়েছে প্রধানত কাদামাটির তৈরি একটি যুৎসই মিশ্র-দ্রব্য দিয়ে যাতে কাদামাটি ছাড়া রয়েছে গোবর, বালি, এবং খড়— সবই ভাল করে মেশানো। কাঠামোর ওপর এটি পুরু করে লেপে দেয়া হয়েছে— যা রোদে শুকিয়ে চমৎকার শক্ত দেয়াল হয়েছে। অধিকাংশ বাড়ি লম্বায় ২৪ মিটার ও প্রস্থে সাড়ে ৬ মিটারের মত, অর্থাৎ বাড়িগুলো বেশ লম্বাটে, ভেতরে দু'একটি কামরায় ভাগ করা। ছাদেও সেই ছকের মত খোপ

খোপ কাঠের কাঠামো। তবে এখানে কাঠগুলো হালকা— এর কাজ হলো ওপরের খড়ের ছাউনিটিকে ধরে রাখা। ওই ৫০- ৬০ টি বাড়ির বেশির ভাগই ভেতরে বাইরে পরস্পরের সঙ্গে একই রকম, তাতে চোখে পড়ে শুধু কৃষির আয়োজন।

তবে গ্রামের এক কিনারায় কয়েক ঘর মানুষ রয়েছে যারা একটু ব্যতিক্রমী। আসলে ওরাই ইউনিটিসের সংস্কৃতিকে একটি বৈশিষ্ট দিয়েছে। ওরা ধাতুর কর্মী— ধাতু বলতে অবশ্য তামা আর ব্রোঞ্জ। ওদের মধ্যে বড় বাড়িতে থাকা অর্থাৎ বড় কারখানাটির অধিকর্তা যে মানুষটি তিনিই আমাদের হাঁসুলি কাকা, তাঁর বাবা মায়ের দেয়া নাম বহু আগেই সবাই ভুলে গিয়ে এই অদ্ভুত নামেই তাঁকে সবাই ডাকে। এর কারণ হলো হাঁসুলি অলঙ্কারটি ইউনিটিসের ধাতুর কাজের মধ্যে কেন্দ্রীয় জায়গা দখল করে আছে; আর সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে ভারী জড়োয়া হাঁসুলি তৈরির জন্যই খ্যাতি এই মানুষটিরই। ধাতুবিদ্যায় তিনি এখানকার সেরা কারিগর, এজন্যই আদর করে সবাই তাঁকে হাঁসুলি কাকা নামে ডাকে— ছেলে, বুড়ো সবাই। হাঁসুলি জিনিসটি গলায় পরার অলঙ্কার। বেশ কিছু মোটা ধাতব তারকে পেচিয়ে বেশ মোটাসোটা, দৃঢ় কিন্তু তারপরও খানিকটা নমনীয় এই হাঁসুলি তৈরি হয়। এটি গলার চারিদিকে বেষ্টনীর মত থাকে। অনেক হাঁসুলিতে দুই খোলা প্রান্তের মাঝখানে খানিকটা ফাঁক থাকে, যা টেনে আরো ফাঁক করে গলায় পরা যায়। আবার কোন কোনটায় দুই প্রান্তকে পরস্পরের সঙ্গে আটকে দেবার জন্য ব্যবস্থা থাকে। একটি প্রান্তের গর্তের মধ্যে অন্য প্রান্তটি ঢুকিয়ে একটি চাবি দিয়ে আটকে দিয়ে এটি করা হয়। চাবিটি খুলে হাঁসুলি গলায় পরে আবার আটকে দেয়া যায়।

ইউনিটিসে এবং ইউনিটিসের সংস্কৃতি যেখানে সেখানে বিস্তৃত হয়েছে সব জায়গায় হাঁসুলির খুবই কদর। এর বৈচিত্র অনেক— ওই যে ধাতব তারকে পেচিয়ে, বিনুনি করে মোটা হাঁসুলি তৈরি তা অনেক বিচিত্র ভাবে করা যায়। ওর মধ্যেই অনেক কারুকার্য করা যায়; এখানেই হাঁসুলি কাকার বাহাদুরি। তিনি এগুলো তৈরি করেন ব্রোঞ্জ দিয়ে, যা কিনা মূলত তামা কিন্তু শক্ত করার জন্য এর সঙ্গে অন্য কয়েকটি ধাতু মেশানো হয়— আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, টিন ইত্যাদি। হাঁসুলি কাকা বলেন তাঁর বয়স যখন কম ছিল তখন আর্সেনিক ও অ্যান্টিমনি বেশি ব্যবহার করা হতো, কারণ টিন বেশ দুষ্প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এর মধ্যে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য বেড়ে যাওয়াতে ওখানকার কর্নওয়ালের বিস্তর টিনের খনি থেকে এখন টিন আনা সম্ভব হচ্ছে, তাই ব্রোঞ্জে টিনই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। তামাও অবশ্য আমদানী করতে হয়, তবে তা অপেক্ষাকৃত কাছেই পাওয়া যায়। সদ্য তৈরি ব্রোঞ্জের হাঁসুলি তার ধাতব চাকচিক্যের কারণেও অদ্ভুত সুন্দর। তবে হাঁসুলি কাকার কাছে অলঙ্কার হওয়া ছাড়াও এর অন্য এক তাৎপর্য রয়েছে— তা হলো যথেষ্ট পরিমাণ ব্রোঞ্জ ধাতুর জমানো ষ্টক হিসেবে। যেহেতু হাঁসুলিগুলো বেশ মোটা ও ভারী হয়, কাজেই তাঁর কারখানায় হাঁসুলি কাকা যে প্রচুর ব্রোঞ্জ তৈরি

করেন তার অনেকটা দিয়ে বহু হাঁসুলি তৈরি করে রাখেন। ক্রেতারা এই হাঁসুলি দুটি উদ্দেশ্যে কেনে— আপাতত অলঙ্কার হিসেবে উৎসবাদিতে ব্যবহারের জন্য, এবং মূল্যবান ব্রোঞ্জ ধাতু জমিয়ে রাখার জন্য। পরে নানা ভাবে এই ধাতু ব্যবহার করা যায়, প্রয়োজনে এর বিনিময়ে অন্য পণ্য পাওয়া যায়। এমন কি এটি ভেঙ্গে অন্যান্য অলঙ্কারও গড়িয়ে নেয়া যায়। হয়তো এ জন্যই এখানে হাঁসুলির এত আদর।

হাঁসুলি কাকার কারখানায় অন্যান্য যে সব ব্রোঞ্জের জিনিস তৈরি হচ্ছে তার মধ্যেও কোন কোনটির এই দু'রকম উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন হাতের বালার মত এক রকম ব্রেসলেটের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে একই ব্যাসের অনেক বার পেচ খাওয়ানো বাড়তি অংশ— যা একই সঙ্গে লাগানো অনেকগুলো চুড়ির মতো থাকে। এটিও এখানকার জনপ্রিয় অলঙ্কার— ইউরোপের ওই অঞ্চলে নানা জায়গায় ইউনিটিসের পেচানো লেজওয়ালা ব্রেসলেট নামে প্রসিদ্ধ। দীর্ঘ লেজসহ এই ব্রেসলেট এতই ভারী যে অনেকের উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে ধাতু জমিয়ে রাখা। আর একটি জিনিস খুব দেখা যায় যাকে অলঙ্কার বলা না গেলেও কার্যত আলঙ্কারিক ব্যবহারটিই তার মুখ্য— এটি হলো ব্রোঞ্জের তৈরি চেপ্টা কুড়াল। হাতিয়ার হিসেবে একে খুব বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়না, বরং একে সৌন্দর্যের জন্য সাজিয়ে রাখাটাই অনেকের ইচ্ছে। বেশ ভারী ও বড় জিনিস বলে এর মাধ্যমেও অনেকখানি ধাতু জমিয়ে রাখা সম্ভব হয়। তাই ঘরে ঘরে এক বা একাধিক ব্রোঞ্জের কুড়াল থাকে এখানে।

মোটের ওপর এসবের মাধ্যমে বোঝা যায় যে ব্রোঞ্জ ধাতুটি ইউনিটিসের মানুষের জীবনে একটি বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে— অন্তত অপেক্ষাকৃত ধনী মানুষদের জীবনে। ওই হাঁসুলি, ওই লেজওয়ালা ব্রেসলেট, ওই কুড়াল এসব ব্রোঞ্জ ধাতু বাণিজ্যের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। হাঁসুলি কাকার মত মানুষদের হাতে এরকম জিনিস প্রচুর তৈরি হয়ে জমে ওঠে, তা নানা দিকে বিক্রি ও রপ্তানী না করা পর্যন্ত। তাই তাঁর বাড়ি ও কারখানার সঙ্গেই ব্যবস্থা রয়েছে এসব জমিয়ে রাখার। যারা ব্রোঞ্জের ষ্টক হিসেবে পাইকারি হারে এই ধাতু কিনতে চায় তারা এ রকম হাঁসুলি, ব্রেসলেট বা কুড়াল হিসেবেই তা পাবে শুধু ধাতুর ব্লক বা থালি হিসেবে নয়।এতে পরে তাদের খুচরা বিক্রিতে সুবিধে হয়, মানুষ ব্যবহার ও সঞ্চয় উভয় কাজে একে লাগাতে পারে।

কৃষিকাজ আর পশু পালনের বাইরে ইউনিটিসের বড় কারবার হলো ব্রোঞ্জ উৎপাদন এবং এ ধাতুর ব্যবসা। ব্রোঞ্জ দিয়ে নানা সামগ্রী তৈরির জন্যও এটি বেশ পরিচিত। এসব ধাতুর সামগ্রীর মধ্যে অলঙ্কার এবং অস্ত্রই বেশি। গলা, হাত, বাহু, কান— সব অঙ্গের জন্যই চমৎকার সব ব্রোঞ্জের অলঙ্কার এখানে তৈরি হয়। অস্ত্রের মধ্যে ব্রোঞ্জের তলোয়ার, ত্রিভুজাকৃতি চেপ্টা ছুরি, বর্শা, চেপ্টা কুড়াল ইত্যাদিও তৈরি হচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত এই অস্ত্রগুলোও আসলে এক রকম

অলঙ্কার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়— সাজিয়ে রাখার জন্য, অথবা কোন কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাময়িক সাজের সঙ্গে পরার জন্য। সত্যিকার যুদ্ধে বা সত্যিকার সমর চর্চায় ধাতুর অস্ত্রের ব্যবহার খুবই কম— সেখানে সনাতন পাথর, কাঠ ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি তীর-ধনুক, বর্শা ইত্যাদিই এখনো রাজত্ব করছে। জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারের হাতিয়ারও খুব একটা ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি হচ্ছেনা। সেসব আসবাব ও হাতিয়ার বরাবরের মত পাথর, কাঠ, হাড়, পটারি এসব দিয়েই চলছে। ব্যাপারটি বেশ অদ্ভুত। শুধু ইউনিটিসের নয়, এখন ইউরোপের যে অনেক জায়গায় একই ইউনিটিস সংস্কৃতির জয় জয়কার, ব্রোঞ্জ শিল্পই তার বড় সাইনবোর্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। অথচ সে শিল্পটি জনজীবনের কার্যকর জায়গাগুলোতে তেমন কোন প্রভাব রাখতে পারেনি— প্রধানত অলঙ্কার আর শিল্প-কর্মের মধ্যেই তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ।

এর একটি কারণ ব্রোঞ্জের উচ্চ মূল্য, আর একটি কারণ তামার চেয়ে যদিও শক্ত, তারপরও ব্রোঞ্জ হাতিয়ার হিসেবে নিত্য টানাপোড়েনের কাজে অথবা অস্ত্র হিসেবে সত্যিকার যুদ্ধের কাজে ব্যবহারের মত শক্ত নয়। এদিক থেকে এর অসুবিধাগুলো অনেকটা সোনার মতোই। সোনার অলঙ্কার ও সোনার ব্যবসাও ইউনিটিসের একটি বড় কাজ। হাঁসুলি কাকার কারখানার কাছেই বেশ কয়েক জন স্বর্ণকারের বাড়ি— এই পুরো এলাকাটিই ধাতু-পাড়া হিসেবে পরিচিত। তবে ইউনিটিস সংস্কৃতিতে সোনার যত অলঙ্কার ব্যবহৃত হয় তা কিন্তু সব এখানে তৈরি নয়, সুদূর আয়ারল্যান্ড থেকেও অনেক সোনার অলঙ্কার আসে।

ধাতু-পাড়ায় আরো কয়েক ঘর কারিগর আছে যারা ঠিক ধাতু নিয়ে কাজ করেনা— তাদের কাজ এম্বার নিয়ে। এম্বার স্থানীয় ভাবে পাওয়া যায়না, প্রায় সবটুকুই আমদানী করা হয় উত্তরের বাল্টিক অঞ্চল থেকে— এষ্টোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া অঞ্চল থেকে। এম্বার এক রকম হলুদ রেজিন— কিছুটা স্বচ্ছ, অথবা অনচ্ছ— লক্ষ লক্ষ বছর আগের উদ্ভিদের কষ জমে এটি তৈরি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এম্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্দী হয়ে থাকতে দেখা যায় সেই কালের কোন বুদবুদ এমন কি ছোট পোকা মাকড়। এমনটি বন্দী কিছু পাওয়া গেলে অলঙ্কার হিসেবে তার দাম বাড়ে। বাল্টিক অঞ্চল থেকে পাইকারী হারে আমদানী করা এম্বার দিয়ে ইউনিটিসে যেমন কানের দুল, নেকলেস ইত্যাদি সূক্ষ্ম অলঙ্কার তৈরি করা হয়, তেমনি অলঙ্কার বাক্স, টেবিল অলঙ্করণ, দরজা অলঙ্করণ ইত্যাদি বড় কাজেও তা ব্যবহৃত হয়— যদিও এম্বারের মূল্য ধাতুর চেয়ে কোন অংশে কম নয় এখানে।

কুমোরের চাকা ব্যবহার করে তৈরি ইউনিটিস সংস্কৃতির পটারি পাত্রগুলো বহু দূর দেশেও খুবই পরিচিত। এগুলো যতটা না এর ওপর অলঙ্করনের জন্য বিখ্যাত তার চেয়ে বেশি এর আকার-আকৃতির ডিজাইনের জন্য। এই পটারির কাপ-পিরিচ, মগ, পাত্র এসবের ডিজাইনের মধ্যে এমন কিছু নান্দনিকতা এবং ব্যবহার-

সুবিধা আছে যা অন্যত্র দেখা যায়না। যেমন কাপের পাশে যেভাবে ধরার হাতলটি লাগানো হয়, পিরিচের ওপর কাপটি রাখার যে ব্যবস্থা— এসব অনন্য। পানীয় ইত্যাদি ধারণের সুবিধার জন্য এসব পটারি পাত্রকে এক রকম গ্লেজ করারও উপায় ইউনিটিসের কুমোররা উদ্ভাবন করেছে। ইউনিটিসের ব্রোঞ্জ এবং ইউনিটিসের পটারি দুভাবে এই সংস্কৃতিকে ছড়িয়েছে। একদিকে নেহাত ব্যবসায়িক ভাবে ইউরোপের দূরদূরান্তে এর অলঙ্কার ও শিল্পপণ্যকে পৌঁছিয়েছে এবং জনপ্রিয় করেছে। অন্যদিকে উত্তর ও মধ্য ইউরোপের নানা জনপদে এই একই পেশা, রুচি, কুশলতা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির জন্ম দিয়েছে। শেষেরটি এত ব্যাপক ভাবে ঘটেছে যে এই পুরো বিশাল অঞ্চলের সংস্কৃতি বলতে এখন ওই ইউনিটিস গ্রামটির সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউনিটিসের আশপাশের জায়গাগুলো তো বটেই, বিশেষ করে আরো দূরে উত্তর জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের কোন কোন জনপদ এখন নিজেরাই এই সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে ওঠেছে— সেই বিশেষ ধরনের পটারি, ব্রোঞ্জের হাঁসুলি, চেপ্টা কুড়াল, ত্রিভুজাকার চেপ্টা ছুরি ইত্যাদি। কিন্তু এই বৃহত্তর পরিসরে ব্রোঞ্জের সৌকর্য এখানেই থেমে থাকেনি। উদাহরণ স্বরূপ ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যে যে সাধারণ বিষয় ছাড়াও পর্যবেক্ষণকারীর চোখে রাতের আকাশের মত ভিন্ন দৃশ্যও ফুটিয়ে তোলা যায় তারও চমৎকার প্রমাণ এসব জনপদ রাখছে। এসব জায়গায় 'আকাশ চাকতি' নামে পরিচিত এরকম ব্রোঞ্জের থালার ওপর আকাশের ছবি খোদাই করার সুন্দর কাজ দেখা যায়। ওই থালার জমিনটিকে আকাশের রূপ দিয়ে তার রঙ করা হয় আকাশী নীল আর এর ওপর খোদাই করা বাঁকা চাঁদ, সূর্য, অনেকগুলো ছোট ছোট তারা ইত্যাদিকে ফুটিয়ে তোলা হয় হলুদ রঙে। সব মিলে ইউনিটিস সংস্কৃতির চিন্তার গভীরতা এবং ব্রোঞ্জের ওপর তাদের কুশলতার দখলটি বেশ স্পষ্ট।

ইউনিটিস সংস্কৃতির সুনামের আর একটি কারণ খাদ্যের প্রযুক্তিতে তাদের অবদানে। এর মূলে প্রধানত কাজ করেছে এখানে লবন উৎপাদন ও লবনের ব্যবহার। এই সংস্কৃতির মধ্যেই লবন উৎপাদনের দুটি ভিন্ন উপায় অনুসরণ করা হয়। যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে লবনাক্ত পানি পাওয়া যায় সেখানে সে পানি মাঠে অল্প পুরুত্বে ছড়িয়ে দিয়ে রোদে শুকিয়ে বাষ্পীভুত করে লবন পাওয়া যায়। আর যেখানে কাছে লবনের খনি আছে সেখান থেকে লবন খনন করে আনা হয়। লবন উৎপাদনের কারণ হলো এখানে বিভিন্ন কিছু নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ন লবনের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। খাদ্য সংরক্ষণের একটি তাগিদ দেখা দেয়াতে এবং খাবারের স্বাদ বদলাবার তাগিদেও লবন দিয়ে সংরক্ষিত ও জারানো মাছ, মাংস, সবজি, ফল এসব এখানে বেশ জনপ্রিয়। অন্য দিকে চামড়া পাকা করার এবং কাপড় রাঙানোর এই উভয় প্রযুক্তির উন্নয়নও লবনের চাহিদা সৃষ্টি করেছে। ইউনিটিস সংস্কৃতিতেই বলতে গেলে রঙীন পোষাক ও শীতের দিনে

উন্নত চামড়ার পোষাক ও জুতা প্রথম ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। জীবন-যাত্রার নানা দিকের মান উন্নয়নের চেষ্টাটি এখানে বেশ স্পষ্ট।

এ জিনিসটি আরো ভাল বোঝা যায় খাবারের স্বাদকে সমৃদ্ধ এর করার দিকে ওদের নানা চেষ্টায়। লবনের ব্যবহার তার একটি পদক্ষেপ মাত্র। অন্য দিকে যাকে বলা হয় খাবারে সিজনিং বা মশলার ব্যবহার তার ক্ষেত্রেও ইউনিটিস সংস্কৃতি যথেষ্ট সজাগ। এখানেও মাছ বা মাংস সরাসরি রোষ্ট করে খাওয়াটিই নিয়ম। কিন্তু তাতে সরষে বাটা, আফিঙের পপি ফুলের বীজ, রসুন ইত্যাদি কড়া ঝাঁজের কড়া স্বাদের উপাদান মেশানোর রীতি রয়েছে। বিশেষ করে বড় বড় ভোজের আয়োজন যখন হয় তখন এগুলো দেদার ব্যবহৃত হয়। রুটি তৈরি ও মদ তৈরির প্রযুক্তিও এদের খাবারকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে ঈষ্টের ব্যবহারটি লক্ষণীয়। আঙ্গুরের এবং এলডার বেরি ফলের চামড়ায় এই ঈষ্ট থাকে বলেই এই চামড়ার প্রয়োগ বিশেষ স্বাদের ফুলে ওঠা রুটি তৈরিতে এবং আঙ্গুর রসকে মদে পরিণত করতে যে সাহায্য করে তা তারা আবিষ্কার করেছে। কাজেই তাদের ভোজ যথেষ্ট সমৃদ্ধ বৈকি। শুধু গৃহপালিত ঘোড়া, গরু, ভেড়া, মাংস যথেষ্ট পরিমাণে পাতে ওঠে বলে নয়, বরং সিজনিং, মদ ও ফোলানো রুটি সহযোগে তা তাদের কাছে আরো উপাদেয় হয়ে ওঠেছে বলে।

অবশ্য এর সব সমৃদ্ধির মূলে তাদের রয়ে গেছে লাঙ্গল ব্যবহার করে উন্নত কৃষিকাজ। বসন্ত থেকে শুরু করে গরমের দিনে তাদের একটি মাত্র ফসল— এতেই সারা বছরের খোরাক। বছরের শস্য সংরক্ষণ করে রাখার জন্য ইউনিটিসে চমৎকার একটি ব্যবস্থা আছে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে। ওই যে কাঠের কাঠামোতে তৈরি লম্বাটে ধরনের খড়ের ছাউনি দেয়া চারকোনা বাড়ি, তার মেঝের তলায় ওরা করে নিয়েছে গভীর সব গর্ত। গর্তগুলো সিলিন্ডার আকৃতির, কিন্তু ওপরের দিকে মুখটা কিছুটা সরু হয়ে এসেছে। ওখানে ঘরের মেঝে কাঠের ঢাকনি দিয়ে গর্তগুলো ভালভাবে ঢাকা। এই সব গর্ত কিন্তু তাদের শস্য গোলা।

হাজার বছর ধরে এ অঞ্চলের মানুষ গৃহপালিত গরু-ভেড়া-শূয়োরে অভ্যস্ত। পরের দিকে ঘোড়াও যোগ হয়েছে এর সঙ্গে। এক সময় মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা মানুষ এসব বিদ্যা সঙ্গে আনলেও এখন এগুলো একান্তই এদের সংস্কৃতি। তবে সব কিছু ছাড়িয়ে এর ধাতু-সংস্কৃতিটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আর তার মূলে আছেন হাঁসুলি কাকার মত মানুষ।

ধাতু জমছে হাঁসুলি কিংবা পেঁচানো লেজ বিশিষ্ট জড়োয়া ব্রেসলেট, কিংবা চেপ্টা ভারী কুড়ালের আকারে। ধাতু অথবা এম্বার কিংবা পটারি দিয়ে তৈরি হচ্ছে অদ্ভুত শিল্পকর্ম। এই সব তাই ইউনিটিস গ্রামকে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত করেছে। এখানে বা আশপাশে কোথাও খুব বড় ধরনের লোক বসত নেই বটে, কিন্তু এই ছোট ছোট বসতের মধ্যেও প্রচুর আসা-যাওয়া, দেয়া-নেয়া আসলে একটি বৃহত্তর জগত সৃষ্টি করছে।

*   *   *

১৮৭৯ সালে প্রাগ নগরের কাছের বর্তমান গ্রাম ইউনিটিসের পাশের পাহাড়ী জায়গায় একটি অতি প্রাচীন গ্রামের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়— গোটা পঞ্চাশেক বাড়ির চিহ্ন এতে পাওয়া যায়। ১৯৩০ এর দশকে এর কাছাকাছি আরো বেশ কিছু জায়গায় সমসাময়িক বসত খননে উদ্ঘাটিত হয়। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয় এখানকার বৈশিষ্টময় সংস্কৃতির নানা দিক— আজ থেকে চার হাজার পূর্বের সমৃদ্ধ এক সংস্কৃতি। তখনকার কৃষি, পশুপালন ও গার্হস্থ্য জীবনযাত্রা তো বটেই, আবিষ্কৃত হয় তার চেয়েও বেশি ব্রোঞ্জ যুগের এক চমৎকার বিকাশ। আরো দেখা গেলো হুবহু ইউনিটিসের ব্রোঞ্জ নিদর্শনগুলোর মত নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে মধ্য ইউরোপের আরো নানা জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননে— বোঝা যায় ওই সংস্কৃতির বিরাট বিস্তৃতি।

প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে ইউনিটিসে বড় উদ্ঘাটনগুলো হয়েছে এর কোন কোন স্থানে ভূগর্ভে প্রোথিত অবস্থায় একই ব্রোঞ্জ সামগ্রীর অনেক পরিমাণ সঞ্চয়ের আবিষ্কারের মাধ্যমে, এবং বিভিন্ন কবরের মধ্যে দিয়ে দেয়া বহু মূল্যবান নিদর্শনের মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ এক জায়গায় ৬০০টি ব্রোঞ্জ থালি পাওয়া গেছে, আরেক জায়গায় ২৯৩টি ভারী ব্রোঞ্জ কুড়াল, আরেক জায়গায় কয়েক শ মোটা ব্রোঞ্জ হাঁসুলি— সবই মনে হয় ওখানে রাখা হয়েছিলো ধাতুর ষ্টক হিসেবে জমিয়ে রাখতে ও ব্যবহার করতে।

ইউনিটিসে আবিষ্কৃত বাড়িগুলো কাঠের, মাটির, খড়ের তৈরি হওয়াতে তার ধ্বংসাবশেষ বিস্তারিত খুব একটি পাওয়া যায়নি— কিন্তু মাটিতে তার কাঠামো, ছিদ্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে, আর পাওয়া গেছে ঘরের মেঝেতে গর্ত করে তৈরি শস্যাগারগুলো। খননে কৃষি সামগ্রী থেকে শুরু করে ছোট ছোট শিল্পকর্ম, ব্রোঞ্জের নানা অলঙ্কার, অস্ত্র, পটারির নানা নমুনা পাওয়া গেছে যার অনন্য বৈশিষ্টগুলো ইউনিটিস সংস্কৃতির বৈশিষ্ট হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এর মধ্যে কোন কোনটি তার শিল্প-উৎকর্ষের কারণে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। যেমন জার্মানীর স্যাক্সনিতে আবিষ্কৃত 'নেব্রা আকাশ চাকতি' নামে পরিচিত ব্রোঞ্জের কাজটি ইউনিটিস সংস্কৃতির একটি সেরা কাজ হিসেবে মনে করা হয়। ব্রোঞ্জে তৈরি চন্দ্রসূর্য তারকা খচিত এই রঙীন থালাটি এখনো দেখতে অদ্ভুত সুন্দর। এসব কারণেই সাধারণ কৃষিজীবী গ্রামীণ জীবন সত্ত্বেও ইউনিটিস সংস্কৃতি এতটা গুরুত্বপূর্ণ। ওখানে কোন লিপি ছিলনা, বড় নাগরিক জীবন ছিলনা, ব্যাপক শিল্প কারখানা ছিলনা যা ওসময়ের অনেক আগেই মেসোপোটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু অববাহিকায় বা চীনে ছিল। ইউরোপ এর সবগুলো দিকে পিছিয়ে থাকলেও অন্তত ইউনিটিস সংস্কৃতিতে তার প্রযুক্তি, উদ্ভাবনশীলতা এবং জীবন মানের উন্নয়ন লক্ষ্য করার মত।

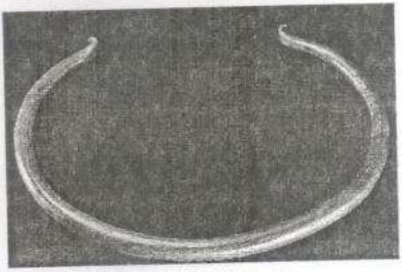

ব্রোঞ্জের ভারী হাঁসুলি

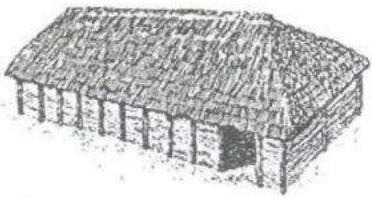

ইউনিটিসের বাড়ির সম্ভাব্য গঠন

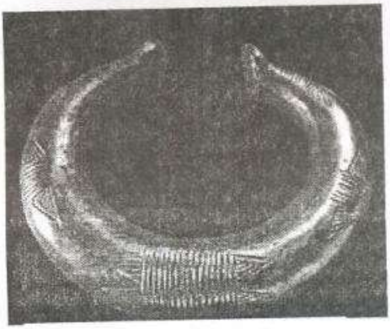

ব্রোঞ্জের ভারী হাঁসুলি

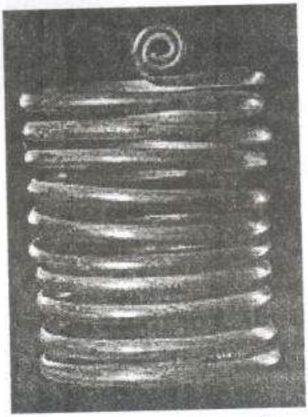

ব্রোঞ্জের পেচানো ব্রেসলেট

ব্রোঞ্জের কুড়াল

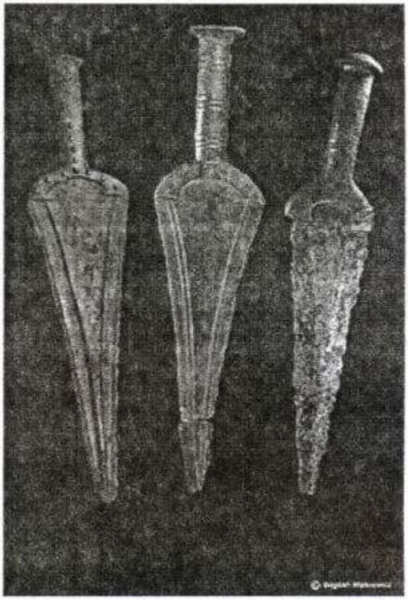

ত্রিভুজাকৃতি ব্রোঞ্জের ছুরি

বৈশিষ্টময় পটারি

নেব্রার 'আকাশ চাকতি'

মেক্সিকোর সান লোরেঞ্জোর গুরু ঃ
তিন হাজার বছর আগে

মধ্য-মেক্সিকোর স্যাঁতসেঁতে বাদল বনের কিনারা ঘেঁষে খুবই পরিকল্পিত নগর গড়ে তুলেছে এখানকার ওলমেক সংস্কৃতির মানুষরা। কৃষি সাফল্যের সুযোগ নিয়ে স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের যে বিকাশ এখানে ঘটেছে সেটি অনন্য। এগুলো তৈরি যেমন পাথরের, তৈরি করার হাতিয়ারও সব পাথরেরই। শিল্পবোধ আর কুশলতায় এগুলোর সৃষ্টিকারদের একজন হলেন গুরু।

বর্তমান মেক্সিকো সিটির পূবে মেক্সিকো উপসাগর ঘেঁষে সান লোরেঞ্জো এলাকায় তিন হাজার বছরের মত আগের দিনগুলোতে চলে গেলে পাচ্ছি একটি রমরমা শহর। তার আশপাশে অনেকগুলো ছোট ছোট গ্রাম, কোন কোনটি একেবারেই ছোট — বলতে গেলে এক একটি বড় পরিবার নিয়েই একটি গ্রাম। আজ যাঁকে আমরা গুরু বলে ডাকছি তাঁর জন্ম এমনি একটি গ্রামেই। পুরো এলাকাটি নিরক্ষীয় ঘন বনের এলাকা— যার মাঝে মাঝে রয়েছে নদী আর জলা। ওই শহর আর ওই গ্রামগুলো গড়ে ওঠেছে এরকম পানির ধারেই— কারণ জীবিকার জন্য এখানকার মানুষ পানির ওপর খুব নির্ভর করে; বিশেষ করে মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী হবার কারণে। আর্দ্র জলবায়ু এবং পানিসমৃদ্ধ উর্বর মাটি এখানে কৃষির ফলনকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছে— জনসংখ্যার তুলনায় ফসলের উৎপাদন যথেষ্ট বেশি। এটিই সুযোগ করে দিয়েছে কাছেই রীতিমত পরিকল্পিত বড় শহর গড়ে তুলে তাতে নানা বাণিজ্যিক উৎপাদন, শিল্পকলা এবং আচার ও রীতির প্রতিষ্ঠা করতে।

এরই ফলশ্রুতিতে আমাদের গুরু অল্প বয়সেই তার কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী পরিবারকে ছেড়ে সান লোরেঞ্জোতে চলে এসেছিলো শহরের বৃহত্তর পরিবেশে নিজের ভাগ্য গড়তে। এখানে সে আশ্রয় পেয়েছিলো একটি আশ্রমে যেখানে প্রতিভাবান বালক বালিকাদেরকে নানা শিল্পকর্ম শেখানো হয়। এখানেই তার গুরু হয়ে ওঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ ঘটে। আশ্রমে তাকে প্রথম তালিম দেয়া হয় পাথর খোদাই করার বিদ্যায়। এদিক থেকে তার প্রতিভা ইতোমধ্যেই যথেষ্ট

প্রকাশ পেয়েছিলো— সেই গ্রামে শৈশব থেকেই। তখন অবশ্য ফেলনা সব পাথরে অন্য পাথরের হাতিয়ার ঠুকে ঠুকে সে নানা সরল খেলনা মূর্তি তৈরি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতো। এখন শহরের আশ্রমে শিগ্‌গির হাত পাকালো সত্যিকারের মূর্তি গড়ার কাজে। ইতোমধ্যে ওই আর্দ্র বনাঞ্চল ঘেরা জায়গার বিভিন্ন লোকালয়ে রীতিমত একটি সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছিলো যা মোটের ওপর প্রস্তর যুগেরই উন্নততর সংস্কৃতি। হাতিয়ারগুলোর প্রায় সবই পাথরের; যদিও কোন কোন কাজের জন্য তার সঙ্গে যোগ হয়েছে যুৎসই হাড়, হরিণের শিং, কাঠ ইত্যাদিরও হাতিয়ার। ব্যবহৃত সামগ্রীর প্রায় সবটুকু এসব জিনিসে তৈরি; অবশ্য কাদামাটি থেকে তৈরি পটারি পাত্রগুলোর কথাও ভুল্‌লে চলবেনা যদিও তা অপেক্ষাকৃত সাদামাটা। সাধারণ ব্যবহার্য হাতুড়ি, ছেনি, হামানদিস্তা, শিল-পাটা সবই সাধারণ পাথরের বটে, তবে পাথর খোদাইয়ের হাতিয়ারগুলোর জন্য প্রয়োজন হয়েছে আরো শক্ত পাথরের যোগান। এর কিছু কিছু ওরা বাইরে থেকে আমদানী করে— যেমন চমৎকার ধারালো ছুরি তৈরির জন্য আনা হয় ওবসিডিয়ান পাথর।

আশ্রমে অল্প বয়স্ক কুশলীদেরকে আরো কুশলী করে তোলার এই চেস্টার কারণ হলো শহরে বড় আকারে ও বড় সংখ্যায় পাথরের মূর্তি তৈরির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। আসলে ওলমেক সংস্কৃতি নামে পরিচিতি এই সংস্কৃতির সব চাইতে বড় খ্যাতিই হলো তার শহর জুড়ে বিশাল বিশাল সব মূর্তির জন্য— প্রায় সবই সত্যিকার কোন কোন মানুষের আদলে প্রকাণ্ড সব পাথরের খোদাই করা মাথার মূর্তি। অবশ্য একই সঙ্গে ছোট আকারের পাথরের মূর্তি, মুখোশ ইত্যাদির নির্মাণেও এখানকার ভাস্কররা দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছে। দীর্ঘ দিনের কঠিন সাধনার পর আমাদের গুরু আশ্রমের সেই প্রশিক্ষণের দিনগুলোকে অনেকটা পেছনে ফেলে এসেছেন। আজ তিনি নিজেই ভাস্কর্যের গুরু, অনেক তাঁর শিষ্য। শহরের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিপত্তিশালীদের কাছ থেকে প্রায়ই ডাক আসে মূর্তি গড়ার— তাই শিষ্যদের নিয়ে সব সময় মূর্তি গড়ার কাজে ব্যস্ত তিনি।

প্রতিপত্তিশালীরা যে ওভাবে ক্ষমতাবান ও ধনবান হতে পেরেছে, নিজেদের প্রকাণ্ড আকারের মূর্তিই শুধু নয় বেশ উন্নত ও বৃহদাকার স্থাপত্য সমৃদ্ধ নগর রচনা করতে পেরেছে, তার মূলে কিন্তু রয়েছে চার পাশের গ্রামের উৎপাদনশীলতা। হ্রদ ও নদীর পারের এই ওলমেক গ্রামগুলোর মানুষের খাদ্য তালিকায় এবং উৎপাদনশীলতার তালিকায় সবার আগে রয়েছে মাৎস্য সম্পদ। মাছ, খোলস ওয়ালা জলচর— ঝিনুক, শামুক, কাঁকড়া, কচ্ছপ; ছোট ছোট কুমির ঘড়িয়াল এ সবের প্রাচুর্য এখানে। শস্যের বাইরে এগুলোই প্রধান খাদ্য। গ্রামবাসীদের প্রয়োজন মিটিয়ে শহরের বাসিন্দারাও এর ওপরেই নির্ভর করে। শস্য বলতে মেক্সিকোর ভুট্টা, কুমড়া (স্কোয়াশ) আর নানা শিম (বীন্‌স)। এর কাছাকাছি জায়গাতেই বহু আগের যুগে প্রথম এগুলো কৃষিতে এসেছিলো। ইতোমধ্যে অবশ্য কাসাভা এবং মিষ্টি আলুও যোগ হয়েছে। নারকেল আর তালকে খাদ্য হিসেবে

গুরুত্ব দেবার রীতিও এখানে ভাল ভাবে চালু হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে ভুট্টার প্রাধান্যটি খুব স্পষ্ট। ওদের জীবনে ভুট্টা এমন স্থান দখল করেছে যে ভুট্টার প্রতিভূ রূপে একজন শক্তিশালী দেবতাই তাদের রয়েছে। এই দেবতার মূর্তিতে দেখা যায় মূর্তির মাথার একটি ফাটলের মধ্য থেকে ভুট্টার চারার উদগম হচ্ছে। এখানকার উর্বর মাটিতে ভুট্টার আর শিমের বছরে দুটি শস্য পেতেও প্রায়ই দেখা যায়। তবে চাষাবাদ হয় প্রধানত ঝুম পদ্ধতিতে। বনের কিছু কিছু অংশকে আগুন দিয়ে পরিস্কার করে নেয়া হয় কয়েক মৌসুমের শস্য ফলনের জন্য। বনের গাছপালার ছাই মাটিতে মিশে এভাবে খুব উর্বর জমি পাওয়া যায়।

শহরে চলছে শিল্প-বাণিজ্য। বাণিজ্যের কিছু পণ্য নানা দিক থেকে আসে। তার মধ্যে রয়েছে ওবসিডিয়ান, জেইড, সার্পেন্টাইন ইত্যাদি মূল্যবান পাথর। এগুলো দিয়ে উন্নত মানের দামী হাতিয়ার আর অলঙ্কার তৈরি হয়। প্রসাধনীর জন্য মাইকা আর পাখির পালকের কদর খুব বেশি। আর একটি চমৎকার জিনিস হলো ইলমেনাইট অথবা ম্যাগনেটাইট আকরিকের পাথর-ফাটানো চকচকে তল দিয়ে তৈরি আয়না। আজকাল প্রসাধন করার সময় নিজের মুখ, দেহ দেখার জন্য আয়নার ব্যবহার যথেষ্ট বেড়েছে। কষ সংগ্রহ করে রাবার তৈরির জন্য যে গাছ সেই রাবার গাছের প্রচলনও এখানে বহুদিনের। রাবারকে ওরা নানা দরকারী কাজেতো লাগিয়েছেই, এটি দিয়ে আবার খেলার বলও তৈরি করেছে। এই বলের এক রকম খেলাকে এরা এত গুরুত্ব দেয় যে এই খেলার জন্য লোকজন রীতিমত পাগল। এমনকি নগরের শাসকদেরও একটি প্রিয় বিনোদন হলো এই বল খেলার আয়োজন করা। এর জন্য অনেক মানুষের সমাবেশ, বিশেষ পোষাক, আচার-অনুষ্ঠান এসবের বিস্তারিত ঐতিহ্যও গড়ে ওঠেছে এখানে। বিশেষ করে খেলার সময় মাথায় যে হেলমেটটি পরা হয় তা এই ওলমেট সংস্কৃতির একটি প্রতীকেই যেন পরিণত হয়েছে। এই হেলমেটটি তৈরি হয় পশু চামড়া দিয়ে।

সান লোরেঞ্জোর নগরটির পরিকল্পনাও বেশ চমৎকার— মাঝখানে একটি সোজা প্রশস্ত প্রধান রাস্তা দিয়ে এটি প্রতিসম দুই ভাগে বিভক্ত। পুরো জায়গাটি নিচু জমিতে জলসীমায় রয়েছে বলে স্থাপনাগুলো তৈরি হয়েছে ছোট ছোট কৃত্রিম টিলার ওপর। মাঝখানে একটি জায়গায় রয়েছে বিরাট চত্বর যা দুই মিটার উঁচু অনেকগুলো পাথরের স্তম্ভ দিয়ে ঘেরা। উৎসব-অনুষ্ঠানে নগরের মানুষ এখানেই একত্রিত হয়। বড় লোকদের প্রাসাদগুলো পাথরে তৈরি— বেশির ভাগ লাল রং করা। অন্যান্য বাড়িগুলো কিছুটা সাদামাটা— গাছের গুড়ি, মাটি আর অল্পকিছু ভারি পাথর দিয়ে তৈরি। গাছের গুড়িকে পাশাপাশি গায়ে গায়ে লাগিয়ে খাড়া করে করে বাড়ির জায়গাটুকু ঘিরে নেয়া হয়। মাঝখানে কিছুটা মাটি ভরাট করে পাথর দিয়ে বা দুরমুস করা মাটি দিয়ে দিয়ে মেঝ তৈরি হয়। এর ওপর গাছের গুড়ির বীম ব্যবহার করে ছাদের কাঠামোটিও তৈরি হয়। গ্রামের বাড়িগুলোর সঙ্গে শহরের এই সাধারণ বাড়ির খুব বেশি পার্থক্য নেই। নগরের বিভিন্ন জায়গায় বেশ

কিছু খোলা জায়গা রয়েছে ওই বল খেলার মাঠ হিসেবে— দর্শকদের বসার ব্যবস্থা সহ। কিছু কিছু জায়গা নানা পণ্য তৈরির কারখানা হিসেবেও চিহ্নিত। স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপাদন হচ্ছে তো বটেই কিন্তু বহু দূরের জায়গা যেমন দক্ষিণ মেক্সিকো, গুয়াতেমালা ইত্যাদি অঞ্চলের সঙ্গেও আমদানী-রপ্তানী চলে।

ওলমেক সংস্কৃতিতে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে এর ভাস্কর্য ও পাথর খোদাইয়ের কারুকার্য। আমাদের গুরুর মত মানুষের কদর তাই এখানে অনেক বেশি। গাছের গুড়ির তৈরি অতি সাধারণ গ্রামের কুটির থেকে উঠে আসা গুরু এখন নগরীর ওই লাল রঙ করা পাথরের প্রাসাদগুলোর একটির বাসিন্দা; তিনি এখানকার ভাস্কর্য বিদ্যালয়ের প্রধান; নগরীর প্রতিপত্তিশালীদের সঙ্গে তাঁর কাজ কারবার। অবশ্য কাজেকর্মে তিনি আগের মতই রয়ে গেছেন— আপনভোলা এক ভাস্কর রূপে যিনি হাতুড়ি-ছেনি নিয়ে বিশাল পাথরের ওপর আঘাত করে চলছেন। গুরুর হাতে এখন যে কাজগুলো রয়েছে তার কয়েকটির দিকে মনোযোগ দিলে আমরা বুঝবো কেন তিনি পুরো নগরীতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। গুরুর এখনকার বড় কাজ আর একটি বিশাল মাথার ভাস্কর্য তৈরি। এমন কাজ তিনি আগেও করেছেন— এই নগরের মানুষদেরই বিশিষ্ট কয়েক জনের আদলে ওই প্রকাণ্ড সব মাথার ভাস্কর্য গড়া। এবারকারটি হবে প্রায় তিন মিটার উঁচু, ওজন আট টন। এ জন্য উপযুক্ত ব্যাসাল্ট পাথরের বিশাল খণ্ড গুরু নিজে পছন্দ করে নিয়ে এসেছেন প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরের পাথরপূর্ণ জায়গা থেকে। আনা হয়েছে তাঁর তত্ত্বাবধানে, সাবধানে নদীতে ভেলায় ভাসিয়ে। তারপর থেকে কাজে লেগে গেছেন তিনি। একটু একটু করে পাথর কুচি এই বিশাল খণ্ড থেকে ভেঙ্গে তুলে ফেলছেন তিনি তাতে ছেনি-হাতুড়ির ব্যবহারে। এভাবে যেই অতি গুরুত্বপূর্ণ মানুষটির মুখাবয়ব তিনি এতে ফুটিয়ে তুলছেন তাঁকে যে সামনে বসিয়ে দেখে দেখে কাজটি করতে পারবেন তাও নয়, কারণ তিনি এখন প্রকৃত পক্ষে সান লোরেঞ্জোর শাসক, এর হর্তাকর্তা বিধাতা; মূর্তির মডেল হয়ে বসে থাকা তাঁর সাজেনা। তবে গুরুর একটি আশ্চর্য গুণ হলো মানুষের মুখের বৈশিষ্ট নিখুঁতভাবে মনে রাখতে পারেন। তাই স্মৃতি থেকেই চলছে তাঁর ভাস্কর্য গড়া।

অতি অভিজাত শ্রেণীর মানুষের মূর্তি হলেও এই মুখাবয়ব মেক্সিকোর ওলমেক মানুষদের সাধারণ বৈশিষ্টেরই অধিকারী— সেগুলোই রূপ লাভ করছে গুরুর গড়া মূর্তিতে। সেই মুখটা কেমন যেন নিচের দিকে বাঁকা করা, গালগুলো ফোলা ফোলা, ঠোঁট মোটা, নাক চেপ্টা থ্যাবড়া। সব চেয়ে বৈশিষ্টময় হলো চোখগুলো— সরু একটুখানি ফাটলের মধ্যে মিট মিটে চোখ, আর তাতে মণি দুটিতে যেন কিছুটা ট্যারা ভাব রয়েছে। এ পর্যন্ত এখানে যে কয়টা এরকম প্রকাণ্ড মূর্তি গড়া হয়েছে তার সব কটিতেই এই বৈশিষ্টগুলো রয়েছে কারণ তা তো এখানকার মানুষেরই ছবি। গুরুর গড়া মূর্তিটির মাথার ওপরের দিকটি একটি চামড়ার হেলমেটের আকৃতিতে খোদাই করা হয়েছে— ঠিক যেরকম হেলমেট বল

খেলার সময় খেলোয়াড়রা পরে। এই প্রতিপত্তিশালী শাসনকর্তাও এই হেলমেট নিজের মূর্তিতে রাখতে চেয়েছেন হয়তো নিজে খেলেন বা এই খেলা পছন্দ করেন বলে, অথবা হেলমেটটিকে তাঁর রাজমুকুট হিসেবেই গ্রহণ করেছেন বলে।

যে সব বড় বড় ভাস্কর্য প্রকল্প গুরুর নেতৃত্বে সম্পন্ন হচ্ছে তার মধ্যে আর একটি হলো সান লোরেঞ্জের কাছে পাহাড়ী গুহার মুখের শিলা কেটে ভাস্কর্য ও চিত্রণের মাধ্যমে বর্তমান শাসনকর্তার প্রকাণ্ড মূর্তি ও তার সঙ্গে পটভূমি দৃশ্যের সৃষ্টি করা। এটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখানে পাহাড়ের গায়ের শিলা খোদাই করে নগরীর অধিকর্তার পূর্ণ প্রকাণ্ড মূর্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একটি সিংহাসনে আসীন অবস্থায়। এর পেছনে পাথরে খোদাইয়ে সামান্য উঁচু হয়ে থাকা রিলিফে দেখা যাচ্ছে ভুট্টা খেতের দৃশ্য। একে আরো জীবন্ত করার জন্য রঙীন চিত্রণেরও সাহায্য নেয়া হয়েছে। এখানকার পাহাড়ী শিলার গায়ে এরকম প্রকাণ্ড শিল্পকর্ম আরো রয়েছে। যেমন একটিতে অধিকর্তাকে সম্পূর্ণ একটি পাখির সাজে দেখা যাচ্ছে। পশু-পাখিকে এরকম ক্ষমতা ও শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহারের বহু নমুনা এখানকার শিল্পকলায় রয়েছে। এর মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে জাগুয়ারের প্রতিকৃতিগুলো। জাগুয়ার হলো স্থানীয় বাঘ জাতীয় পশু যার শক্তিমত্তা প্রশ্নের অতীত। ওদের একটি দেবতা হলো জাগুয়ার-দেবতা। তার দেবত্বের কিছুটা আরোপ করা হয় এখানকার শক্তিমান মানুষদের ওপরেও। তাই সেই শক্তিমানদের মাথার প্রকাণ্ড মূর্তি গড়া হয়েছে জাগুয়ারের মতই— বাদাম আকৃতির চোখ, মুখ ফাঁক করা, নিচের দিকে ঝুলানো মোটা ঠোঁট, মাথার ওপরের দিকটায় মনে হয় একটু ফাটলের মত। এরকম কোন কোন মূর্তিতে মাথার ওপর থেকে কপালের ওপর মুকুটের মত নেমে এসেছে জাগুয়ারের দুটি থাবা। জাগুয়ার দেবতার মূর্তি আরো নানা ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন অনচ্ছ জেইড পাথরের তৈরি কুড়ালকে জাগুয়ারের আকৃতি দেয়া হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে মূল্যবান চকচকে জেইডের তৈরি এই কুড়াল সত্যিকার কাজ করার জন্য নয়, বরং আলঙ্কারিক উদ্দেশ্যেই তা তৈরি।

ওলমেক সমাজে আরো নানা দেব-দেবীর মূর্তি তাদের শিল্পকলায় রূপ লাভ করছে। গুরুর তত্ত্বাবধানে তাঁর ছাত্ররা প্রায়ই নানা আকারের একটি মূর্তি তৈরি করছে যাকে বলা হয় 'বৃষ্টি-শিশু'। আসলে এটি বৃষ্টি দেবতার মূর্তি, তাকে দেখা যায় প্রায়শ বেশ বড় আকারের একটি শিশুর আদলে পাথরের মূর্তিতে— অদ্ভুত ভাবে যার খোলামুখ, তাতে কোন দাঁত নেই, মাথাটির ওপরে বেশ স্পষ্ট ফাটল, আর মাথায় একটি হেড-ব্যান্ড ব্যবহার করা— কতকটা খেলোয়াড়দের মত। অধিকাংশ দেবদেবী অবশ্য মানুষের নয় জীবজন্তুর আদলে তৈরি। জাগুয়ার ছাড়াও এদের মধ্যে আছে ঈগল, সাপ, হাঙ্গর ইত্যাদি। জাগুয়ারে-মানুষে মিলিত মূর্তির একটি দেবতাও বেশ চোখে পড়ে। স্পষ্টত দেবতার পর্যায়ে যাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে সেই জীবজন্তুগুলো সবই ভয়ঙ্কর এবং শিকারি প্রকৃতির।

গুরুর নিজের কাজে ও তাঁর শিষ্যদের কাজে প্রকাণ্ড ও মাঝারি আকারের শিল্প-কর্মগুলো বেশি গুরুত্ব পায়। কিন্তু অন্য প্রতিষ্ঠিত ভাস্কররা ভিন্ন বিষয় ও ভিন্ন আকারের ভাস্কর্য গড়ার ক্ষেত্রে হাত পাকিয়েছেন। এর মধ্যে আছে জেইড, সারপেনটাইন, গ্রিন-ষ্টোন ইত্যাদি নানা মূল্যবান পাথরে তৈরি ছোট ছোট মূর্তি। নর-নারীর মূর্তিই বেশি— অধিকাংশ সাদামাটা মুখাবয়ব, তবে প্রকান্ড মূর্তিগুলোর নাক-চোখের বৈশিষ্টগুলো এখানেও প্রায় একই। পূর্ণাঙ্গ মূর্তির ক্ষেত্রে নগ্নতাটিই বেশি উচ্চকিত— হয় একেবারে নগ্ন, অথবা অপ্রতুল বস্ত্র। যে মূল্যবান পাথরগুলো খোদাই করে এগুলো তৈরি তার সবই দূর অঞ্চল থেকে আমদানী করতে হয়েছে। তবে এসব ছোট ছোট মূর্তির বেশ একটি রপ্তানী বাজার আছে— ওলমেকদের নিজেদের নগরের বাইরেও। তাই গুরুর মত গুণীদের থেকে শিক্ষা নেয়া তরুণতররা যে ভাস্কর পল্লী গড়ে তুলেছেন, তার একটি অর্থনৈতিক দিকও রয়েছে বৈ কি। নর-নারীর মূর্তি ছাড়াও আরো ব্যাপক ভাবে খোদাই হয় ফুলদানির মতো পাত্র— পাখি-পাত্র, মাছ-পাত্র ইত্যাদি নামের পাখি বা মাছের মোটিফে।

সান লোরেঞ্জোর অর্থনীতিতে আরো কিছু ভূমিকা রাখছে এখানকার কুমোর আর পটুয়ারা— তাদের বিচিত্র পটারি-কর্ম নিয়ে। তবে ভাস্কর্যের নমুনাগুলোর তুলনায় তা কিছুটা আটপৌরে ডিজাইনের, শিল্প সৌকর্যের দিক থেকে কিছুটা সাদামাটা। বহুল ভাবে প্রচলিত ভাস্কর্যের আর একটি চমৎকার উদাহরণ হলো মূল্যবান পাথরের তৈরি ছোট মুখোশ। এর ছোট সাইজ দেখেই বোঝা যায় যে ঠিক মুখের ওপর পরার জন্য এ মুখোশ তৈরি হয়নি। বরং তরুণ তরুণীদের দেখা যায় এটি গলায় অলঙ্কারের মত ঝুলিয়ে পরতে। যেই সারপেনটাইন, জেইড ও ওবসিডিয়ান পাথরকে পাতলা করে এই মুখোশ তৈরি হচ্ছে, সেইগুলোকে এই আকার-আকৃতিতে আনা মোটেই সহজ কাজ নয়— কিন্তু ওরা অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে সেই কাজটিই করছে। বিশেষ করে সবুজ ও ছাই রঙের সার্পেন্টাইন পাথরের মুখোশে যে আভা তা অনবদ্য যদিও আরো বেশি প্রচলিত অনচ্ছ সবুজ জেইডের মুখোশও কম যায়না। মুখমণ্ডলের আকৃতিতে বাঁকা হয়ে আসা এই পাতলা পাথরের ওপর খোদাই করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নাক, চোখ, মুখ সব মিলিয়ে সেই একই রকম মুখাবয়ব— শাসক বা অন্য বিভিন্ন গণ্যমান্যদের আদলে; সেই পুরো উল্টানো ঠোঁট চাপা নাক, চেরা ও ট্যারা চোখ। চোখের মণির জায়গায়, মুখের ফাঁকে সামান্য ছিদ্র করেই বাকিটুকু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মুখোশের ওপরটা একেবারেই মসৃণ পালিশ করা। ভেজা দড়ি দিয়ে দিনের পর দিন ঘষে মুখোশের সূক্ষ্ম ঢেউয়ের কারুকার্য যেমন তৈরি হয়েছে তেমনি এই চকচকে পালিশও পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন মুখোশের নানা জায়গায় এমন সব ফাটল বা ভাঁজ রয়েছে যা ওলমেকদের একটি জনপ্রিয় সাজ মুখের ওপর উল্‌কি আঁকার ভাবটিই এনে দিয়েছে। অল্প কিছু মুখোশে গালে যে ছিদ্র দেখা যায় তারও একটি রূপ সত্যিকার মানুষের মুখেও দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মুখের সাজ হিসেবে নিজেদের গালে ওরা ছোটছোট

রীতিমত ছিদ্র করে যা আবার খিলের মত জিনিস দিয়ে বন্ধ করে দেয়। এই খিলগুলোর খানিকটা মুখ থেকে বেরিয়ে থাকে। মুখোশের দুই কিনারায় দুটি ছিদ্র করা থাকে যাতে মালার সুতো পরিয়ে একে গলায় বা মাথার টুপির সঙ্গে পরার ব্যবস্থা করা যায়।

মূর্তির ওপর, মুখোশের ওপর, পাথর চিত্রণের সঙ্গে ওপর ওলমেকরা কয়েক রকমের চিহ্ন ব্যবহার করে— এগুলোর এক ধরনের প্রতীকী অর্থ আছে। কিন্তু অন্তত তাদের হাতে ওগুলো কোন লিপিতে পরিণত হয়নি। ওলমেক সমাজের অনেক কিছুতেই আসলে নানা প্রতীকী অর্থ রয়েছে— যার অনেক খানিই ধর্মীয় আচারের সঙ্গে জড়িত। যেমন পাথর খোদাই করা কোন কোন মূর্তির হাতে খুব পালিশ করা জেইডের অথবা ম্যাগনেটাইটের মত লৌহ আকরিকের তৈরি চকচকে আয়না থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এই আয়না মূর্তি নিজে নিজের মুখ দেখছে সেটি বোঝাবার জন্য নয়, বরং দেবদেবীর সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগের একটি মাধ্যম হচ্ছে এই আয়না, সেটি বোঝাবার জন্যই শিল্পী মূর্তির হাতে এই আয়না ধরিয়ে দিয়েছে।

ছোট মুখোশ, ছোট মূর্তি, ছোট অলঙ্কার এসবের কারুকার্যের কোন অভাব নেই সান লোরেঞ্জোতে। গুরুর যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং তার সংলগ্ন যে উৎপাদন কেন্দ্র তার বিভিন্ন বিভাগে এগুলোর কাজ চলছে। এর প্রত্যেকটি দিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষক থাকলেও গুরু নিজে সবগুলো দিক তদারক করেন। কিন্তু যে কাজে তিনি সরাসরি তাঁর শিল্প প্রতিভাকে নিয়োজিত করেন তা হলো নগরীর বড় বড় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রকল্পে। এর মধ্যে প্রকাণ্ড মূর্তির কথা অবশ্যই প্রথমে আসে। সব চেয়ে প্রধান স্থাপনাগুলো গড়ে তোলা হয়েছে সান লোরেঞ্জোর কেন্দ্রস্থলে। এখানে একটি কৃত্রিম টিলার মত উচ্চ ভূমি তৈরি করে তাকেই সেই কেন্দ্রের মূল আকর্ষণ ও ভিত্তি করা হয়েছে। এখানকার একটি একেবারে নতুন ধরনের ও ভবিষ্যতমুখী প্রকল্পের জন্য গুরুকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তা হলো এক ধরনের পিরামিড তৈরি— যা হবে নগরীর জন্য একেবারে ব্যতিক্রমী ও বৈপ্লবিক একটি ব্যাপার। এখনো এটি তৈরি হয়নি— তবে কেমন করে হবে তার একটি পরিকল্পনা গুরু ও তাঁর সহকারীরা নগরীর গণ্যমান্যদের কাছে পেশ করেছেন। পাথরের বড় বড় ব্লক সাজিয়ে ধাপে ধাপে এই পিরামিড তৈরি হবে। সব চেয়ে নিচের ধাপটি হবে সব চেয়ে বড়; তারপর এর চেয়ে কিছু ছোট দ্বিতীয় ধাপ; আরো ওপরে আরো ছোট তৃতীয় ধাপ; এমনি করে অনেক ওপরে উঠে যাবে ধাপ পিরামিড। সবার ওপরের ধাপে থাকবে নগরীর মন্দির— সব চেয়ে শক্তিশালী দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে যেটি হবে নিবেদিত। তবে এ প্রকল্পটি বেজায় বড় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী— আর এদিকে সান লোরেঞ্জোর অর্থনৈতিক অবস্থায় কিছুকাল ধরে একটি অনিশ্চয়তা চলছে। তাই এর কাজ খুব ধীরে এগোচ্ছে।

* * *

মেক্সিকোর ঘন জঙ্গলে ঢাকা পড়ে সান লোরেঞ্জো সহ ওলমেক সংস্কৃতির অন্যান্য নগর ও জনপদগুলো প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে গিয়েছিলো— কারণ এর অনেক আগেই কোন এক অজ্ঞাত কারণে এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছিলো। ওই জঙ্গলের মধ্যে এর কিছু কিছু নমুনা প্রথম আবিষ্কৃত হয় মাত্র ১৮ শতকের শেষের দিকে। তবে সত্যিকার অর্থে এগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ ও গবেষণা শুরু হয় ১৯২০ এর দশকে। প্রথমে একে মায়া, আজটেক ইত্যাদি এই এলাকার পরবর্তী কালের পরিচিত সভ্যতাগুলোর সমসাময়িক মনে করা হলেও কার্বন ডেটিং এর মাধ্যমে যখন দেখা যায় যে এর অনেকগুলো তিন হাজার বছরেরও প্রাচীন তখন দারুণ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এখন বোঝা যাচ্ছে নানা দিক থেকে এই ওলমেক সংস্কৃতি পরবর্তী কালের মধ্যে আমেরিকার বিখ্যাত ওই সভ্যতাগুলোর মাতৃস্থানীয় বলা যায়। পনরো শতকে ইউরোপীয় আগন্তুকরা যখন প্রথম এখানে এসেছে তার অনেক আগেই ওলমেক বসতগুলো সম্পূর্ণ লুপ্ত। কিন্তু তারা এসে যে আজটেক, মায়া ইত্যাদি জমজমাট সংস্কৃতির সাক্ষাত পেয়েছে ওলমেক ছিল তারই আদি রূপ। আজটেক ও মায়া নগর পরিকল্পনা, ধাপ পিরামিড, বড় ছোট মূর্তি গড়া, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের আদল, ভুট্টা দেবতা সহ নানা দেবদেবীর পূজা, ধর্মীয় আচার, খাদ্য ও পানীয় রীতি, প্রতীক ব্যবহার, লিপি ব্যবহার, সব কিছুর দিক থেকে ওলমেক ছিল শুধু মধ্য আমেরিকার পরবর্তী সভ্যতা সমূহের নয়, আজকের মধ্য আমেরিকার আদিবাসীদেরও সাক্ষাত পূর্বসুরি।

সান লোরেঞ্জো ওলমেকদের কিছুটা প্রথম দিকের নগরী— তিন হাজার বছর আগের। এর পর কাছাকাছি অন্যান্য নগরীগুলো গড়ে ওঠেছে— লা ভেন্টা, ট্রেস জাপোটেস, ল্যাগুনা দ্য কোরোস ইত্যাদি। এর সবগুলোতে প্রায় একই ধরনের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। সান লোরেঞ্জো নগরটি পরিত্যক্ত হবার পরও লা ভেন্টা সহ আরো কিছু নগর গড়ে ওঠেছে— সেখানে ধাপ পিরামিড সহ স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনার আরো উন্নত পর্যায় দেখা গেছে।

এসব প্রত্যেকটি নগরে এবং তার আশপাশে ভাস্কর্য, পটারি ও অন্যান্য শিল্পকর্মের অধিকাংশ নমুনা প্রত্নতত্ত্ববিদরা আবিষ্কার করেছেন মাটিতে প্রোথিত অবস্থায়। মনে হয় এগুলোকে ইচ্ছে করেই বড় বড় ভাণ্ডার হিসেবে মাটিতে গেড়ে রাখা হয়েছিলো। এর মধ্যে কোন কোনগুলো অবশ্য বাড়িঘরে পরিত্যক্ত আবর্জনার গর্তে বা স্তুপে পাওয়া গেছে, আবার কোন কোনগুলো দেখলে মনে হয়েছে কবরে মৃতদেহের সঙ্গে সমাধিস্ত করা হয়েছে। তবে কবর মনে হওয়া এসবে মৃতদেহের কঙ্কাল, হাড় ইত্যাদি বড় একটা পাওয়া যায়নি। এর কারণ এখানকার স্যাঁতসেতে, এসিডপ্রধান মাটিতে ওরকম জৈব বস্তু দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

সাধারণ ভাবে মূল্যবান শিল্প সামগ্রীকে মাটিতে প্রোথিত করার পেছনে খুব সম্ভব কিছু ধর্মীয় বা অনুরূপ আনুষ্ঠানিকতা জড়িত ছিল, হয়তো দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি রক্ষার কারণেই এই কাজ। এই ব্যাপারটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে প্রকাণ্ড মূর্তিগুলো বা এ রকমের বড় আকারের ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে। এরকম বেশ কিছু মূর্তিকেও মাটিতে এমন ভাবে গেড়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয় এ ভাবে প্রোথিত করার আগে কোন কোন মূর্তিকে বিকৃত করা হয়েছে, কোন কোনটি আবার পরিবর্তন করা হয়েছে, তবে চেঙ্গারা অবিকৃত রেখে। এসবের পেছনের কারণগুলো বোঝা যায়নি।

মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় শুধু বড় মূর্তি বা মূল্যবান অলঙ্কার শুধু নয়, বরং এসবের প্রচুর কাঁচামালও পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জেইড ইত্যাদি মূল্যবান পাথরের সঞ্চয়, পাথরের মোজাইক, সার্পেন্টাইনের মত পালিশ করা মূল্যবান পাথর যা মুখোশ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। আবার বিপুল পরিমাণ রঙীন কাদাকেও অতি যত্নে মাটিতে পুঁতে সংরক্ষণ করতে দেখা গেছে।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বলতে গেলে হঠাৎ করেই ওলমেক নগরগুলো পরিত্যক্ত হয় এবং হারিয়ে যায়। ব্যাপারটি কিছুটা রহস্যময় হয়েই রয়েছে। ওসময় পরিবেশের বা জলবায়ুর কোন বড় রকম বিপর্যয়ের কথা জানা যায়নি, বাইরের কোন রকম আক্রমণ, মহামারী বা স্বাস্থ্যজনিত কোন দুর্যোগেরও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, না কোন অর্থনৈতিক সংকট। অন্য দিকে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী, শিল্পকর্মগুলো, এমনকি এসবের কাঁচামালগুলো ব্যাপক ভাবে মাটিতে প্রোথিত করার ব্যাপারটিও বেশ রহস্যময়। তবে ওলমেকরা সরে গেলেও ওলমেক সংস্কৃতি কিন্তু মোটেই সরে যায়নি। ওই সময়ের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পত্তন হওয়া টেয়োটিহুয়াকান নগরী ও তার সংস্কৃতিতে ওলমেকদের ছাপ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। বর্তমান মেক্সিকো সিটির কাছে এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়া হাজার হাজার পর্যটক নগর পরিকল্পনা, ধাপ পিরামিড, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের চিহ্নের মধ্যে ওলমেক সংস্কৃতির ছায়া দেখতে পান। আরো পর আজটেক, মায়া ইত্যাদি বিখ্যাত সভ্যতার মধ্যে তার ধারাবাহিকতা কিছুটা বজায় ছিল।

বাদল বনের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে ওলমেক সংস্কৃতির নগর

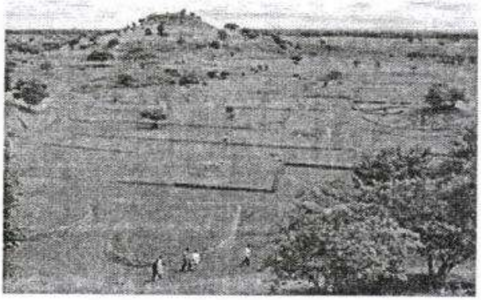

সান লোরেঞ্জোর খনন

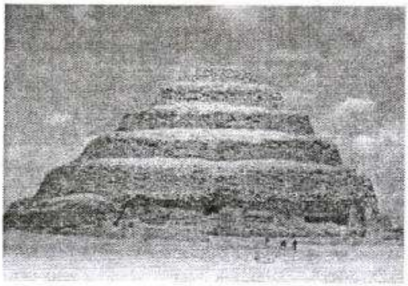

দক্ষিণ আমেরিকার ধাপ পিরামিডের
শুরু এখানেই

অতিকায় মাথার মূর্তি

ওলমেক সংস্কৃতির রাবারের বল

ভুট্টা দেবতা

জাগুয়ার দেবতা

'বৃষ্টি শিশু'

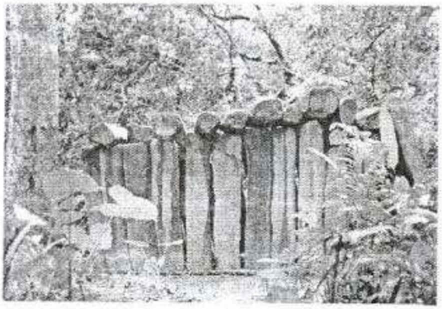

সান লোরেঞ্জোর গেরস্ত বাড়ির সম্ভাব্য গঠন

অতিকায় মাথার মূর্তিগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে ভূগর্ভে

ওলমেক সংস্কৃতির পাথরের মুখোশ

পাথরে খোদাই করা প্রতীকী চিহ্ন

যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ড সিটির উজি-ঠিকাদারঃ দুই হাজার বছর আগে

মানুষগুলো থাকে নদীর ধারে ছড়ানো ছিটানো বিভিন্ন বাড়িতে। শুধু চোখে পড়ার মত হলো বাড়িগুলো থেকে দূরে দেয়ালে ঘেরা বিরাট জায়গাটি— মৃত্যুর পর বড় বড় সমাজপতিদের পারলৌকিক ক্রিয়া ও সমাধির জন্য। সমাধির ওপর তৈরি হচ্ছে খুবই বিশেষ রকমের আকৃতি-প্রকৃতির বিশাল সব মাটির ডিবি— যেগুলোর জন্য এ সমাজ ও তাদের সংস্কৃতি বিখ্যাত। ডিবির দেয়াল মেরামত, নতুন ডিবি তৈরি সহ এখানকার যাবতীয় কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব যার কাঁধে তাঁর নাম উজি-ঠিকাদার।

যুক্তরাষ্ট্রে ওহাইয়ো ষ্টেটের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট একটি শহর চিলিকোত— কাছেই সিয়োতো নদী। এই শহরের কাছেই নদীর ধারের জায়গা মাউন্ড সিটি যেখানকার আজকের কিছু দৃশ্য আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে আজ থেকে দু'হাজার বছর আগের দিনগুলোতে— হোপওয়েল সংস্কৃতির আদি আমেরিকানদের জগতে। সেখানেই সাক্ষাত পাব উজি-ঠিকাদারের। লম্বা চুল, রুক্ষ চেহারা, অন্যদের তুলনায় দেহটাকে বেশ দশাসই বলতে হবে। গরমের দিন— তাই গায়ে খুব মামুলি গোছের কাপড়চোপড়ই আছে; তা ছাড়া ভীষণ ব্যস্ত এখন উজি-ঠিকাদার। এই গরমের কয়েকটি মাসেই মাউন্ড সিটির মাটির দেয়ালের ও ডিবির বেশ খানিকটা মেরামত কাজ সম্পন্ন করতে হবে— যার জন্য অনেক মানুষের শ্রম প্রয়োজন হবে। বহুকাল পর মাউন্ড সিটি নাম দেয়া হলেও ওই দেয়ালের ভেতর সিটি বা নগরের মত কিছু নেই, এমনকি কোন বসতবাটিও নেই। বার ফুটের মত উঁচু মাটির দেয়ালে ঘেরা সব দিকে কয়েক মাইল ব্যাপী জায়গাটির একমাত্র উদ্দেশ্য এর বাইরে নদীর ধারের নানা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহু মানুষের পারলৌকিক ব্যবস্থাদি করা। এখানেই তাদের সবার মৃতদেহকে কবর দেয়াই শুধু হয়না, দেহাবশেষের ওপরে তৈরি করা হয় বেশ উঁচু উঁচু বড় বড় মাটির ডিবি।

দেয়ালে ঘেরা এই বিশাল জায়গাটিকে আমরা বলতে পারি সমাধিপুরী। ইতোমধ্যেই বিশটির মত ওরকম ডিবি রয়েছে এই সমাধিপুরীতে। নদীর বানে ও নানা কারণে মাটির দেয়ালের অনেক খানি ভেঙ্গে গেছে। একটি নতুন ডিবিও তৈরি করতে হবে। এই গরমের মৌসুমেই এসব মেরামত ও তৈরি করে ফেলা জরুরী। স্থানীয় যে দশ বারো পরিবার বড় কর্তা-ব্যক্তিরা রয়েছেন তাঁরাই বংশানুক্রমিক ভাবে এসব ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্বগুলো পালন করে থাকেন। কিছুদিন আগে তাঁদের একটি সভায় এই কাজগুলোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং সেখানে ডাক পড়েছে উজি-ঠিকাদারের। তাঁর এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই উজি-ঠিকাদার এ ধরনের কাজে বেশ কিছু ঠিকাদারী করেছেন। কাজটি সহজ নয়। অনেক মানুষ যোগাড় করে, সবার কাজের সমন্বয় করে পরিকল্পনামত কাজ তদারকি করতে হবে।

শুরুতে নদীর ধার সহ আরো কয়েকটি জায়গা থেকে নতুন মাটি খনন করে আনতে হবে। তারপরই সম্ভব হবে দেয়াল মেরামত ও ডিবি তৈরির কাজ— অন্তত শ খানেক মানুষের বেশ কিছু দিনের কাজ। কাজের নানা অংশে মাটির দরকার বিভিন্ন রকমের, সেভাবে চিনে আনতে হবে। যেমন ডিবির কিনারার মাটি আর মাঝখানের মাটি এক রকমের হবেনা। আর এই ডিবিগুলো যেনতেন রকমে যে কোন আকৃতিতে গড়ার জিনিস নয়— হোপওয়েল সংস্কৃতির বিশেষভাবে পরিচিত ডিবি বলে কথা। প্রত্যেকটি ডিবি এক বিশাল ব্যাপার— ডিবির চারিদিকের দৈর্ঘ হাজার খানেক ফুট তো হবেই। আর এর আকৃতি খুবই হিসেব-নিকেশ করে জ্যামিতিক আকৃতিতে তৈরি— কোনটি বর্গ ক্ষেত্র, কোনটি বৃত্ত, কোনটি পঞ্চভুজ, কোনটি ষড়ভুজ। আসলে যখন যেটি মনে হলো সেই আকৃতিতে করে ফেলার ব্যাপারও এ নয়। ধর্মীয় আচারের স্পষ্ট বিধান আছে কোন ক্ষেত্রে এর কোন বাহুকে কোনদিনের সূর্য উদয়ের দিকের সঙ্গে মেলাতে হবে, কোনটিকে কোন দিনের চন্দ্র উদয়ের সঙ্গে মেলাতে হবে ইত্যাদি। এত সব হিসেব-নিকেশের যে কারিগরি দিক আছে তার দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হয় উজি-ঠিকাদারের, নইলে সব ভন্ডুল হয়ে যাবে।

কিন্তু শুধু কারিগরি দিকই সব নয়, সময়মত লোক যোগাড় করে কাজগুলো সম্পন্ন করাটিও কম বড় দায়িত্ব নয়। শীত আর বৃষ্টি নামার আগেই কাজ সারতে হবে। কিন্তু এই গরমের দিনে সবাই নানা কাজে ব্যস্ত। বসতের যে ছোট ছোট পাড়া তা একটির থেকে অন্যটি অনেক দূরে দূরে। ওখানে মানুষ নিজেদের বাগানের চাষবাসে ব্যস্ত এ সময়, শিকার ও সংগ্রহের জন্যও এটি উপযুক্ত সময়। তাই অনেক বলে রাজি করিয়ে প্রয়োজনীয় কাজের মানুষ যোগাড় করতে হয়। ধর্ম-আচারের দোহাই দিয়েই এটি সম্ভব হয়। তা ছাড়া ক্ষমতাবানদের প্রিয়ভাজন হবার লোভটিও থাকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এভাবে সামাজিক কাজে এগিয়ে আসার পেছনে। কাজের মানুষদের দু'বেলা খাবার যোগানোর প্রশ্ন আছে— সেটি

সামাজিক ভাবে সংগৃহীত দানের মাধ্যমে, বিশেষ করে বড় লোকদের দানের মাধ্যমে সম্ভব হয়।

এ সময় ওই দেয়ালে ঘেরা মাউন্ড সিটিতে গেলেই ব্যস্ত সব মানুষের মধ্যে উজি ঠিকাদারকে স্পষ্ট দেখতে পাবেন— হাঁকডাক করে চরকিবাজির মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে আরো বিশেষ ভাবে চিনতে পারবেন তাঁর মুখে অথবা হাতে ধরা সার্বক্ষণিক ধূমপানের পাইপটির কারণে। পাইপটি দেখতে এমন আর তিনি এমনভাবে এতে ধূমপান করেন যেন এটি তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আসলে এই হোপওয়েল সংস্কৃতিতে ধূমপানকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়, যেন অনুভূতি এবং চিন্তা চেতনাকে প্রভাবিত করার এক আলাদা ক্ষমতা আছে এই ধূমপানের। উজি ঠিকাদারের পাইপটির দিকে একটু মনোযোগ দেয়া যাক। খয়েরী লাল রঙের এক রকম পাথর দিয়ে এ পাইপ তৈরি হয়েছে (একে পাইপ-ষ্টোনও বলা হয়)। পাইপটির তলার দিকের ইঞ্চি চারেক লম্বা ও ইঞ্চি খানেক চওড়া পাতলা বিস্কুটের মত অংশটি এর ভিত্তি, যার এক প্রান্তের ছোট একটি ছিদ্র থাকা অংশটি মুখে দেয়া হয়। তামাক রাখার বাটিটি পাইপের অন্য প্রান্তে নয়, বরং এর মাঝামাঝি জায়গায় ওই ভিত্তির থেকে ওপরে উঠে এসেছে। তবে তা সহজ সরল বাটির আকারে নয় বরং একটি প্রাণীর আকারে। উজি ঠিকাদারের পাইপটিতে একে একটি উদের আকার দেয়া হয়েছে যেই উদ পানিতে সাঁতার কেটে মাছ ধরে খায়। পাথরে খোদাই করা এই উদটির সামনের অংশটি সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে রয়েছে— মাথাটি একটু উঁচু করা, সামনের দুই পায়ে ভর দিয়ে রয়েছে। এত সুন্দর ভাবে পাথরকে খোদাই করা হয়েছে যে উদের ভেজা লম্বা পশমকে পর্যন্ত একেবারে বাস্তবানুগ দেখা যাচ্ছে। উজি যখন এতে ধূমপান করেন তখন মনে হয় উদটির নাকের সঙ্গে তাঁর নিজের নাক গিয়ে ঠেকেছে আর তাঁর চোখ উদের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। বলা বাহুল্য উদের এই চোখ পাথরে চোখের কোটরের মত করা গর্তে দুটি মুক্তা লাগিয়ে তৈরি হয়েছে।

মাউন্ড সিটি সমাজে উঁচু মহলের সব মানুষ উজি-ঠিকাদারের মত প্রায় সব সময়েই পাইপে ধূমপান করছেন। তামাক চাষ ও ধূমপান শুধু হোপওয়েল সংস্কৃতিতে নয়— আমেরিকার উত্তর থেকে দক্ষিণে এখানকার সব সংস্কৃতিতেই গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে মধ্য আমেরিকার গরমের অঞ্চলে সব সময় অন্য উপযুক্ত পাতায় মুড়িয়ে চুরুট বানিয়ে ধূমপান করা যায় কারণ এখানে চির হরিৎ গাছের অনেক সরবরাহ রয়েছে। কিন্তু মাউন্ড সিটির মত উত্তরের জায়গাতে শীতকালে চুরুট বানানোর মতো পাতা পাওয়া যায়না, তাই সব মৌসুমের জন্য পাথরের তৈরি পাইপই ভরসা। উজির পাইপের উদের মত এই সব পাইপেই কোন না কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি খোদাই করা আছে— বনবেড়াল, কচ্ছপ, ব্যাং, কাঠবিড়ালি, পাখি, মাছ, মাছ খাওয়ারত পাখি, কোন কিছুই বাদ যায়নি। যে অদ্ভুত সৌকর্য ও শ্রমের মাধ্যমে এক একটি প্রাণীর আদলে পাইপকে খোদাই করা

হয়, আর ব্যবহারকারীরা এ পাইপকে যে রকম যত্ন ও মূল্যের জায়গা দিয়ে থাকে তা অবাক করার মত। আসলে আশপাশের প্রকৃতিতে ছোট বড় প্রাণীর সঙ্গে এদের এক অদ্ভুত আত্মিক সম্পর্ক আছে। ধূমপানের অতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সময় চোখে চোখ রেখে, তার নাকে নাক লাগিয়ে ওরা তামাকে এই সুখ টানটি দিতে চায়।

ধূমপানের প্রচলন এত বেশি যে তামাক তাদের ভালই ফলাতে হয় বাগান রচনা করে। কিছু কিছু খাবারও এভাবে বাগানে চাষ করেই পায় ওরা। তার মধ্যে বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে কিছু বীজ খাবার— মে-গ্রাস নামের ঘাসের বীজের জন্য ওই ঘাস, তেল বীজের জন্য সূর্যমুখী, শস্যের জন্য বন্য ধান এসব এরা বাগানে ফলায়। অল্প কিছু ভুট্টাও ফলায় যদিও সেটি এত ভাল হয়না; কিছু কিছু কুমড়া এবং শিমও হয়। অবশ্য এ সবের জন্য তাদেরকে কৃষিজীবীর পর্যায়ে ফেলা যায়না, বড়জোর ওরা সুবিধামত বাগান করে এইটুকু বলা যায়। কারণ তাদের খাবারের বড় অংশটি তারা যোগাড় করে শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবে। শিকারের মধ্যে নানা রকম হরিণের প্রাচুর্য যেমন আছে তেমনি আছে নদীতে ও জলায় মিঠা পানির মাছ ধরার সুযোগ। তাছাড়া একটু চেষ্টা করলেই তারা বন্য নানা বাদাম, বীজ, শিকড় ইত্যাদি খাবার যোগাড় করতে পারে— এবং সেভাবেই তাদের খাবারের বড় অংশটি আসে। তবে সংগ্রহ ও শিকার দীর্ঘ দিন এক জায়গায় বাস করে এক নাগাড়ে করা যায়না। তাই মূল বাড়ি ছেড়ে তাদেরকে প্রায়ই সাময়িক ক্যাম্পিঙে যেতে হয় বেশ দূরে দূরে। মূল বাড়ির যে এক একটি ছোট্ট পাড়া সেগুলো বেশ ছোট ছোট— এক একটিতে চার পাঁচটার বেশি বাড়ি নেই, সবগুলোই বলতে গেলে একই পরিবারের কয়েক ঘর। নদীর ধারে ধারে একটির থেকে আরেকটি অনেক দূরে এই পাড়াগুলো। তবে ওই যে দীর্ঘ উঁচু মাটির দেয়াল ঘেরা পারলৌকিক কর্ম ও স্মৃতিরক্ষার যে ডিবিগুলো রয়েছে সেখানকার আচার-অনুষ্ঠানগুলোই বিস্তৃত এলাকার সব মানুষকে একই সমাজবদ্ধ করে রেখেছে। অনুষ্ঠানগুলো সমাজের সব মানুষকে সময় সময় ওই জায়গায় জড়ো করতে পারে।

বাড়িগুলো কাঠের থামে ও কাঠামোতে গড়া চৌকা আকৃতির। এই কাঠামোর সঙ্গে মাটির দেয়াল তোলা হয়েছে। তবে এটি শুধু মাটি নয়, মাটির সঙ্গে চটচটে কাদা, বালি, গোবর আর খড় মিশিয়ে যে আঠালো জিনিসটি তৈরি হয়, তা শুকালে বেশ শক্ত হয়। ওই মিশ্রণে মাটি ছাড়া বাড়ির ছাদ তৈরি হয় শন ও খড়ের ছাউনি দিয়ে। বাড়ির কাছেই রচনা করেছে তাদের বাগান— তামাক, সূর্যমুখী, মে-গ্রাস যাই লাগানো হোক না কেন। কোন কোন বাড়ির সঙ্গেই নানা রকম উৎপাদনের জন্য পরিবারিক কারখানার মত রয়েছে যেখানে পটারি; পাথরের, হাড়ের বা কাঠের হাতিয়ার; মূল্যবান পাথর, মাইকা (অভ্র), তামা ও কিছুটা রূপার তৈরি অলঙ্কার ইত্যাদি ওরা তৈরি করে। এসব শিল্পকর্মের একটি ভাল ব্যবসা নিজেদের সমাজে যেমন রয়েছে তেমনি উত্তর আমেরিকার দূর দূরান্ত জুড়ে রয়েছে। এসবের

চাহিদা জীবন্ত মানুষের ব্যবহারের জন্য যেমন রয়েছে তেমনি ওই সমাধিপুরীর ডিবিগুলোতে মৃতের দেহাবশেষের সঙ্গে দেয়ার জন্যও রয়েছে।

পটারি যা তৈরি হচ্ছে তা বেশি পাতলা ও সৌকর্যময়— গায়ে সরু রেখার চিত্রণ, যার কোন কোনটি কাঁচা অবস্থায় আঁচড় কেটে এঁকে দেয়া হয়, আর অন্যগুলো সীলমোহরের মত পর পর স্টাম্প করে করে ফুটিয়ে তোলা হয়। এমন চিত্রিত জার, বয়াম, বাটি, পাত্র প্রচুর। ফ্লিন্ট পাথরের হাতিয়ারই বেশি তৈরি করা হয় শিকারের জন্য বর্শার অগ্রভাগ ছুরি ইত্যাদি। তবে ওবসিডিয়ানের মত মূল্যবান পাথরের খুব কার্যকর বর্শাগ্র, ধারালো ছুরি ইত্যাদিও বেশ কিছু হয়। হাড়ের হুক, সুচ যেমন হচ্ছে তেমনি কাঠের তৈরি শাবল, কোদাল ও অন্যান্য হাতিয়ার সব তৈরি হচ্ছে।

কিছু কিছু অলঙ্কারের শিল্পকর্ম তাকিয়ে থাকার মত। পরতে পরতে থাকা পাতলা চকচকে মাইকা কেটে কেটে মানুষের হাত, ঈগলের নখ, গোটা পশু-পাখি ইত্যাদির আদলে চমৎকার প্রতিকৃতি গড়া হয়। ভালুকের দাঁত, মিঠা পানির ঝিনুক থেকে মুক্তা, ছোট বড় শাঁখ, তামা, রূপা, ওবসিডিয়ানের মত মূল্যবান পাথর— অলঙ্কারের জন্য আরো নানা রকম উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে। পাথর খোদাই করে ধূমপানের পাইপকে যেমন শিল্পকর্ম রূপে গড়ে তোলা হচ্ছে, তেমনি গড়া হচ্ছে ছোট ছোট অসংখ্য মূর্তি— সবই সাজাবার জন্য, দেখাবার জন্য এবং মৃতের সঙ্গে দেবার জন্য। সব কিছুতে পশু-পাখির আদলকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে— এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য যে জমকালো পাগড়ি মাথায় পরার জন্য ব্যবহার করা হয় তাতেও জুড়ে দেয়া হয় পশু-পাখির মাথার কঙ্কাল, পাখির পালক। মনে হয় এদের দেহ, এদের বাড়ি, এদের অভ্যাস সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের প্রিয় পশু-পাখি।

শিকার ও সংগ্রহের তাগিদে পরিবারের অন্তত একাংশকে প্রায়ই নানা জায়গায় ঘুরতে হয়। বিভিন্ন মৌসুমে বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ, শিকারের বিশেষ বিশেষ প্রাণীর অনুসরণে তাদেরকে নানা দিকে এভাবে যেতে হয়। দেখা যায় সরু ছিপ নৌকার মত নায়ে চড়ে নদী পথে ওরা চলেছে দূরের গন্তব্যে। গাছের গুড়ির মাঝখানে খোদাই করে ফাঁকা করে এ নৌকা ওরা তৈরি করে। এক সঙ্গে দু'তিনটা নৌকায় এক একটি দল এভাবে গিয়ে পৌছে নতুন জায়গায়। সেখানে পাথুরে আশ্রয় পেয়ে গেলে ওখানেই সাময়িক বসবাসের ব্যবস্থা করে, তা না পেলে চামড়ার তাঁবু বানিয়ে বা অস্থায়ী কুটির তুলে আপাতত থাকার ব্যবস্থা করে। বাদাম, বীজ, শিকড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে সেগুলো বাছাই করে, খোসা ছাড়িয়ে এখানেই প্রস্তুত করে নেয়। শিকারের পশুকে কাটাকুটি করে, মাংসে ধোঁয়া দিয়ে, শুকিয়ে, সংরক্ষণের ব্যবস্থাটিও এখানেই করে ফেলে। তারপর সঞ্চিত রসদ নিয়ে নিজের স্থায়ী বাড়িতে ফেরত যায়।

সেখানে এখন উজি-ঠিকাদার বেশ বড়সড় একটি কর্মীদল যোগাড় করে ফেলেছেন সমাধিপুরীর কাজের জন্য। যে কাজটি খুব জরুরী তা হলো নতুন

একটি ডিবি তৈরি; কারণ দু'তিন মাস আগে এই সমাজের খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ মারা গিয়েছেন। উচ্চ বংশে জন্মানো এই মানুষটি খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত বহুদিন সমাজের 'প্রধান' হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। তারপরও এখানকার মানুষ নানা পূজা-অর্চনায় তাঁর আশীর্বাদ ও পরামর্শের জন্য যেতো। স্বল্পবাক এই অতি বৃদ্ধ মানুষটি আপন মনে পাইপে ধূমপান করে নিজের চারিদিক সব সময় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে রাখতেন। আর শ্রোতা পেলে খুব অস্ফুষ্ট স্বরে এ সমাজের পূর্বপুরুষদের কথা, তাদের সঙ্গে নানা জীবজন্তুর বেশে থাকা বিভিন্ন দেবতা-অপদেবতাদের টানাপোড়েনের কথা বলতেন। এমনি এক আসরে তিনি নিজের মৃত্যুর পর পারলৌকিক কর্মগুলোতে বিশেষ কী কী করতে হবে তাও বলে গেছেন। তাঁর জন্য তৈরি করতে হবে ষড়ভুজের আকৃতিতে ডিবি; ষড়ভুজের উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত বেখাটির দুই প্রান্তের দুই কোণ সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের সীমা নির্দেশ করবে। এই নসিহতের কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, আর বেশ কয়েকদিন ধরে চলেছে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া।

এ নিয়ে সমাজপতিরা বসে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই মতেই সব কাজ হয়েছে। সমাধিপুরীতে একটি স্থান নির্বাচন করে সেখানে খনন করা হয়েছিলো তাঁর কবর। মৃতদেহটি রাখা হয়েছিলো একটি কাঠের কফিনে। সুন্দর ছিমছাম কফিন— চারিদিকে সমতল কাঠ দিয়ে তৈরি— কোন রকম অলঙ্করন ছাড়াই। শুধু এর ওপরের ঢাকনির কাঠের ওপর কিছু মাঙ্গলিক চিহ্ন আঁকা। ওই কবরের মধ্যে রেখেই কফিন সহ দেহটি দাহ করা হয়েছে। সমাজের বর্তমান প্রধান এর প্রধান পুরোহিতও বটেন। কফিনের চারিদিকে সাজানো কাঠের জ্বালানিতে তিনিই অগ্নি সংযোগ করেছেন। এই পর্যায়ে পরিবারের সদস্যরা আর সমাজপতিরা ছাড়া কেউ ছিলনা। সব ছাই সহ দেহাবশেষের শেষকৃত্যের জন্য আয়োজন হয়েছিলো সব মানুষের উপস্থিতিতে বিরাট অনুষ্ঠানে। সমাজপতিদের একটি কাজ ছিলো যে মূল্যবান জিনিসগুলো দেহাবশেষের সঙ্গে দেয়া হবে তার সংগ্রহ ও সমাবেশ করা ও সুন্দর করে কবরে সাজিয়ে দেয়া। পাথরের, দাঁতের, হাড়ের, তামার নানা রকম অলঙ্কার তো ছিলই— এতে বিশেষ স্থান পেয়েছে 'প্রধান' থাকা কালে একটি ঈগল পাখির আদলে মাথায় পরার যে জমকালো পাগড়ি তিনি ব্যবহার করতেন সেটি এবং জীবনের নানা সময় তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন পশু-পাখির আদলের ধূমপানের অনেকগুলো পাইপ। আয়োজনের অনেকখানি দায়িত্ব পড়েছিলো উজি-ঠিকাদারের ওপর। নিজে সমাজপতিদের একজন না হলেও তিনি সাধারণ কেউ নন মোটেই। পারলৌকিক কর্মগুলোর আয়োজনে তাঁর বিরাট ভূমিকা— কবর খোঁড়া থেকে তাতে মাটি দিয়ে দেয়া পর্যন্ত সব কিছুর ব্যবস্থাপনা করতে হয়েছে তাঁকে, যদিও করেছেন প্রধান আর সমাজপতিদের নামে। সব চেয়ে বড় কথা এর পর সর্বসাধারণের জন্য যে বিরাট ভোজের আয়োজন করতে হয়েছে সেটির আয়োজনের দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। ভোজের

জন্য বিশেষ শিকারের ব্যবস্থা, নানা জনের বাগান থেকে দান নেবার ব্যবস্থা- বিশেষ করে সমাজের বড় লোকদের থেকে বড় আকারের দান, এর সব আয়োজনে তাঁকে তৎপর হতে হয়েছে। এটিই তাঁর পেশা, সমাজপতিদের একজন না হলেও তাঁদের নামে যত কিছু ঘটে সব কিছু কার্যকর করার দায়িত্বটি তিনি নিয়ে নিয়েছেন। এভাবে তিনি সামনে খুবই বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী শুধু হননি, একজন ধনী ব্যক্তিও হয়েছেন। এই কাজগুলো তাঁর জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ। সমাজপতিদের সন্তুষ্টি মত যথাসময়ে করতে না পারলে সব দোষ তাঁর হবে। এমনকি তাঁর ওই ঠিকাদারি বেহাতও হয়ে যেতে পারে। তবে এ সবে তাঁর মত কেজো মানুষ দ্বিতীয়টি পাওয়া ভার হবে।

এখন ওই মৃত্যুর মাস তিনেক পর শুরু হয়েছে উজি-ঠিকাদারের আসল প্রকল্প; কবরটির ওপরে নির্দেশিত খুঁটিনাটি অনুযায়ী তৈরি করতে হবে আর একটি সমাধি ডিবি। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ আর কর্মীদের শ্রম নিয়ে তিনি কবরটিকে মাঝখানে রেখে তৈরি করলেন বিশাল আকারের একটি ষড়ভুজ নক্সা। তার কিনারাগুলো অনুসরণ করে প্রথমে তৈরি করা হলো দেয়াল তোলার উপযুক্ত মাটি দিয়ে বেশ পুরু করে প্রায় ১২ ফুট উঁচু দেয়াল— যার দৈর্ঘ গিয়ে দাঁড়ালো প্রায় হাজার খানেক ফুট। এত উঁচু এত লম্বা মাটির দেয়ালকে মজবুত ভাবে খাড়া করা চাট্টিখানি কথা নয়। এর পর এর মাঝখানের জায়গাটুকুকে ভরাট করা হলো এটি টিলার আকারের ডিবিতে— প্রচুর মাটি কাটা ও ভরাট করার ব্যাপার এটি, কারণ এ টিলার মাঝখানের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুটের মত। মানুষের লম্বা সারি করে হাতে হাতে নদীর পার থেকে ধীরে ধীরে এই মাটি আনা হয়েছে। মাটি ভরাট করার পর কিছুদিন তা বসতে দিয়ে এর ওপর তৈরি হবে কাঠ ও পাথর ব্যবহার করে একটি ছোট মন্দির। শ্রদ্ধেয় মৃত ব্যক্তির আত্মার সৎগতির জন্য এই প্রতীকী মন্দিরটি নির্মাণ করে তার অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান না করা পর্যন্ত উজি-ঠিকাদারের প্রকল্প শেষ হবেনা। এত দিন সমাধিপুরীতে এ রকম ডিবির সংখ্যা ছিল বিশটি। এই শেষেরটির কাজ শেষ হবার পর সংখ্যাটি গিয়ে দাঁড়াবে একুশে।

এই ডিবির কাজটি সফল ভাবে শেষ করেই উজি তাঁর একটি মনোষ্কামনা আনুষ্ঠানিক ভাবে কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। তিনি তাঁর বড় ছেলের জন্য এই ঠিকাদারি কাজটি নিশ্চিত করতে চান এবং এজন্য এখন থেকেই তাকে তৈরি করতে চান নিজের সঙ্গে কাজে লাগিয়ে। এ জন্য সমাজপতিদের সুপারিশ প্রয়োজন। উজির ছেলের নিজের কিন্তু এ কাজে বেশি আগ্রহ নেই। সে ব্যবসায়ী হয়ে দূরে দূরান্তে ভ্রমণ করতে চায়। ইতোমধ্যে সে এ নিয়ে মেলা খোঁজখবর করেছে, এক ঝানু ব্যবসয়ীর সঙ্গে একবার ক্যারোলিনা গিয়েছিলো। এখানে মাইকার যোগান দেয়াই এই ব্যবসায়ীর কাজ। মাউন্ট সিটির ব্যবসায়ীরা আসলে একটি দূরপাল্লার ব্যবসায়িক যোগাযোগ গড়ে তুলেছে নদীপথে ও স্থলপথে উভয় রকমে ভ্রমণের মাধ্যমে। তারা তামা আনছে অনেক উত্তরের লেইক মিশিগান

অঞ্চল থেকে। মাইকা তাদের বড় প্রিয় জিনিস, যা দিয়ে তৈরি তাদের শিল্পকর্মের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অনেক দিন থেকে, অথচ সেই মাইকার জন্য তাদের যেতে হয় ক্যারোলিনা অঞ্চলে। তাদের শিল্পপণ্যের একটি বড় অংশ ঝিনুক, শাঁখ ইত্যাদিকে নিয়ে, যা একমাত্র সমুদ্র-উপকূলে পাওয়া সম্ভব ছিল— হয় দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর থেকে অথবা পূর্বে আটলান্টিক থেকে। পশ্চিমেও তারা বহু দূর চলে যায়— যেমন ওবসিডিয়ান পাথর আনার জন্য রকি পর্বত অঞ্চলে।

এই সব ইহজগতের কাজ দুর্দান্তভাবে করলেও এই সাধারণ মানুষরাও কিন্তু অভিজাতদের মতই পরলোকের চিন্তাটি মনের থেকে দূরে রাখতে পারে না। তারাও সাধ্যমত সঞ্চয় করে যাতে সময় এলে নিজের কবরটিকে সমৃদ্ধ করতে পারে। নাই বা হলো তার ওপর প্রকাণ্ড ডিবি আর প্রতীকী মন্দির, কিন্তু তাদের অনেকে চেষ্টা করে কবরটির ভেতরটা মাইকার পাতলা পাত দিয়ে মুড়ে দিতে, তা যদি না পারে অন্তত সুন্দর বেত দিয়ে তৈরি মাদুর দিয়ে হলেও কবরের ভেতরটা মুড়ে দেবার আশা রাখে। তারাও তাদের অবসর মুহূর্তগুলোতে আত্মমগ্ন হয়ে প্রাণীর আদলে তৈরি পাথরের পাইপে ধূমপান করে আর ভাবে একদিন এই প্রাণীর আত্মা তার কবর পাহারা দেবে, কবরে সাধ্যমত অন্য জিনিসের সঙ্গে তার প্রিয় এই পাইপটিও তার সঙ্গে শায়িত থাকবে।

* * *

ওহাইয়োর মাউন্ড সিটিতে মাটির দেয়ালে ধ্বংসাবশেষ এবং নানা আকৃতির ডিবিগুলো অষ্টাদশ শতক থেকেই প্রত্নতত্ত্ব প্রেমিক মানুষের চোখে পড়েছিলো। তবে ১৯৭১ সনে এর কাছাকাছি জায়গায় প্রাচীন বসত ভিটার কিছু চিহ্ন চোখে পড়ার পরই শুধু এখানে সত্যিকারের প্রত্নতাত্ত্বিক খবর নেয়া শুরু হয়। কিছু ঘরের থামের চিহ্ন ও সীমানা অবয়ব আবিষ্কৃত হয় এবং ঘরের মেঝেতে অনেক মাইকার টুকরা, ফ্লিন্টের ছুরি, ভাঙ্গা পটারির টুকরা, পশুর হাড় ইত্যাদি পাওয়া যায়। যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয় ওই ছুরি মাইকা কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে নানা অলঙ্কার তৈরির জন্য। তবে সব চেয়ে বড় আবিষ্কার ঘটেছে এখানকার নানা জ্যামিতিক আকৃতির কিনারা যুক্ত বিশাল সব মাটির ডিবিগুলো খননের মাধ্যমে। দেখা গেছে ডিবিগুলো কবরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এবং স্পষ্টত এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ সব মানুষের কবর। প্রায় প্রত্যেকটি কবর অনেক মূল্যবান সব নিদর্শনের আকর— যার অধিকাংশ অলঙ্কার জাতীয়। কোন কোন ডিবিতে পাওয়া গেছে মাইকার তৈরি অনেক শিল্প সামগ্রী। ডিবিগুলোর অধিকাংশের মধ্যে সাধারণ ভাবে বেশি পাওয়া গেছে বিশেষ খয়েরি লাল পাথরে (পাইপ-স্টোন) নানা জীবজন্তুর আদলে সূক্ষ্ম খোদাই কাজের মাধ্যমে তৈরি ধূমপানের অনেকগুলো পাইপ। শুধু একটি ডিবিতেই পাওয়া গেছে এরকম ২০০টি পাইপ। এর মধ্যে একটি পাইপ বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে যেটিকে আমাদের কাহিনীতে উজি-ঠিকাদারের পাইপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিদর্শনের যে সব কাঁচামাল তাঁর নিকটতম উৎসও মাউন্ড সিটি থেকে শত শত মাইল দূরে। দূরদেশে কঠিন অভিযাত্রায় উৎসাহী ব্যবসায়ীর উপস্থিতি ছাড়া

এগুলো এখানে আসার কথা নয়। উজির ছেলের এমন একজন হবার আকাঙ্ক্ষা তাই অসম্ভব নয়।

ডিবিগুলো সব রয়েছে নদী কাছে ভেড়ি বাঁধের মতো একটি মাটির দেয়ালে ঘেরা বিশাল এলাকায় এখানে মোট ২৩টি ডিবি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ঘেরা এলাকাটি বসত এলাকা হবার কোন প্রমাণ মেলেনি, বরং এর ব্যবহার কবর ও ডিবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া দেয়ালটি মানুষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে তৈরি হয়নি তাও স্পষ্ট। এর অসংখ্য ফটক আত্মরক্ষার সহায়ক নয়। বাড়িঘরগুলো এই এলাকার বাইরে নানা ছোট ছোট পাড়ায় উদ্ঘাটিত হয়েছে— সেই সঙ্গে মানুষের জীবন-জীবিকার নানা চিহ্ন। ওহাইয়োর এ জায়গাটি ছাড়াও কাছাকাছি অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে প্রায় একই ধরনের সমসাময়িক সংস্কৃতির বসতের আবিষ্কার হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এখন এদের সবগুলোকে একই হোপওয়েল সংস্কৃতির অংশ বলে মনে করেন। ডিবিগুলোর দেয়াল ঘেরা এলাকার বিশাল সব মাটির স্থাপনার সঙ্গে এর বাইরের বিচ্ছিন্ন দূরে দূরে ছোট ছোট বসতের চিহ্নগুলো মেলালে বোঝা যায় আমাদের গল্পের উজি- ঠিকাদারের কাজটি কত কঠিন ছিল। জীবিকার কাজে ব্যস্ত স্বল্প জন-সংখ্যার মানুষকে শ্রম দানে আকৃষ্ট করেই এই স্থাপনাগুলো গড়ে তুলতে হয়েছে, আবার ঘন ঘন মেরামতও করতে হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে এই সংস্কৃতি ২,২০০ বছর আগে থেকে ১৫০০ বছর আগের দিনগুলো পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিলো। এর প্রভাব বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র এলাকার একটি বড় অংশের ওপর পড়েছিলো— বিশেষ করে এর উত্তর ও মধ্য ভাগের ওপর। যদিও মেক্সিকো সহ মধ্য আমেরিকায় এর কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই যথারীতি কৃষি নির্ভর নগর সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছিলো, এখানে কিন্তু তা হয়নি; ঘন বসতের সমাজও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্পকর্মের সৌকর্য এসব দিক থেকে এদের বিকাশ কোন অংশে কম ছিলনা।

এখন থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে হোপওয়েল সংস্কৃতি যেন কিছুটা হঠাৎ করেই লোপ পেয়েছিলো। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এ অঞ্চলে এর পরের সব খনন-স্থলে পাওয়া গেছে বড় বড় গ্রামের চিহ্ন যার মধ্যে কোন কোনটি দেয়াল দিয়ে বেশ সুরক্ষিত। শুধু সমাধিপুরীর জন্য ওরকম বিশাল আয়োজন আর দেখা যায়নি। সেখানে কৃষির নিদর্শনগুলো আরো ব্যাপক ভাবে পাওয়া গেছে— বিশেষ করে ভুট্টার কৃষির। শিকারের অস্ত্র হিসেবে বর্শার স্থানটি দখল করেছে তীর-ধনুক। আরো নানা দিক থেকে সেগুলো পরবর্তীকালের উত্তর আমেরিকান আদিবাসীদের সুপরিচিত সংস্কৃতির পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছে।

মাউন্ড সিটিতে বিভিন্ন কবরে সমাধিস্থ মানুষের যে হাড় পাওয়া গেছে তার কোন কোনটিতে বিশ্লেষণ করার মত ডিএনএ প্রায় অবিকৃত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই ডিএনএ বিশ্লেষণ থেকে সেখানকার মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে। তাদের সঙ্গে আগে পরের উত্তর আমেরিকার অন্যান্য গোষ্ঠির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তারা সবাই যে আদিতে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার বাসিন্দা ছিল এবং অভিবাসী হয়ে ১২ থেকে ১৫ হাজার বছর আগে আমেরিকা গিয়েছে এই ডিএনএ বিশ্লেষণ সেই তত্ত্বকে জোরালো সমর্থন যুগিয়েছে।

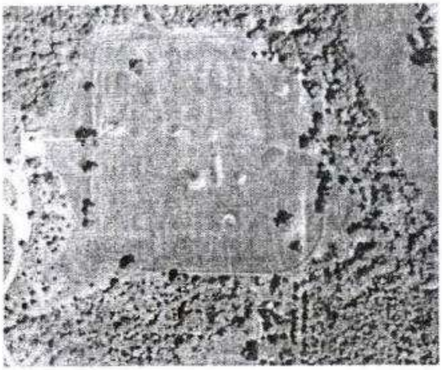

মাউন্ড সিটির সমাধিপুরীর আবিষ্কৃত দৃশ্য

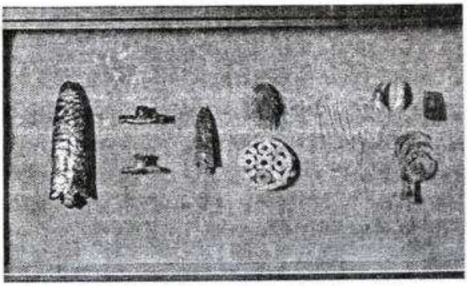

ডিবির কবরের মধ্যে পাওয়া শিল্পকর্ম
(মাইকার নানা কাজ ও পাথরের ধূমপান পাইপ)

মাইকার তৈরি শিল্পকর্ম
(ঈগলের নখ)

পাইপ-ষ্টোনে তৈরি উদ আকৃতির ধূমপানের পাইপ
(বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত)

মাউন্ড সিটির কয়েকটি ডিবি

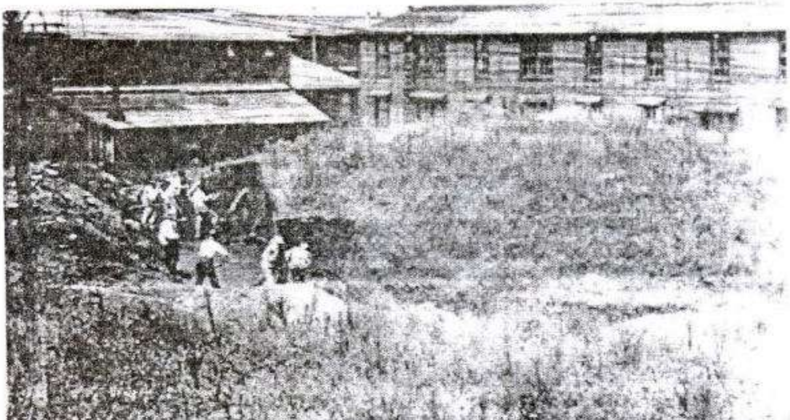

মাউন্ড সিটির একটি ডিবির খনন

বতসোয়ানার মধ্য-কালাহারির গোয়েন্দা ঃ
ছয় শ' বছর আগে

মাত্র তিরিশ জনের এ গোষ্ঠি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে ফলমূল সংগ্রহের আর শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। সব বাসা ওদের দুদিনের বাসা; ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে তেমন কিছুই নেই। কিন্তু পশুর পায়ের ছাপ বা গাছের পাতায় তার চলাচলের আলামত দেখে শিকারযোগ্য পশুটির নাড়ী-নক্ষত্র বোঝার অপরিসীম ক্ষমতা তাদের। সে জন্যই ওদের একজনের নাম গোয়েন্দা।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের দেশ বতসোয়ানার একটি বড় অংশ কালাহারি মরুভূমি, যেটি অবশ্য নামিবিয়ায় এবং কিছুটা মোজাম্বিকেও বিস্তৃত হয়েছে। বতসোয়ানার মাঝামাঝিতে রয়েছে মধ্য-কালাহারি নামে পরিচিত অঞ্চলটি। এটি সহ প্রায় পুরো কালাহারিটিই মরুভূমি হলেও, এই মরুভূমি সাহারার মত ধূধূ বালির মরুভূমি নয়; কারণ এটি শুষ্ক নয়, বরং বলা যায় আধা-শুষ্ক জলবায়ুর জায়গা এটি। এক নজর দেখলে মনে হয় এটি মোটামুটি বিরান জায়গা— সবুজের চিহ্ন বিরল। কিন্তু এর সঙ্গে ভাল ভাবে পরিচিত হলে দেখা যাবে এর মধ্যেই রয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেশ বিচিত্র কিছু রূপ। স্বল্প মাত্রার বৃষ্টিপাতের বদৌলতে এটি সম্ভব হয়। অল্প স্বল্প যে পানির উৎস কালেভদ্রে পাওয়া যায় তাতেই এখানে গড়ে ওঠে বেশ বলার মতই তৃণভূমি, কাঁটাযুক্ত ঝোপের সমাবেশ এবং মাঝে মাঝে একাশিয়া জাতীয় গাছ এখানে ওখানে।

এমন পরিবেশে নানা রকম হরিণ, শেয়াল, বন্য কুকুর, হায়েনা থেকে শুরু করে উটপাখি, সজারু, খরগোস, সাপ, নানা রকম পোকা-পতঙ্গ, পিঁপড়া ইত্যাদি নানা প্রাণীও বেশ কিছু রয়েছে যদিও তাদের মধ্যে বড় প্রাণীর সংখ্যা কোথাও তেমন বেশি নয়— সবই ছড়ানো ছিটানো। তবে হঠাৎ কোথাও কোথাও কখনো কখনো জেব্রা, জিরাফ বা সিংহ, চিতার মত আরো বড় প্রাণীর সাক্ষাতও অস্বাভাবিক নয়। এর মধ্যে খুব হালকা জনসংখ্যায় হলেও মানুষও রয়েছে। ছয়শত বছর আগের যখনকার কথা বলছি তখন যেমন রয়েছে তেমনি ছিল তারও

বহু হাজার বছর আগে; পুরা-নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন লক্ষ বছর আগে আফ্রিকাতে মানুষের উদ্ভবের সময় থেকেই এখানে স্থানে স্থানে অল্প কিছু মানুষ ছিল।

ছয়শত বছর আগে গিয়ে যাদের কথা আমরা বলছি তারা নিজেদেরকে বলে সান্— ওই মধ্য-কালাহারি ছাড়াও তারা আফ্রিকার দক্ষিণাংশে আরো নানা জায়গায় থাকে; তবে এখন এই কালাহারিকেই ওরা সব চেয়ে পছন্দ করে। ওদেরই একটি পরিবারকে নিয়ে আমাদের কাহিনী। সব সানদের (পরবর্তী কালে ইউরোপীয়রা যাদেরকে বুশম্যান নামে ডেকেছে) মত এরাও যাযাবর শিকারি-সংগ্রাহক— শিকারের পশু যেদিকে থাকে, সংগ্রহের মত ফলমূল যেখানে তখন পাওয়া যাবে, সেদিকে গিয়ে অস্থায়ী আবাস গড়ে। পরিবারটির যে কর্তা তার নাম গোয়েন্দা। চল্লিশ বছর বয়সী এই মানুষটির বয়স সান গোষ্ঠির মানুষের গড় আয়ুর হিসেবে কম নয়। তবে তাঁর বাবাও বেঁচে আছেন এবং এই পরিবারের সঙ্গেই আছেন। পরিবারের এই সব চেয়ে বয়োবৃদ্ধ মানুষটিকে নাতি-নাতনিদের অনুসরণে সবাই ডাকে ঝুনা দাদু। আসলে ঝুনা দাদুর মতই গোয়েন্দা নামটিও সবাই ডাকতে ডাকতেই সৃষ্টি।

এখানকার পরিবারগুলোতে তার বিভিন্ন সদস্যের বিশেষ বিশেষ পারদর্শিতাকে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়। যে কাজে যার পারদর্শিতা সে ক্ষেত্রে তার মতামতকে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। শুধু পরিবারের মধ্যে নয়, খানিকটা আত্মীয়তার ভিত্তিতে কয়েকটি পরিবার মিলে এক সঙ্গে চলার জন্য তিরিশেকের যে দল রয়েছে তার যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। তাদের সবার কাছেই আমাদের এই পরিবারটির কর্তার নাম গোয়েন্দা। এর কারণ এ দলের মানুষরা যখন শিকার করতে যায় তখন ওর ওপরেই প্রধান দায়িত্ব পড়ে পশুর পায়ের চিহ্ন সহ নানা আলামত দেখে শিকারের গতিবিধি নির্ণয়ের; সেটি রীতিমত সূক্ষ্ম গোয়েন্দাগিরির কাজ। এ কাজে সান্দের সাধারণ ভাবে দারুণ পারদর্শিতা আছে, তবে আমাদের গোয়েন্দার পারদর্শিতাটি বিশেষ রকমের।

পরিবারের অন্যান্য কয়েকজনের ডাক নামেও তাদের আপেক্ষিক পারদর্শিতার কিছু পরিচয় রয়েছে। গোয়েন্দার দুই স্ত্রী— একজনের নাম গেছো-মা আর অন্য জনের কেঁচো-মা। গোয়েন্দার বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে অন্য এক প্রতিবেশী গোষ্ঠিতে। মেজ মেয়ে পরিবারে এখনো আছে তাকে সবাই ডাকে টোকাই। বড় ছেলে বিয়ে করলেও পরিবারের সঙ্গেই আছে, তার ডাক নাম বিষবাবু। আর মেজো ছেলেটি সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ বয়সের হলেও ইতোমধ্যে সেও একটি ডাক নাম পেয়েছে— হাতসই। ছোট ছেলেটি এখনো বেশ ছোট, আরো ছোট একটি মেয়েও আছে গোয়েন্দার। এই দুই শিশুর বয়স ৮ ও ৬ বছর। ওই নানা জনের যে নানা নাম তা কী সব পারদর্শিতার জন্য তা আমরা পরে বুঝতে পারবো।

ছেলেবুড়ো সব নিয়ে ওরা তিরিশ জনের যে আত্মীয়গোষ্ঠি তাতে গোয়েন্দা পরিবারের মত আরো চারটি ছোট বড় পরিবার আছে। এর একটি গোয়েন্দার পিঠাপিঠি বড় ভাইয়ের ছেলের পরিবার, যে ভাই মারা গেছে। আর একটি গোয়েন্দার চাচাতো ভাইয়ের পরিবার। গোয়েন্দার এক ফুফুর অন্য গোষ্ঠিতে বিয়ে হয়েছিলো— স্বামী মারা গেলে তার বড় বড় ছেলেসহ ভাইয়ের গোষ্ঠিতে আলাদা পরিবার হিসেবে যোগ দিয়েছে। গোয়েন্দাদের একজন খুব ভাল পারিবারিক বন্ধু ছিল অন্য গোষ্ঠিতে। তাদের মধ্যে এত বন্ধুত্ব যে আজ বহুদিন হয়ে গেলো নিজের গোষ্ঠি ছেড়ে সে এখানে এসে যোগ দিয়েছে। আসলে সান্‌রা আত্মীয়তাভিত্তিক সমাজ গঠন করলেও তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বোধটি অন্য অনেকের চেয়ে কিছুটা নমনীয়। রক্তের বন্ধনের চেয়ে মতের মিল রেখে পারদর্শিতা ও পরিশ্রমের সঙ্গে এক জোট হয়ে কাজ করাটাকেই তারা গোষ্ঠিবদ্ধ হবার সময় গুরুত্ব দেয়। এই গোষ্ঠিই তাদের সব।

যাযাবর এই মানুষগুলোর স্থায়ী বাড়িঘর বলে কিছু নেই। শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোন জমিজমা এবং বলার মত কোন আসবাব বা অন্য সম্পত্তিও নেই। এ ধরনের সম্পত্তির মালিকানার কোন ধারণাও তাদের নেই। তবে সামগ্রিক ভাবে খাস করে এই গোষ্ঠির নিজের অধিকারে আছে এমন কিছু এলাকা ওই বিরাট কালাহারি মরুতে রয়েছে মোটামুটি যার মধ্যেই ঘুরে ফিরে তাদের যাযাবর জীবন কাটে। ওই তিরিশ জন মানুষের খাবার শিকার ও সংগ্রহের মাধ্যমে যোগাড় করতে গেলে এই এলাকাটুকুর ওপর তাদের একক ভরসা থাকতে হয়। এলাকাটিকে মোটামুটি ৫০ মাইলের মত ব্যাসের একটি বৃত্তাকার জায়গা মনে করা যেতে পারে। এর যে খুব স্পষ্ট একটি সীমারেখা আছে, তা অবশ্য নয়। বিভিন্ন দিকে এই এলাকার ঠিক বাইরে একই রকম অন্য যে গোষ্ঠিগুলো রয়েছে তাদের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই সীমানাটি মোটামুটি কতগুলো প্রাকৃতিক অবস্থান দিয়ে চিহ্নিত আছে। এই সীমানা চিহ্নিত হয়েছে কোথাও একটি বালিয়াড়ির স্তূপে, কোথাও একটি মরা নদীর খাতে, কোথাও বা চোখে পড়ার মত কিছু গাছ-গাছড়ায়।

প্রত্যেক গোষ্ঠির এখতিয়ারে থাকা এলাকাটি যত বড় বা ছোটই এর মধ্যে ন্যূনতম একটি স্থানীয় পানির উৎস থাকতে হবে— কোন কুয়া, স্থায়ী ডোবা অথবা এমনি অন্য কোন পানির উৎস। দলের জন্য এটিই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, শুধু তাদের খাবার পানির চূড়ান্ত উৎস হিসেবেই নয়, এই পানির আকর্ষণে এখানে ছোটবড় বিভিন্ন শিকারের প্রাণীর সংখ্যা বাড়ে বলেও। গোয়েন্দাদের গোষ্ঠির এলাকার ঠিক মাঝামাঝিতে রয়েছে একটি কুয়া যাতে সারা বছর কমবেশি পানি থাকে। যে মৌসুমে বৃষ্টি কিছু হয় তখন কুয়ার পানি এর কিনারা ছাপিয়ে সামান্য জলার সৃষ্টি করে যেখানে মাঝে মাঝে কিছু পশু-পাখি পানি খেতে আসে। এই এলাকাটি এ গোষ্ঠির এখতিয়ারে থাকার মানে কিন্তু এমন নয় যে অন্য প্রতিবেশী

গোষ্ঠি কখনো এখানে শিকার করতে পারবেনা, এখান থেকে ফলমূল খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবেনা, বা পানির জন্য এর কুয়াটি ব্যবহার করতে পারবেনা। তবে তা করতে হলে এর অধিকারী গোষ্ঠির অনুমতি নিতে হবে ও তাদেরকেও নিজেদের এলাকায় একই সুযোগ দিতে হবে। বাইরের যে সব গোত্রের সঙ্গে এমন সদ্ভাব আছে তারা অনুমতি নিয়ে গোয়েন্দাদের এলাকায় মাঝে মাঝে শিকারে চলে আসছে, গোয়েন্দারাও কালেভদ্রে তাদের জায়গায় যাচ্ছে। তবে খুব প্রয়োজন না হলে প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকাতেই যাযাবর জীবন যাপন করে। শত্রুভাব নিয়ে বা জোর করে অন্যের এলাকায় গেলে সংঘাত হতে পারে যা মারামারি, খুন খারাবিতে গড়াতে পারে। তবে এমন ঘটনা খুব সচরাচর হয়না, এ মানুষরা সহজাত ভাবে শান্তিপ্রিয়, বেশির ভাগ সময় নিজেদের গোষ্ঠির ভালমন্দ, খাবার সংগ্রহ,এবং নিজেদের মধ্যে আমোদ ফুর্তিতে ব্যস্ত থাকে।

এক জায়গায় বেশিদিন থাকাটি ওদের চলেনা। ওখানে শিকারের তৎপরতা শুরু হলে ছোট বড় অনেক প্রাণীই দূরে সরে যায়। তা ছাড়া অন্যান্য নানা কারণেও প্রাণীগুলো একদিক থেকে অন্যদিকে সরে যায়, বিশেষ করে হরিণের মত বড় প্রাণীগুলো। তখন দলের কাজ হলো প্রাণীগুলো সরার দিকে নিজেরাও সরে যাওয়া, অবশ্য অধিকাংশ সময় তা নিজেদের এলাকার মধ্যে। নিজেদের এলাকার ভেতরেও বেশ কিছু বৈচিত্র আছে— কোথাও ঘাস বেশি, কোথাও ঝোপ বেশি, কোথাও গাছ বেশি। সংগ্রহের মতো ফলমূলও ওভাবে এক এক সময় এক এক দিকে বেশি থাকে; ঘুরে বেড়াবার এটিও একটি কারণ।

কালাহারি মরুভূমির মত শুষ্ক জায়গায় ঘুরে বেড়ানোটি খুব সহজ ব্যাপার নয়। অধিকাংশ জায়গায় পথে পানির খুব অভাব হয়। কিছু পানি ওরা সঙ্গে রাখার চেষ্টা করে। লক্ষ্য করলে দেখবো অল্প-স্বল্প যে সব জিনিস সঙ্গে নিয়ে গোয়েন্দারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে অদ্ভুত বড় আকারের বেশ কিছু ডিমও রয়েছে। এগুলো আসলে উটপাখির ডিমের খোলস যাতে ছোট ছিদ্রপথে পানি ভরে ছিদ্রটি ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। উটপাখির ডিমের খোলসটি পানি বহন করার জন্য যথেষ্ট শক্ত সমর্থ পাত্র— যতদিন না ফুরায় ততদিন ওই খোলস থেকেই সরাসরি পানি পান করে সবাই বোতলের মত। কিন্তু বাকি পানির জন্য পথে পথে বিশেষ ধরনের রসালো শেকড়ের সন্ধান করতে হয়। এই শেকড়ের সন্ধান পেলে ওরা এটি তুলে এর গায়ে কোরানোর মত আঁচড়াতে আঁচড়াতে ওই কোরানো শেকড়কে মুঠার মধ্যে চেপে পানি বের করে আর তা চুষে খায়। ওরা প্রায় সবাই এমন শেকড় খুঁজতে সক্ষম হলেও বিশেষ পারদর্শিতা বলে একটি কথা আছে। গোয়েন্দার এক স্ত্রী কেঁচো-মা এমনি একজন পারদর্শী। কেঁচোর মত মাটির ভেতরের খবর রাখে বলে এবং মাটি খুঁড়ে সঠিক শেকড় বের করতে পারে বলেই তা এই নাম। শুধু পানির জন্য রসালো শেকড় নয়, মাটির ভেতরের অন্যান্য শেকড়, কন্দ, কচু, বাদাম যে সবের ওপর খাবারের জন্য তাদেরকে নিত্য নির্ভর

করতে হয় সেগুলো খুঁজতেও খুবই পারদর্শী কেঁচো-মা। এদিক থেকে কেঁচো-মা হলো গোয়েন্দা পরিবারের একটি বড় ভরসা।

বোঝাই যাচ্ছে যে এরকম অবস্থায় মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াবার সময় খুব বেশি কিছু বহন করার সুযোগ নেই— কিছু পানি আর খুব জরুরি কিছু হাতিয়ার ও অস্ত্র ছাড়া বলতে গেলে আর কিছু নয়, বিশেষ করে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও যখন পিঠে ঝুলিয়ে বহন করতে হয়। গোয়েন্দাদের গোষ্ঠির ছোট বালক-বালিকাদের বাদ দিলে বাকি প্রত্যেকের পিঠে চামড়া সেলাই করে তৈরি একটি থলে থাকে আর ওর মধ্যেই থাকে অতি জরুরী ক'টা জিনিস— হাড় বা পাথরের তৈরি কাটাচেরার হাতিয়ার, মাটি খুঁচিয়ে শেকড় বের করার খুটি বা তার গর্ত থেকে খরগোস বের করার লাঠি, ওষুধপত্র ইত্যাদি। বলতে গেলে এসব আর তীর-ধনুক, গাছের লাঠির বর্শা, পরনের সামান্য আঁশ-বস্ত্র আর খারাপ আবহাওয়ায় মাথার ওপর ছাদ দেয়ার জন্য কয়েকটা হরিণের চামড়া ছাড়া ওদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পত্তি বলতে আর কিছু নেই। ওই ক'টা জিনিস নিয়েই ওদের পথ চলা।

যুৎসই একটি জায়গায় গিয়ে আপাতত গোয়েন্দাদের পথ চলা থামে। এখানে চটপট কিছু বাসা খাড়া করে ফেলতে হয়— প্রত্যেক পরিবার নিজের বাসা তৈরি করে। একেবারেই অস্থায়ী তাদের এই বাসা— স্থায়ী বাসস্থান বলতে ওদের কোথাও কিছুই নেই। কালেভদ্রে দু'একটি জায়গায় পাহাড়ী গুহার মত কিছু কিংবা তার বাইরে পাথুরে ছাদের মত কোন আশ্রয় পেয়ে যায় তখন কাজটি সহজ হয়। নইলে মাটির ওপর গাছপালার ডাল আর ঘাস-পাতা দিয়েই এই অস্থায়ী বাসা তৈরি করতে হয়। লম্বা ডালের পুষ্ট অংশ মাটিতে গেড়ে আর দুদিকের ওপরের প্রান্তকে পরস্পর একত্র করে বেঁধে তাঁবুর মত কাঠামো তৈরি করা হয় বাসার। একে ঘাস-পাতা-খড় আর শনের মত উদ্ভিজ আঁশ দিয়ে ঢেকে বাসাটি সম্পূর্ণ হয়। গোয়েন্দারাও নিজেদের পরিবারের জন্য এরকম গোটা তিনেক ঘর অল্প সময়ে খাড়া করে ফেলে। একই সময়ে গোষ্ঠির অন্যান্য পরিবারের একই রকম বাসাগুলোও খাড়া হয়ে যায়। সবগুলো বাসা মিলে ওই জায়গায় একটি বড় বৃত্ত তৈরি করেছে। এজন্য আগেই বৃত্ত এঁকে নিয়ে এক পরিবারের বাসাগুলোর সঙ্গে অন্য পরিবারের গুলোর কিছু ফাঁক রেখে পরিকল্পনা করে নেয়া হয়েছিলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এসব হলো। প্রত্যেকটি নতুন জায়গায় গিয়ে এসবই বার বার হয়। কোলের শিশু থেকে শুরু করে ঝুনা দাদুর মত বৃদ্ধ পর্যন্ত ৩০ জন মানুষের এই অস্থায়ী পাড়া সরগরম হয়ে ওঠে। প্রতি পরিবারের বাসার সামনে আলাদা আলাদা রান্নার আগুন জ্বলে ওঠে। এগুলো ছাড়াও অবশ্য ওই বৃত্তাকার উঠানোর মাঝখানে আর একটি আগুন জ্বলে। এটি হলো মাঝে মাঝেই পুরো গোষ্ঠির সব মানুষের একত্র হয়ে আড্ডা দেয়ার, কখনো একত্র ভোজের, এবং নাচ-গানের আসর বসাবার জায়গায়। এ আগুন ওদের এখানে বাস কালে কখনো পুরোপুরি নেভেনা।

খাবার যোগাড়টিই প্রধান কাজ; এটি সাধারণত প্রত্যেক পরিবার নিজে নিজে করে, যদিও মাঝে মাঝে দু'একটি পরিবার একত্রেও কিছু কিছু করে। আর একটি জিনিস নিশ্চিত করতে হয় যে মাটিতে-বালিতে লাঠি গেড়ে গর্ত খুঁড়লে তাতে কিছু পানি পাওয়া যাবে, যদি পানির অন্য কোন উৎস সেখানেও নাও থাকে। খাবারের প্রধান উৎস হলো ওখানকার ঘাস, ঝোপঝাড়, মাটির অভ্যন্তর আর বিরল কিছু গাছ। আর প্রতি সপ্তায় অন্তত তিন চারদিন বাসা থেকে বের হয়ে দিনমান নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে এগুলো সংগ্রহ করে আনতে হয় পরিবারের মেয়েদেরকেই। যেহেতু নিয়মিত খাদ্যের অন্তত শতকরা ৭০ ভাগ আসে এই উদ্ভিজ উৎস থেকে কাজেই খাবার যোগাড়ের প্রধান দায়িত্ব মেয়েদের। এই ব্যাপারে সান্দের স্ত্রী-পুরুষ বিভাজনটি বেশ স্পষ্ট— মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ করবে, আর পুরুষরা শিকার করবে। এদিক থেকেই পরিবারের তিন বয়স্কা নারীর এত গুরুত্ব— কেঁচো-মা, গেছো-মা আর টোকাই। কেঁচো-মার কাজের সাক্ষাত আমরা ইতোমধ্যেই পেয়েছি। তাঁর সংগ্রহটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ উদ্ভিজ খাবারের অর্ধেকেরও বেশি আসে বাদাম থেকে— মাটির নিচেই বেশ কয়েক রকমের বাদাম পাওয়া যায় বন্য চীনা বাদামের মত। সেই সঙ্গে নানা রসালো শেকড় তো আছেই, ঝোপ-ঝাড়ের ভিড়ে লুকানো কাণ্ড-পাতা দেখে মাটির ভেতরে এ সবের অবস্থান চিনে নিতে হয়। তাছাড়া তাঁর আর একটি কাজ হলো কোথায় মাটির ওপরে শোয়া নানা রকম তরমুজ-বাঙি পাওয়া যায়— এখানকার বালির মধ্যে এই রসালো বড় ফলগুলো কালাহারির বড় দান। এই পানির অভাবের জায়গায় খাদ্য হিসেবে ছাড়াও প্রচুর জলীয় অংশের জন্যও এগুলো অমৃতের মত।

কেঁচো-মার পারদর্শিতা বেশি বলে অন্যরা যে এগুলোর অনুসন্ধানে খুব পিছিয়ে তা বলা যাবেনা। যেমন গেছো-মা তার নামটি পেয়েছে কাঁটা গাছ বা তার চেয়েও বেশি ঝোপের মত গাছ থেকে নানা রকম বেরি জাতীয় ফল এবং বন্য ধানের মত শস্য সংগ্রহে অধিক দক্ষ বলে। কিন্তু তার আরো গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হলো খাবার উপযোগী মাশরুম চেনা। এখানকার মাটিতে এবং গাছের গায়ে নানা রকম মাশরুম পাওয়া যায়। কিন্তু এর সবই খাওয়ার উপযুক্ত নয়, বরং কোন কোনটি রীতিমত বিষাক্ত। তাই ভাল মত চিনে তবেই মাশরুম সংগ্রহ করতে হয়। একাজে গেছো-মার অভিজ্ঞতার কোন তুলনা হয়না। কেঁচো-মা আর গেছো-মা উভয়েরই দারুন শাগরেদ হয়ে ওঠেছে তাদের মেয়ে টোকাই। বাদাম হোক, মাশরুম হোক, কিংবা বালিতে প্রায় লুকানো তরমুজই হোক, টোকাইয়ের সূক্ষ্ম চোখকে তা ফাঁকি দিতে পারেনা। এভাবে সব রকম জায়গা থেকে দ্রুত অনেক পরিমাণ খাবার সে কুড়িয়ে আনতে পারে বলেই এই অল্প বয়সেই সে টোকাই নামটি পেয়েছে। সারা দিনের এই সংগ্রহের মাধ্যমে বেশ কিছু খাবার নিয়ে আসতে পারলে তবেই পরিবারের আগুনে ভাল রান্না চড়বে, অথবা এর কোন কোনটি কাঁচাই খেয়ে সবার তৃপ্তি হবে। পরিবারের পুরুষরা প্রায় প্রতিদিনই

শিকারে বেরুচ্ছে বটে, কিন্তু সফল একটি শিকার প্রতিদিন সম্ভব হয়না। যখন হয়, বিশেষ করে বড় আকারের কিছু হয়, তখন তা শুধু পরিবারের নয় পুরো গোষ্ঠির জন্য বড় খবর— খাবারে দারুণ বৈচিত্র আসে তখন।

সান্‌রা প্রাণীজ প্রায় সব কিছু খায়। যে সব জিনিস বড় রকম শিকারের অপেক্ষা রাখেনা— সেই পোকা-মাকড়, পিপড়া, শুয়াপোকা তো বটেই, মাঝে মাঝে পেয়ে যাওয়া সাপ, কচ্ছপ কিছু বাদ যায়না— বিষাক্ত হলেও না। কোনটি কী ভাবে খেতে হবে এ সব ওদের বিলক্ষণ জানা। পাখির, কচ্ছপের ও সাপের ডিম, বন্য মৌচাক থেকে মধু— এগুলোর দিকেও তাদের কড়া নজর, কারণ এসব খুব কাম্য খাবার। কালাহারি যেহেতু আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগে এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি, মাঝে মাঝে সংলগ্ন ভিন্ন জায়গা থেকে জেব্রা-জিরাফের মত বড় প্রাণীও গোয়েন্দাদের এলাকায় এসে হাজির হয়। তখন ওরা দল বেঁধে খুবই চালাকির সঙ্গে ওগুলোর শিকারের চেষ্টায় ত্রুটি করেনা; একই চালাকি থেকে সিংহ বা লিওপার্ডের মত প্রাণীও বাদ যায়না যদি কখনো ওদের কেউ এসে পড়ে। তবে এসব অত্যন্ত বিরল ঘটনা। নিয়মিত শিকারের লক্ষ্য হলো আরো একটু ঘন ঘন যাদের দেখা মেলে— বন্য কুকুর, শেয়াল, খরগোস ইত্যাদি। অবশ্য সব চেয়ে কাম্য হলো এখানকার কয়েক রকম হরিণ, বিশেষ করে মরুভূমির বড় আকারের হরিণ এলান্ড, অরিক্স এবং জেমবক। শিকারের প্রধান লক্ষ্যই থাকে এই হরিণের দিকে।

কেঁচো-মা, গেছো-মা, টোকাই ওরা যখন ফলমূল সংগ্রহে ব্যস্ত পরিবারের পুরুষরা তখন সবাই শিকারের সন্ধানে ঘুরছে। বড় শিকারের সন্ধানে দূরে দূরে ঘোরা ছাড়াও দৈনন্দিন যে কাজগুলো পরিবারের পুরুষরা করে থাকে তা হলো ছোট ছোট শিকারের জন্য নানা রকম ফাঁদ পাতা আর কৌশল অবলম্বন করা। এই পরিবারে এসবের কৌশল-শিরোমণি হলো গোয়েন্দা নিজে। ছোট বড় পশু-পাখির গতিবিধি নানা আলামত দেখে আঁচ করতে পারে বলেই তো তার নাম গোয়েন্দা। তার গোয়েন্দাগিরির সব চেয়ে সফল প্রয়োগ হয় চালাকি করে শিকার ধরার মাধ্যমে। ছোটবড় খরগোস, পাখি ইত্যাদি ধরার জন্য যে ফাঁদ সে পাতে তা এরকম গতিবিধি আঁচ করে আসা যাওয়ার পথেই পাতা হয়। খুব জটিল কিছু নয় এই ফাঁদ। পশুর অন্ত্রকে পাকিয়ে শক্ত সুতায় পরিণত করে তাতে ফাঁদের ফসকা গেরো দিয়ে রাখে, এমন ভাবে যেন ওই ফসকা গেরোর ভেতর মুখ ঢুকিয়ে টোপের খাবার খেতে গেলেই সুতায় টান পড়ে গেরো টাইট হয়ে একে আটকিয়ে ফেলে। আর একটু বড় প্রাণীর জন্য সে চোরাগর্ত বানিয়ে রাখে। প্রাণীটির চলাচলের পথে গভীর গর্ত করে তাকে ঘাসপাতা দিয়ে ঢেকে দেয় যেন গর্তের অবস্থান বুঝতে না পারে। গর্তের তলায় মাঝখানে আবার পুঁতে রাখে একটি তীক্ষ্ণ করা শক্ত কাঠের কাঠি, যাতে পশুটি গর্তের ওপর অজান্তে হাঁটতে গিয়ে নিচে পড়ে এতে আহত হয়। গোয়েন্দারা যখন তাদের এলাকার মাঝখানে কুয়ার কাছে

থাকে, তখন সেখানে অবশ্যই এরকম অনেক ফাঁদ ও অদৃশ্য গর্ত তৈরি করে রাখে। কারণ পানি খেতে এদিকে বিভিন্ন সময় নানা পশু আসে। দুপুরে খুবই তপ্ত রোদে কোন কোন ছোট পশু যুৎসই কোন প্রাকৃতিক গর্ত বা ছোট গুহা পেয়ে গেলে সেখানে ঢুকে বিশ্রাম নেয়। গোয়েন্দা তখন এর ঠিক কাছেই নিজেকে আড়াল করে ওৎ পেতে থাকে। বিশ্রাম শেষে পশুটি যেই বেখেয়ালে গর্ত থেকে বের হয় তখনই সে পশুটির মাথার ওপর কাঠের বড় গদা দিয়ে আঘাত করে একে অজ্ঞান করে ফেলে। এসব ক্ষেত্রে এবং তীর-ধনুক দিয়ে আসল শিকারের সময়ও গোয়েন্দাকে বেশ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যেন শিকার পশু বা পাখি তার উপস্থিতি আগে টের পেয়ে পালিয়ে যেতে না পারে।

এজন্য শব্দ ও গন্ধ এই দুটি শিকারের কাছ থেকে গোপন রাখা জরুরী। নিজেদের নড়াচড়ার বা কথোপকথনের শব্দ যেন একেবারে না হয় সব কিছু করতে হয় সন্তর্পনে ও যোগাযোগ করতে হয় ইশারায়। এর মধ্যেই গোয়েন্দা ধূলি উড়িয়ে চট করে বুঝে নিতে পারে বাতাস কোন দিক থেকে বইছে। বাতাসের গতি যেন মানুষের গন্ধ পশুর কাছে নিয়ে না যেতে পারে তাই তাকে থাকতে হয় এ গতির উল্টো দিকে। গোয়েন্দার গোয়েন্দাগিরিতে এসব জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন ছোট পশু— খরগোস, বন্য ইঁদুর ইত্যাদি— মাটিতে নিজেদের আঁকাবাঁকা সব গর্ত করে তার ভেতরে নিরাপদে বাস করে। বাইরে থেকে এসব গর্ত চেনা সহজ নয়। কিন্তু গোয়েন্দার মত মানুষের কাছ থেকে এগুলো গোপন থাকে না। তারা ঠিকই চিনে নিতে পারে কোনটি কোন পশুর গর্ত, এর মুখ থেকে কত দূরে গর্তের কী রকম খোপখাপে পশুটি লুকিয়ে আছে। ওখান থেকে একে খুঁচিয়ে বের করার জন্য উপযুক্ত নমনীয় লাঠি গোয়েন্দার হাতে থাকে। ওভাবে খুঁচিয়ে পশুটিকে গর্তের মুখে আনতে পারলে কাঠের গদা দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলতে বেগ পেতে হয়না।

মধ্য-কালাহারির মত জায়গায় যত্রতত্র শিকারের পশু দেখা যাবে, বা ঝাঁক বেঁধে চলে ওরা শিকারির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সে আশা বৃথা। কোন পশু যদি শিকারিদের কাছাকাছি জায়গাতে এসে থাকে বা তাদের এলাকা দিয়ে কিছুক্ষণ আগে পার হয়ে থাকে, তা হলে চলাচলের পথে নিজের কোন না কোন চিহ্ন রেখে যাবে এটি আশা করা যায়। শিকারির পক্ষে তাকে অনুসন্ধান করে বের করার একমাত্র উপায় হতে পারে ওই চিহ্নগুলো বুঝতে পারা— সেটি ভাল পারে বলেই গোয়েন্দার নাম গোয়েন্দা হয়েছে। চিহ্নের মধ্যে পায়ের ছাপ হলো সব চেয়ে প্রধান। মাটির অবস্থাভেদে গভীর ও স্পষ্ট হোক কিংবা আবছা খুবই অস্পষ্ট হোক পায়ের কিছু না কিছু ছাপ থাকবেই। সানরা এই ছাপ থেকে অনেক কিছু বুঝতে পারে— এটি কোন পশু তা বুঝতে তো পারেই, সেটি স্ত্রী না পুরুষ, অসুস্থ না সুস্থ, আনুমানিক বয়স কী রকম, কোন দিকে গেছে, কী গতিতে হেঁটে বা দৌড়ে গেছে, এমন কি কতক্ষণ আগে গেছে ইত্যাদি অনেক কিছুও পারে। পশুটি ঘাস বা

ঝোপের মধ্য দিয়ে গেলে ওখানকার পাতা ও ডালগুলো কীভাবে এলোমেলো বা তছনছ হয়েছে তার আকৃতি প্রকৃতিও অনেক কথা বলে দেয় গোয়েন্দার মত মানুষের কাছে। যদি পশুটির মল পাওয়া যায় তা হলে যাওয়ার সময় ইত্যাদি জানা আরো সহজ হয়ে পড়ে।

এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গোয়েন্দা ও তার সাথীরা পশুটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে শিকারের জন্য। এর জন্য আলামতগুলো অনুসরণ করে সারা দিন তার পেছন পেছন যেতে হলেও অবাক হবার কিছু নেই। এতে প্রায়ই গোয়েন্দার সঙ্গে থাকে পরিবারের অন্য দু'জন পুরুষ— তার বড় ও মেজ ছেলে বিষবাবু ও হাতসই। কখনো কখনো অবশ্য অন্য পরিবার থেকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা বন্ধুস্থানীয় কেউ কেউ থাকে। পশুটির দেখা মিললে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদেরকে গোপন রেখে তার যথা সম্ভব কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে ওরা, কার্যকর ভাবে ধনুক থেকে তীর ছোঁড়ার জন্য। তাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি এই স্বল্পকালীন সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা যায়। মেজ ছেলেটি সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ হলেও ইতোমধ্যে যে হাতসই নাম পেয়েছে তার তীরের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের জন্য। এটি অবশ্য বিশেষ করে বোঝা গেছে অল্প কিছু দিন আগে যখন তার সাবালক হওয়া উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আগে বড় একটি এলান্ড হরিণ মেরে সে সবাইকে হকচকিয়ে দিয়েছিলো। গোত্রের মধ্যে কারো এভাবে সাবালক হবার অনুষ্ঠানটি বেশ উৎসবের সৃষ্টি করে। নিজ হাতে প্রথম শিকার করার মাধ্যমেই সাবালকত্ব চূড়ান্ত হয়। এটি ঘটার পরপরই এ নিয়ে কয়েক দিন ধরে নাচ গান আর ভোজের অনুষ্ঠান হয় যাতে ওই বালককে এবার বয়স্ক পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। হাতসই অবশ্য অনেক আগে কিশোর বয়স থেকেই তার তীরন্দাজের কৌশল দেখিয়ে ওই নাম আদায় করে নিয়েছিলো।

হাতসই উদীয়মান তারকা হলেও পরিবারের আসল অব্যর্থ শিকারি কিন্তু গোয়েন্দা নিজে। বড় ছেলে বিষবাবুও তীর ছোঁড়ায় কম যায়না। কিন্তু শিকারকে ঘায়েল করার ব্যাপারে সানরা কিন্তু তীরের আঘাতে পশুকে আহত করার ওপর বেশি নির্ভর করেনা, করে তীরে মাখানো বিষের দ্বারা পশুকে অজ্ঞান ও নিহত করার ওপর। এখানেও গায়ের জোর বা আঘাতের তীব্রতার চেয়ে কৌশলের ওপরই ভরসা বেশি। ওদের যে তীর-ধনুক তা খুব বড় বা জোরালো কিছু নয়, যদিও লক্ষ্যভেদটি গুরুত্বপূর্ণ। তাই সান শিকারিদেরকে শুধু ভাল তীরন্দাজ হলেই চলে না তাকে ভাল বিষ বিশেষজ্ঞও হতে হয়। তার এই তরুণ বয়সে এই কাজটিই চমৎকার ভাবে করে বলে গোয়েন্দার এই ছেলেটি বিষবাবু।

সানরা তাদের জীবনে সব কিছুর জন্যই উদ্ভিজ বা প্রাণীজ উৎসের ওপর নির্ভর করে। তাদের হাতিয়ারের ও তৈজসের প্রায় সবই কাঠেরও হাড়ের; শুধু দু'একটি ব্যাতিক্রমী ক্ষেত্রে পাথরের ব্যবহার তারা করে। তীর-ধনুক, ছুরি, বর্শা, গদা, লাঠি, সবই প্রায় হয় কাঠের অথবা হাড়ের তৈরি। ব্যবহার্য অন্য সব কিছুও

হয় উদ্ভিদ থেকে নইলে প্রাণী থেকে পাওয়া। বিষের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই। বংশ পরম্পরায় নানা জিনিস থেকে তীরে মাখাবার বিষ তৈরির জ্ঞান তাদের রয়েছে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কেউ কেউ এই জ্ঞানকে আরো পাকা করেছে। এ জন্য ধুতুরা বিষের মত বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের বিষ তারা ব্যবহার করে; আর বিশেষ বিশেষ গুবরে পোকা বিশেষ কিছু পতঙ্গের লার্ভা, শুয়াপোকা ইত্যাদি থেকেও যুৎসই বিষ পায়। এই ছোট্ট প্রাণীগুলো নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যই খুব কার্যকর বিষ দেহের মধ্যে তৈরি করে। এগুলো হামানদিস্তায় ছেঁচে, শুকিয়ে ঘন করে কেমন করে বিষকে তীব্র করে তুলতে হয় তা তাদের জানা। সাপের বিষ-দাঁতের নিচে থেকে বিষ সংগ্রহ করতেও তারা পটু। তীর ছোঁড়ার আগে তীরের মাথাতে এই বিষ মাখানোর ব্যাপারে তাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়, কারণ এই বিষ মানুষের নিজেদের ক্ষেত্রেও মারাত্মক ভাবে কাজ করে। তীরের সূক্ষ্ম আগায় বিষ মাখালে অসাবধানতাবশত সেই আগা হাতে সামান্য বিদ্ধ হলেই শরীরে বিষক্রিয়া হয়ে নিজেই মারা যাবার ভয় থাকে; তাই ওরা বিষটি মাখায় তীরের একেবারে আগায় নয়, সেই আগার ঠিক পেছনে। ধনুক থেকে সজোরে গিয়ে পশুর গায়ে লাগলে অবশ্য তীরের পুরো মাথাটি বিষ সহই বিদ্ধ হয়।

বিষমাখা তীরবিদ্ধ পশুর দেহে বিষক্রিয়া শুরু হতে এবং তার সম্পূর্ণ ফলাফল পেতে অনেক্ষণ লেগে যায়, বড় পশুর ক্ষেত্রে একাধিক দিনও লেগে যেতে পারে। এই পুরো সময় ধরে ওদেরকে আহত পশুটিকে অনুসরণ করে যেতে হয়। বিষে মারা যাওয়ার অর্থ এই নয় যে পশুর সারা শরীর বিষাক্ত হয়ে গেছে। এই বিষ পশুর মস্তিষ্ককে ছাড়া শরীরের আর কোথাও কোন স্থায়ী প্রভাব রেখে যায় না। ফলে এ পশুর মাংস ওরা নিরাপদেই খেতে পারে। শিকারের বড় পশু মারা যাওয়ার পর আপাতত কোন ভাবে লুকিয়ে রেখে গোষ্ঠির বাকি সবাইকে খবর দেয় গোয়েন্দারা। কারণ এ ধরনের বড় শিকারের মাংস গোষ্ঠির সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে খাওয়াটাই নিয়ম। তবে যে পরিবারের শিকারের ফল এটি, বিশেষ করে যার তীরের আঘাতে পশুটি মারা গেছে সবাইকে দাওয়াত করার, পরিবেশন করার সম্মানটি তারই। এরকম ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যেখানে পশুটি মারা গেছে ঠিক সেখানেই শুরু হয়ে গেছে পুরো গোষ্ঠির ভোজের উৎসব— ক্ষেত্র বিশেষ অন্তত দু'তিন দিন এ উৎসব চলতে পারে, প্রচুর নাচ-গান আর ফুর্তির সঙ্গে। এভাবে অন্য কোন পরিবারে সার্থক শিকার সম্পন্ন হলে গোয়েন্দা পরিবারও সেখানে দাওয়াত পাবে। কাজেই বেশির ভাগ দিন উদ্ভিজ ও অন্যান্য ছোটখাট স্বাদ বদলের মধ্য দিয়ে খাবার সারলেও মাংসের ভোজের দিনগুলো নেহাত কম নয়।

সানরা শিকার করা পশুর কিছুই বৃথা যেতে দেয়না— খাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন, অন্য কাজের ক্ষেত্রেও তেমন। মাংস, চর্বি, সম্ভবমত হাঁড় ভেঙ্গে তার মজ্জা, কলজে, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস প্রত্যেকটির তৈরির, পরিবেশনের ও খাওয়ার নিয়ম কানুন আছে। নানা অংশের হাড়ের নানা ব্যবহারও রয়েছে— হাতিয়ার, অস্ত্র, ছুরি,

থেকে চামড়া ও কাপড় সেলাইয়ের সুচ পর্যন্ত। কাপড় বলতে উদ্ভিজ আঁশকে মোটা দাগে বুনে যা তৈরি হয় তা। গায়ে পরার জন্য স্ত্রী-পুরুষ কারুই এদের খুব বেশি কিছু লাগেনা; যেটুকু লাগে সেটুকু হয় সামান্য পশু-চামড়া অথবা সামান্য কাপড় দিয়ে সেরে ফেলে। পশুর রগ হয় সেলাইয়ের সুতা, লম্বা অন্ত্র পাকিয়ে হয় ছোটখাট প্রাণী ধরার ফাস তৈরির দড়ি বা এমনি আরো কিছুর জন্য শক্ত দড়ি।

গোয়েন্দা পরিবারের দাওয়াতে যে ভোজটি চলছে সেদিকে একটু লক্ষ্য করা যাক। রান্নার কিছু কিছু কায়দা বেশ অভিনবই বটে। মাংস সব সময় ওরা হয় সরাসরি আগুনে রোস্ট করে খায়, অথবা আগুনে উত্তপ্ত ছাইয়ের মধ্যে তা অনেক্ষণ রেখে দিয়ে তারপর খায়। ওই ছাইয়ের ঠিক বাইরেই থাকে গনগনে অঙ্গার। কাজেই যে কোন জায়গায় একটি খোলা আগুন জ্বালালেই তাতে কোন পাত্র ছাড়াই রান্নার কাজ চলতে পারে। মাংস ছাড়াও অন্যান্য সব জিনিসও এভাবেই রান্না হতে পারে। তরমুজ জাতীয় ফলের রান্নার কায়দাটি সুন্দর। পুরো তরমুজটি গেছো-মা জ্বলন্ত অঙ্গার আর উত্তপ্ত ছাইয়ের মধ্যে একেবারে গুঁজে দিল। তরমুজের খোসাটি অনেকটা পুড়ে গিয়ে ভেতরের বাষ্প যখন প্রায় বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে তখন এটি অঙ্গার থেকে বের করে পোড়া খোসাটি ফেলে দিল বাকিটা কাঠের হামানদিস্তায় ফলের শরবতের মত ঘুঁটে ফেলা হলো। এই শরবত সবাই তৃপ্তি করে খেলো— এতে রান্না করা সবজি খাবার যেমন হয়, পানির অভাবও মেটে।

ওদের রান্নার মধ্যে কোন রান্নার পাত্র ব্যবহারের সুযোগ নেই। শেকড়, বেরি ফল, শস্য, মাশরুম সবই ওই উত্তপ্ত ছাইয়ের মধ্যে দিয়েই রান্না করা হয়— শুধু সমস্যা হলো মাংসের দলা বা তরমুজের তুলনায় এগুলো ছোট সাইজের বলে ছাই থেকে এগুলো ছেঁকে বের করতে হয়। বেতকে ফালা করে সেগুলো বেড়ার মত বুনে এই ছাকনি গোয়েন্দা পরিবারের মেয়েরা আগেই তৈরি করে রাখে। এতে ছিদ্রের সাইজটা ছাই পড়ে যাবার জন্য যথেষ্ট হলেও বেরি ফল বা শস্য পড়ার জন্য নয়।

পরিবারের মহিলারা যখন ফলমূল সংগ্রহে যায় আর পুরুষরা যখন শিকারে যায় তখন ওই অস্থায়ী বাসায় থাকে ঝুনা দাদু তাঁর ছোট ছোট নাতি নাতনিকে নিয়ে। এই ত্রিকালদর্শী মানুষটির শরীর এখন বার্ধক্যে দুর্বল কিন্তু তাঁর স্মৃতি ও মন অত্যন্ত চাঙ্গা। বাচ্চাদের নিয়ে যখন বাসায় কাটান তখন তাদের কাছে সানদের পুরানো দিনের কাহিনী শোনান। প্রাচীন সান কিংবদন্তীর নানান দিক বংশ পরম্পরায় তাঁর গল্পে এসে একালে পৌঁছে গেছে। এখানে সব বাসাগুলোকে নিয়ে রচিত বৃত্তের মাঝখানে কেন্দ্রীয় আগুনটির চারিদিকে বসে রাতে পুরো গোষ্ঠির আড্ডার সময়ও গোষ্ঠিশুদ্ধ ছেলেবুড়ো ঝুনা দাদুর ওই কিংবদন্তীর গল্প শুনতে ভালবাসে।

ঝুনা দাদু নাতি নাতনিদেরকে বলেন— 'এই যে আমরা সানরা এখন মরুভূমিতে বিরান জায়গায় একটুখানি খাবার যোগাড়ে প্রাণান্ত পরিশ্রম করছি,

আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে তা কিন্তু করতে হয়নি। তারা থাকতো দক্ষিণ আফ্রিকার সুজলা সুফলা জায়গাগুলোতে— তারাই ওখানে সবার আদি মানুষ। একেবারে দক্ষিণের সমুদ্র পর্যন্ত শুধু তারাই ছিল। কিন্তু এক সময় উত্তর থেকে অনেকটা আমাদের মত দেখতে অন্য গোত্রের মানুষ এলো যাদের নাম খোই-খোই। সানদের মতই তাদের গায়ের রঙ হালকা হলুদ-বাদামি। তাদের গায়ের চামড়া অপেক্ষাকৃত কম বয়স থেকেই কুচকানো— যেমন এই তোমাদের বাবা মা'দের মুখের চামড়া মাঝ বয়সেই কেমন কুঁচকে গেছে, আর আমি ঝুনা দাদু তো আগাগোড়াই কুঁচকানো। আমাদের চুলের দিকে তাকাও বেশ দূরে দূরে এখানে ছোট্ট বেঁটে এক গুচ্ছ, ওখানে ছোট এক গুচ্ছ করে অল্প কিছু চুল ছাড়া এগুলোর মাঝখানের জায়গাগুলো চুলহীন। এরকম গায়ের রঙ, এরকম চামড়া, এরকম চুলের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম মানুষও কিন্তু আছে, তোমরা তাদের দেখোনি। কিন্তু হুবহু এরকম সানদের মত দেখতে হলে কী হবে, এই খোই খোই মানুষরা আমাদের মত শিকার করতো না, ফলমূল সংগ্রহও করতোনা, বরং তাদের প্রায় সবারই ছিল অনেক ভেড়া। দুম্বা জাতীয় এই ভেড়া সম্পদের জন্য তাদের অবস্থা ভাল ছিল, খাওয়ার চিন্তা ছিলনা। এই ভেড়া চরাতে গিয়ে তারা আমাদের শিকারের পশুকে তাড়িয়েছে, আমাদের জীবিকার উৎসগুলো নষ্ট করেছে। শিকার-সংগ্রহ করে চলি বলে আর কোন সম্পত্তি নেই বলে ওরা আমাদেরকে নিচু জাত মনে করতো। বাধ্য হয়ে আমাদের অনেকে বাঁচার তাগিতে তাদের ভেড়া চরাবার কাজ নিয়ে তাদের সঙ্গে থেকেছে; এক সময় ওদের সঙ্গে মিশে গিয়ে খোই-সান বলে পরিচিত হয়েছে। এর মধ্যে আরো উত্তরের দেশগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের এবং ভিন্ন রকম দেখতে মানুষও আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় দলে দলে আসছিলো— তারা বান্টু মানুষ। এদের গায়ের রঙ কালো, চামড়া মসৃণ, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল। খোই-খোইদের সঙ্গে আমাদের ভাষার কিছু মিল থাকলেও ওই বান্টুদের ভাষা কিন্তু একবারেই আলাদা। সবচেয়ে বড় কথা এদের রয়েছে অনেক পোষা গরু, এরা খামার করে— চাষ করে ফসল আবাদ করে। এসব আমাদের থেকে তো বটেই খোই-খোই বা খোই-সানদের থেকেও একেবারে আলাদা। এই নতুন মানুষরা তাদের খামার আর গরুর পাল নিয়ে এসে আমাদের জীবিকাকে সেখানে একেবারেই ধ্বংস করে দিয়েছিলো। শুধু তাই নয় আমাদেরকে কাবু করে একেবারে দাসে পরিণত করে ফেলেছিলো। প্রায় দাস হিসেবে তাদের খামারে কাজ করা ছাড়া ওদের পক্ষে ওখানে বাঁচার কোন উপায় ছিলনা। নিজেদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য আমাদের কিছু কিছু সাহসী পূর্বপুরুষ এখানে কালাহারি মরুভূমিতে এসে কঠিন জীবন জীবন সংগ্রাম করেছে। তাদের বংশধর আমরা আজ এখানে এই জীবনেই খুশি।'

গোয়েন্দাদের প্রায় সব কাজকর্ম নিজের গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও আশপাশের অন্যান্য গোষ্ঠির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে, কিছুটা বোঝাপড়াও

আছে। এসব করার জন্য নিজেদের গোষ্ঠির যে কোন নেতা বা গোষ্ঠিপতি আছে তা কিন্তু নয়— ওরা এরকম কোন বিশেষ নেতার ওপর তাদের নানা কাজের সিদ্ধান্ত নেবার ভার ছেড়ে দেয় না। বরং সব কিছু গোষ্ঠির সবার মধ্যে আলোচনা করে মতৈক্যর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়।

এই যে মরুভূমিতে দিনের পর দিন ওরা ঘুরছে, সব সিদ্ধান্ত কিন্তু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিচ্ছে। গোয়েন্দার মত পরিণত বয়সের মানুষের মতামত শুধু নয়, কম বয়সীদের মতামতকেও গুরুত্ব দেয়া হয়। এজন্য ওরা ঘন্টার পর ঘন্টা একটি বিষয়ে আলোচনা চালাতে প্রস্তুত থাকে। সাধারণ ভাবে যার পারিদর্শিতা যেদিকে বেশি বলে মনে করা হয়, ওই বিশেষ ক্ষেত্রে তার মতামতকেই গুরুত্ব দেয়া হয়— সে স্ত্রী, পুরুষ, বড়, ছোট যেই হোক না কেন। নানা বিরোধের মীমাংসাও ওরা ওভাবে আলোচনার মাধ্যমে করে। কোন দলপতি বা রাজা গোছের কারো কথা ওরা ভাবতেই পারেনা। তাদের জগতে সব গোষ্ঠিরই ধ্যানধারণা একই রকম বলে এতে তাদের কোন অসুবিধে হয়না। এভাবে আলোচনার ভিত্তিতেই পুরো অঞ্চলটির সব গোষ্ঠিগুলো বছরে একবার একটি মেলায় একত্রিত হয়। মজার ব্যাপার হলো মোটামুটি একই সান ভাষার উপজাত হলেও ওদের বিভিন্ন গোষ্ঠির ভাষা পুরোপুরি এক নয়— কষ্ট করে একে অপরের জরুরি কথাগুলো কোন ভাবে বুঝতে পারে মাত্র। তবে একটি বিষয়ে ভাষাগুলোর মধ্যে বড় মিল রয়েছে ওদের অনেক শব্দের উচ্চারণগুলো শুনলে মনে হবে মুখে ক্লিক ক্লিক আওয়াজ করছে; এই ক্লিক আওয়াজটিই সানদের সব ভাষার বৈশিষ্ট।

ভাষার কিছু ভিন্নতা অবশ্য মধ্য-কালাহারির সানদের ওই বার্ষিক মেলার আনন্দকে মোটেই ম্লান করতে পারেনা। এতে নাচগানের অনুষ্ঠানে প্রচুর ফুর্তি হয়, ওদের বিভিন্ন গোষ্ঠির বিশেষ খাবারগুলোর ভোজ হয়। কিন্তু ফুর্তি ছাড়াও এই মেলার পেছনে দরকারি সব উদ্দেশ্যও আছে। সহজ সরল জীবন যাপন করলেও, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে প্রায় কিছুই না থাকলেও, সানরা ছোট ছোট অলঙ্কার গায়ে পরতে পছন্দ করে— রঙীন পুঁতির মালা ইত্যাদি। এই অলঙ্কার বিনিময় করার, সংগ্রহ করার, এবং অন্যদেরকে দেখানোর এটি একটি বড় সুযোগে। এই মেলার মাধ্যমে কাছাকাছি বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে জানাশোনা সদ্ভাব গড়ে ওঠে; নিজ নিজ এলাকার সীমানা ইত্যাদি নিয়ে কোন বিরোধ বাধলে তা মেটানোও সহজ হয়। আরো জরুরী কথা হলো সানরা সাধারণত নিজের গোষ্ঠির মধ্যে বিয়েশাদি সম্পর্ক করেনা, করে অন্য গোষ্ঠির সঙ্গে। বিবাহযোগ্য ছেলেমেয়েরা এই মেলাতেই অন্য গোষ্ঠির মধ্যে তাদের বর-কনে বেছে নেয়। সাধারণত কনেরাই তাদের নতুন গোষ্ঠিতে চলে যায় ওই গোষ্ঠির অংশ হয়ে পড়ে— এ ভাবেও অবশ্য গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে সখ্যতা গড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ গোয়েন্দার দুই স্ত্রী কেঁচো-মা আর গেছো-মা দুজনে দুটি ভিন্ন প্রতিবেশী গোষ্ঠি থেকে এসেছে। গোয়েন্দার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এই উভয় গোষ্ঠিতে থাকা আত্মীয়-স্বজনের খুবই ভালবাসা

আর মেলামেশা রয়েছে। এ আত্মীয়তা আরো আত্মীয়তা এবং সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

গোয়েন্দাদের গোষ্ঠিতে সবাই খাওয়া-পরার কাজ নিয়ে বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকলেও অবসর মুহূর্তগুলোর অনেকখানিই কাটে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ও আলাপে। ওদের জগতে রয়েছে একজন পরম শক্তিশালী দেবতা ও আরো অনেক ছোট দেবতা। কোন দেবতাকেই ওরা একেবারে অশরীরী কিছু বলে ওপরে তুলে রাখেনা বরং মনে করে ওই দেবতাদেরও রয়েছে ঘর-সংসার-ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। ওদের ধারণা ওদের পরলোকগত আত্মীয়স্বজনের আত্মার সঙ্গে এই দেবতাদের মেলামেশা আছে তাই ওই আত্মাদেরকেও তারা সমীহ করে। এই যে ওরা মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়ে প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে খাচ্ছে, শিকার করে খাচ্ছে একে ওরা ধর্মের অনুশাসন বলে মনে করে। কারণ যে ভূমিতে তারা বিচরণ করে তার পুরোটাই তাদের কাছে দেবতুল্য— এখানে কোন একটি জায়গায় আবদ্ধ থাকা ধর্মের অবমাননা। তাই বলে অবশ্য সব দেবতাকে সব সময় খুব নির্ভুলও মনে করেনা ওরা। এমন দেবতাও তাদের আছে যাকে নিয়ে নানা কিংবদন্তী গড়ে ওঠেছে— এর কোনটিতে তিনি খুব জ্ঞানী, কোনটিতে খুব বোকা, কোনটিতে খুবই দয়ালু ও সাহায্যকারী, আবার কোনটিতে খুবই বিরক্তিকর। শুধু তাই নয় এরকম দেবতা তাদের কাছে কখনো ধরা দেন একটি গঙ্গা ফড়িং হিসেবে, কখনো একটি বড় এলান্ড হরিণ হিসেবে, কখনো বা সাপ অথবা শকুন হিসেবে। মজার ব্যাপার হলো এই দেবতাই আবার কখনো একজন সাধারণ সান মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করেন।

এসবের কিছু কিছু ধরা পড়ে লাল মাটির বা সাদা মাটির চক দিয়ে অথবা কাঠকয়লা দিয়ে এদের পাথরের গায়ে নানা কিছু আঁকার অভ্যাসে। যখনই অবসর পায় এবং আঁকার মত পাথুরে দেয়াল পায় গোয়েন্দা পরিবারের কেউ কেউ এভাবে আঁকার কাজে লেগে যায়— অনেকটা ধর্মকর্মের মনোভাব নিয়ে। দেখে মনে হবে ওদের পরিচিত পশুপাখি, শিকারের ছবি, তাদের নাচের ছবি বাচ্চাদের মত খুব সহজ সরল ছবিতে আঁকছে তারা। আসলে তারা কিন্তু নিজেদের আধ্যাত্মিকতার ছবি আঁকছে। ওই যে এলান্ড হরিণের ছবি বার বার আসছে, ওকে তারা তাদের আরাধ্য দেবতার স্থান দেয়। ওই যে বিশেষ ভঙ্গির নাচের ছবি, তাতে তারা যে নাচতে নাচতে এক রকম উন্মাদনার মধ্যে চলে যায় এটিই আঁকার চেষ্টা করেছে। ওই পশুদের ছবিতেও এমনি অঙ্গভঙ্গির, লাফ দেয়ার, ছোটার উম্মাদনা দেখানোর চেষ্টা আছে। এ ধরনের উম্মাদনা সান ধর্মীয় চেতনার অংশ। সুযোগ পেলেই ওরা এ ধরনের উম্মাদক নাচে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। নিজেদের মধ্যে এক ধরনের ফকিরী ভাব অনুভব করে যার কিছু বাহ্যিক লক্ষণও দেখা যায়— মুখে ফেনা ওঠে, নাক দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে।

তবে ধর্মীয় অনেক আচার অনুষ্ঠানেরই সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। প্রত্যেকের জীবনের বড় বড় মোড়গুলোকে পুরো গোষ্ঠি মিলে খুবই হৈচৈ করে উদযাপন করে

ধর্মীয় আচারের মাধ্যমেই। নিজের প্রথম শিকারের মাধ্যমে বালকের সাবালেগ হয়ে ওঠার অনুষ্ঠানটি আগেই দেখেছি। প্রথম মাসিক রক্তস্রাবের মাধ্যমে বালিকার বয়োপ্রাপ্তির ঘটনাটিকে উদযাপন করা হয় আরো বড় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। গোয়েন্দার মেয়ে টোকাইয়ের এই অনুষ্ঠানে তার জন্য আলাদা একটি ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছিলো আর একে কেন্দ্র করে কয়েক দিন চলেছিলো নাচের অনুষ্ঠান। গোষ্ঠির সব পুরুষরা তখন পুরুষ হরিণের নাচ নাচে, আর মহিলারা নাচে স্ত্রী হরিণের নাচ। গোয়েন্দার যে ফুপু সপরিবারে এই গোষ্ঠিতে আছে তার ছোট ছেলের বিয়েতে এবার তার শ্বশুর গোষ্ঠির সঙ্গে দারুণ উৎসব হলো। শ'খানেক মানুষের সে এক উদ্দাম উৎসব— বিশাল ভোজ। বিয়ের অনুষ্ঠানেরও মূল আকর্ষণ হলো উন্মাদক নাচ। যেই এলান্ড হরিণকে তারা দেবতার আসন দিয়ে থাকে, আর যে তাদের শিকারেরও প্রধান লক্ষ সেই হরিণের চর্বি দিয়ে বর-বধূর সারা দেহ ভাল করে চর্চিত করা হয় এই অনুষ্ঠানে।

তবে মানুষের জীবনের একটি পর্যায়কে সানরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে পরিণত করেনি, বরং এর পুরো ব্যাপারটিকেই তারা যথাসম্ভব এড়িয়ে যায়— তা হলো মৃত্যু। তাদের ধারণা মৃত্যুর পর আত্মা গিয়ে দেবতাদের জগতে যোগাযোগ করে যার পরিণতি সব সময় ভাল হয়না। তাই গোষ্ঠিতে কারো মৃত্যু হলে মৃতদেহ যে বসতিতে রাখা হয়, যে জায়গায় কবর দেয়া হয়, দ্রুত তারা এর সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করে। ওই পুরো বসতটিকেই তারা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করে অন্যদিকে চলে যায়, আর পারতপক্ষে ওই কবরের খোঁজ নেয় না।

*　　*　　*

আফ্রিকার দক্ষিণের দেশগুলোতে দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, বতসোয়ানা, মোজাম্বিকে সান গোষ্ঠির মানুষদের বসবাসের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো বহুকাল ধরে তাদের অস্থিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। অনেকেই মনে করে যে এরা বর্তমান প্রজাতির (হোমো সেপিয়েন্স) মানুষের একেবারে আদিতমদের সাক্ষাত বংশধর এবং আফ্রিকার দক্ষিণ অংশের প্রাচীনতম আদিবাসী। এখানে অন্তত ২০ হাজার বছর ধরে তাদের অস্থিত্বের প্রমাণ আছে। তাদের আগুন জ্বেলে রান্নার ও খাদ্য গ্রহণের জায়গায় বিভিন্ন বন্য প্রাণীর হাড় ইত্যাদি থেকে এই দীর্ঘ সময়ের নানা পর্যায়ের জীবনযাত্রার কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মিলেছে।

তবে সানদের অতি সরল উদ্ভিজ-নির্ভর যাযাবর জীবনযাত্রায় হাতিয়ার বা রসদের বাহুল্য যেমন ছিলনা তেমনি যা ছিল সেগুলো বেশীদিন টিকে থাকার মতো নয়। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকদেরকে হাজার হাজার বছর ধরে তাদের আঁকা পাহাড়ের গায়ের সহজ-সরল ছবিগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে দেখা গেছে হাজার হাজার বছর ধরে আলাদা ভাবে থাকা সানদের জীবনযাত্রায় তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। আমাদের কাহিনীতে বর্ণিত মধ্য-কালাহারির ছয় শত বছর আগের সানরা যেমন ছিল এর পরেও তেমন ছিল, এমন কি এখনো যে ক'জন অবশিষ্ট আছে তেমনিই আছে। ফলে ওই

কাহিনীর মাত্র শ' খানেক বছর পর ইউরোপীয়রা যখন প্রথম এসব জায়গায় এসেছে তাদের বর্ণিত অবস্থা আমাদের গোয়েন্দা পরিবারের অবস্থা থেকে মোটেই ভিন্নতর ছিলনা। কাজেই ইউরোপীয় ঔপনেবেশিক সময়ের প্রথম দিকে কালাহারির এবং আরো বেশি দক্ষিণ আফ্রিকার নানা অঞ্চলের (বিশেষ করে কেইপ অঞ্চলের) সানদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে যা এর চেয়ে আগের অবস্থাকেও উদ্‌ঘাটিত করেছে। অবশ্য আলাদা থাকা সানদের চেয়েও অনেক বেশি জানা গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার কেইপ অঞ্চলের সান ও খোই-খোইদের মিশ্র গোষ্ঠি খোই-সানদের সম্পর্কে এবং কালো বর্ণের আফ্রিকান খামারি ও গরু পালনে অভ্যস্ত বান্টুদের সম্পর্কে। খোই-সানরা প্রথম দিকের ডাচ ঔপনেবেশিকদের সঙ্গে অনেক বেশি মেলামেশা করেছে, তাদের অনেক নারীকে এই ইউরোপীয়রা বিয়ে করেছে যার ফলে খোই-সানদের অনেকে মিশ্র জাতিতে পরিণত হয়েছে— নিজেদের ভাষা ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচদের ভাষা আফ্রিকানকে নিজের ভাষা করে নিয়েছে। বর্ণবাদী এপারথাইড সরকারের আমলে এই মিশ্র খোই-সানদেরকে সাদা ও কালোর মাঝখানে কালারড নামের একটি আলাদা শ্রেণীভুক্ত করা হতো এবং কালোদের থেকে অধিকতর অধিকার দেয়া হতো। এখন অবশ্য গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকার সবাই সমান নাগরিক, খোই-সানরা সহ।

তবে সানদের মধ্যে যারা বহু আগেই খোই-খোইদের ও বান্টুদের আগ্রাসন এড়াতে সুদূর কালাহারি মরু অঞ্চলে সংগ্রামী জীবনে চলে গিয়েছিলো তাদের কথা ভিন্ন— আমাদের কাহিনী তাদেরকে নিয়েই। ইউরোপীয়ানদের আগ্রাসনে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সব চেয়ে বেশি, কালাহারিতে বা দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যত্র ওরা যারাই নিজের মত বসবাস করতে চেয়েছে। ওদেরকে ইউরোপীয়রা মানবেতর মনে করেছে এবং সে ভাবেই তাদের প্রতি আচরণ করেছে, এবং এক রকম গণহত্যার সম্মুখীন করেছে। ইউরোপীয় ঔপনেবেশিক বড় বড় খামার মালিকগণ এই যাযাবর শিকারি-সংগ্রাহক মানুষগুলোকে (তাদের ভাষায় 'বুশম্যান') বন্য শেয়াল-কুকুরের মত এক ধরনের উৎপাত মনে করে ওসবের মতই তাদেরকে ধ্বংস করেছে। তবে কালাহারিতে অন্তত দূরত্ব ও দুর্গমতার কারণে তাদের অনেকে টিকে গিয়েছে এবং এখনো টিকে আছে। এখনো তাদের জীবনযাত্রা, সমাজ, বিশ্বাস, আচরণ এখানে বর্ণিত সানদের থেকে আলাদা কিছু নয়। এখনো তারা যাযাবর জীবনে শিকার ও সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। বড় জোর তাদের সঙ্গে এখন ধাতব কিছু ছুরি-কাঁচি ঘটি-বাটি-থালা বাসন থাকে কাজের সুবিধার জন্য। এখন তাদের কেউ কেউ স্থানীয় অন্য ভাষা শিখেছে, তাদেরকে দেখতে যাওয়া পর্যটকদের সঙ্গে তারা কথা বলতে পারে; তাদের অতি সহজ সরল জীবনযাত্রা অতি সরল ভাবে বর্ণনাও করতে পারে, দেখাতে পারে। কিন্তু তাদের মূল জীবন এখনো আপাদমস্তক প্রাগৈতিহাসিক জীবন।

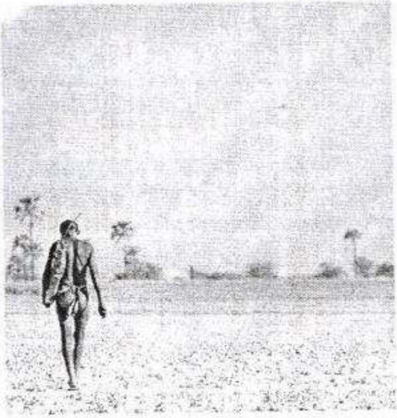

মধ্য-কালাহারির সান্‌দের বিচরণ ক্ষেত্র

উদ্ভিজ দিয়ে তৈরি অস্থায়ী আবাস

অতি সন্তর্পনে শিকারের উদ্যোগ

পাথরের গায়ে আঁকা চিত্র

পাথরের গায়ে আঁকা চিত্র

পাথরের গায়ে সানদের নাচের দৃশ্যের

অষ্ট্রেলিয়ার বোটানি বে' তীরের বড়শিওয়ালি ঃ
পাঁচ শত বছর আগে

স্থায়ীভাবে সাগরধারে থাকা এই পরিবারগুলোতে মেয়েদের একটি দৈনন্দিন কাজ হলো বড়শি দিয়ে মাছ ধরা। সুকৌশলে শাঁখ কেটে বড়শি তৈরিতে আর নানা ফন্দিতে মাছকে আকর্ষণ করতে ওরা পারদর্শি। পুরুষদের অহেতুক আগ্রাসী আচরণের বিপরীতে ওরাও অনেকটা নারীবাদী হয়ে ওঠেছে, আর তাদের একজন নেতা বড়শিওয়ালি।

এখন যেখানে অষ্ট্রেলিয়ার বড় নগরী সিডনি গড়ে উঠেছে তার সঙ্গেই সরু প্রবেশ মুখ ছাড়া চারদিক থেকে স্থলে ঘেরা উপসাগর বোটানি বে'। আজ থেকে পাঁচ শত বছর আগে এখানে না ছিল কোন নগর, না কোন শহর, না ঘন বসত নিয়ে কোন বড় গ্রাম। ওই পুরো এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় যাযাবর যে মানুষগুলোকে আমরা সেদিনে ফিরে গিয়ে দেখতে পাই তাদেরই একজন বড়শি-ওয়ালি। এখানকার মানুষের সঙ্গে মাছ ধরার সম্পর্ক হাজার হাজার বছরের, বলতে গেলে এই বোটানি বে'র সাগরে এবং এর সঙ্গে মেশা যে বেশ কয়েকটি নদী তাদের বসতের কাছ দিয়ে গিয়েছে সেখানকার পানিতে থাকা প্রাণীগুলোই ওদের প্রধান খাদ্য। ছোট-বড় নানা মাছ তো বটেই— কচ্ছপ, চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রচুর বৈচিত্রের সেই জলজ প্রাণী। আর কিছু তো রয়েছে নেহাত এই অঞ্চলেরই বিশেষ কিছু পানিতে থাকা প্রাণী— যেমন পানি-ইঁদুর, সব দিক থেকে ইঁদুর হলেও পানিতেই বেশি থাকে এবং সেখান থেকেই শিকার করা হয়। আবার রয়েছে প্লাটিপ্লাস— যার সঙ্গে তার ঠোঁটের জন্য হাঁসের মিল, কাঁটার জন্য সজারুর মিল, লেজের জন্য ভোঁদড়ের মিল, যদিও স্তন্যপায়ী তবুও ডিম দেয়; সব কিছু মিলে সে এক জগাখিচুড়ি অদ্ভুত প্রাণী। সব চেয়ে বড় কথা হলো এরা সবাই ওই মানুষদের প্রধান খাদ্য।

পাড়া-পড়শি সবার কাছে বড়শি-ওয়ালি নামে পরিচিত ওই বছর তিরিশেক বয়সের মহিলাটির বড়শি নিয়ে কাজটি অবশ্য তেমন ব্যতিক্রমী কিছু নয়। কারণ

মাছ ধরা, কিংবা অন্যান্য সব জলজ প্রাণী শিকারের কাজটি যদিও এখানে স্ত্রী-পুরুষ সবাই করেই থাকে, তার মধ্যে মেয়েদের মাছ-ধরার কায়দাটি প্রধানত বড়শি নিয়ে। কখনো নদীর তীরে বসে লম্বা ছিপ থেকে তারা বড়শি ফেলে আবার কখনো গাছের গুড়ি বা বাকল দিয়ে তৈরি ছোট্ট সরু নৌকায় বসে পানিতে বড়শি ফেলে। কিশোরী, তরুণী, মাঝবয়সী সব মেয়েদের এমনি ভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা মাছ ধরার দৃশ্য এখানে খুবই পরিচিত।

কিন্তু মেয়েদের সবাই যদি বড়শি দিয়ে মাছ ধরবে, তা হলে আমাদের বড়শি-ওয়ালি আলাদা করে ওই নামে খ্যাতি পেলো কেন? সেটি অবশ্য শুধু মাছ ধরার কারণে নয়, বরং নিজের ব্যক্তিত্বের গুণে এখানকার মাছ-ধরা মেয়েদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে বেশ প্রতিবাদী করে তোলার কারণেই তার আলাদা সম্মান। পুরুষরা নানা ভাবে নারীদের দাবিয়ে রাখছে এখানে। ওই পুরুষরা দাবি করে যে জীবন-জীবিকার বড় বড় কাজগুলো তারাই করে। এই যে প্রধান খাদ্য জলজ প্রাণী শিকারের কথাই ধরা যাক— পুরুষরা মহিলাদের বড়শি দিয়ে মাছ ধরাকে তেমন কোন কৃতিত্ব দিতে চায়না। তারা বড়াই করে বলে তারা যে ভাবে হারপুন দিয়ে বিদ্ধ করে হাঙর, ষ্টিং-রে, ইত্যাদি বিশাল সব মাছ এবং ডলফিন, কাছিম ইত্যাদি অন্যান্য বড় জলজ প্রাণীকে বিদ্ধ করে শিকার করে, সে তুলনায় মহিলাদের বড়শি গাঁথা মাছ তুচ্ছ। ভাবখানা এমন যেন ওরা ব্যস্ত থাকতে চায় থাকুক, সূতায় গাঁথা বড়শি ফেলে পানির দিকে তাকিয়ে থাকুক। আর এদিকে সত্যিকারের সব শিকার পুরুষরা করছে— গাছের শক্ত লম্বা ডালে তৈরি তিনমুখী হারপুন চালাচ্ছে; আবার গাছের লতা থেকে দড়ি বানিয়ে তার থেকে বোনা জালে চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক ইত্যাদিও প্রচুর তুলছে। নদীতে ফাঁদ পেতেও অনেক মাছ ধরছে। ওই যে নৌকায় বসে মেয়েরা মাছ ধরার বিনোদন করছে সেই নৌকাগুলোও তো পুরুষরাই মেলা খেটে তৈরি করেছে। মেয়েদের কাজে খাজনা থেকে বাজনাই বরং বেশি।

হারপুন চালাতে বা জাল ফেলতে পুরুষরাও হয় পানির ধারের পাথুরে প্লাটফরমগুলোতে দাঁড়িয়ে তা করে, অথবা গাছের বাকলের তৈরি সেই সরু নৌকা থেকে করে। স্বাদ বদলাবার জন্য এখানকার বিচিত্র প্রাণীও শিকার করে। ওসব নিয়েও তাদের বীরত্ব কাহিনী কম নয়। তাদের কথা হলো যদি মহিলারাও একই ভাবে বর্শা বা বুমেরাং চালিয়ে নিয়ে আসতো কয়েকটি ক্যাঙ্গারু কিংবা ওয়ালাবি তা হলে বুঝতাম পরিবার চালাতে তাদের অবদান কম নয়।

পুরুষদের এসব টিটকারির কথায় অন্য মহিলারা দমে গেলেও আমাদের বড়শিওয়ালি কিন্তু মোটেই দামেনা। সে জানে এসব টিটকারির কথার অন্তরালে পুরুষের আসল চেহারাটি লুকানো থাকে— তা হলো মেয়েদেরকে দাবিয়ে রাখতে তাদের যার পর নাই চেস্টার কথা। ঘরে-বাইরে যাবতীয় সব কর্তৃত্ব তারা করতে চায়, মেয়েদের সুযোগ সুবিধার কথা বিন্দুমাত্র ভাবেনা। কিন্তু এখন মেয়েরাও শোধ তুলছে। বড়শিওয়ালি নৌকায় বসে বড়শি ফেলে আর নৌকার অন্যান্য

মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে। তার কথা হলো পুরুষদেরকে ভয় পাবেনা, তাদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করবেনা; তোমরা যা করছো ভাল করে করো, ওখানে পুরুষদেরকে প্রশ্রয় দিয়োনা। মেয়েরা যেন তাদের কাজে স্বনির্ভর হতে পারে সেজন্য বড়শিওয়ালি মেয়েদেরকে শেখাচ্ছে কেমন করে বড় টারবান শাঁখ কেটে কেটে সযত্নে বড়শি তৈরি করতে হয়, আবার গাছের বাকল থেকে অথবা ফ্ল্যাক্স আঁশ থেকে লম্বা সুতা বের করে সেগুলো পাকিয়ে সরু শক্ত বড়শির সুতা বানাতে হয়। তবে বড়শি পানিতে ফেলে তাদের আলাপ (প্রশিক্ষণও বলা যায়) শুধু মাছ ধরার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা— কী ভাবে পুরুষের বড়াইগুলো ফুটো করে দিতে হয়, কীভাবে তাদের মুখের কথার জবাব দিতে হয়, আর কীভাবে নিজেদের অধিকারগুলো আদায় করে নিতে হয় সে সব আলাপও চলে এ ভাবেই লোকমুখে নাম ছড়িয়ে পড়েছে বড়শিওয়ালির— শুধু ভাল মাছ ধরে বলে নয়; বরং এভাবে নেতৃত্ব দানের জন্যই।

পুরো বোটানি বে' এলাকার সব মানুষ একই রকম নিয়মে আবদ্ধ একই সমাজের বাসিন্দা হলেও তাদের বসতগুলো কিন্তু পুরো এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বিচ্ছিন্ন এক একটি বসতে বড় জোর একটি বৃহত্তর পরিবারের বাস। সেটি সমুদ্র কিনারায় খাঁড়ি এলাকার আশেপাশেই নানা পাথুরে আশ্রয়ের সুযোগ নিয়ে গড়ে ওঠেছে। কোন কোন জায়গায় যুৎসই কোন গুহাকেও তারা বসবাসের উপযুক্ত করে নিয়েছে। সমুদ্র থেকে কিছু দূরে নদীর ধারে এমন আশ্রয় পেলে সেটিকেও তারা ব্যবহার করছে। মূল খাবারের জন্য সমুদ্র ও নদীর ওপর নির্ভর করে বলে এগুলোই তাদের মোটামুটি স্থায়ী বাসস্থান। তবে পশু-পাখি শিকারের খোঁজে, আর ঝোপ-ঝাড় থেকে উদ্ভিজ খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদেরকে এই মূল আবাস থেকে বেশ দূরে দূরেও চলে যেতে হয়— এমনি চলে যাওয়াটা মনে হয় তারা বেশ উপভোগও করে। এ সময় খোলা জায়গায় অস্থায়ী আবাস গড়ে নেয় তারা। এই আবাসগুলো এতই অস্থায়ী ও ঠুনকো হয় যে গাছের সরু কাণ্ড বা ডাল মাটিতে পুঁতেই এগুলোর কাঠামো তৈরি হয়ে যায়— সেই কাণ্ডে বা ডালে দুচারটি শাখা-প্রশাখা-পাতা লেগে থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। কাঠামোটির ওপর এরপর ওরা গাছের বাকল লাগিয়ে নেয়। 'বাঁধাকপি বৃক্ষ' নামের এক ধরনের গাছের পাতা দিয়ে এসব কুটিরের ছাদ ছাওয়ার কাজটি বেশ সহজেই করা যায়। অনেক সময় একবার মাত্র শিকারের পর পশুদেহ কেটেকুটে আগুন জ্বালিয়ে রোষ্ট করে একটি ভাল ভোজ খেতে যতক্ষণ ওখানে থাকতে হয় ততক্ষণই শুধু তারা ওখানে থাকে— বলা যায় নৈশ ভোজের ক্যাম্প মাত্র এগুলো।

তবে দৈনন্দিন স্থায়ী আবাসটিতে থেকে, মাছ ধরে, আশপাশের ছোটখাট প্রাণী শিকার করেই ওদের প্রধানত চলে। বেশ কিছুটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও সমাজের সবাই প্রায়ই নানা উপলক্ষে জড়ো হয়। তাই পশু পাখি শিকার এবং হাতিয়ার ও নানা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরির রসদ সংগ্রহ করতে যেমন তাদেরকে

দূরে দূরে যেতে হয় তেমনি নানা সামাজিক কাজের তাগিদে একত্র হবার জন্যও যেতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিয়ে অনুষ্ঠান, নানা মৌসুমী আচার অনুষ্ঠান, কেউ মারা যাওয়ার কারণে শেষকৃত্য অনুষ্ঠান ইত্যাদি। কখনো কখনো কোন অপ্রত্যাশিত ভোজের কারণেও সবাইকে একত্র হতে দেখা যায়। যেমন মাঝে মাঝে সাগর থেকে বড় কোন তিমি অসাবধানে খাঁড়িতে ঢুকে পড়ে এবং তীরে আটকা পড়ে গিয়ে মানুষের কবলে চলে আসে। ঘটনাটি যত দূরেই ঘটুক না কেন বৃহত্তর এলাকার সবার কাছে খবরটি রাষ্ট্র করে দেয়া হয়। তখন চারিদিক থেকে মানুষের সমাগম ঘটে ওখানে বিশাল তিমি মাছ ভোজে অংশ নেবার জন্য।

কাজেই বিচ্ছিন্নভাবে বোটানি বে'র মানুষরা সমাজের নানা নিয়ম নিগড়ের বাইরে যেতে পারেনা। এসব বিষয়ে সমাজপতিদের বেঁধে দেয়া নিয়মগুলো বড় কড়া— আচরণের নিয়ম, আচার-অনুষ্ঠানের নিয়ম, পারিবারিক নিয়ম, বিয়ের সম্পর্কের নিয়ম, স্ত্রী-পুরুষের নানা কর্তব্যের নিয়ম এসব। আর সমাজপতিরা সব পুরুষ বলে এ নিয়মগুলোর বেশকিছু মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। আমাদের বড়শিওয়ালির ও তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ মহিলাদের প্রতিবাদ ও ক্ষমতায়ন প্রচেষ্টাগুলো আছে এখানেই। এ নিয়ে ওরা আজকাল সামাজিক নানা সভায় কথা কাটাকাটি বাদ-প্রতিবাদ পর্যন্ত করার সাহস করছে। পুরুষদের নানা মেকি বাহাদুরি প্রদর্শনের ব্যাপারে ঠাট্টা করতেও ছাড়ছেনা ওরা। এই মেকি বাহাদুরি বেশি প্রকাশ পায় যখনই প্রতিবেশী দুটি দল একত্র হয় এবং ওরা সামান্য ছুতানাতা নিয়ে মারামারি এমনকি যুদ্ধযুদ্ধ খেলায় মেতে ওঠে। মহিলাদের এটি ভারী অপছন্দ।

হাতের বর্শাকে শিকারের অস্ত্র না বানিয়ে তখন ওরা যুদ্ধের অস্ত্রে পরিণত করে। নিহত হবার ঘটনা বিরল হলেও যুদ্ধের হুঙ্কার ও ভয়াবহতা তাতে বিন্দুমাত্র কম থাকেনা। এ সময় একটি জিনিস খুব ব্যবহার করে তা হলো নিজেকে রক্ষা করার ঢাল। কিছু কিছু ঢাল শক্ত কিন্তু হালকা একরকম কাঠ দিয়ে তৈরি হলেও, অধিকাংশ তৈরি হয় বিশেষ গাছের বাকল দিয়ে। বেশ পুরু এই বাকল সংগ্রহ করা হয় খুব অগভীর সমুদ্রের কিনারায় এক রকম ম্যাংগ্রোভ গাছ থেকে ছিলে নিয়ে। লালচে রঙের এই বাকল ওই গাছের গুড়ির আকৃতি অনুসরণে একটু বাঁকা হয়। সাধারণত ফুট খানেক চওড়া এই ঢাল লম্বায়ও তিন-চার ফুটের বেশি হয়না। এর ওপর ও নিচের অংশকে ক্রমে সরু করে কেটে নেয়া— মাঝখানটিই শুধু প্রশস্ত। ঢালের পেছনে গাছের ছোট ডাল দিয়ে একটি হাতল লাগিয়ে নেয়া হয় যেটি এক হাতে ধরে শরীরের সামনে ঢালটি রাখা যায় আত্মরক্ষার জন্য। এমন সাইজের একটি ঢাল শরীরের পুরোটা যে আবৃত করতে পারেনা তা বলাই বাহুল্য। তারপরও ঢালকে নানা ভাবে ধরে তারা বীরদর্পে যুদ্ধ করার চেষ্টা করে। ওই বাকলটি বেশ হালকা পাতলা হলেও ঢাল হিসেবে এর উপযুক্ততা কম নয়, কারণ কাঠের বর্শার সাধারণ আঘাত এটি বেশ ঠেকিয়ে দিতে পারে, ছুড়ে মারা পাথর,

বুমেরাং এ সবও ঠেকিয়ে দিতে বা বিক্ষিপ্ত করে দিতে পারে, বাকলের নরম দৃঢ়তার কারণে।

অবশ্য ঢালের ব্যবহারের একমাত্র কারণ এরকম আত্মরক্ষা নয়, বরং এর প্রতীকী নানা অর্থই জিনিসটিকে পুরুষদের কাছে এমন অপরিহার্য করে তুলেছে। এক ধরনের শক্তিমত্তা ও বেপরোয়া ভাব প্রদর্শনের প্রতীক হিসেবেই তারা ঢাল ব্যবহার করে। এজন্য নানা দল নিজস্ব কিছুটা আকৃতি প্রকৃতি দেয় ঢাল তৈরির সময়— যেন এটি তার আত্মপ্রকাশের একটি উপায়। বড়শিওয়ালির নেতৃত্বে নারীবাদীরা একেও পুরুষদের একটি মেকি বীরত্ব বলে উল্লেখ করে; বলে কাজের কাজ না করে ওরা এসব মেকি বাহাদুরি দেখানো পুরুষদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। একই রকম মানসিকতা পুরুষতান্ত্রিকতার নানা বৈষম্য মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

এই পুরুষতান্ত্রিতার বেশ খানিকটা প্রতিফলন তারা দেখতে পায় প্রধানত পুরুষদের আঁকা নানা গুহাচিত্রে। নানা পাথুরে আশ্রয়, গুহার সঙ্গে পাথরের ওপর হালকা অগভীর খোদাইয়ের মাধ্যমে বহু চিত্র ফুটিয়ে তোলে এরা। এসবের অধিকাংশ চিত্রে কিছু একটি বক্তব্য থাকে— তাদের গোত্রের পূর্বপুরুষদের কোন কাহিনী, তাদের বংশ পরিচয় নিয়ে বড়াই, এ জায়গার ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এমনি সব ভাবসাব ওরা ফুটিয়ে তোলে খুব সাদামাটা সব আঁচড়ে। একটি চোখা পাথরের ছেনি দিয়ে খুব ছোট ছোট অগভীর গর্ত পাথরের ওপর একের পর একে করে গিয়ে এবং ছিদ্রগুলোর মাঝখানটায় আঁচড় কেটে গিয়ে এই চিত্রগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়। মেয়েদের কোন রকম সম্মানজনক উপস্থিতি এসব চিত্রে নেই। আগাগোড়া যেন পুরুষদের বাহাদুরি দেখাবার জন্যই এসব আঁকা।

একই সঙ্গে প্রচুর রঙীন ছবিও আঁকা হয় পাথরের ওপর— তবে রঙের প্রকার খুব সীমিত— সাদা, কালো, এবং লাল। রঙ বস্তু তৈরির রসদ সীমিত বলেই রঙের এই সীমাবদ্ধতা। ওরা সাদা রঙ তৈরি করে সাদা মাটি দিয়ে, কালো রঙ কাঠ-কয়লা দিয়ে, আর লাল রঙ ছোট ছোট ল্যাটারাইট অর্থাৎ লৌহ আকরিকের ডেলা দিয়ে। খুবই বিরল দু'একটি ছবিতে সামান্য হলুদের ছোপও রয়েছে— সেই হলুদ রঙটি আসে এক রকম পিপড়ার বাসায় পাওয়া হলুদ গুড়া থেকে। বোঝাই যায় কেন এটি এত বিরল। ছবিগুলোতে কাহিনীর চেয়েও নানা রকম বিচ্ছিন্ন প্রতিকৃতিই বেশি, অধিকাংশ জীবজন্তুর ছবি— ক্যাঙ্গারু, এমু, কোয়ালা, শজারু, ডলফিন ইত্যাদি।

সমাজের মুরব্বিয়ানায় মেয়েদের তেমন স্থান না থাকলেও নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলোতে তাদের অংশগ্রহণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঘরকন্না, সন্তান পালন এগুলো নিয়ে যথেষ্ট ব্যস্ত তো থাকতেই হয় তার ওপর দৈনন্দিন খাবার যোগাড়ে একটি বড় ভূমিকা তারা রাখে এবং তা পুরুষদের তুলনায় অনেক নীরবে, কম হৈচৈ

করে। বড়শি দিয়ে নিত্য যে মাছ তারা ধরে তা দৈনন্দিন খাবারের একটি বড় অংশ। এর জন্য প্রাথমিক কাজগুলোও তারাই করে— বড়শি তৈরি ও সুতা পাকানো। বড়শিওয়ালির দল বড়শি ফেলার আগে বেশ কয়েকদিন বাড়িতে বসে এগুলো করে। নতুন যারা করছে তাদেরকে এ নিয়ে শিখে হাত পাকাতে হয়। বড়শিওয়ালি অকাতরে সবাইকে শেখাবার চেষ্টা করে— কারণ সফল মাছ ধরাকে মেয়েদের ক্ষমতায়নের অংশ মনে করে সে। তাদের মূলমন্ত্র হলো স্বনির্ভরতা অর্জন— নিজেদের কজের কোন দিক নিয়ে যেন পুরুষদেরকে বাহাদুরি দেখাবার সুযোগ না দিতে হয়। মাছ ধরার নৌকাগুলো পুরুষরা তৈরি করছে করুক, এ নৌকা পুরুষরাও কম ব্যবহার করেনা। তবে বড়শির তৈরি থেকে ব্যবহারের সব কৌশলে মেয়েরা স্বনির্ভর অবশ্যই হবে।

খাঁড়ি এলাকা থেকে যুৎসই বড়বড় বেশ কিছু টারবান শাঁখ (শঙ্খ) আগেই যোগাড় করা থাকে। এই শাঁখ কেটে এর মাঝের অংশ থেকে ওরা বড়শি তৈরি তরে। একটি শাঁখ থেকে এক বা একাধিক ডিম্বাকার রিং আকৃতির অংশ কেটে নেয়া হয়, যাতে মাঝের ছিদ্রটি সরু পাথর দিয়ে ঘষে বেশ বড় বৃত্তাকার করে নেয়া হয়, আর ওপরের তলটি ঘষে ঘষে মসৃণ করা হয়। এবার রিং থেকে খানিকটা কেটে বাদ দিলে এটি হুকের আকার ধারণ করে। এর প্রান্তটি ঘষে ঘষে তীক্ষ্ণ করে বড়শির বিদ্ধ করার অংশ তৈরি হয়। অন্য প্রান্তে একটি গভীর দাগ কেটে নেয়া হয় যেখানে বড়শির সুতা আটকানো হবে। দেড় সেন্টিমিটার লম্বা ছোট বড়শি থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বড় বড়শি এ ভাবে তৈরি হয়। শাঁখের টুকরা দিয়ে বড়শি তৈরির সুবিধা হলো এতে মাছের জন্য কোন টোপ ব্যবহার করতে হয়না। টারবান শাঁখের ভেতরের তলটি অনেকটা মুক্তার মত চকচক করে যা মাছের জন্য মুখ দেবার একটি আকর্ষণ হিসেবে কাজ করে। সুতায় বাঁধা বড়শি পানিতে ফেলার সময় সুতার সঙ্গে একটি ছোট পাথর বেঁধে দেয়া হয় ডুবে থাকতে সাহায্য করার জন্য। তারপর ছোট চিংড়ি ইত্যাদি জলজ প্রাণী কাঁচা অবস্থায় মুখে ভাল করে চিবিয়ে মুখ থেকে থুতু ফেলার মত ঠিক ওখানটায় প্রানির ওপরিভাগে ছিটিয়ে দেয় মেয়েরা। এরই গন্ধে আশপাশ থেকে মাছ এদিকে এগিয়ে আসে। বোটানি বে'তে নানা রকম মাছ এভাবে বড়শিতে ওরা নিয়মিত ধরছে— স্ন্যাপার, সামুদ্রিক বাইন, ক্র্যা-ফিশ, মুলেট, ফ্ল্যাট-হেড, মেকেরিল, জেব্রা-ফিশ, জিউ-ফিশ— এরকম বেশ বড়, মাঝারি মাছ যেমন তেমনি মলা মাছের মত ছোট ছোট নানা মাছও।

নদীর তীরে পাথুরে প্ল্যাটফরম থেকে অথবা নদীর মাঝে বাকলের তৈরি সরু নৌকা থেকে বড়শি ফেলে এরকম যথেষ্ট মাছ নিয়ে ফেরে বড়শিওয়ালিরা। কয়লার আগুনে পুড়ে রোষ্ট করা এ মাছই তাদের এ সময়কার নিত্য দিনের খাওয়া। এই খাবারকে আরো সমৃদ্ধ করতে উদ্ভিজ্জ নানা খাদ্য সংগ্রহের কাজটিও মেয়েরাই প্রধানত করে। বাড়ির কাছের ঝোপঝাড়ে খোলা জায়গায় তারা খুঁজে

বেড়ায় খাওয়ার মত শিকড় ইত্যাদি— বিশেষ করে ইয়াম ও আলু জাতীয় কিছু পাওয়া যায় যা খুটির মত কাঠি দিয়ে মাটিতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওরা বের করে। তা ছাড়া খাবার মত শাকপাতা, মৌ-যুক্ত ফুল, আর বেরি জাতীয় ছোট ফলও প্রচুর পাওয়া যায়। এসব ওরা গাছের বাকলে তৈরি ঝুড়িতে করে নিয়ে আসে। ইয়াম সহ কিছু কিছু শিকড় জাতীয় খাদ্যকে ভিজিয়ে রেখে দুই পাথরের মাঝখানে পিষে এক রকম ময়দাও তৈরি করে। মাছের সঙ্গে এসব শর্করা খাবার ও সবজিতে ভাল পুষ্টির ব্যবস্থা হয়ে যায়— সবই মেয়েদের মাধ্যমে। এই সব কাজ করে পুরো পরিবারকে নিয়মিত খাওয়াতে মেয়েদের কোন ক্লান্তি নেই। তাদের আপত্তি শুধু পুরুষের কর্তৃত্ববাদিতায়— পুরুষরা সমালোচনা করে, কিন্তু সহানুভূতি দেখায়না; মনে করে সব সিদ্ধান্ত নেবার এখতিয়ার শুধু তাদের। এখন মেয়েরা ছেড়ে কথা বলছেনা, তাদের নায্য কথার সম্মান আদায় করে ছাড়ছে।

পুরুষরা অবশ্য শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ আর বাহাদুরি দেখানোর কাজ করেনা, বড় ধরনের শিকারের কাজটিও ভালই করে। মাছ শিকারেও তাদের চোখ বড় বড় মাছ আর অন্যান্য জলজ প্রাণীর দিকে, আর সে জন্য বর্শা বা হারপুনের ব্যবহারটি বেশ শক্তিমত্তার কাজই বটে। পশু-পাখি শিকারের জন্য তাদেরকে অনেক দূরে দূরে যেতে হয়, কখনো পরিবার নিয়ে দলেবলে, কখনো একা অন্যদের সঙ্গে। পশু শিকারেরও প্রধান অস্ত্র বর্শা— কাঠের ডান্ডার চোখা আগায় হাড়ের টুকরা ইত্যাদি লাগানো থাকে ইউকেলিপটাসের আঠা দিয়ে। এর মারাত্মক আঘাতে ছোট বড় নানা প্রাণী ঘায়েল করে ওরা— ক্যাঙ্গারু, ওয়ালাবি, পোসাম, উড়ন্ত কাঠবিড়ালি, ব্যান্ডিকুট, ওমবাট, ফলের বাদুড় (উড়ন্ত শেয়ালও বলা হয়) , সজারু, ইঁদুর, বিশাল এমু পাখি, হাঁস, কচ্ছপ, সাপ— এ সবই তাদের উপাদেয় খাদ্য। অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীটিকে কাছাকাছি পেলে পিটিয়ে মারার জন্য এক রকম গদার মত লাঠিও ব্যবহার করে ওরা, তাছাড়া পাথরের ধারালো কুড়াল দিয়েও সাবাড় করে এদের। আবার ছোট ছোট পাখি ও ছোট প্রাণীর জন্য ফাঁদ পাততেও ওস্তাদ এরা।

তবে এদের সব চেয়ে বৈশিষ্টময় অস্ত্র হলো বুমেরাং— বাঁকানো কাঠ দিয়ে ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের আকৃতির এই অস্ত্র দূর থেকে কায়দা করে ছুঁড়ে দিলে ঘুরতে ঘুরতে এমন ভাবে ছুটে যায় যে প্রাণীটিকে আঘাত করে আবার নিজের দিকেই ফেরত আসে। কোন কোন বুমেরাং অবশ্য আঘাত করে ফেরত আসার জন্য তৈরি হয়না। এগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট পশু, হাঁস ইত্যাদিকে আঘাত করে আহত করে, অনেক সময় বেহুঁশ নিশ্চল করে দেয়। যে ভাবেই শিকার করুক সব সময় মাছ আর জলজ প্রাণী খাওয়ার মধ্যে এ সব পশুপাখির মাংসের স্বাদ পেলে পরিবারের সবাই বেশ খুশিই হয়। বড়শি-ওয়ালির দলের মেয়েরা পুরুষদের বাড়াবাড়ি রকমের আস্ফালনে বিরক্ত হলেও এই শিকারের পর্বটি অবশ্য খুব অপছন্দ করেনা।

একটি কথা খুব স্পষ্ট বোটানি বে'র মানুষরা কোন রকমের কোন চাষবাস করার ধার ধারেনা। অন্যদিকে শিকার ও সংগ্রামের পেছনে দিন রাত ঘুরে বেড়াতে তাদের কোন ক্লান্তি নেই। তাই উৎসবাদি, ভোজ, বিয়ে, অন্ত্যেষ্ঠি ইত্যাদি ছাড়া মেয়েদের অন্তত আর কোন অবকাশ নেই। পুরুষরা অবশ্য মারামারি ও যুদ্ধের সময় পায়। এর মধ্যে কেউ কেউ পাথরে ছবি মধ্যে অন্যের প্রতি তুকতাক জাদু-টোনা করে। যেমন পাথরের ওপর হাত রেখে তার ওপর মুখ থেকে রঙ কুলি করে এর ওপর ফেলে হাতের ছাপ নেয়— এ রকম অসংখ্য ছাপ। এগুলোর নানা মানে তারা করে। ওই যে মেয়েদের ওপর নানা রকম অপমানকর বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেয় সেগুলোও এরকম জাদু-টোনার অংশ যার সব কিছু ওরা কড়াকড়ি ভাবে মানে।

চাষবাস না করলেও একটি আয়োজন তারা করে তা হলো বাড়ির কাছে খোলা জায়গায় ক্রমাগত বিস্তৃত তৃণভূমিতে ও ঝোপঝাড়ে কিছুদিন পর পর আগুন লাগিয়ে দেয়। এটি তারা কয়েকটি কারণে করে। এসব জায়গায় ওপোসাম, উড়ন্ত কাঠবিড়ালি, ইঁদুর প্রভৃতি যে সব ছোট ছোট শিকারের পশু লুকিয়ে থাকে তাদেরকে শিকার করতে সুবিধা হয়ে যায় এতে। একই ভাবে অপ্রয়োজনীয় ঝোপঝাড়গুলো পুড়ে জায়গাটি উন্মুক্ত হয়ে গেলে ওসব ঝোপের নিচে মাটিতে যে সব শিকড় খাদ্য জন্মে নির্বিঘ্নে ওখানে গিয়ে তা খুঁড়ে তোলা সম্ভব হয়। এই সুবিধাটি শীতকালে বেশি প্রয়োজন হয় কারণ ওই সময় অন্য রকম খাবারে টান পড়াতে এই শিকড় জাতীয় খাদ্যের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়। আর একটি সুবিধা হয় অপ্রয়োজনীয় ঝোপঝাড় পুড়ে গেলে এবং তার ছাই মাটিকে উর্বর করলে ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি প্রাণী যে পুষ্ট ঘাস খেয়ে চরেবরে বাড়তে পারে সেগুলোর বৃদ্ধিতে সুবিধা হয়ে যায়। পরের মৌসুমে তাই এমন শিকার-প্রাণীর প্রাচুর্য ঘটে। আর একটি খুব সাধারণ লাভ যা হয় তা হলো জায়গাগুলো উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় এর মধ্য দিয়ে তাদের যাতায়ত সহজ হয়ে যায়। এই জায়গা দিয়েই তাদেরকে প্রায়ই চলাচল করতে হয়— মাছ ধরতে যেতে, দূরে শিকার করতে যেতে, অথবা রসদ যোগাড় করতে যেতে।

বোটানি বে'র মানুষরা প্রকৃতিতে প্রায় সব রকম জিনিসকে তাদের হাতিয়ার আর সামগ্রীর জন্য সুকৌশলে কাজে লাগায়। কাঠ আর পাথরই ওদের হাতিয়ারের প্রধান কাঁচামাল হলেও বাকল, বেত, উদ্ভিজ আঁশ, হাড়, শাঁখ বা শামুক-ঝিনুকের খোলস, পশু চামড়া, পশুর রগ— এদের কোন কিছুই তারা ব্যবহারে বাদ দেয়না। যেখানেই তারা থাকে সেখানেই এসব সামগ্রী আর হাতিয়ারের পরিত্যক্ত অংশের একটি আবর্জনা স্তুপ তারা সৃষ্টি করে। স্থায়ী ভাবে সাগর ধারে থাকে বলে এই স্তুপগুলো ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে জমে উঠতে পারছে। আর শামুক-ঝিনুক প্রভৃতি খোলসওয়ালা খাবার প্রচুর খায় বলেও ওই খোলসের আবর্জনা জমতে পারছে বেশি। বোটানি বে' এলাকার পুরুষরা সুযোগ পেলেই শিকারের খোঁজে এদিক

ওদিক চলে যেতে চায়। তাদেরকে অধিকাংশ সময়ে ওই স্থায়ী আবাসে রেখে দিয়েছে সাগরের টান। আর যতই তাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করুক তাদেরকে ওখানে স্থায়ী নোঙর দিয়েছে পরিবারের মেয়েরা। এই মেয়েরা চিরকাল তাদেরকে দৈনন্দিন খাবার যুগিয়েছে। এখন বড়শিওয়ালির মত ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা তাদেরকে চিন্তার খোরাকও যোগাচ্ছে।

* * *

অস্ট্রেলিয়ায় হোমো সেপিয়েন্স মানুষ প্রথম ঠিক কখন গিয়ে পৌঁছেছিল এ নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও ৫০ হাজার থেকে ৪৫ হাজার বছর আগের সময় যে ওখানে মানব বসত ছিল তা নিঃসন্দেহ। অনেকের মতে ব্যাপারটি ঘটেছিলো আরো আগে এখন থেকে ৬০-৭০ হাজার বছর আগে। তার আদি বসত আফ্রিকা থেকে কিছু কিছু মানুষের বের হবার পর মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতের দক্ষিণের উপকূল বরাবর অনুসরণ করে মানুষ ভারতে এবং কিছু পরে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছতে বেশি সময় লাগায়নি। আফ্রিকার, ভারতের এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দিকের আদি মানুষের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক ভাবে অনেক মিলও খুঁজে পাওয়া গেছে।

অন্তত ৫০ হাজার বছরের ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার আদি মানুষ জীবন-জীবিকা, হাতিয়ার তৈরি, শিল্পকর্ম, সমাজ গঠন ইত্যাদিতে ক্রম উন্নতি দেখালেও অন্যান্য অনেক জায়গার তুলনায় তাতে খুব বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলো তেমন আসেনি। যেমন তারা শেষ পর্যন্ত শিকারি-সংগ্রাহকই থেকে গেছে, কৃষি ও চাষবাসে অভ্যস্ত হয়নি, বড় শহর-নগরও গড়ে তোলেনি। অবশেষে ১৭৭০ সালে উন্নত জগতের প্রথম অভিযাত্রী হিসেবে বৃটিশ ক্যাপ্টেন কুক তাঁর জাহাজ নিয়ে যখন অস্ট্রেলিয়ার ওই বোটানি বে'তে হাজির হলেন তিনি ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা এখানকার মানুষকে ওই শিকারি-সংগ্রাহক অবস্থাতেই দেখতে পেয়েছেন। এরপর অবশ্য ওই আদিবাসীদের নিজস্ব জীবনযাত্রা ভীষণ ভাবে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের পর এই পরাশক্তির জোর জবরদস্তিতে এবং তাদের দ্বারা বাহিত নতুন প্রতিরোধহীন অসুখে ভুগে তাদের অধিকাংশ মরে গেছে, বেঁচে যারা আছে তারা নানা সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত অস্বাভাবিকতায় ভুগেছে, এখনো ভুগ্ছে।

এ কাহিনীতে আমরা বোটানি বে'র মানুষদের যে সময়ের কথা বলেছি সেই পাঁচশত বছর আগেও ওরা নিজেদের মধ্যে নিজেরা দিব্যি নিরুদ্বেগেই ছিল। তখনকার অবস্থা অবশ্য প্রথম ইউরোপীয় ঔপনেবেশিকরা এসে দেখা অবস্থা থেকে যে খুব বেশি ভিন্ন তা নয়। তাই এর কিছু কিছু প্রথম আসা অভিযাত্রীদের বর্ণনার সঙ্গে মেলে— বিশেষ করে বোটানি বে' বা সিডনি অঞ্চলের আদিবাসী মানুষদের সামাজিক গঠন, গোত্র বিভক্তি, জীবন-জীবিকার অভ্যাস ইত্যাদি নিয়ে। তবে অধিকাংশ তথ্য আমরা ব্যবহার করেছি তারও কয়েক শ' বছর আগের সময় থেকে পাওয়া নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে।

ইউরোপীয়রা আসার পর থেকে শুরু করে আজ অবধি এ এলাকার আদি বসতিগুলোর ওপর প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ হয়েছে। ১৯৬০ থেকে শুধু সিডনি অঞ্চলেই ৩৫০টি আলাদা জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ করা হয়েছে— যা এখন রয়্যাল ন্যাশনাল পার্কের অন্তর্ভূক্ত। এখানে অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে নানা বসতির নিদর্শন

পাওয়া গেছে যার মধ্যে আমাদের কথিত কাহিনীর সময়টুকুও অন্তর্ভুক্ত। এই পুরো সময়ে এখানকার জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ ইত্যাদিতে চমৎকার ধারাবাহিকতা দেখা গেছে। বসতগুলো চিহ্নিত করা এবং এতে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো পাওয়ার একটি প্রধান উপায় হলো সেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে হাজার হাজার বছর ধরে জমা হওয়া আবর্জনা স্তুপগুলো (মিডেন) পরীক্ষা করা। কোন কোন জায়গায় এগুলো এত বড় স্তুপ যে তা ছোটখাট টিলা পাহাড়ের রূপ নিয়েছে। সমুদ্রের ধারের বসতগুলোতে এখানে আবর্জনার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে খাওয়ার পর ফেলে দেয়া শামুক-ঝিনুকের খোলস। পরিমাণের দিক থেকে তার পরেই রয়েছে পাথরের নানা হাতিয়ার ও তার ভগ্নাংশ, মাছের কাঁটা, পশু-পাখির হাড়, এবং যে সব শক্ত উদ্ভিজ্জ বেশ কিছু পচে গিয়ে দৈবাৎ সংরক্ষিত। বেশির ভাগ স্তুপ পাওয়া গেছে সমুদ্রের কাছে বা কিছু দূরে পাথুরে আশ্রয়ের কাছে, গুহার কাছে অথবা নদীর ধারে। এসব নিদর্শন থেকে বসতের সঙ্গের হাতিয়ার, অস্ত্র, সামগ্রী, মানুষের খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন জানা গেছে তেমনি পাওয়া গেছে ওখানকার জনসংখ্যা, জীবিকার উপায় ইত্যাদির আন্দাজ।

ওই সব প্রায় স্থায়ী পাথুরে আশ্রয় বা গুহার বসতগুলোতে আবর্জনা স্তুপগুলো বিশাল হওয়াতে সেগুলো পেতে যেমন অসুবিধা হয়নি তেমনি আবার খোলা জায়গার অস্থায়ী কুটিরগুলোর সঙ্গের আবর্জনা স্তুপকে পেতে খুব বেগ পেতে হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো ছোট এবং পরে মাটিতে ও ঘাসে ঢেকে গিয়েছে। কিন্তু এদের উদ্ঘাটন করে এর থেকেও মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে— স্থায়ী আবাস থেকে দূরে ঘুরে বেড়াবার সময় তারা কী সঙ্গে নিতো, এক জায়গায় কত দিন থাকতো, কত জন থাকতো, কী করতো ইত্যাদি। তাছাড়া কোন মৌসুমে ওখানে ওরা প্রতি বছর যেতো তাও আবর্জনার স্তুপগুলো পরীক্ষা করে জানা গেছে। একই ভাবে আবার প্রচুর সংখ্যক মানুষের জমায়েত হবার এবং রাত কাটাবার, ভোজ খাওয়ার, উৎসব করার নিদর্শনগুলোও আলাদা ভাবে পাওয়া গেছে। এভাবে আমরা জানতে পেরেছি ছোট দলে বাস করলেও একই সমাজ ভুক্ত হওয়াতে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ এসে কেমন করে বড় ভোজে ও উৎসবে একত্রিত হতো।

বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের বহু আগে এখানকার মানুষের সম্পর্কে জানার আর একটি উপায় হলো এদের গুহা-চিত্রগুলো। তাদের জীবনযাত্রার বিষয়ে জানানো ছাড়াও এসব কোন কোন পাথরে খোদাই করা চিত্রে নানা সমাজ কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে খুবই সরল আঁচড়ে। এতে এদের বীরত্ব প্রকাশ, পূর্বপুরুষ নিয়ে বড়াই ইত্যাদিও ধরা পড়ে।

সত্যিসত্যি ওদের সমাজ, গোত্র, সামাজিক সম্পর্ক, নারী-পুরুষ সম্পর্ক ইত্যাদি বোঝার জন্য এবং তাদের হাতিয়ার, অস্ত্র, সামগ্রী, জীবনযাত্রার প্রকৃত নমুনা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রথম ইউরোপীয় আগন্তকদের বর্ণনা ও উপকরণ সংগ্রহের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ওদের জীবনের ধারাবাহিকতা থেকে মনে করার কারণ আছে যে পাঁচশত বছর আগের সময়ের সঙ্গে প্রথম ইউরোপীয় আগন্তকদের দেখা সময়ের অবস্থার খুব পরিবর্তন হয়নি। আদিবাসীদের নিয়ে প্রথম ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সামাজিক গবেষণার নানা বর্ণনা থেকে জীবনযাত্রা ও সমাজ সম্পর্কে কিছু ধারণা পাই। পুরুষ-তান্ত্রিকতা, পুরুষের কলহপ্রীতি, মেয়েদের ভূমিকা ইত্যাদিও এভাবে জানা গেছে।

উদাহরণ স্বরূপ আমাদের কাহিনীতে বড়শিওয়ালি ও তার সঙ্গীনীরা কিভাবে টারবান শাঁখ কেটে বড়শি তৈরি করেছে তার পদ্ধতির হদিশ আমরা পেয়েছি মিউজিয়ামে

সংরক্ষিত বড়শি বানাবার বিভিন্ন পর্যায়ের কাটা ও ঘষা শাঁখের অংশ থেকে। পর পর বিভিন্ন পর্যায়ের সত্যিকার নিদর্শন কৌতুহলী নৃতত্ত্ববিদরা এভাবে সংগ্রহ করে রেখেছেন বলেই এটি সম্ভব হয়েছে। অন্য দিকে পুরুষরা বীরদর্পে গাছের বাকলের তৈরি যে ঢাল ব্যবহার করতো তার একটি সুন্দর নিদর্শন বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে যা ক্যাপ্টেন কুক তাঁর সেই প্রথম এখানে এসে অবতরণের দিনেই সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর এবং তাঁর একজন সঙ্গীর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে ওই দিন তিনি যখন জাহাজ থেকে নৌকায় করে তীরে এসে উঠছিলেন তখন সমবেত অনেক আদিবাসী ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু শুধু দু'জন মানুষ শেষ পর্যন্ত মারমুখী হয়ে তাঁদেরকে বাধা দেবার অঙ্গভঙ্গি করছিলো। ওদের একজন এই ঢালটি নিয়ে খুব নর্তন কুর্দন করছিলো। তাদেরকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য প্রথমে বন্দুকের ফাঁকা শব্দ ও পরে ছররা গুলি ছুঁড়লে আহত হয়ে এরাও পালিয়ে যায় এবং ওসময় ঢালটি ফেলে যায়। বেশ শক্ত সমর্থ এই ঢালের মাঝখানে বর্শার আঘাতের একটি ছিদ্র ছিল। এটিই ক্যাপ্টেন কুক পরে ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে বৃটিশ মিউজিয়ামে দেন, যা আজ যে কেউ দেখতে পারে।

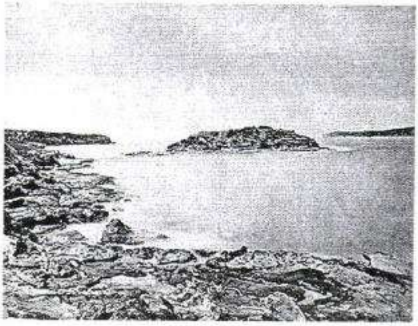

সেদিনের বোটানি বে'র সম্ভাব্য দৃশ্য

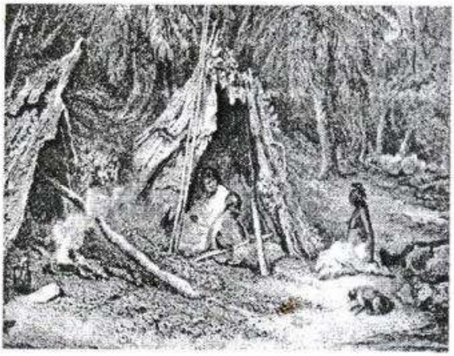

অস্থায়ী সম্ভাব্য আবাস

গাছের বাকলে তৈরি ঢাল
(বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত)

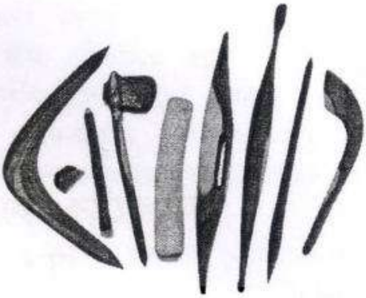

নানা অস্ত্র

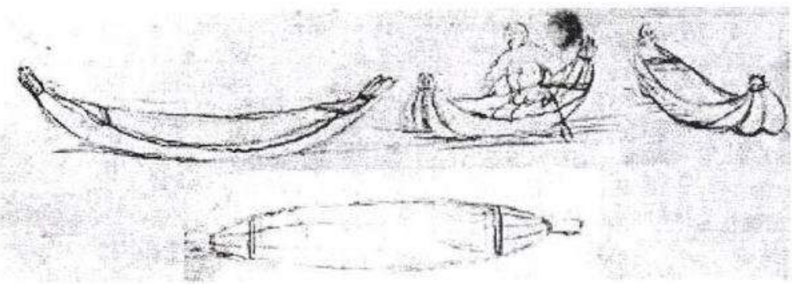

গাছের বাকলে তৈরি নৌকা

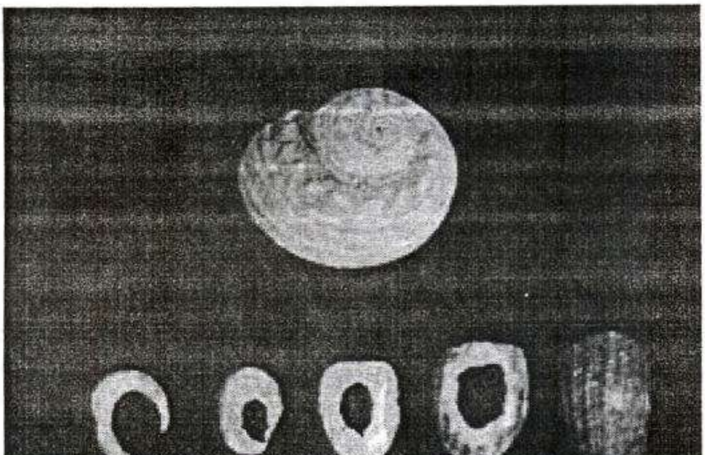

উপরেঃ টারবান শাঁখ যার থেকে বড়শি তৈরি হতো
নিচেঃ ডান দিক থেকে বড়শি তৈরির নানা পর্যায়

যুক্তরাষ্ট্রের কোলিংটনের কর্ত্রী-মা ঃ
পাঁচশত বছর আগে

আমেরিকার আদি বাসিন্দাদের একটি গ্রাম। চাষবাস ও শিকার-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকলেও তাদের সব কিছু ঘটছে এক আধ্যাত্মিক ধর্ম চেতনায়—যেখানে নিজভূমিই সব, কারণ এটি তাদের পূর্বপুরুষের অস্থি ধারণ করছে। প্রত্যেক বৃহত্তর পরিবারের মাথা হচ্ছেন একজন নারী-কারণ এটি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। এমনি একজন হলেন কর্ত্রী-মা। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে ভূমির কাজগুলো করছে মেয়েরা, আর পুরুষরা শিকার করা ছাড়াও ভূমি রক্ষায় হরদম যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিকের সমুদ্র তীরের একটি গ্রাম কোলিংটন; পাঁচশত বছর আগের সময়ের কথা বলছি— এখনো পুরো মহাদেশটিই আদিবাসীদের মহাদেশ, প্রথম ইউরোপীয়ানরা এর তীরে এসে দেখা দিতে এখনো শ'খানেক বছর বাকি। গ্রামটি বড়সড় কিছু নয়— ৪০/৫০টি পরিবারের বাস। কিন্তু এ গ্রাম বিচ্ছিন্ন বা একা কিছু নয়, কাছাকাছি দূরত্বে রয়েছে এরকম ছোট বড় আরো গ্রাম। তবে এই বিশেষ গ্রামটির বৈশিষ্ট হলো এখানে থাকেন এই পুরো এলাকার যিনি গোত্র-প্রধান সেই মুখ্য ব্যক্তিটি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ক্ষমতাশালী অন্যান্য কয়েকজন। সেদিক থেকে এই গ্রামকে অনেকটা রাজধানী গ্রাম এবং অন্যান্যগুলোকে সাধারণ গ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণ গ্রামগুলো অধিকাংশের সীমানা চিহ্ন বলতে তেমন কিছু নেই। কিন্তু এই গ্রামটিতে একই রকম ফুট খানেক ব্যাসের গাছের গুড়ি পাশাপাশি পরস্পর ঘেঁষা অবস্থায় গেড়ে গ্রামের চারিদিকে এক রকম সীমানা প্রাচীর তৈরি করা আছে। এটি এখানকার মান্যগণ্য মানুষদের নিরাপত্তার জন্যও বটে, আবার তাদের সম্মানের জন্য ও বটে।

গোত্রপতি নিঃসন্দেহে গ্রামে এবং পুরো গোত্রে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কিন্তু আমাদের আলোচনায় মুখ্য ব্যক্তিত্বটি কিন্তু তিনি নন, বরং গ্রামে একটি বড় পরিবারের মধ্যমণিই আমাদের মুখ্য ব্যক্তিত্ব যাঁকে এই পরিবারের সবাই কর্ত্রী-মা বলে ডাকে, প্রতিবেশী অন্যান্যরাও তাই ডাকে। তাঁর গুরুত্বের কারণ হলো

কোলিংটন সংস্কৃতির যে গোত্র তাতে এবং এরকম আরো অনেক গোত্রে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সমাজ। কর্ত্রী-মা তাঁর পরিবারের প্রধান— আর মূল পরিবারটিও তাঁর মেয়ে, ছেলে, নাতি, নাতনি ওদের দিয়েই প্রধানত গঠিত। জীবদ্দশায় তাঁর স্বামী যেমন ছিলেন, তেমনি মেয়ে-জামাই, নাত-জামাই সব অন্য পরিবার থেকে এই পরিবারে এসেছে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। পরিবারের প্রায় সব কিছুতেই ষাটোর্ধ এই মহিলার কর্তৃত্ব প্রায় চূড়ান্ত।

এর মানে এই নয় যে কোলিংটন সংস্কৃতি বা তার অনুসারী বৃহত্তর চেরোকি ইত্যাদি কয়েকটি জাতির মাতৃতান্ত্রিকতা নারীদের ওপর সব রকম দায়িত্বের বোঝা চাপায়। তা কিন্তু মোটেই নয়। এখানে নারীরা সব কাজকর্মে নিজেদের বড় ভূমিকা গড়ে তুলেছে কারণ তারা নিজেদের অবদানকে পুরুষদের থেকে বিন্দুমাত্র কম বলে মনে করেনা। পরিবারের আবাসটিকে সব দিক থেকে সমৃদ্ধ করে রাখাই হলো তাদের কাজ। আর এ ক্ষেত্রে ওই মাতৃতান্ত্রিকতাটি তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে। তারা মনে করে নারী হলো পরিবারের মেরুদণ্ড, আর পরিবারের গঠনটি খাড়া আছে এই মেরুদণ্ডের ওপর। প্রত্যেকটি মানুষের পরিচয় হলো প্রথমে তার পরিবার, তারপর তার গোত্র— উভয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নারীর পরম্পরায়ে— মা, নানী, নানীর মা, এমনিভাবে। শুধু কোলিংটনের মানুষ নয় উত্তর আমেরিকার প্রায় সব আদিবাসীর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবার, গোত্র, গোত্রপতি, গোত্রের পুরোহিত, আপন পূর্বপুরুষ— এমন সবার আত্মা আর পশু-পাখির আত্মার সঙ্গে মেশানো প্রকৃতির সঙ্গে জটিল বন্ধনে থাকা তাদের ধর্ম। তাদের জন্য এই ধর্মই জীবনের সারাংশ। এই সারাংশের একটি মূল সূত্র হিসেবেই কর্ত্রী-মার এত গুরুত্ব।

পুরুষ ও নারী যার যার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিচ্ছে। নারী আবাসকে সজীব রাখছে, পবিত্র রাখছে, ওই ধর্মীয় আচরণের অংশ হিসেবেই পরিবেশকে যত্ন দিয়ে। বাড়ির চুলাটি, এর চারিদিকে সংগৃহীত শস্য, বীজ, মূল, ফল, বাদাম সবই পবিত্র। এসবের যোগান দেয়ার দায়িত্ব নারীর। দুই ভাবে তারা সে দায়িত্ব পালন করে— কৃষিখেতে ভুট্টা, শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া এগুলো ফলিয়ে; এবং বন থেকে ফলমূল, বাদাম ইত্যাদি সংগ্রহ করে এনে। মাতৃত্বের মায়া দিয়ে পরিবারে ও গোত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কাজ তাদের এই সব বৈষয়িক কাজের সঙ্গে একাকার হয়ে আছে। অন্য দিকে পুরুষরা একেবারে অন্য ভাবে সংসারে অবদান রাখে। তারা মূলত শিকারি আর যোদ্ধা। শিকারের কাজে ওরা গ্রাম থেকে দূরে দূরান্তে চলে যায় প্রায়ই— তীর-ধনুক আর বর্শা হাতে শিকার করে, অস্থায়ী আবাসে রাত কাটায়; তারপর গ্রামে ফিরে আসে হরিণ, ভালুক, র‍্যাকুন, খরগোস, টার্কি ইত্যাদির দেহ সঙ্গে নিয়ে। কখনো কখনো ওরা নদীতে ও হ্রদে মাছ ধরে, শুধু মাছ নয় অন্যান্য জলজ প্রাণী বিশেষ করে কাছিমও ধরে। প্রায় একই রকম অস্ত্র ও হাতিয়ার নিয়ে পুরুষরা অন্য শত্রু গোত্রের মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এ রকম যুদ্ধে প্রায়ই ছোট বড় নানা আকারে চলতেই থাকে। যে সব জিনিসকে ওরা খুবই জরুরী মনে করে সেই

ভূমি, আবাস, শিকারের এলাকা ইত্যাদি নিয়েই প্রধানত সংঘাতের সৃষ্টি হয়। বলা যায় নারীরা ও পুরুষরা যা করছে তা একই মুদ্রার দুই বিপরীত পিঠ। উভয়ে নিজের মত করে পরিবার ও গোত্রের ধারাবাহিকতার জন্য কাজ করছে যা তাদেরকে নিজেদের সুদূর পূর্বপুরুষের সঙ্গে যুক্ত করে।

এ সবের মধ্যে কর্ত্রী-মা'র বিশেষ ভূমিকাটি কী? যেই মাতৃতান্ত্রিকতার মাধ্যমে এখানকার সবাই পূর্বপুরুষ ও গোত্র নিয়ে বড়াই করে সেটিকে ধরে রেখেছে কর্ত্রী-মা'র মত বয়োজৈষ্ঠরাই। নারীর ও পুরুষের এই যে ভিন্ন রকম অবদান, তার প্রত্যেকটির ওপর শেষ কথাটি তাঁরই, অন্তত পরিবারের ভেতর। পরিবারের জামাই হিসেবে বাইরের কোন্ পুরুষকে গ্রহণ করা হবে, কী ভাবে তাকে পরিবারের অংশ করে নেয়া হবে এ সবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁরই। শুধু তাই নয় পরিবারের সকল বৈশিষ্ট সৃষ্টিতে, এবং এর মানুষগুলোর ব্যক্তিত্বের ওপর তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের একটি বড় ছাপ থাকে। বিশেষ করে পরিবারের সব বয়সী নারীদের কাজকর্মের ওপর সব সময় তাঁর সজাগ দৃষ্টি— সেটি গৃহকর্মেই হোক, চাষবাসে হোক কিংবা ফল-মূল সংগ্রহেই হোক। তাঁকে ঘিরেই যেমন এসব বিষয়ে শলাপরামর্শ হয়, তেমনি আবার তাঁকে ঘিরেই মেয়েদের আড্ডা সব সময় জমে ওঠে। পুরুষরা প্রায়ই কাজ উপলক্ষে বাড়ি থেকে দূরে থাকে বলে ওরা এসব শলাপরামর্শ বা আড্ডায় ওভাবে অংশ নিতে পারেনা, কিন্তু তাদেরও অকৃত্রিম ভক্তি কর্ত্রী-মা'র ওপর। শিকার এবং যুদ্ধ বিগ্রহের পর সব কিছু তাঁকে জানানো ও তাঁর থেকে পরামর্শ নেয়া ওরা খুব জরুরী মনে করে। কর্ত্রী-মার বয়স হয়েছে। আগের মত সব কথা মনে রাখতে পারেন না। কিন্তু তাঁর একটুখানি কথা, একটু খানি ছোঁয়া এখনো তরুণতর সবার জন্য খুবই কাম্য। পরিবারের সবার মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখার কাজটিও তিনিই প্রধানত করেন।

পাশাপাশি যে কয়েকটা বাড়ির বাসিন্দাদের ওপর কর্ত্রী-মার এই কর্তৃত্ব সেগুলো দেখতে কী রকম? এখানকার বাড়িগুলো কাঠের থামের চারিদিকে গাছের বাকলে তৈরি, ওপরে ঘাস পাতার ছাউনি। বেশির ভাগ গ্রামের মত এ গ্রামটিও নদীর ধারে, অথবা নিচু জলাভূমির কাছে তৈরি। তাই কোন কোন বাড়িকে মাটি থেকে একটু উঁচু মাচানের মত তৈরি করতে হয়। আবার একটু উঁচু জায়গায় কিছু কিছু বাড়ি মাটি দিয়ে তৈরি। এগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট, তেমন কোন জানালাও এতে নেই। মাটির এ বাড়িগুলো শুধু শীতের সময় ব্যবহৃত হয়। গাছের বাকলের দেয়াল দেয়া বড় বড় বাড়িগুলোই পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবাস। বাড়ির মেঝটি মাটির হলেও তার ওপর খড় বিছিয়ে অথবা খড়ের তৈরি মাদুর বিছিয়ে বেশ আরামদায়ক করে তোলা হয়েছে।

আসবাবপত্র ও তৈজস বেশির ভাগ কাঠের অথবা পাথরের। অবশ্য এর কিছু কিছু হাড়ের ও হরিণের শিঙের তৈরি। ঘটি-বাটি-পাত্র ইত্যাদি বেশির ভাগই মাটির পটারি। সবই সাদামাটা পটারি, তবে কোন কোনটার ওপর আঁশ বা দড়ির

ছাপ দিয়ে এক রকম অলঙ্করণ রয়েছে। পুরো গোত্রের পটারিতে এক রকম বৈশিষ্ট আছে বৈকি। মজার ব্যাপার হলো অনেকগুলো পটারির তলাটি গোল নয় বরং ক্রমে নিচের দিকে সরু— বসাতে হলে ছাই ইত্যাদির মধ্যে গুঁজে রাখতে হয়।

হাতিয়ার, তৈজস, অস্ত্র যা কিছুই বলি এই উদ্ভিজ, প্রাণিজ, পাথুরে আর পোড়ামাটির সামগ্রী শুধু ভরসা। সরাসরি ধাতু হিসেবেই ভূমিতে পাওয়া যায় এমন কিছু খুব ছোট ছোট পুঁতির মত দলা ছাড়া কোন ধাতব দ্রব্যের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। তাই যে তীরের ওপর শিকার, যুদ্ধ সব কিছু অনেকটা নির্ভর করছে তার আগাটি তীক্ষ্ণ করে নেয়া পাথরে তৈরি। ছুরি, কুড়াল, কোরানি সবই পাথরকে নানা আকৃতি দিয়ে তৈরি। চাষের খেতের শাবল, কোদাল ইত্যাদিও কাঠের সঙ্গে পাথরের সমন্বয়ে গড়া। ওদিকে শস্য মাড়াই, পেষা ইত্যাদিও ভারি পাথরের যাঁতা, হামানদিস্তা দিয়েই করা হয়। হাড়ের ব্যবহার বেশি হচ্ছে মাছ ধরার বড়শি, সেলাইয়ের সুচ, ছিদ্র করার তুরপুন হিসেবেই বেশি। কাঠের ব্যবহার অসংখ্য— নানা হাতিয়ারে হাতল হিসেবে তো বটেই, আবার নিজেই বর্শা, চাষের হাতিয়ার, মাটি খুঁড়ে শিকড় তোলার চোখা কাঠি, ইত্যাদিতে সরাসরিও বটে। অন্যান্য কাজে বেতের ও আঁশের নানা ব্যবহার রয়েছে ঝুড়ি, দড়ি, মাদুর ইত্যাদি।

গ্রামটিতে নানা পারিবারিক বাড়ি ছাড়া কিছু বড় আকারের বাড়ি আছে যেগুলো আসলে এক একটি মিলনায়তন। শুধু তাই নয় গ্রামের মাঝখানে একটি জায়গা মাটি ফেলে ডিবির মত উঁচু করে তার ওপর তৈরি হয়েছে আরো একটি সার্বজনীন বাড়ি, যেটি আসলে একটি মন্দির। গ্রামের জন্য তো বটেই সমগ্র গোত্রের জন্য গোত্রীয় ধর্মটি খুবই বড় জিনিস। ওই মিলনায়তনে একত্রিত হয়ে তারা গোত্রপতি ও পুরোহিতের বয়ান শোনে, তাদের সঙ্গে নানা আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। আর ওই মন্দির হলো তাদের পূর্বপুরুষের আত্মার আবাস। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো অবশ্য তাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। যেমন ধরা যাক 'সবুজ ভুট্টা অনুষ্ঠানের' কথা। এটি আসলে এক ধরনের নবান্নের অনুষ্ঠান— গ্রীষ্মের শেষ দিকে ভুট্টা যখন পাকে তখন এর আয়োজন হয়। এর সঙ্গে চলে একটি শুদ্ধতার অভিযান— ওরা তখন নিজেদের আত্মার শুদ্ধির জন্য ধ্যান, উপবাস, গোসল, ইত্যাদিতে কাটায়; নিজের কৃতকর্মের জন্য অন্যদের কাছে ক্ষমা চায় এবং একই সঙ্গে পরিবেশের শুদ্ধির জন্য কর্মযজ্ঞ শুরু করে। এসময় ওরা নিজ নিজ বাড়ি ও তার আশপাশ পরিস্কার করে, সবাই মিলে আবার মিলনায়তনগুলোও পরিস্কার করে। বাড়িতে নিত্য জ্বলতে থাকা পুরানো আগুন নিভিয়ে ফেলে, আর একটি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন আগুন জ্বালাবার আয়োজন করে। এমনি সব আচারের মধ্য দিয়েই ধর্ম ও জীবন একাকার হয়ে আছে ওদের জীবনে। পারিবারিক পর্যায়ে এসব যখন হয় তখন আমাদের পরিবারটির সব সদস্যের কাজ হয় কর্ত্রী-মাকে প্রথমে সম্ভাষণ জানিয়ে আসা, এবং তাঁকে ঘিরে বসে আত্মশুদ্ধির শ্লোক আওড়ানো। তিনি সেদিন সবাইকে আশীর্বাদ করে দেন।

তবে সাধারণ শাসন ব্যবস্থার এবং পারলৌকিক কাজের নেতৃত্ব উভয় দায়িত্ব মূলত বর্তায় গোত্রপতির ওপর, যিনি তাঁর বেশ কিছু অভিজাত পারিষদ ও পুরোহিতের সঙ্গে মিলে এই দায়িত্ব পালন করেন। গোত্রপতির ক্ষমতা অনেক, কিন্তু এসব সমাজে গোত্রপতি তাঁর ক্ষমতা রাজার মত বা অন্য কোন ধরনের একনায়কের মত প্রয়োগ করেন না— অনেকটা দার্শনিকের মত প্রয়োগ করেন, অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে। গোত্রপতির পদটি অবশ্য বংশানুক্রমিক, অন্যান্য অভিজাতদের ক্ষেত্রেও বংশানুক্রমিক। তাঁরা নেতৃত্ব দেন বটে কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে রাখেননা। কৃষি, শিকার, সামাজিক কাজ, আচার-অনুষ্ঠান এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ— সব বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলো ওভাবে পরামর্শের মাধ্যমেই নেয়া হয়। ওই যে বড় মিলনায়তন সেখানে অনেক মানুষ একত্রিত হয় এভাবে পরামর্শ গ্রহণের ও পরামর্শ দেবার আয়োজন করে।

একই মুখের ভাষা, একই সংস্কৃতি এবং মোটামুটি একই এলাকা জুড়ে থাকা বেশ কিছু দলবদ্ধ মানুষের সমন্বয়েই এক একটি বড় গোত্র, মহাগোত্র, বা 'জাতি' এখানে গড়ে উঠেছে— এক্ষেত্রে যেমন চেরোকি। ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভূমি। নিজেদের ভূমিকে ওরা বিশেষ পবিত্র মনে করে এবং এদিক থেকে নিজেদেরকে ভূমিপুত্র বলে মনে করে। এটি শুধু এই ভূমি তাদের জীবন-জীবিকার জন্য অপরিহার্য বলে নয়, এই ভূমি তাদের পূর্ব-পুরুষদের অস্থি ধারণ করছে বলেও। এদিক থেকে এখানকার কবর দেয়ার পদ্ধতিটিও লক্ষনীয়। এখানে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদা একটি কবর করার পরিবর্তে ওরা মানুষের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াটি দুই পর্বে সারে। প্রথমত মৃতদেহকে কফিনের মধ্যে বন্ধ করে মন্দিরে সংরক্ষণ করে। দীর্ঘদিন পর যখন মৃতদেহের হাড় শুধু অবশিষ্ট থাকে তখন এরকম বেশ কিছু কফিনের হাড় এক সঙ্গে করে একটি গণকবরে কবর দেয়। গোত্রের পুরো এলাকার বিভিন্ন স্থান এভাবে অস্থি ধারণ করে তাদের জন্য পবিত্র ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

কোলিংটন সংস্কৃতি বা বৃহত্তর চেরোকি সংস্কৃতিতে ধর্ম চিন্তায় ও আচারে ভূমি যেমন একটি বড় ভূমিকা পালন করছে, তেমনি পুরো পরিবেশটাও তা করছে। আকাশের ঈগল থেকে শুরু করে বনের হরিণ, মাটিতে সাপ পর্যন্ত সবকিছুর একটি গুরুত্ব সেখানে আছে। শুধু কি তাই— আগুন, ধোঁয়া, নদী, পাহাড়, ধর্ম আচারে বার বার এমনি সব প্রাকৃতিক জিনিসের নাম আসে। এসব এমন ভাবে আসে যেন সব কিছু মধ্যে একটি ভারসাম্য আনাটাই তাদের ধর্মের কাজ। কিছু কিছু গাছ, লতা-পাতার সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পর্ক। এর মধ্যে ভুট্টার নামটি খুব সামনে চলে আসে— কারণ ভুট্টা এক ভাবে প্রায় পূজার আসনে আসীন। অন্য গুরুত্বপূর্ণ চাষের ফসল শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়াকেও তারা পবিত্র মানে। তামাক চাষ ও ধূমপানকে তারা অভ্যাসের অংশ নয় বরং ধর্ম-আচারের অংশ মনে করে। আর অসুখ সারানোর জন্য যে সব ভেষজকে তারা প্রকৃতিতে চিনে নেয় সেগুলো

তাদের কাছে পবিত্র জীবনদাতা হিসেবে সম্মানিত— অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধা ভরে সেগুলোকে সংগ্রহ করে প্রার্থনা উচ্চারণের সঙ্গে; এক সাথে চারটি চারটি করে, কারণ সেটিই নিয়ম।

এই শেষোক্ত আচারগুলোর সঙ্গে কর্ত্রী-মার মত গুরুজন স্থানীয় নারীদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বাড়ির আশপাশ, তারপর কিছু দূরের বাগান ও চাষের খেত, বন-বাদাড়— এসব নারীদের কাজের ও কর্তৃত্বের এলাকা। গুরুজন-স্থানীয় অভিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয়া নারীদের ওপর দায়িত্ব বর্তায় এসবের পবিত্রতা রক্ষার। যেমন পরিবারের পক্ষ থেকে খেতের প্রথম ফসলটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় বিনম্রতার সঙ্গে সংগ্রহ করার, কিংবা ভেষজ লতা গুল্মকে চিনে নিয়ে ওভাবে সংগ্রহ করার কাজটি কর্ত্রী-মার। গ্রামের নিরাপত্তা দেয়ালের বাইরে যে বিস্তীর্ণ চাষের খেত তাতে প্রত্যেক পরিবারের একটি নিজস্ব খণ্ড আছে। বাড়ি থেকে বের হয়ে পরিবারের নারীরা প্রায়শ এখানে চাষের কাজ করতে আসে। কর্ত্রী-মা বাড়ি আগলিয়ে রাখেন বটে, কিন্তু চাষের সব খোঁজখবর রাখেন। বাড়ির মেয়েরা চাষের ও শস্যের কাজে অনেক প্রস্তুতিমূলক বিষয়েও ব্যস্ত। যেমন তাদের একটি কাজ ঝুড়ি, বস্তা, পাটি, মাদুর ইত্যাদি তৈরি করা যা শস্য বহন, শস্য প্রক্রিয়াকরণের নানা পর্যায়ে লাগে। আরো কঠিন কাজ হলো পটারি তৈরি এবং তা পোড়া। এসবে বিশেষজ্ঞ মানুষ আছে বটে কিন্তু কর্ত্রী-মার তত্ত্বাবধানে পরিবারের মধ্যেই কিন্তু এর অনেকখানি তৈরি হয়ে যায়।

কোলিংটনের মানুষ অবশ্য সম্পূর্ণ কৃষিজীবী নয়, কৃষি তাদের জীবিকার একটি অংশ মাত্র। কিন্তু কৃষি তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনেরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর যেহেতু কৃষির অধিকাংশ দায়িত্ব মেয়েদের ওপর, তাই ওই ধর্মীয় আচারেও তাদের অনেকটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে। বন-বাদার-ভূমি থেকে বন্য খাবার সংগ্রহ করতে গিয়েও মেয়েরা প্রকৃতির সঙ্গে এবং সেই সুবাদে ধর্মীয় আচারের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়। কর্ত্রীমার মত গুরুজনদের তাই শুধু একটি পারিবারিক কর্তৃত্ব থাকেনা বরং ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তৃত্বও থাকে।

অন্যদিকে পুরুষরা কিছুটা বহির্মুখী, আগ্রাসী চরিত্রের। শিকার ওদের একটি বড় দায়িত্ব। কৃষি ও সংগ্রহের মাধ্যমে যে খাদ্য পাওয়া যায় তার সঙ্গে উচ্চ মানের আমিষ খাদ্য ও বৈচিত্র যোগ করার জন্য শিকারটি গুরুত্বপূর্ণ— আর ওই প্রাকৃতিক পরিবেশে শিকারের প্রাপ্তিটিও যথেষ্ট ভাল। শিকারের সন্ধানে বিভিন্ন দলে ছড়িয়ে পড়ার কারণে ওদের সঙ্গে অন্যান্য নানা গোত্রের মানুষের দেখা হয়, এবং শিকারের অধিকার নিয়ে সংঘাতেও জড়িয়ে পড়তে হয় ওদেরকে। এর ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে সন্ধি, আঁতাত, জোট পাকানো, অন্য জোটের বিরোধিতা ইত্যাদি তাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রচলিত। যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনাও কম নয়। এর মধ্যে প্রতিটি গোত্র নিজ নিজ ধর্মীয় ও আচারের বৈশিষ্টগুলোকে বড় করে তুলছে এবং তার ভিত্তিতে আন্তগোত্র বিষয়গুলোর ফয়সালা করছে, অথবা প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে

যাচ্ছে। হ্যাঁ লড়াইটি প্রচণ্ডই বটে এবং যথেষ্ট নিষ্ঠুরও শত্রুকে মেরে ফেলতে পারলে তার মৃতদেহের চিহ্ন দেহে অলঙ্কার হিসেবে ধারণ করাটাই তাদের বীরত্বের প্রকাশ। এর জন্য সাধারণত নিহত শত্রুর মাথার চামড়া চুলসহ ছিলে নেয় এবং তা নিজের পোষাকে ধারণ করে। যোদ্ধাদেরকে ভীষণ-দর্শন করে তোলার জন্য মুখে নানা উল্‌কি ইত্যাদিও ধারন করে। অবশ্য গোত্রপতি, পুরোহিত, অভিজাতরাও নানা ভাবে নিজেদেরকে জমকালো করে তোলে উপযুক্ত পাগড়ি ইত্যাদি মাথায় দিয়ে যা বিভিন্ন পাখির পালক, পাখির মাথা, ঠোঁট ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত।

একটি বিষয় ওদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যবহার বা অন্য কোন বাহক হিসেবে কোন পোষা প্রাণী এখানে নেই। খাবার জন্যও কোন পোষা প্রাণী নেই। পোষ মানা প্রাণী শুধু একটিই— তা হলো কুকুর। সীমিত কৃষি ও খাবার জন্য পোষা প্রাণীর অভাব সত্ত্বেও কোলিংটনের মানুষের খাদ্য বৈচিত্র হিংসে হবার মত। কোন বিশেষ একটি পশুর বা পাখির মাংস নয় বরং ভালুক-হরিণ থেকে শুরু করে খরগোস-কাঠবিড়ালি পর্যন্ত নানা পশু এবং বন্য জমকালো দেখতে মুরগির মত বড় টার্কি থেকে শুরু করে পানির পাখি, ঘুঘু, ময়না পর্যন্ত নানা পাখি তাদের পাতে প্রায়ই আসে। নদীর ধারের ও সমুদ্রের ধারের মানুষ হিসেবে মাছ সহ পানি থেকে শিকার করা প্রাণীকেই খাবার হিসেবে ওরা বেশি পায়। যেমন মাটির নিচ থেকে সংগৃহীত বাদাম, জলার আলু, মিষ্টি আলু, কাসাভা, গর্তের কচু, তেমনি মাটির উপরের ওয়ালনাট, হিকোরি নাট, ওক গাছের একর্ন ইত্যাদি বাদাম ও বন্য ধান; ফল হিসেবে স্ট্রবেরি, ক্র্যাব আপেল, মালবেরি, বেদানা, হাকলবেরি, ব্লু বেরি, আঙ্গুর সবই তাদের প্রাচুর্যের অংশ।

ফলমূল তো বটেই, অন্যান্য খাদ্যেরও একটি বড় অংশ তারা কাঁচাই খায়। মিষ্টিকুমড়া বা লাউয়ের মত কিছু জিনিস কাচাও খায় আবার রান্নাও হয়। ওরা হাঁড়িতে রান্না করে— ভেজে বা স্যাঁকে খাবার অভ্যাস তাদের কম, বরং রান্না মানেই সেদ্ধ করা, কয়েকটি খাদ্য মিশিয়ে ঘন্টের মত রেঁধে ফেলা। শস্যকে গুড়ো করে রুটি বানিয়ে যেমন খায় শস্যের ভর্তা, সেদ্ধ, ডাম্পলিং জাতীয় পিঠা ইত্যাদি করেও খায়। মাছ বা মাংস বা সবজির সেদ্ধ তরকারি করার সময় গুড়ো অথবা গোটা ভুট্টার সেদ্ধ ফ্যান তার জন্য একটি চমৎকার শুরুয়া হিসেবে কাজ করে। সবজির মধ্যে অবশ্যই প্রধান হলো শিম, মিষ্টিকুমড়া আর নানা রকম লাউ। মাছের কথা বলা হলেও কচ্ছপ, ঝিনুক এসব জলজ প্রাণীর মাংসটিও দারুণ ভূমিকা রাখে এ খাবারে। এমন লোভনীয় খাবারের মধ্যে একটি অভাব হয়তো অনেকে অনুভব করবে— তা হলো লবনের অভাব। এখানে খাবারের মধ্যে যে লবন থাকে তার বাইরে এর সঙ্গে যোগ করার মত কোন লবন নেই। তবে ধনেপাতা তেজপাতার মত কিছু পাতা, আদার মত মাটিতে পাওয়া কিছু মসলার সহযোগে রান্না করে লবনের অভাব কিছুটা লাঘব হয়। সেদ্ধ করে অধিকাংশ যে রান্না তার প্রায় সবই

হয় মাটির হাঁড়িতে— যার তলাটি নিচের দিকে সরু। এমন তলার হাঁড়ি অবশ্য চুলার ওপর ঠিকই বসানো যায়।

কর্ত্রীমার তত্ত্বাবধানে বাড়িতে যে রান্না হয় তাতে মেয়েদের আগের কৃষি ফসল থেকে জমিয়ে রাখা খাবার আর মেয়েদের সংগৃহীত বন্য খাবার সব সময় কিছু না কিছু থাকে। শিকার করা খাবার অবশ্য নির্ভর করে পরিবারের পুরুষরা এখন কোথায় শিকার করছে তার ওপর। বাড়ির কাছাকাছি মাছ ধরা, কচ্ছপ ধরা অথবা খরগোস, ঘুঘু মারার ব্যাপার যদি হয় তা হলে রোজ কিছু না কিছু এরকম মাছ মাংস পাতে পড়ে। বাড়ির মাঝবয়সী গিন্নীরাই রান্নার পরিকল্পনা আর তার বাস্তবায়ন করতে যথেষ্ট। তবে প্রায় দিনই তারা একটি কাজ করে; কর্ত্রী-মার কাছে গিয়ে তাদের রান্নার পরিকল্পনার কথা জানায়। তাঁর অনুমতি নেয়াটিকে জরুরী মনে করে ওরা। বেশির ভাগ সময় শোনা মাত্রই অনুমতি দিলেও মাঝ মাঝে তিনি তাঁর কোন নতুন রান্নার আইডিয়া দেন। পরিবারের মেয়েরা যেমন নানা কাজে ব্যস্ত, পুরুষরাও তাই। ওদেরকে জড়ো করে সবার খাবারের ব্যবস্থা করার দিকে কর্ত্রী-মার কড়া নজর। সবাই ব্যস্ত হলে পরিবারের বাচ্চাদের দিকে নজর রাখার প্রধান কাজটি তাঁকে করতে হয়— ওরা বাড়ির কাছেই হেসে খেলে বড় হচ্ছে, বড়দের কাছ থেকে শিখছে। পরিবারের পুরুষরা যখন আরো বড় দলে দূরে চলে যাচ্ছে শিকারের জন্য, অথবা গোত্রের স্বার্থ রক্ষার কাজে, তখন অবশ্য বেশ কদিন তাদেরকে আর বাড়িতে পাওয়া যায়না।

কোলিংটনের মানুষরা একেবারে দেয়ালে ঘেরা প্রতিষ্ঠিত গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও তাদের কিছু যাযাবর প্রকৃতিও রয়েছে— বিশেষ করে ভাল শিকারি পুরুষরা যখন বেশ কিছুদিনের জন্য গ্রাম ছেড়ে দূর দূরান্তে চলে যায় তখন সেখানেই পাতে তাদের অস্থায়ী আবাস। অনেক সময় হরিণের চামড়ার তাঁবুতেই তাদের এ কাজ চলে। আগুন জ্বালিয়ে, শিকারের মাংস রান্না করে আপাতত তাদের অস্থায়ী ঘরকন্না চলে। শিকারের বা যুদ্ধের অভিযানের সুবিধার্থে, অথবা বিশেষ বিশেষ মৌসুমে প্রাণীর অভিবাসনের সুবিধা নেবার জন্য ওরা মাঝে মাঝে এক রকম অস্থায়ী গ্রামও গড়ে তোলে। তখন আর শুধু তাঁবুর ওপর নির্ভর না করে গাছের গুড়ি ও বাকল দিয়ে খড়-পাতা দিয়ে ছাউনি দিয়ে অস্থায়ী গ্রাম গড়ে তোলা হয়। অল্পদিন পর পরিত্যক্ত হলেও মৌসুমে মৌসুমে এ গ্রাম বার বার ব্যবহার করা হয় কিছু মেরামত করে।

হরিণের চামড়ার অসংখ্য ব্যবহার ওদের কাছে। শীতের দিনের গায়ে পরার জন্য পোষাকগুলো এ দিয়েই তৈরি হয়। এ সময় মেয়েরা চামড়ার লম্বা ড্রেস পরে, পুরুষরা চামড়ার পুরো বা আধা প্যান্টের মত পোষাকের ওপর পাতলা চামড়ার জামা পরে। খুব শীতে এর ওপর কোটের মত আরেকটা চামড়ার পোষাক পরে নেয়। এত হরিণের চামড়া সব সময় পাওয়া যায় না বলে খরগোস, কাঠবিড়ালি

ইত্যাদি সহজলভ্য ছোট ছোট পশুর চামড়া সেলাই করে জোড়া দিয়ে দিয়ে ওরা বিকল্প শীতের পোষাক তৈরি করে। এতো গেলো শীতের কথা। কিন্তু কোলিংটনের মত জায়গায় শীত দীর্ঘস্থায়ী নয়। দীর্ঘ বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরতে আরো হালকা পোষাকে চলে— যার বেশির ভাগ আসে উদ্ভিজ আঁশ ও বাকল খুব চিকন করে ছিড়ে নিয়ে তা দিয়ে তৈরি সূতায় কাপড় বুনে। এই কাপড় দিয়ে পুরুষের জামা, মেয়েদের ড্রেস ইত্যাদি তৈরি হয়। বেশি গরমে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই প্রায় উর্ধাঙ্গে খালি গায়ে থাকে। মোকাসিন চামড়ায় তৈরি জুতা পরা এদের নারী-পুরুষের একটি বৈশিষ্ট। এসব জামা কাপড়ে কিছুটা ফ্যাশন করতে অবশ্য এদের কার্পন্য নেই। বিশেষ করে শীতের শেষে ওদের নতুন জামা, ড্রেস, মোকাসিনের জুতা ইত্যাদি নানা ফ্যাশন চোখে পড়ার মত। নানা রকম পুঁতির অলঙ্কার, রঙীন ডিজাইন, পাখির রঙীন পালক ইত্যাদি দিয়ে এগুলো চিত্রিত হয়। পালকের তৈরি একটি পুরো আলখাল্লাই কেউ কেউ পরে জমকালো দেখানোর জন্য কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে। আটপৌরই হোক, আনুষ্ঠানিক হোক; গরমের হালকা কাপড়ের হোক, শীতের চামড়ার পোষাক হোক— এসব বোনা, সেলাই, তৈরি সবই অধিকাংশ মেয়েদের কাজ। এটিও বাড়ির মেয়েদের সব সময় ব্যস্ত রাখে।

ফ্যাশনের জগতে মেয়েদের একাধিপত্য— পুরুষদের এ নিয়ে তেমন মাথা ব্যাথা নেই, কর্ত্রী-মার অনুমোদনে বাড়ি থেকে যে ডিজাইন আসে তাতেই তারা খুশি। এই ব্যাপারে কর্ত্রী-মার কাজটি কিন্তু খুব সহজ নয়। কিশোরী, তরুণী মেয়েরা চায় ফুরফুরে নতুন ডিজাইনের পোষাক। কিন্তু কর্ত্রী-মা এক্ষেত্রে কোলিংটন সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিতে চান— সহজে এর বাইরে যেতে চান না। এ নিয়ে পরিবারে মন কষাকষি হয়। কর্ত্রী-মা যখন নাতনিকে আদর করে পাখির পালকের বড় জমকালো আলখল্লা পরিয়ে দেন নাতনির সেটি পছন্দ হয়না। এ নিয়ে তিনি মন খারাপ করেন।

মজার ব্যাপার হলো পোষাকের অংশ হিসেবেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ওরা প্রচুর অলঙ্কার পরে। প্রধানত ছোট ছোট রঙ বেরঙ পাথর, অথবা পাথরের বা মুক্তার পুঁতির অথবা ঝিনুক-শামুক-শাঁখের একের ওপর এক নানা মালায় এরকম অলঙ্কার তৈরি হয়। এ অলঙ্কারের উপকরণগুলো যোগাড়ের জন্য পুরুষদেরকে অনেক দূরে দূরে গিয়ে নিজেদের শিকারে পাওয়া পশুর চামড়া ইত্যাদি বিনিময় করতে হয়। চুলের অলঙ্করণটি লক্ষ্য করার মত, চুল রাখার কায়দাটিও। পুরুষরা সাধারণত মাথার প্রায় পুরোটা চুলই মুড়িয়ে ফেলে শুধু ঠিক ওপরের কিছু চুল রেখে দেয়া ছাড়া। মেয়েরা অবশ্য লম্বা চুল বিনুনি করে রাখে। ধর্ম, পূর্বপুরুষের অস্থি রক্ষায় উদ্বেগ কোলিংটন সংস্কৃতিকে আনন্দশূন্য করতে পারেনি।

*　　*　　*

আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনার যে জায়গাটির কথা বলছি, সেখানে অন্তত হাজার তিনেক বছর ধরে মানুষের চমৎকার আবাসের প্রমাণাদি পাওয়া গেছে। এ যুগকে বলা হয় উত্তর আমেরিকার উডল্যান্ড যুগ— সমুদ্র তীরবর্তী বন বা গাছ গাছড়া সমৃদ্ধ অঞ্চলের এই আবাস। এর সঙ্গে পরে এসে কিছুটা মিশেছে আরো পশ্চিমের মিসিসিপি উপত্যাকায় সৃষ্ট কিছুটা ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি যেটি গত হাজার খানেক বছর ধরে চলেছে, তারও নানা নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ববিদরা খুঁজে পেয়েছেন। এখানে কোলিংটন সংস্কৃতির যে পরিচয় আমরা কর্ত্রী-মার পরিবার ও তাঁর গোত্রের কাহিনীর মাধ্যমে পেয়েছি তা অবিকৃত এই মিশ্র সংস্কৃতির একেবারে শেষ পর্যায়ের কথা, এখন থেকে পাঁচশ' বছর আগে। এর শ'খানেক বছরের মধ্যেই প্রথমে অল্প কয়েকজন ইউরোপীয় অভিযাত্রী এবং পরে পরে ইউরোপীয় ঔপনেবেশিকদের সঙ্গে এখানকার মানুষের সাক্ষাত ও ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে। এরপর তারা আর নিজেদের শুদ্ধ সংস্কৃতি নিয়ে থাকতে পারেনি, প্রাগৈতিহাসিক যুগেও আর বাস করতে পারেনি। বরং তাদের অধিকাংশই ধীরে ধীরে আবাস ভূমি হারিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে জীবনও হারিয়েছে।

ইউরোপীয়রা আসার আগের সেই দিনগুলোর কোলিংটন সংস্কৃতির নানা নিদর্শন পরবর্তী প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো গ্রামের মাঝখানের পিরামিডের মতো ঢিবি, এবং চারধারের গাছের খুঁটির দেয়ালের আলামতগুলো। খুঁটির জন্য পরপর যে গর্ত তার থেকেই দেয়ালের অস্থিত্ব বোঝা যাচ্ছে। একই ভাবে মাটিতে খুঁটির গর্ত থেকেই প্রধানত বাড়িগুলোর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। আসল খুঁটি, গাছের বাকলের দেয়াল, খড়-পাতার ছাউনি, অধিকাংশ কাঠ ও জৈব জিনিসের আসবাব হাতিয়ার এ সব ওই আবহাওয়ায় বেশিদিন থাকার কথা নয়। তবে বাড়িতে যেখানে আগুন জ্বলেছে, রান্না হয়েছে, পটারি ছিল, পাথরের বা হাড়ের হাতিয়ার ছিল সেগুলোর নানা নিদর্শন খননের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। রান্নার হেঁশেলের কাছে পাওয়া গেছে খাওয়া নানা মাছ-পশু-পাখির হাড়ের ছিটে ফোটা যেগুলোকে সনাক্ত করা গেছে। এর মধ্যে হরিণ, ভালুক, র‍্যাকুন, ওপোসাম, খরগোস, টার্কি, কচ্ছপ, মাছ ইত্যাদির নিদর্শন যেমন মিলেছে, তেমনি মিলেছে কিছু কিছু সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া উদ্ভিদের বীজ ও পরাগ যার থেকে ওখানে মিষ্টি কুমড়া, লাউ, শিম ইত্যাদির আধিক্য বোঝা যাচ্ছে।

কোলিংটনের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে দেখা গেছে যে এখানে প্রায় ডিম্বাকৃতি দেয়ালে ঘেরা গ্রাম যেমন ছিল তেমনি ঘেরাওয়ের বাইরে চাষের উপযোগী বেলে মাটির ঢেউ খেলানো মাঠ ছিল; আর তার পরেই ছিল নদীর পারে পারে ওক, হিকোরি ইত্যাদি গাছের বন। এই গ্রাম ও কাছাকাছি আরো নানা গ্রামের সঙ্গে বেশ কিছু কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। কিছু কিছু কবর পৃথক এক এক জন মানুষের কঙ্কাল ও তার সঙ্গে কবরে দেয়া কিছু কিছু অলঙ্কার, আসবাব ইত্যাদি প্রিয় জিনিস রয়েছে। তবে আধিক্য দেখা যায় একই কবরে অনেক মানুষের হাড়ের— যার মধ্যে মনে হয় বিভিন্ন সময়ে মৃত নানা বয়সের মানুষের হাড় রয়েছে।

এখানে যে কাহিনী আমরা এনেছি সে সময়ের অল্প কিছু পরে ইউরোপীয় অভিযাত্রীরা এবং ঔপনেবেশিকরা অবশ্য এখানকার পরবর্তী প্রজন্মগুলোর মানুষদেরকে সাক্ষাতে দেখেছে, পরে তাদের সঙ্গে নানা ভাবে জড়িতও হয়েছে। এই ইউরোপীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে আমরা অন্যান্য কথাগুলো আন্দাজ করে নিতে পেরেছি।

গ্রামের যে দৃশ্য, স্থানীয়দের জীবন-জীবিকা, আবাস সম্পর্কে আগন্তুকরা যা দেখেছে তা ওই অবস্থায় শ'খানেক বছরের আগের থেকে খুব বেশি পরিবর্তিত হবার কথা নয়। কোন কোন দিক থেকে একই অবস্থা এর পরেও অনেকখানি বজায় ছিল। এভাবে প্রথম ইউরোপীয়দের বর্ণনা থেকেই আমরা ঠিক তখনকার ওদের পরিবার, সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, পোষাক-আষাক, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছি।

এরপর ইউরোপীয়রা যত বেশি সংখ্যায় এসে স্থায়ী ভাবে এখানে বাস করতে শুরু করেছে ততই এসব চিত্র দ্রুত বদলিয়েছে। এর কারণ এই স্থানীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের নানা রকম লেনদেন ঘাত-প্রতিঘাত। প্রথম দিকের উপনিবেশ স্থাপনকারীদের পক্ষে ওখানে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন ছিল। ওসময় ওই স্থানীয়রাই তাদেরকে খাদ্য সাহায্য দিয়ে, ওখানকার উপযোগী চাষবাসের নিয়ম শিখিয়ে, তাদের জীবন রক্ষা করেছে। কিন্তু ক্রমশ ঔপনেবেশিকরা যখন এখানে গেড়ে বসেছে তাদের শক্তিমত্তা নিয়ে আদিবাসীদের ভূমি দখল করতে ও তাদেরকে নানা ভাবে বিপর্যস্ত করতে শুরু করেছে তখনই উভয়ের সংঘাত শুরু হয়েছে।

কিন্তু এসবের মধ্যেও উভয়ের এক রকম সহঅবস্থান গড়ে ওঠেছিলো। এর একটি কারণ আগে থেকেই উভয় পক্ষের এক ধরনের বিনিময় ব্যবসার অভ্যাস ছিল। ইউরোপীয়দের প্রয়োজন হতো ওদের কাছ থেকে পশু চামড়া, পশম, বীজ ও অন্যান্য কিছু জরুরী পণ্য। এর বিনিময়ে আদিবাসীদের তারা দিতো আমদানী করা কাচ, ধাতব জিনিস, কাপড়, বন্দুক, বারুদ ইত্যাদি। এসব নতুন জিনিসের প্রতি আসক্তি ও এদের ব্যবহার ক্রমেই আদিবাসীদের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব ফেলেছে। ওই আদিবাসীরা হঠাৎ করেই যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অন্তত কোন কোন দিক থেকে বের হয়ে গিয়ে আধুনিক যুগের অনুকরণে লেগে গেল; যেমন ইতোপূর্বে অজানা ঘোড়ায় চড়ে বন্দুক চালানোর কাজে। অন্য দিকগুলোতে ওরা আগের মতই প্রাগৈতিহাসিকই রইলো। কিন্তু ইউরোপীয়দের থেকে যে জিনিস পাওয়াটি তাদের কাল হলো তা ছিল মহামারীর জীবাণু বিশেষ করে বসন্ত রোগের। এসব রোগের বিরুদ্ধে নিজেদের কোন প্রতিরোধ শক্তি ছিলনা বলে তারা দলে দলে মৃত্যুর সম্মুখীন হলো, তাদের জনসংখ্যা অবিশ্বাস্য রকমে কমে গেলো; সেই সঙ্গে ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতাও। তাছাড়া ইউরোপীয়রা সুকৌশলে তাদের নানা গোত্রের মধ্যে বিবাদকে কাজে লাগালো। এক দলের সঙ্গে আঁতাত করে অন্যের বিরুদ্ধে লাগার অভ্যাস আদিবাসীদের আগে থেকেই ছিল; এখন ইউরোপীয়দের সঙ্গেও এদের এক এক গোত্র এরকম আঁতাতের রাজনীতি গড়ে তুললো। এই পক্ষেও ইংরাজ, ফরাসী, ডাচ এরকম বেশ কিছু প্রতিযোগী ঔপনেবেশিক ছিল— আঁতাতের দিক থেকে স্থানীয় গোত্রগুলো কখনো ওদের এই পক্ষ কখনো ওই পক্ষে গিয়ে নিজেরাও ভয়াবহ যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়লো। এসব নানা টানাপোড়েন শেষ পর্যন্ত ওদের জন্য আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আরো পরে বিজয়ী আগ্রাসী ইংরেজ ঔপনেবেশিকরা তাদের অবশিষ্ট ক'জনকে নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দূর প্রত্যন্ত এলাকায় নির্দিষ্ট জায়গায় বাস করতে বাধ্য করেছে। খুবই দীনহীন ভাবে এখানে অস্থিত্ব রক্ষার সংগ্রামে রত রয়েছে ওরা এর পরের শত শত বছর ধরে।

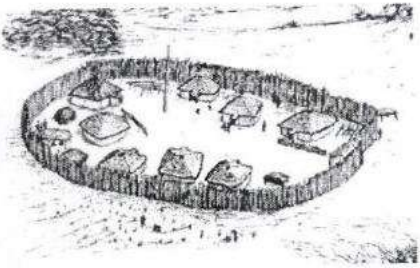

একটি 'রাজধানী' গ্রাম

কর্ত্রী-মাদের আবাস যেমনটি হবার সম্ভাবনা

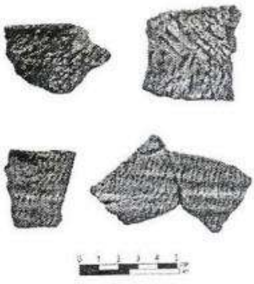

চিত্রিত পটারির টুকরা

কোলিংটন পটারি

চেরোকি শিকারি যোদ্ধা

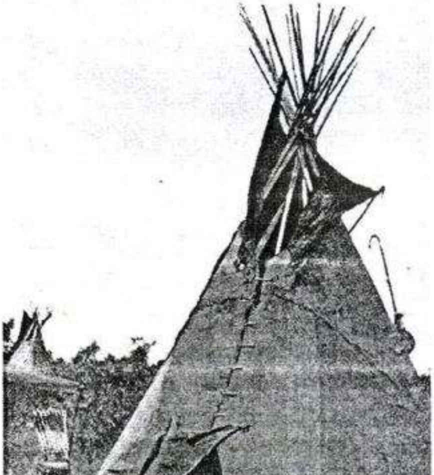

শিকারে বা যুদ্ধে গেলে পুরুষদের তাঁবু

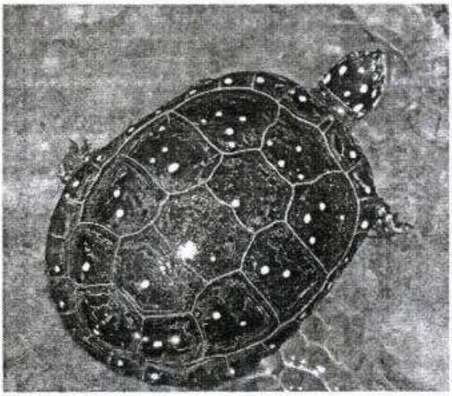

কচ্ছপ ওদের সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ

গোত্রপতির জমকালো পাগড়ি ও বস্ত্র

ইস্টার আইল্যান্ডের কড়ি ঃ

চার শত বছর আগে

প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে সব কিছু থেকে অনেক দূরে ছোট্ট দ্বীপ ইস্টার আইল্যান্ড। সেখানকার এক যুবক কৃষক কড়ি। ফসল ফলানোর কাজ ছাড়াও তাকে দ্বীপের সমাজপতিদের এক অদ্ভুত খেয়ালের কাজে কামলা খাটতে হয়। এটি হলো পাথরের প্রকান্ড সব আবক্ষ মূর্তি তৈরির কাজে সহায়তা দেয়া এবং আরো শত শত মানুষের সঙ্গে মিলে সে মূর্তিকে টেনে এনে সমুদ্রের ধারে ধারে বিশাল সব মঞ্চে খাড়া করা। এই পাগলা খেয়ালে ইস্টার আইল্যান্ডের পরিবেশ সম্পদ সব যেমন ধ্বংস হচ্ছে, কড়ির জীবনেও নেমে আসছে অনিশ্চয়তার কাল মেঘ।

অন্য বড় লোকালয় থেকে যত বেশি দূরে একটি লোকালয় থাকতে পারে তারই একটি চরম উদাহরণ হলো ইস্টার আইল্যান্ড। দক্ষিণ আমেরিকার চিলির মূল ভূখন্ড থেকে ২,৩০০ মাইল পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ছোট্ট দ্বীপ এটি—এই দুইয়ের মাঝখানে ওই মহাসাগর ছাড়া আর কিছু নেই। দ্বীপটি তবুও রাজনৈতিক ভাবে এখন চিলিরই অংশ। তবে ইস্টার আইল্যান্ডের নিকটতম লোকালয় হলো এর ১৩০০ মাইল পশ্চিমের পিটকার্ন দ্বীপ। কাজেই মাত্র ৬৬ বর্গমাইলের ত্রিভুজাকৃতি এই দ্বীপটি মহাসাগরের বুকে খুবই বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। সেখানে যদিও মানুষের বসবাস আজ থেকে প্রায় ১২ শত বছর আগে থেকে, আমরা এখন চলে যেতে চাই চার শত বছর আগে ওখানকার দিনগুলোতে আমাদের কাহিনীর নায়ক কড়ির কাছে। বাবা-মা ওর নাম কড়ি দিয়েছিলো কিছুটা দু:খের থেকে। কারণ তাদের ছোট বেলায় ওখানকার মানুষদের খুব প্রিয় মজার খাবার ছিল বড় বড় সব সামুদ্রিক কড়ি। শামুক-ঝিনুক জাতীয় অন্যান্য উপাদেয় খাবারের মধ্যে এটি ছিল সব চেয়ে মনোলোভা। কিন্তু আরো নানা খাদ্য উৎসের সঙ্গে এই কড়িরও খুব আকাল শুরু হয়েছিলো পরে, ফলে কড়ির স্বাদ তাদেরকে

ছোট ছোট কালো শামুকে মেটাতে হচ্ছিলো। এই দু:খে অন্তত পুরানো দিনের সুখস্মৃতি মনে করে সন্তানের নাম তারা রেখেছিলো কড়ি।

তবে কড়ি এখন সেই ছোটটি নেই, এখন ২২ বছরের তাগড়া যুবক সে। বাবা-মা'র যৌবন কাল থেকে তাদের অবস্থা এখন আরো অনেক খারাপ হয়েছে। এখন কড়ি নামের সঙ্গে নানা সময় বিশেষ শব্দ যোগ করে মানুষ— চাষী কড়ি, খেত মজুর কড়ি, কামলা কড়ি ইত্যাদি। এর সবেরই কারণ রয়েছে। চাষীদের জীবনযাত্রার অবস্থা এখন খারাপের দিকে এবং দেশের পরিবেশ সম্পদ ইত্যাদির অবস্থা খারাপের দিকে। কিন্তু সেজন্য কোন কাজই থেমে থাকেনি। আগেকার সমৃদ্ধির দিন থেকে শুরু হওয়া এখানকার কর্তৃপক্ষের যে সব বড় বড় প্রজেক্ট চলছে সেগুলোতে এখনো ভাটা পড়েনি; আর সে সবে কড়ির মত মানুষদের খুবই প্রয়োজন। কখনো সে তার ছোট্ট নিজস্ব খামারে কাজ করে, তখন তার পরিচিতি চাষী হিসেবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার ডাক পড়ে অভিজাত বড় লোকদের মালিকানার উন্নত গণখামারে খেত মজুর হিসেবে কাজ করার জন্য। আবার অন্য সময় তাকে কাজ করতে হয় কর্তৃপক্ষের বিশাল সব নির্মাণ প্রজেক্টে কুলি কামলা হিসেবে। দ্বীপটিতে এখন হাজার দশেকের মত মানুষ থাকে, দ্বীপের ছোট্ট সাইজের তুলনায় এটি নেহাত কম বড় জনসংখ্যা নয়। কিন্তু পুরো দ্বীপ জুড়ে যেই বিশাল বিশাল সব মনুমেন্ট মূর্তি স্থাপনার প্রজেক্ট চলে আসছে; এবং সেগুলোর পেছনে সম্পদ যোগাতে যে বিশাল বাড়তি কৃষি প্রজেক্ট আয়োজন করতে হয়েছে; তাতে কাজের মানুষ খুঁজতে গেলে এ জনসংখ্যা অপ্রতুলই মনে হয়। কাজেই কড়ির মত মানুষরা সব সময় ব্যস্ত থাকে— নিজের চাষবাস ছাড়াও ওই সব কাজের কারণে তাদের মৌলিক অন্ন বস্ত্রের অভাব হয়না।

ইস্টার আইল্যান্ডের মানুষরা সব পলিনেশিয়ান গোষ্ঠির, যে গোষ্ঠির মানুষরা ওই অঞ্চলের সব দ্বীপগুলোতে বসত করেছে— পিটকার্ন, মারকুয়েসাস, কুক্স আইল্যান্ড, ফিজি, টঙ্গা, সামোয়া, হাওয়াই, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি। নানা দিক থেকে এসব নানা দ্বীপের পলিনেশিয়ান মানুষদের সংস্কৃতিতে বহু মিল রয়েছে, কারণ বহু শত বছর ধরে এই মানুষরা এসব এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে গিয়ে সেখানে মানব বসত শুরু করেছে। ওই সাড়ে চারশত বছর আগের সময়ে এসে ইস্টার আইল্যান্ডের কড়িরা এতসব না জানলেও বংশ পরম্পরার তাদের বহু কথিত কিংবদন্তী অনুযায়ী এটুকু জানে যে বহুদিন আগে তাদের পূর্বপুরুষরা সাধারণ সব নৌকায় করে এক টানা পনরো বিশ দিন হাজার মাইলেরও বেশি সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে এসে মানব বসতের সূচনা করেছিলো। পাম গাছের গুড়ি থেকে তৈরি সরু ছোট্ট যেই নৌকা করে ওরা এখন সমুদ্রে মাছ শিকার করে, উত্তাল সাগরের মধ্য দিয়ে এখানে আসতে পূর্বপুরুষদেরকে সেই একই রকম নৌকা ব্যবহার করতে হয়েছিলো। তাদের বিশ্বাস পূর্বপুরুষরা চমৎকার নাবিক ছিলো বলে এই দু:সাহসিক কাজ করতে পেরেছিলো।

কড়ির পরিবার এখানকার অধিকাংশ পরিবারের মত কৃষিজীবী। বেশ কয়েকটি আগ্নেয়গিরির লাভার সৃষ্টি এখানকার মাটি যথেষ্ট উর্বর। পূর্বপুরুষরা আসার সময় চাষ-বাসের কৌশল নিয়ে এসেছিলো— কচু, কলা, আখ, মিষ্টি আলু এগুলোই এখানকার প্রধান কৃষিজাত। আর গৃহপালিত পশু-পাখি বলতে এখানে রয়েছে শুধু একটিই— তা হলো মুরগি। তবে সবে ধন নীলমণি এই মুরগিকে ওরা খুব যত্নে পালন করে। কড়িদের বাদবাকি খাবার আসে দ্বীপের অল্প কিছু পাখি এবং মাঝে মাঝে সমুদ্র থেকে আসা গাঙ চিলের মত পাখি শিকার করে এবং সমুদ্রের মাছ, শুশুকও শামুক-ঝিনুক থেকে। এই পাখি ও সমুদ্রের খাবার অবশ্য ক্রমে খুবই কমে এসেছে। কড়ির বাবা-মা বা তাদের বাবা-মা'রা যে রকম হারে এসবের স্বাদ পাওয়ার গল্প করে, এখন তার ভগ্নাংশও নেই। তাই ঘুরে ফিরে চাষের কচু, কলা, মিষ্টি আলু, আখ ইত্যাদি শর্করা প্রধান খাবারের ওপরেই তাদেরকে নির্ভর করতে হয় সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘরে পালা মুরগি। এ ছাড়া পুরো দ্বীপে বন্য অবস্থায়ও খাবার মত কোন প্রাণী নেই। ব্যতিক্রম অবশ্য একটি আছে তা হলো ইঁদুর। এই ইঁদুর নাকি ওই পূর্বপুরুষদের আসার সময় নৌকায় তাদের অজান্তে জিনিসপত্রের সঙ্গে চলে এসেছিলো। এখন সারা দ্বীপে তাদের সংখ্যা অনেক। এগুলোও খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় বটে, তবে তারা দ্বীপের গাছপালার যে ক্ষতি করছে তা অপূরণীয়।

ইস্টার আইল্যান্ডের সমাজ উঁচু মহল ও নিচু মহলের মধ্যে ভীষণ ভাবে বিভক্ত। এই দুইয়ের বাড়িঘর, জীবনযাত্রা, সমাজে তাদের ক্ষমতা ইত্যাদি দেখলে বিষয়টি খুবই স্পষ্ট হয়। যাদেরকে উঁচু মহল ধরা হচ্ছে তাদের প্রায় সবাই এক ধরনের সর্দার গোছের মানুষ— বংশানুক্রমে তাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন মিলে নিজ নিজ গোত্রের সর্দারি করে আসছে। দ্বীপের সম্পদের বড় অংশটি তাদের আওতায় রয়েছে। কড়ির মত মানুষরা হলো সাধারণ জনগণের অন্তর্ভুক্ত; ওদের প্রায় সবাই খেটে খাওয়া মানুষ, জীবন ধারণের জন্য কঠিন পরিশ্রম করে যেতে হয়। এ কারণেই তাকে চাষী কড়ি, খেত মজুর কড়ি, কামলা কড়ি সব ভূমিকাতেই কাজ করবে হয়। তার পরিশ্রমের ফসলগুলোর একটি বড় অংশ সর্দাররা নিজেদের সুবিধার জন্য নিয়ে নেয়; অবশ্য তা করে সর্ব সাধারণের নাম করে সমাজের ধর্ম রক্ষা করার অজুহাতে। পূর্বপুরুষ যারা পরকালে দেবতা হয়ে এ সমাজকে রক্ষার ভার নিয়েছে তাদের সন্তুষ্টির বিধান করাটাই হলো সর্দারদের কথিত বড় লক্ষ্য এবং এর জন্য বিশাল এক ধরনের প্রজেক্ট সম্পাদনের প্রতিযোগিতায় সবাইকে মত্ত করে রাখা হয়। এ প্রজেক্টের সবচেয়ে বড়টি হলো ওই পূর্বপুরুষ দেবতাদের কারো কারো প্রকান্ড সব পাথরের মূর্তি গড়ে তা দ্বীপের কিনারায় দশাসই সব মঞ্চের ওপর স্থাপন করা। কয়েক শত বছর ধরে এমন ভাবে এই কাজটি চলে আসছে যে এখন মনে হচ্ছে এটিই পুরো দ্বীপের সব মানুষের মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায় এবং এর জন্য মানুষের জীবন, জীবিকা, পরিবেশ সব বিপর্যস্ত করতেও বাধছেনা। কড়িদের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে পরে আসছি।

দ্বীপের চারিদিকে সমুদ্র তীরের কাছাকাছি জায়গাগুলোতে উঁচু মহলের মানুষ অর্থাৎ সর্দার পরিবারগুলোর বাস। এ জায়গায় সাধারণ মানুষের বসবাসের প্রশ্ন ওঠেনা— কারণ ওরা যেখানে থাকবে সেখানে কাছে রাখবে মুরগির ঘর, খামারের কম্পোস্ট গর্ত, আবর্জনা স্তুপ ইত্যাদি। ওই সব রোজকার জীবিকার কাজকর্ম ও গন্ধময় পরিবেশ মূর্তিগুলো স্থাপন করার জায়গার এত কাছে থাকতে পারে না। অবশ্য সর্দারদের সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলোর কথা আলাদা। এ বাড়িগুলো বেশ অদ্ভুত আকৃতির— মনে হয় যেন ওদের ব্যবহৃত সরু, লম্বা নৌকাকে উল্টো করে রাখা হয়েছে। এরকম বাড়ির অধিকাংশ ৪০ ফুটের মত লম্বা। নৌকার মতই লম্বালম্বি দুই প্রান্তের দিকে বেঁকে গেছে। দেয়াল আর ছাদ বলে এতে তাই আলাদা কিছু নেই— একই ধারাবাহিকতায় ছাদটিই দেয়াল হয়ে মেঝ পর্যন্ত নেমে এসেছে। আর এটি তৈরি শণ জাতীয় আঁশ-পাতা স্তরের পর স্তর ঘন করে বেঁধে। তবে আগাগোড়া মেঝটি যে ভাবে সুন্দর ভাবে পরস্পর চমৎকার ভাবে ফিট করা ব্যাসাল্ট পাথর দিয়ে বাঁধানো হয়েছে এবং এই পুরু পাথরের মজবুত সন্নিবেশে যে ভাবে বাড়ির ভিত্তিমূল তৈরি করেছে তাতেই বোঝা যায় এগুলো কত উঁচু মহলের বাড়ি। দুই প্রান্তে ছাদ-দেয়াল এসে যেখানে মেয়ের সঙ্গে মিশেছে সেখানকার পাথরগুলোকেও খুব সুন্দর বাঁকানো আকৃতি দিয়ে সৌকর্যময় করে তোলা হয়েছে। বাড়ির এই অংশটির বিশেষ পাথুরে সৌকর্য নিয়ে নানা সর্দারের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বড়াইয়ের শেষ নেই। দ্বীপের কিনারা জুড়ে রয়েছে ওই বিশাল বিশাল মঞ্চে প্রকান্ড সব মূর্তি যা সমুদ্রের দিকে পিঠ রেখে ও দ্বীপের অভ্যন্তরের দিকে মুখ করে মনে হয় দ্বীপের সব কিছুর ওপর নজর রাখছে। তার থেকে দ্বীপের সামান্য ভেতরে তাও সাগরের খুব কাছে সর্দারদের ওই দৃষ্টি-নন্দন বাড়িগুলো— এক একটি পাড়ায় আট দশটি করে বাড়ি। এমনি ভাবে দ্বীপের চারিদিকের কিনারায় সাগর ঘেষে শ'দুয়েক গজ চওড়া এক ফালি জমিতে রয়েছে ওই মূর্তিগুলো আর ওই বাড়িগুলো।

কড়িরা থাকে সাগর থেকে ও অভিজাত এলাকা থেকে অনেক দূরে দ্বীপের বেশ কিছু ভেতরের দিকে; কারণ ওখানেই সাধারণ মানুষের বাস। কড়ির পাড়া-পড়শিদের কেউ কেউ অবশ্য ওই অভিজাত এলাকায় ও সাগর তীরে কাজ করতে যায়। যেমন বেশ ক'জন অভিজ্ঞ কুশলী ঘরামি এখানে থাকে যারা ওই অভিজাত বাড়িগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করতে যায়, কখনো নতুন বাড়ি তৈরির জন্যও— তাদের মধ্যে কেউ কেউ শনের ছাদ-দেয়াল ছাওয়ার কুশলী, আবার কেউ কেউ পাথরের কাজের। তার চেয়েও বেশি কিছু মানুষ রয়েছে যারা নৌকা তৈরি করে, সারায়; এবং কেউ কেউ যারা সে নৌকা নিয়ে সাগরে কিছু দূর যায় মাছ ও শুশুক ধরতে, শামুক-ঝিনুক সংগ্রহ করতে কিন্তু এখন এদের সংখ্যা ক্রমে কমে যাচ্ছে; কারণ যে সুউচ্চ পাম গাছ দিয়ে নৌকা তৈরি হয় এবং অন্যান্য অনেক কাজ করা হয় সেগুলোর সংখ্যা এখন খুব অল্পে গিয়ে ঠেকেছে। আর নৌকার ব্যবহারও তেমন

নেই। ইস্টার আইল্যান্ডের কাছেধারে মাছের এবং শামুক-ঝিনুকের বড় সমাগম ঘটার মত তাদের আশ্রয় প্রবাল কলোনি বড় একটা কখনো ছিলনা, যাও বা ছিল পরিবেশ বিনষ্টি ও অতিরিক্ত শিকারের কারণে তা বিলুপ্ত প্রায়। এখন মাছ ইত্যাদি অল্প যা পাওয়া যায় তা ওই সর্দার বাড়িগুলোর ভোগেই লেগে যায়।

কড়িদের এলাকায় হাতের কাজ করার ও মাছ ধরার মানুষ কিছু থাকলেও বাকিরা কৃষিজীবী। এখানকার বাড়িঘর ও আঙ্গিনা তাই গেরস্ত-বাড়ির আদলে গড়া। এ বাড়িগুলোও ওই উল্টো নৌকার আকৃতিতে গড়া— কিন্তু অনেক ছোট এবং পেটানো মাটির কাঁচা মেঝের। কাছাকাছি ঘেষাঘেষি অনেকগুলো বাড়ি আর এগুলোর সঙ্গেই রয়েছে খানিকটা পাথরের দেয়ালে ঘেরা ছোট ছোট খেত— কলা, কচু, আখ ইত্যাদি চাষের। কড়ি এবং অন্যান্যরা তাদের বাড়ির সাথের এই ব্যক্তিগত খামারে নিজেরাই চাষবাস করে বটে তবে ওদের কৃষিতে 'অধিক খাদ্য ফলাও' জাতীয় কিছু সার্বজনীন প্রচেষ্টার ছোঁয়া রয়েছে। তাদের ভাগ্য যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেই গোষ্ঠিপতিরা সব সময় নজর রাখছে ওভাবে অধিক খাদ্য ফলানো সম্ভব হচ্ছে কিনা; উৎসাহিতও করা হচ্ছে নানা রকম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা নিয়ে। বাড়তি খাদ্য ফলিয়ে নিজেদের কেন্দ্রীয় কোষাগার ভর্তি করাটাই উদ্দেশ্য। এখানকার কৃষিতে অনেক সমস্যা— ইস্টার আইল্যান্ড বিষুব রেখা থেকে অনেকখানি দক্ষিণে হওয়াতে এখানকার উত্তাপ কম, সাগর থেকে ভীষণ বেগে যে ঠাণ্ডা বাতাস সব সময় বয়ে যায় তা কলা, কচু, আখের মত নিরক্ষীয় ফসল ফলানোর খুব সহায়ক নয়। তা ছাড়া এদের জন্য যে পানির দরকার তাও সহজলভ্য নয়। এ জন্য তাদের ছোট ছোট খেতগুলো পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা হয়েছে— বাতাস থেকে ফসলকে বাঁচাবার জন্য। পাঁচ থেকে ষাট ফুট নানা ব্যাসের ও চার ফুটের মত গভীর করে গর্ত তৈরি করা হয়েছে যার তলা ও ভেতরটা পাথরে আবৃত। সারিবদ্ধ এরকম গর্ত বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে অনেক। এখানে ফেলনা পচনশীল সব জিনিস পচিয়ে কম্পোষ্ট সার তৈরি করে তার ওপরেই ফসল লাগানো হয় ভাল ফলনের জন্য। আরো বড় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে পানি সেচের সুবিধা সৃষ্টির জন্য। এখানে যে দু'একটি মরা আগ্নেয়গিরি আছে তার একটির গা বেয়ে পাহাড়ি ঝরণার পানি কোন কোন মৌসুমে ছোট নদীর মত বয়ে যায়। এই পানিকে আটকিয়ে জমিয়ে রেখে চাষের খেতে নিয়ে আসার কিছু ব্যবস্থা বহু বছর ধরে চালু রয়েছে। ওই ছোট নদীর বুকে এ জন্য পাথর দিয়ে বাঁধ বেঁধে নালা কেটে খেতে পানি আনার ব্যবস্থা হয়েছে। এরকম কিছু কিছু বড় আকারের সেচ ব্যবস্থা না করা হলে দ্বীপে সারা বছর যে অল্প বৃষ্টি হয় তাতে 'অধিক খাদ্য ফলাও' এর আহ্বান কার্যকর হতো না।

শুধু ফসল নয় ঘরে পালা মুরগির জন্যও নেয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা যাতে অল্প জায়গায় অনেক মুরগির চাষ করা যায়। যেমন কড়িদের বাড়ির সঙ্গেই রয়েছে তাদের পাথরে তৈরি মুরগির ঘর— ২০ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া আর ৬ ফুট উঁচু।

তার নিজের ঘর যেখানে শন পাতা দিয়ে তৈরি ঠুনকো কুটির মাত্র তার মুরগিগুলোর ঘর পাক্কা পাথরে তৈরি বড়সড় ব্যাপার— কারো কারোটি ৫০-৬০ ফুট লম্বা দশাসই ব্যাপার। আসলে এগুলো বহু আগে থেকে সরকারী ভাবে তৈরি পাথুরে মুরগির ঘর— বংশানুক্রমে ওই বিশেষ মুরগি-ঘরটি কড়িদের পরিবারের দখলে আছে। ঘরের এক প্রান্তে খোলা দরজা দিয়ে মুরগি সামনের একটি চত্বরে চরতে পারে তবে সেটিও পাথরের দেয়ালে ঘেরা, যাতে মুরগি হারিয়ে না যেতে পারে।

অতীতে সর্দারা ওই সেচ ব্যবস্থা, মুরগির ঘর ইত্যাদি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলো তাদের নিজেদের সর্দারির সুবিধার জন্য এবং প্রকান্ড মূর্তি তৈরির মত প্রজেক্টে শ্রমিকদের খাদ্য যোগাতে বাড়তি খাদ্যের জন্য নিবিড় চাষ প্রকল্প হিসেবে— যা সাধারণ চাষীদের শ্রমে ও তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য তাদের বাড়ি ঘরের আওতায় তৈরি করা হয়েছিলো। এখন এর কার্যকারিতায় অনেকটা ঢিলেমি পড়লেও এর প্রয়োজনীয়তা ফুরায়নি, এখনো কোন রকমে ব্যবস্থাগুলো চালু রয়েছে। তবে নিবিড় খাদ্য চাষের চেষ্টাটি পুরোপুরি সাধারণ চাষীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সর্দাররা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি। তাই পাশাপাশি তারা তাদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে এক ধরনের সরকারী গণখামার গড়ে তুলেছে। এতে সর্বসাধারণের অনেক সম্পদ ও শ্রম বিনিয়োগ করা হয়। আগাগোড়া পাথরের ব্যবহার করে গড়ে তোলা হয়েছে বলে একে বলা যায় পাথুরে গণখামার।

এসব গণখামার সাধারণ মানুষের বাসস্থান থেকে কিছু দূরে দ্বীপের আরো ভেতরে প্রায় কেন্দ্রস্থলের দিকে। কয়েক বিভিন্ন আকারের পাথর এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন পাথরের বিশাল বিশাল খণ্ডকে বিস্তৃত খেতের বাইরে খাড়া করা হয়েছে ফসলকে ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহের থেকে রক্ষা করতে। এর চেয়ে ছোট পাথর খণ্ডগুলো খেতে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যেগুলোর আড়ালে ফাঁকে ফাঁকে ফসল লাগানো হয়েছে। এতে চারা অবস্থায়— কলার বা কচুর গাছ বাতাসের ঝাপটা থেকে রক্ষা পায়, রোদের সরাসরি তাপে শুকিয়ে যায়না। এ ছাড়া অনেক জায়গায় আগাগোড়া খেতকে নুড়ি পাথরে ঢেকে দেয়া হয়েছে— আধুনিক কৃষিতে যাকে মালচিং বলা হয় খড় বা অন্য কোন আবরণে খেত ঢেকে দেয়াকে। ফসল লাগানো হয়েছে পাথরের এই আবরণে জায়গায় জায়গায় ফাঁক করে ও গর্ত সৃষ্টি করে। এ যেন এক ধরনের পাথরের মালচিং— মাটির আর্দ্রতা ও পুষ্টি ফসলের জন্য ধরে রাখে। দ্বীপের অভ্যন্তরের এসব জায়গা সমুদ্র তীরের বা তার কাছের অঞ্চল থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে হওয়াতে এখানে আর্দ্রতা বেশি, কিন্তু ঠাণ্ডাও বেশি। বাতাস থেকে দূরে রেখে এবং কালো পাথরের মাল্‌চের (আবরণ) মধ্যে চাষ করে ফসলের গায়ে উত্তাপটিকে বাড়িয়ে নেয়া হয়, বাড়তি আর্দ্রতাটুকুও ধরে রাখা হয়।

কিন্তু যেটি অবাক হবার মতো তা হলো এভাবে বাড়তি ফসল উৎপাদনের আয়োজনের জন্য কর্তৃপক্ষকে কী বিরাট উদ্যোগ নিতে হয়েছে, বহু মানুষকে কী

প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে। কারণ এই পাথর স্থানীয় ভাবে পাওয়া যায়নি, দ্বীপের যেখানে আগ্নেয়গিরির মরা জ্বালামুখ রয়েছে সেখান থেকে বহু কষ্টে আনতে হয়েছে। বোঝাই যায় যে এই বাড়তি খাদ্য উৎপাদনটি বরাবর কর্তৃপক্ষের কাছে খুব জরুরী তাদের কর্তৃত্বের সম্পদ যোগাতে এবং তাদের প্রজেক্টের ব্যয় নির্বাহ করতে।

তবে এই যে পাথুরে গণখামার তাতেও শ্রম দিতে হয় কড়ির মত সাধারণ মানুষকে। এখানে কড়ির কাজ খেত মজুরের মত। তাদের বসতের পাড়া এই গণখামার থেকে বেশ খানিকটা দূরে। যখন মৌসুমে মৌসুমে শ্রম দিতে হয় তখন দলে দলে হেঁটে ওরা ওই খামারে যায়, সন্ধ্যার পর ফিরে আসে। এই শ্রমের বিনিময়ে ফসলের অল্পস্বল্প কড়িরাও পায়, তবে বেশি কিছু নয়। ওই গণখামারের সঙ্গেও অল্প কিছু সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে অনেকটা সমুদ্র তীরের বাড়িগুলোর অনুরূপ। এগুলোতে সর্দারদের মানুষ থাকে খামারের তদারকী আর ব্যবস্থাপনার জন্য— তারা নিজেরাও যেন খামারের দায়িত্বে ছোট সর্দার। কড়ি কখন নিজের খামারে কাজ করছে, কখন সর্দারদের মূর্তি নির্মাণ প্রকল্পে কামলা দিচ্ছে, কখন গণখামারে খেত মজুর হিসেবে কাজ করতে আসছে ওরা এ সব খবর রাখে। ছোট সর্দারদের ওপর বিরাট দায়িত্ব গণখামারের খাদ্য উৎপাদনে যেন কোন গাফিলতি না হয়। অন্য দিকে কড়ির মত চাষীদের নিজের খামারও যেন ফসলের ও মুরগির উৎপাদনে যেন কোন কমতি না হয়। এ ভাবে নিবিড় চাষের ব্যবস্থাই এখানকার কর্তৃপক্ষের জন্য যথেষ্ট উদ্বৃত্ত খাদ্য সৃষ্টি করতে পারে আর অনেক মানুষকে চাষবাসের থেকে সরিয়ে এনে মূর্তি তৈরি ও স্থাপনের প্রজেক্টে কাজে লাগাতে পারে তাদের বেতন ও খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে।

নিজেদের খামারে প্রচুর কাজ, অথচ গণখামারের ছোট সর্দার বার বার লোক পাঠাচ্ছে ওখানে কাজ করতে যেতে . এ রকম পরিস্থিতি কড়িকে আজকাল প্রায়ই সামাল দিতে হচ্ছে। বৈরি আবহাওয়ার কারণে নিজের ফসল রক্ষা করতে প্রাণান্ত হচ্ছে কড়ি, তার ভাই ও বাবাকে নিয়ে তাদের ছোট পরিবার সবাই দিনভর খেটেও যথেষ্ট ফসল ফলাতে পারছেনা। ওদিকে গণ খামারেও একই অবস্থা। তাই ছোট সর্দারদের মেজাজ খারাপ। শেষ পর্যন্ত নিজেদের কাজগুলো বুড়ো বাবার জিম্মায় দিয়ে কড়িরা দুই ভাই গণখামারে শ্রম দিতে আসছে পর পর পনরো দিন। সর্বক্ষণ সর্দার তাকিয়ে থাকে— ওরকম নজরদারির মধ্যে কাজ করতে তার মোটেই ভাল লাগেনা তবুও করতে হয়। আসা যাওয়াতে মাইলের পর মাইল হাঁটা, তারপর এত খাটনি। আর স্বাস্থ্যে কুলায়না।

সমসাময়িক অন্যান্য পলিনেশিয়ান সমাজের মত ইস্টার আইল্যান্ডে এত রকম কাজের জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ার ও সামগ্রীগুলো কিন্তু বেশ সেকেলে ধরনের। পাথর কাটা, মূর্তি তৈরি সহ যাবতীয় কাটাচেরা, খোদাই করার হাতিয়ার হিসেবে শুধু পাথরের হাতিয়ারই তাদের আছে। চাষবাসের কাজের জন্য ও পাথর এবং

কাঠ ও উদ্ভিজ আঁশের দড়িদড়া ছাড়া তাদের আর কিছু নেই। নৌকা তৈরি, ঘর বাড়ি তৈরি এবং অন্য সব কাজের জন্যও এসবই ভরসা। মাছ ধরা ও কালে ভদ্রে পাখি, শুশুক ইত্যাদি শিকারের জন্যও হাড়ের বা শাঁখের তৈরি বড়শি, হাড় বা পাথর লাগানো কাঠের হারপুন, উদ্ভিজ আঁশের তৈরি জাল ছাড়া কিছু নেই। ধাতুর কোন ব্যবহারই তাদের নেই। বড় পশু নেই যে সেগুলোর হাড়ে বা চামড়ায় হাতিয়ার তৈরি হতে পারে। গাছের বাকল, উদ্ভিজ আঁশ, সরু বেতের মত ফাঁপা নলের দ্বারা বোনা কাপড়ই তাদের পরিধেয়। যাবতীয় আদেশ-নির্দেশ এবং যোগাযোগের জন্য তাদের একমাত্র মাধ্যম মুখের ভাষা, কারণ লিপির প্রচলন এ সমাজে হয়নি; কোন নাগরিক সভ্যতাও গড়ে ওঠেনি।

সব কিছু এত সীমিত তারপরও ইস্টার আইল্যান্ডের সব মানুষের জীবন বলতে গেলে আবর্তিত হচ্ছে প্রকাণ্ড সব মূর্তি তৈরি ও তা স্থাপনের মত অনুৎপাদনশীল কাজে। কড়ির মত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনও এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ছোটবেলা থেকেই সে দেখে এসেছে সমুদ্রের পারে বিশাল বিশাল মঞ্চের ওপর স্থাপিত এই প্রকাণ্ড মূর্তিগুলোকে— সবগুলো শুধু মাথা ও শরীরের ওপরের অংশ; সবগুলোর মুখাবয়ব, হাত, ইত্যাদি শুধু মোটা দাগে খোদাই করা। তাই সুগোল সুডোল সূক্ষ্ম কাজ করা মূর্তির বদলে এখানে আছে কিছুটা সরল রেখায় আয়তাকার নাক মুখ আর উর্দ্ধ দেহের অবয়ব। সবগুলো মূর্তি দ্বীপের ভেতরের দিকে মুখ করে আছে। এ রকম মূর্তি অবশ্য শুধু ওখানে মঞ্চের ওপরেই নেই, পরে অনেকবার সে এরকম অনেক মূর্তি পাথুরে জ্বালামুখের কাছে ধারে কাত-চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছে। ওগুলোর কোন কোনটির তৈরির কাজ কখনো শেষও করা হয়নি। অনেকগুলো ওই জ্বালামুখের মধ্যেই রয়েছে; পাথর থেকে মূর্তি তৈরি শুরু হয়েছিলো কিন্তু বেশি দূর এগুয়নি এখনো শুরু করা মূর্তি খনির পাথর থেকে মুক্ত হয়নি। এভাবে সব মিলে শত শত প্রকান্ড মূর্তি দেখা যাচ্ছে তা আগেকার বহুদিন ধরে তৈরি হয়েছে।

এখন আজকের দিনেও নতুন মূর্তি তৈরি হচ্ছে, তা স্থাপিত হচ্ছে মঞ্চে, আর সে কাজে নানা ভাবে জড়িত হবার জন্য কড়ি ও তার পড়শিদের ডাক পড়ছে। এই ডাকে সাড়া না দেবার কোন উপায় নেই কড়ির। ব্যাপারটিকে এমন ভাবে দেখানো হয় যেন এটি হলো দেশের কাজ, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অবশ্য করণীয়। কিন্তু আসলে কড়ির মত অতি সাধারণ মানুষদেরকেই এখানে শ্রম দিতে ডাকা হয়। অবশ্য কড়ির খুব বেশি আপত্তিও নেই তাতে। তার কাজগুলোর মধ্যে নানা রকমের মূর্তি স্থাপনের জন্য বিশাল সব পাথুরে মঞ্চ তৈরির ব্যাপার আছে, যে ভাস্কররা মূর্তি খোদাই করছে তাদের কাজে যোগালি দেবার ব্যাপার আছে, সেই প্রকান্ড মূর্তিকে বেশ কয়েক মাইল গাছের গুড়ির তক্তার ওপর দিয়ে সাগর তীরের মঞ্চের কাছে আনার ব্যাপার আছে। আর সব চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠিন যে কাজ তা হলো বহুটন ওজনের এই জগদ্দল পাথরের মূর্তিকে মঞ্চের ওপর খাড়া

করা। এত সব কাজের জন্য মানুষের পেশী শক্তি ছাড়া আর যা আছে তা হলো পাথর বা কাঠের হাতিয়ার আর উদ্ভিজ আঁশের দড়ি দড়া। দেখা যাক এই বিশাল সব কর্মযজ্ঞের পেছনে উদ্দেশ্যটি কী?

এর মূলে রয়েছে এই দ্বীপের মানুষের বহুদিনের বদ্ধমূল ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস, যার সঙ্গে ওতোপ্রোতে জড়িয়ে গেছে এখানকার সমাজ ব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতি। এ বিশ্বাস হলো দ্বীপটির মানুষের যে মহান পূর্বপুরুষরা দেবত্ব লাভ করেছে তাদের সুদৃষ্টির ওপরেই দ্বীপের মানুষের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। তারা দ্বীপের কিনারায় দাঁড়িয়ে দ্বীপের ওপর নজর না রাখলে এই সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর নজর রাখলে এই সমৃদ্ধি আসবে সমাজের গোত্রগতিগণ ও তাদের প্রধান মহাপতি-মহাপুরোহিতের হাত ধরে তাদের শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে। কাজেই বহু দিন ধরে নতুন নতুন দেবত্ব প্রাপ্ত পূর্বপুরুষের মূর্তি স্থাপন দ্বীপবাসীর প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বলতে গেলে দ্বীপের মানুষের ওপর গোত্রপতি ও সর্দারদের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি মহাপতি-মহাপুরোহিতের প্রচণ্ড কর্তৃত্ব নির্ভর করে এসেছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা— কারা কত বড় ও কত বেশি মূর্তি স্থাপন করার মাধ্যমে নিজেদের প্রতি অধিকতর দৈব দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। দেবত্ব লাভকারী প্রত্যেক পূর্বপুরুষের আলাদা নাম ও আলাদা ক্ষমতা রয়েছে। কোন্ গোত্র কার মূর্তি স্থাপন করেছে এ নিয়ে তাদের মধ্যে তীব্র গর্ববোধ ও প্রতিযোগিতা রয়েছে। গোত্রের ব্যাপারটি বেশ জটিল। পুরো দ্বীপটি আসলে এগারটি আলাদা গোত্র-এলাকাতে বিভক্ত; তবে তাদের জায়গার বিভক্তিটি খুব সুন্দর ভাবে হয়েছে— অনেকটা একটি বৃত্তাকার কেকের স্লাইজের মত, প্রত্যেক গোত্রের ভাগে কেন্দ্র থেকে শুরু করে সাগর কিনারা পর্যন্ত সব রকম জমির একটি করে স্লাইজ, এভাবে মোট এগারটি স্লাইজে দ্বীপটি বিভক্ত। এরকম প্রত্যেক ভাগে রয়েছে নিজেদের সর্দার এবং নিজেদের প্রধান গোত্রপতি— যাদের তত্ত্বাবধানে এখানে কৃষি ইত্যাদিই শুধু চলেনা, মূর্তি তৈরি ও স্থাপনের কাজও চলে; রয়েছে নিজেদের এলাকার সমুদ্র তীরে মূর্তির জন্য নিজস্ব মঞ্চ। তৈরি হচ্ছে আরো নতুন মঞ্চ ও নতুন মূর্তি।

তবে সব গোত্রের জায়গার ভাগ সমান নয়, আর এরা সমান ভাবে সমৃদ্ধও নয়; কোন কোন ভাগে যে ধরনের মূল্যবান সম্পদ আছে অন্য ভাগে তা নেই। এর একটি উদাহরণ হলো মূর্তি তৈরির জন্য সব চেয়ে উপযুক্ত পাথর যেখানে পাওয়া যায় সেই একমাত্র জায়গা রানো রারাকু জ্বালামুখটি রয়েছে শুধু একটি মাত্র গোত্র টঙ্গারিকিদের এলাকায়। নৌকা তৈরির সময় তক্তাগুলোর মাঝখানের ফাঁককে নিশ্ছিদ্র করার জন্য যেই শ্যাওলা ব্যবহার করা হয় তাও শুধু এখানেই পাওয়া যায়। আবার মূর্তির মাথার ওপর উঁচু সিলিন্ডার আকৃতির টুপির মত ব্যবহৃত বিশেষ লাল পাথর পাওয়া যায় হাঙ্গা পাউকারি নামের অন্য আর এক গোত্রের

এলাকায়। এই ভিন্ন এলাকাতেই আবার পাওয়া যায় মূল্যবান ওবসিডিয়ান পাথর যা ধারালো শক্ত হাতিয়ার তৈরির জন্য দরকার— টঙ্গারিকির ব্যাসাল্ট পাথর কেটে মূর্তি গড়তেও এই হাতিয়ার দরকার, নৌকা তৈরি করার ভাল সুযোগ এক গোত্রের এলাকায়, কিন্তু তা ভাসাবার জন্য সাগরতীরে ভাল বেলাভূমি রয়েছে অন্য গোত্রের এলাকায়। পাথর শুধু ওখানে রয়েছে বলে সব মূর্তি তৈরি করতে হয় টঙ্গারিকিদের এলাকায়। নিজ এলাকায় তাকে টেনে আনতে হয় আরো অন্য কয়েকটি গোত্রের এলাকা দিয়ে। কাজেই প্রতিযোগিতা যেমন তীব্র তেমনি আবার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সহযোগিতাও দরকার। এই সহযোগিতা সম্ভব হয়েছে দ্বীপের কেন্দ্রীয় সরকারের কারণে যা চলে প্রধান শাসক মহাপতি-মহাপুরোহিতের নেতৃত্বে। প্রতিযোগী স্থানীয় গোত্রপতিরা আর সবার ওপরে মহাপতি, এদের ভারসাম্যের মধ্য দিয়েই চলছে এখানকার সমাজ। কিন্তু এই মসৃণ ব্যবস্থায় সম্প্রতি যথেষ্ট ফাটল দেখা দিয়েছে, যদিও ব্যবস্থাটি কোন রকমে কাজ করে যাচ্ছে।

কড়ি তার এই বয়স অবধি নিজের গোত্রের মঞ্চ মেরামতের এবং বেশ ক'টা মূর্তি নির্মাণের ও স্থাপনের কাজে অংশ গ্রহণ করেছে। কাজেই এই ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা নেহাত কম নয়। আরো বড় কথা তার নিজের গোত্রই সম্প্রতি স্থাপন করেছে দ্বীপের সব চেয়ে উঁচু মূর্তি যার নাম 'পারো'— এটি এখন সবার ঈর্ষার বস্তু। পুরো সাগর ধার জুড়ে যে কয়েক শত মূর্তি ইতোমধ্যে স্থাপিত তাদের মধ্যে ৯-১০ ফুট উঁচু থেকে শুরু করে ১৫-২০ ফুট উঁচু মূর্তির সংখ্যাই বেশি। কিন্তু এই পারো পাকা ৩২ ফুট উঁচু। এর ওজন ৭৫ টন, অবশ্য কিছু কম উঁচু হলেও এর চেয়ে ভারি ৮৭ টন ওজনের মূর্তির রয়েছে।

এই সব এলাহি ব্যাপার (বলতে গেলে মঞ্চ সহ পাঁচ তলা আধুনিক ভবনের সমান উঁচু)। এ যেন একটি মূর্তি গড়া নয়, বরং মধ্যযুগের ইউরোপের ক্যাথিড্রাল অথবা দক্ষিণ ভারতের সুউচ্চ মন্দির গড়ার মতই একটি বিশাল কীর্তি; সে রকমই সম্পদ, জনবল, উদ্যোগের দাবীদার। কড়ির মত শ্রমিক যারা এর নানা পর্যায়ের মধ্যে সশরীরে জড়িত তারা এটি ভাল করেই বোঝে। রানো রারাকুর ব্যাসাল্ট পাথরের সঞ্চয়ে যখন পারোর জন্য পাথর কাটা হচ্ছিল সেখানে কড়ি যোগালির কাজ করছিলো— পাথরের যে অংশ মূর্তি হবেনা সেই অংশ কাটতে সাহায্য করা। মূর্তি গড়ার আসল কাজ যারা করেছে এই দ্বীপের সমাজে তারা খুব খ্যাতনামা মানুষ, মূর্তি গড়ার ভাস্কর হিসেবে। প্রত্যেক গোত্রের মধ্যেই তার ভাস্করদেরকে নিয়ে যথেষ্ট গর্ব রয়েছে— তাদেরকে সাহায্য করতে পেরে কড়িও গর্বিত। কৌতুহলী হয়ে সে ভাস্করের প্রত্যেকটি হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করে।

ভাস্করের প্রাথমিক পর্যায়ের মূর্তি গড়া খুবই মোটা দাগে বড় বড় কোপে মূর্তির সার্বিক একটি মুখ, গলা, বুক, হাতের অবয়ব গড়ে তোলা— এর জন্য তিনি অতি শক্ত ও ধারালো বাঁকা কুড়ালের মত বড় অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। এ দিয়ে মূর্তির মুখে হুবহু চেহারা ফুটিয়ে তোলার প্রশ্ন ওঠেনা। ওই বিশাল মূর্তি গড়ার

এটিই সুবিধা— বিস্তারিত অবয়ব ফুটিয়ে তোলার কোন দায় নেই— অনেকটা বিমূর্ত ভাবে মূর্তি গড়াই যথেষ্ট। এমনকি মাথা আর বুকের আকারের অনুপাত রক্ষারও কোন চেষ্টা নেই এতে— উভয়ে প্রায় একই পরিমাণে প্রশস্ত, আর একই ভাবে আয়তক্ষেত্রের মত— মাথাটি যে একটু সুগোল হবে তা নয়। নাক একেবারে সোজা সরল রেখা নিচে নেমে গেছে, নিচের ছিদ্রে গিয়ে প্রশস্ত হয়েছে। এর দুপাশে চোখের বিশাল বিশাল দুটি কোটর, এদের ওপর ভ্রূটি বোঝানো হয়েছে কপালের এধার থেকে ওধারে মোটা সরল রেখা খোদাই করে। ঠোঁট দুটি কেমন যেন একটি বিরক্তির মত ভঙ্গিতে বন্ধ। বাহু ও হাত অপেক্ষাকৃত ছোট ও অস্পষ্ট— যেন বুকরূপী পাথরের মধ্যে হারিয়েই গেছে। পরে সাদা ও কালো পাথর দিয়ে মূর্তির চোখ দুটিও সত্যিকার চোখের মত আলাদা ভাবে তৈরি করা হয়েছে— যা অবশ্য সব সময় মহাপতি-মহাপুরোহিতের কাছে যত্নে সংরক্ষিত থাকে। শুধু বিভিন্ন উৎসবের দিন বা পূজা আচারের সময় এদেরকে চোখের কোটরে স্থাপন করা হয়। শক্ত ধারালো কুড়াল জাতীয় অস্ত্র দিয়ে মোটা দাগের কাজের পর ভাস্কর ওবসিডিয়ান পাথরের কিছুটা ছোট সূক্ষ্ম হাতিয়ার দিয়ে চূড়ান্ত কাজগুলো করেন। যত মূর্তি গড়া হচ্ছে সবই কম বেশি বেজায় রকম বড় ও ভারী, আর পারোর ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। রানো রারাকুর খানির কাছে যেখানে পারোকে গড়া হয়েছে সেখান থেকে তাকে আঘাতে না ভেঙ্গে, না বিকৃত করে, নিরাপদে সাগর ধারে তৈরি মঞ্চে নিয়ে আসা— সে এক আলাদা বিশাল প্রকল্প। তার আগে দেখা যাক মঞ্চটি কী ভাবে তৈরি। মূর্তি যত মূল্য পায় তার জন্য গড়া মঞ্চও তার চেয়ে মোটেই কম গুরুত্ব পায়না। আসলে মঞ্চের পরিসর মূর্তির চেয়ে বড় কারণ একই মঞ্চে একাধিক মূর্তি স্থাপন করা হয়; মঞ্চের সামনে থাকে এরই সঙ্গে গড়া বাঁধানো চত্বর।

মঞ্চের নিজের উচ্চতাই ১০-১২ ফুট। চারিদিকে শক্ত পাথরে বাঁধানো দেয়ালের মাঝখানের আয়তক্ষেত্রের ভেতরটি ভাঙ্গা পাথর ও মাটি ইত্যাদি দিয়ে ভর্তি করে দুরমুস করে শক্ত করা হয়েছে, তারপর ওপরে পাথর দিয়ে আবৃত করে দেয়া হয়েছে। দেয়ালের কোনাগুলোতে পাথরে পাথরে এমন ভাবে ফিট করিয়ে কারুকার্য করা হয়েছে যে বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মঞ্চের ওপর মূর্তি স্থাপন করার সময় তার মাথার ওপর লাগানো হয় সেই উঁচু লাল পাথরের সিলিন্ডার— অনেকটা লাল টুপির মত। পারোর টুপিটি নিজেই ১২ টন ওজন, আর তা মূর্তির উচ্চতাকে আরো উঁচু করে দিয়েছে। প্রতিযোগিতা শুধু মূর্তির উচ্চতা নিয়ে নয়, টুপির উচ্চতা নিয়েও।

এই ব্যতিক্রমী উঁচু মূর্তি পারোর গড়ার প্রত্যেকটি পর্যায়ে যুবক কড়ি তার শ্রম দিয়ে গেছে বটে কিন্তু যখন সে অনেক ছোট ছিল পারোর এই মঞ্চ তখনো ছিল, এবং আগেকার একটি দশাসই প্রায় একই রকম মূর্তিও তখনো ছিল। এই মঞ্চের সামনে দ্বীপের ভেতরের দিকে নেমে বিস্তৃত হওয়া এই চত্বরে বিভিন্ন উৎসবে বাবা,

মা ও অন্যান্য শিশু সাথীদের সঙ্গে আসার অনেক সুখস্মৃতি তার আছে। এসব উৎসবে পূর্বপুরুষের দেবতা মূর্তির প্রতি সবার জয়ধ্বনি এবং মহাপতি মহা-পুরোহিতের কথা তার মনে আছে। সৌম্য চেহারার বিশালকায় সুন্দর পোষাক পরিহিত মানুষটির মাথায় লাল উঁচু টুপি পরা থাকতো, অনেকটা মূর্তির মাথার ওপর ওই জগদ্দল লাল পাথরের টুপির মত। পার্থক্য হলো তাঁর টুপির লাল রঙটি সৃষ্টি হয়েছ এখানকার বিরল এক বন্য পাখির লাল রঙের পালক থেকে, মূর্তির টুপি থেকে তা অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছিল। কড়ির মনে আছে মহা-পুরোহিত কেমন করে মন্ত্র পড়ছিলেন আর সবাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্ত্র পুনরাবৃত্তি করছিলো। তবে সব চেয়ে বেশি মনে পড়ে উৎসবের ভোজের কথা। খুব আহামরি ব্যতিক্রমী কিছু যে উৎসবে খেতে দেয়া হতো তা নয়, কিন্তু এমন ফুর্তি করে এত বেশি পরিমাণে এসব সাধারণত খাওয়া হয়না— দেদার আখের রসের শরবত, গাঁজিয়ে নেয়া কচুর ভর্তা কলা পাতায় বাঁধা, পাকা কলার ফলার, এমনি সব জিনিস। তবে একটি খাবার থাকতো যেটি কড়ি অন্য সময় কখনো পেতোনা সেটি হলো সুউচ্চ পাম গাছের ফল (তাল বা নারকেলের মত, কিন্তু অনেক বড়) এবং এ গাছের রস। ফলের শাঁসটি কেটে কেটে ছোট ছোট টুকরা করে তাদের দেয়া হতো। আর রসটিকে জ্বাল দিয়ে ঘন করে তাতে মিষ্টি আলুর ময়দা দিয়ে একটি পায়েস করে দেয়া হতো— বিশেষ করে ছোটদের কাছে সেটি অমৃত মনে হতো। খুব ছোট বেলায় এরকম একটি উৎসবেই সে শঙ্খ-কড়ির মাংসের স্বাদ পেয়েছিলো— যেই স্বাদ নিয়মিত না পাওয়ার দুঃখে বাবা-মা তার নাম কড়ি রেখেছিলো বলে বহুবার শুনেছে।

বয়স্ক কড়ির কাছে একালের উৎসব নিয়ে তেমন কোন উচ্ছ্বাস নেই, কারণ সে রকম উৎসব, সে রকম ভোজ এখন আর হয়না বলেই চলে। এখন সে মূর্তি স্থাপনের প্রতিযোগিতা আর পরিশ্রমটাই শুধু দেখে। এ নিয়ে বরং হানাহানি, তিক্ততাটাই বেশি ঘটে সর্দারদের মধ্যে, গুরুত্বপূর্ণ সব মানুষের মধ্যে, যা সে পুরোপুরি বোঝেনা। তার কাছে মঞ্চের সামনের চত্বরে গেলে শৈশব সুখ-স্মৃতিগুলোই শুধু মনে পড়ে। কিন্তু ঠিক তেমনি মঞ্চের পেছনে অর্থাৎ মূর্তি ও মঞ্চের পেছনের যে খাড়া দেয়াল সাগর তীরে নেমে গেছে সেদিকে যাওয়ার স্মৃতি সে মনে করতে চায়না। এখনো পারতপক্ষে সে ওদিকে বড় একটা ঘেষেনা। এর কারণ ওখানটায় রয়েছে তাদের গোত্রের শ্মশান। ছোট বেলায় তার প্রিয় নানীকে সে ওখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দাহ করতে দেখেছে, আরো নানা আত্মীয়স্বজনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে তাকে বাবা-মা'র সঙ্গে যেতে হয়েছে। জায়গাটি প্রচুর পোড়া পাম গাছ, ডালপালা, কাঠ কয়লা, ছাই, কখনো কখনো মানুষের হাড় ইত্যাদিতে পূর্ণ। ইস্টার আইল্যাণ্ডে সবাই মৃতদেহকে এভাবে দাহ করে। এগুলো কড়ির কাছে সুখস্মৃতি নয়।

দ্বীপে বড় গাছ বলতে যে খুব বেশি কিছু আছে তা নয়, তবে কোন কোন জায়গায় বেশ উঁচু ৩০/৪০ ফুট উঁচু তিন ফুটের মত ব্যাসের পাম গাছ এখনো

আছে। গুরুজনদের কাছে শুনেছে এগুলোর সংখ্যা আগে অনেক ছিল— এখন সব ধ্বংসের পথে। এটি ছাড়া বাকি গাছপালা খুবই অনুচ্চ, ছোটখাট ঝোপঝাড় জাতীয় গাছই বেশি— জ্বালানি হওয়া ছাড়া খুব বেশি কাজে লাগেনা। ওই মরদেহ দাহ করার কাজে আগে কিন্তু পাম গাছ প্রচুর ব্যবহার হয়েছে, এখনো হয়, তবে এখন ঝোপ ঝাড়ের ওপরই বেশি নির্ভর করতে হয়। তবে মূর্তিকে স্থানান্তর এবং একে খাড়া করার কাজে এই পাম গাছ নানা ভাবে ব্যবহার করা ছাড়া গতি নেই। এবার পারোকে মঞ্চে টেনে এনে খাড়া করতে গিয়ে কড়ি এটি বিশেষ ভাবে টের পেয়েছে।

বেশ কয়েক মাইল দূরের খনি এলাকায় তৈরির স্থান থেকে পারোকে টেনে আনা হয়েছে আগাগোড়া পথে কাঠের তৈরি রেলওয়ের মত তৈরি করে। যথা সম্ভব সমতল পথ অনুসরণ করে অল্প চওড়া দুটি কাঠের তক্তা সমান্তরাল ভাবে চলে গেছে পুরো পথে। এর ওপর একটু পর পর আড়া আড়ি তক্তা উভয়কে যোগ করেছে। মূর্তিকে এই তক্তাগুলোর ওপর দিয়েই টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বলা যত সহজ কাজটি কিন্তু মোটেই তত সহজ নয়। প্রথমত এরকম লম্বা তক্তা আসতে পারে একমাত্র উঁচু পাম গাছ থেকে যেগুলোর সংখ্যা এখন ইস্টার আইল্যাণ্ডে খুবই কমে গেছে। টেনে নেয়ার সময় পারোকে উপুড় অবস্থায় একটি শ্লেজের মত মসৃন কাঠের পাটাতনের ওপর রাখা হয়েছে। এই পাটাতনটিকেই ওই রেলের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাঠের ওই রেল পাতার এবং একটু একটু করে এর ওপর দিয়ে মূর্তিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার এসব কাজে কড়ি অংশ নিয়েছে।

আসলে তিনশ'য়ের মত মানুষ একযোগে এই টানার কাজ করেছে। এজন্য পারোকে রাখা পাটাতনের সঙ্গে দুটি দীর্ঘ মোটা দড়ি লাগানো হয়েছিলো যা হাতে আঁকড়ে ধরে ওরা টানার কাজটি করেছে। একই সঙ্গে তালে তালে হেঁইয়ো হেঁইয়ো আওয়াজ তুলে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়েছে। এখানে টানার সময় যে তিনশ' মানুষকে উদ্বুদ্ধ রাখার জন্য এবং সমতলে টানার সুযোগ করে দিতে গানের ধুয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি তুলতে হয়েছে। এই কাজ সবাই করতে পারেনা। এজন্য যে ছোট্ট গানের দলটিকে গড়ে তোলা হয়েছে কড়ি তাদের একজন। এজন্য তার খুশির আর গর্বের সীমা নেই। সপ্তার ওপরে লেগে গিয়েছে একাজে। কড়িদের গোত্রের মূর্তি হলো পারো, আর এই গোত্রের মোট জনসংখ্যাই এক হাজারের বেশি নয়। সেখান থেকে ৩০০ জন তাগড়া মানুষকে এ কাজে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তারপর ৮০ টনের মত ওজনের পারোকে মঞ্চের ওপর খাড়া করাটিও কম পরিশ্রমের ও ঝুঁকির ব্যাপার হয়নি। ওই উপুড় হয়ে থাকা মূর্তিকে তলার দিকটি সামনে রেখে মঞ্চের সামনের দিক থেকে এর ওপরে টেনে তোলা হয়েছে। তারপর মাথার দিকে তলায় কাঠ ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে একটু একটু করে উঁচু করে একে অবশেষে পুরো খাড়া করা হয়েছে— এমন সাবধানে যেন ধাক্কার

চোটে মূর্তি উল্‌টে না পড়ে। এভাবে তোলার আগেই পারোর মাথায় লাল পাথরের টুপিটি লাগিয়ে নেয়া হয়েছিলো। কড়ির মত শত শত সাধারণ মানুষ যদি আগাগোড়া কাজে শ্রম না দিতো তা হলে মাত্র ১০ হাজার মানুষের দ্বীপটিতে এত বড় বড় কর্মকাণ্ড এরকম অতি মামুলি উপায় উপকরণ ব্যবহার করে সম্ভব হতো না।

বেশ ঘটা করে উচ্চতম মূর্তি পারোকে স্থাপন করা হয়েছে বটে, এর মধ্যেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল ইস্টার আইল্যাণ্ডের অনেক কিছুই আর আগের মত নেই। এ ব্যাপারগুলো কড়ির বয়সী মানুষরা এতটা বুঝতে না পারলেও তার বাবা-চাচারা সহ বয়োবৃদ্ধ মানুষরা ভালই টের পাচ্ছে। তাদের জীবৎকালের মধ্যেই তারা দেখছে দ্বীপের জীবনযাত্রা কেমন কঠিন হয়ে পড়ছে। তারা যা বলার চেষ্টা করছে আগে দ্বীপের দৃশ্য যারা দেখেনি তারা সেটি কল্পনাও করতে পারবেনা। সাগর তীরে এবং অভ্যন্তরে সুউচ্চ পাম গাছগুলোই ছিল এর নজর কাড়া দৃশ্য; আর সেগুলোই ছিল অনেক সম্পদের উৎস। বিশেষ করে চমৎকার সব নৌকা তৈরি করে সাগরের অনেক বাইরের দিকে গিয়ে মাছ, শুশুক, ঝিনুক, বড় বড় কড়ি ইত্যাদি প্রচুর জলজ খাবার আহরণ নিত্য ব্যাপার ছিল। এখনও পাম গাছ আছে, তবে তা চোখে পড়ে কালেভদ্রে। নৌকা তৈরি ক্রমে একটি বিলাসিতায় পরিণত হচ্ছে। সেই সঙ্গে সাগরে মাছ ইত্যাদি শিকার। আসলে দ্বীপে সবুজের ছোঁয়াটাই যেন দ্রুত কমে যাচ্ছে, ফলে পাথরের সঙ্গে যে ঝুরঝুরে উর্বর মাটি প্রচুর ছিল এখন সেগুলো বাতাসে উড়ে, বৃষ্টিতে ধুয়ে, চলে যাচ্ছে; ফলন কমে যাচ্ছে বছরের পর বছর।

তরুণরা এসব লক্ষ্য করতে পারছেনা, বরং মূর্তি নিয়ে গোত্রে গোত্রে প্রতিযোগিতার যে নেশা তার মধ্যে ডুবে থাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু বয়োজৈষ্ঠ আর একটু দায়িত্বশীলরা নিজেদের মধ্যে অন্য রকম কথা বলাবলি করছে। কোন কোন গোত্রের মানুষদের নাকি ঠিক মত খাবারো জুটছেনা, আর অন্যদিকে মৃতদের পোড়ার মত গাছ-পালা জ্বালানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। কানাঘুষা চলছে যে কিছু মানুষ রীতিমত বিদ্রোহ করেছে। নতুন মূর্তি বানাতে সর্দারদের সঙ্গে সহযোগিতা করা দূরে থাক, তারা নাকি উল্‌টা এ সব মূর্তির ক্ষমতা নিয়ে, দেবত্ব নিয়ে, এবং এদের প্রতিনিধি তাদের গোত্রপতি ও দ্বীপের মহাপতির যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। কে বা কারা নাকি রাতের আঁধারে দু'একটি মূর্তি মঞ্চ থেকে ফেলে দিয়ে ভেঙ্গেও ফেলেছে। ওরা নাকি বলছে যেখানে মানুষ খাদ্য যোগাবার জন্য নৌকা বানাতে আর মরা পোড়াতে কাঠ পাচ্ছেনা সেখানে নতুন মূর্তি টেনে আনার জন্য তক্তা পাততে আর দড়ি বানাতে এতগুলো মূল্যবান গাছ কাটার কোন যৌক্তিকতা নেই— এই সব কিছু আসলে হচ্ছে গোত্রপতি ও সর্দারদের স্বার্থে; ওই মূর্তি গড়ার নিয়মটাও তারা চালু করেছে নিজেদের স্বার্থেই। অবশ্য এরকম ভয়ঙ্কর গুজবে কান দেয়াটা এখানে কড়িদের মত মানুষের জন্য মোটেও নিরাপদ নয়।

কড়িদের গোত্রের মানুষরা এবং কড়ি নিজে অবশ্য এখনো হতাশ হয়নি। দ্বীপের সব চেয়ে উঁচু মূর্তিটি তারা সম্প্রতি স্থাপন করেছে— সে জন্য তাদের মনোবলও এখন বেশ উচ্চে। যদিও খাওয়া পরা জীবন যাপন নিয়ে বেশ চাপে রয়েছে তবুও তাদের ধারনা দেবত্বে অধিষ্ঠিত নতুন দেবতা যেই পারোকে তারা সদ্য স্থাপন করেছে তার সদয় দৃষ্টিতে শিগ্‌গির তাদের ভাগ্য ফিরবে।

* * *

অন্য জনপদ থেকে বহু দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে ছোট্ট দ্বীপ ইস্টার আইল্যাণ্ড ইউরোপীদের প্রথম নজরে এসছিলো ১৭২২ সালে। ওই বছর ৫ এপ্রিল এক ইস্টার সানডে'র দিন হল্যাণ্ডের অভিযাত্রী জ্যাকব রোগেভীন এখানে এসে নেমেছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি থেকে ১৭ দিন উন্নত পালের জাহাজ চালাবার পর তাঁর প্রথম মাটি দর্শন হয় এই দ্বীপে এসে পবিত্র ইষ্টারের দিনে; তাই তিনিই এর নাম দেন ইস্টার আইল্যাণ্ড, যদিও জানতে পারেন যে স্থানীয় বাসিন্দা পলিনেশিয়ানরা তাদের দ্বীপকে বলে রাপা নুই। সেই থেকে ইস্টার আইল্যাণ্ড সম্পর্কে জানাজানি, অনুসন্ধানের পালা কিছু কিছু শুরু হয়। রোগেভীন প্রথমেই স্বাভাবিক ভাবেই খুবই চমৎকৃত ও অবাক হয়েছিলেন দ্বীপটির সাগর তীরে ওই অনেকগুলো প্রকাণ্ড মূর্তি দেখে। তিনি আরো বেশি অবাক হয়েছিলেন যে যাদের দ্বীপে এমন সব স্থাপনা তৈরি হয়েছে সেই মানুষগুলোর খুব কাহিল অবস্থা দেখে। তখন দ্বীপের জনসংখ্যা কমে গিয়ে মাত্র কয়েক হাজারে ঠেকেছে ও বড় গাছপালা বলতে কিছুই নেই। যে মুষ্টিমেয় নৌকা সাগর তীরে দেখলেন সেগুলো ১০ ফুটের বেশি লম্বা নয়, তার তক্তার মধ্যে এত ফাঁক যে চলাচলের সময় সারাক্ষণ পানি সেচে ফেলতে হয়। এ নিয়ে আর যাই হোক সাগরে সামান্য দূরেও যাওয়া চলবেনা। তিনি ভেবেই পাচ্ছিলেন না যে এমন নৌকা নিয়ে এই দ্বীপে এ মানুষগুলো সুদূর অন্য কোথাও থেকে এসেছিলো কী ভাবো; তা ছাড়া দ্বীপের মানুষ, হাতিয়ার, সামগ্রী যা দেখা যাচ্ছে তাতে ওই প্রকাণ্ড মূর্তিগুলো তৈরি, স্থানান্তর এবং স্থাপন সম্ভব হলোই বা কী করে সেও এক বিস্ময়।

এরপর গত প্রায় ৩০০ বছর ধরে উন্নত দেশের অভিযাত্রীরা ওই দ্বীপে গিয়েছেন, গবেষকরা গিয়েছেন, প্রত্নতত্ত্ববিদরাও গিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। একেবারে প্রথম দিকের অভিযাত্রীরা স্থানীয় মানুষদের থেকে মুখে মুখে চলে আসা অতীত দিনের কথা শুনেছেন— অন্যান্য পলিনেশিয়ান ভাষার সঙ্গে এখানকার বাসিন্দাদের ভাষার মিল থাকাতে সেটি সহজ হয়েছে। এই সব কিছুতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে ইউরোপীয়রা প্রথম যাবার একশত বছর আগে দ্বীপের জীবন যাপন কেমন ছিল তা আমাদের কাহিনীতে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষকদের সিদ্ধান্তগুলোর ওপরই বেশি জোর দেয়া হয়েছে।

এখন বোঝা যাচ্ছে ১৭২২ সালের অবস্থার চেয়ে আরো অতীতের এই দ্বীপের অবস্থা ও সমৃদ্ধি অনেক বেশি ছিল। বহু দূরের দ্বীপ থেকে ১৯০০ বছর আগে কিংবা মতান্তরে আরো দু'তিনশ বছর পর যে পলিনেশিয়ানরা দীর্ঘ সাগর পথ পাড়ি দিয়ে এ দ্বীপে প্রথম এসেছিলো তাদের নৌকা সে কাজের উপযুক্তই ছিল, যদিও এ কাজটি কম বিপদ-সংকুল

ছিলনা। এখানে এসে তারা সু-উচ্চ পাম গাছ সহ মূল্যবান বৃক্ষ সম্পদে ও উর্বর মাটিতে সমৃদ্ধ একটি দ্বীপই পেয়েছিলো যদিও জীবজন্তু বন্য পাখি, গাঙ চিল, আর সাগরের মাছ, শুশুক ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গবেষকরা এখানকার কৃষি ব্যবস্থার যে পাথুরে নিদর্শন, পাথরের বড় বড় মুরগির ঘর, আর প্রকাণ্ড মূর্তি তৈরির ও তার স্থাপনা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছেন এবং তার পেছনের হাতিয়ার, কলা কৌশল ইত্যাদিও মোটামুটি আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

পাথুরে বাগান, পাথুরে মুরগির ঘর, আগ্নেয়গিরের মৃত জ্বালামুখের পাথর খনিতে অসম্পূর্ণ পড়ে থাকা প্রকাণ্ড মূর্তি ইত্যাদি প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে খুব স্পষ্ট হলেও বাকি অনেক নিদর্শনকে খনন ও সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্ঘাটন করতে হয়েছে। যেমন ১৯৭৯ সালে খননের ফলে মূর্তির চোখ পাওয়া গেছে যা আলাদা ভাবে তৈরি হয়ে মূর্তির চোখের কোটরে ঢুকানো হতো— সাদা অংশ সাদা প্রবালে গড়া, মনির অংশ লাল স্কোরিয়া পাথরে তৈরি। নানা অসম্পূর্ণ মূর্তিগুলো থেকে মূর্তি গড়ার বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ বোঝা গেছে তা থেকে কী ভাবে হাতিয়ার চালানো হয়েছে, হাতিয়ারের প্রকৃতি কী তাও বোঝা গেছে। হাতিয়ারগুলো অবশ্য খননে কিছু কিছু পাওয়া গিয়েছে বিশেষ করে বিভিন্ন পরিত্যক্ত আবর্জনা স্তুপের মধ্যে। মূর্তিগুলোকে যে পথ ধরে টেনে বর্তমান স্থানে আনা হয়েছে তার কিছু চিহ্ন মাটির মধ্যেই পাওয়া গেছে। কী ভাবে টেনে আনা হয়েছে, কী ভাবে খাড়া করা হয়েছে এ সম্পর্কে নানা সম্ভাব্য তত্ত্ব রয়েছে। তবে গবেষণার প্রয়োজনে সত্যিকারভাবে ওই ওজনের ওরকম মূর্তি ওভাবে টেনে আনা ও খাড়া করার ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে এমন তত্ত্বই আমাদের কাহিনীতে ব্যবহার করা হয়েছে। কাঠ কয়লা, মানুষের খাওয়া শুশুকের হাড় ইত্যাদির আধুনিকতম কার্বন ডেটিং পরীক্ষা থেকে এখানকার আদিতম মনুষ্য বসতের সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে।

আমাদের কাহিনীর কালে ইস্টার আইল্যাণ্ডের জনসংখ্যার একটি ধারণা পাওয়া যায় ওসময়ের বাসাগুলোর যে ভিত্তির নিদর্শন পাওয়া যায় এবং একই সময়ে ব্যবহৃত হতে পারে এমন বাসার মোটামুটি সংখ্যা নির্ধারণ করে। এতে খুব সঠিক হিসেব পাওয়া মুশকিল— তাই ওই প্রায় সর্বোচ্চ জনসংখ্যার সময়টিতে ৬ হাজার থেকে ৩০ হাজার নানা রকম আন্দাজ সম্ভব। তবে অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে এই সর্বোচ্চ কালীন জনসংখ্যা ১০ হাজারের কোঠায় বলে মনে করা যায়।

জনসংখ্যা ও সমৃদ্ধি তুঙ্গে ওঠার পর কীভাবে দ্বীপের পরিবেশ ও জীবনযাত্রা ক্রমে অবক্ষয়িত হয়েছে সে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায় উদ্ভিদের প্রাচীন পরাগরেণু বিশ্লেষণে। ইস্টার আইল্যাণ্ডের বেশ কয়েকটি জ্বালামুখ দীর্ঘকাল হ্রদে পরিণত হয়েছিলো এবং তাতে পানির তলায় কাদার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কালের উদ্ভিদগুলোর পরাগরেণু সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে। বিশেষজ্ঞ উদ্ভিদবিদরা খনন করে লম্বা নলাকৃতি নমুনায় ওই প্রাচীন কাদা তুলে এনে খুব যত্ন সহকারে অণুবীক্ষণে রেণুগুলো বিশ্লেষণ করেছেন, তাদের প্রাপ্যতার ঘনত্ব মেপেছেন। তাতে দেখা গেছে দ্বীপে মানব বসত শুরুর কালে এটি সু-উচ্চ চেনিয়ান পাম গাছে ভর্তি ছিল— যেগুলো অন্যান্য পলিনেশিয়ান দ্বীপে খাদ্যের জন্য তো বটেই বড় সমুদ্রগামী নৌকা তৈরি; নৌকার পাল ও মাদুর, থলে, দড়ি, বাড়ির ছাদ ইত্যাদি তৈরি এবং তক্তা বানিয়ে আরো নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এই পামের পরাগ যত দিন গিয়েছে তত কমেছে, এবং আমাদের কাহিনীর কালে অতি বিরল

প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। শেষের দিকে শুধু ঝোপঝাড় ছোট গাছের পরাগই দেখা গেছে।

উদ্ভিদ পরিবেশের এই অবক্ষয়ের সাক্ষ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অন্য ধরনের অবক্ষয়ের সাক্ষ্যও মিলেছে। দ্বীপের বিভিন্ন লোকালয়ে যে আবর্জনা স্তূপগুলো মানব বসতের প্রথম সময় থেকে স্তরে স্তরে জমেছে সেগুলো পরীক্ষা করেই সাক্ষ্য মিলেছে। দেখা গেছে যতই দিন গিয়েছে বসতের তুলনায় এ সব স্তরে সামুদ্রিক প্রাণীর হাড়ের ও খোলসের পরিমাণ কমেছে। স্পষ্টত এ সবের প্রাপ্যতা ও শিকার উভয়েই ক্রমে হ্রাস পেয়েছে এবং শেষের দিকে প্রায় শূন্যে চলে এসেছে। একই ঘটনা ঘটেছে বন্য পাখি ও গাঙচিল জাতীয় সামুদ্রিক পাখির হাড়েও। অন্যদিকে একটি প্রাণীর হাড়ের পরিমাণ বরং বেড়েছে যা হলো অতীতে প্রথম আসা মানুষদের সঙ্গে উৎপাত হিসেবে আসা ইঁদুরের অসংখ্য বংশধরদের হাড়। এটি বিরল আমিষ খাদ্যের অভাব কিছুটা মেটালেও মূল অবক্ষয়টির বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অবক্ষয়ের মুখে পাম ফলের যে সব নমুনা সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে তার অধিকাংশে ইঁদুরের কামড় এমন ভাবে রয়েছে যে ওই অবস্থায় সেটি থেকে নতুন গাছের অঙ্কুরোদগমের কোন সম্ভাবনা নেই। সুস্বাদু মিষ্টি পাম ফলের ওপর ইঁদুরের আক্রমণ এত বিস্তৃত হয়েছিল যে তখন ইঁদুরকেই ইস্টার আইল্যাণ্ডের পরিবেশ বিপর্যয়ের একটি প্রধান কারণ মনে করা হতে। এখন অবশ্য পাম গাছের যথেচ্ছ অতি-ব্যবহার, মূর্তি তৈরির অদ্ভুত নেশা, মৃতদেহ দাহ করতে তার ব্যবহার, সমুদ্রগামী নৌকা বানিয়ে আরো সামুদ্রিক খাবার যোগাড়ের চেষ্টা এগুলোকেই বেশি দায়ী করা হচ্ছে।

ইউরোপীয়রা যখন এই দ্বীপের পরিস্থিতি প্রথম দেখেছে তখন অবক্ষয়ের অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তারপরও ১৭২২ সালের যে ইস্টার রোববার ইউরোপীয়ানরা প্রথম এ দ্বীপে এসেছিলেন তখন তাঁরা পরিস্থিতি তুলনামূলক ভাবে কিছুটা ভালই দেখেছিলেন— তখনো তাঁদের হিসেবে দু'তিন হাজার মানুষের বসত দ্বীপটিতে ছিলো, সারা দ্বীপেই মোটামুটি উর্বর ভূমিতে কৃষি কাজ চল্‌ছিলো। সমুদ্র তীরের বিশাল সব মঞ্চে প্রকাণ্ড মূর্তিগুলো খাড়া দেখে তাঁরা চমৎকৃত হয়েছিলেন। তাঁরা অবশ্য মাত্র কয়েক দিন দ্বীপটিতে ছিলেন। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ক্যাপ্টেন কুক যখন তাঁর অভিযাত্রায় এখানে আসেন তখন মাত্র সাতশ'র মতো বাসিন্দা এ দ্বীপে অবশিষ্ট ছিল। নৌকা বলতে তেমন কিছুই ছিল না। অল্প কিছু জায়গায় কলা, আখ আর মিষ্টি আলুর চাষ বজায় ছিলো, এবং তাই ছিলো জীবিকার একমাত্র উৎস। প্রকৃতিতে মানুষকে পোষণ করার মত গাছপালা, পশু-পাখি অবশিষ্ট ছিলনা। স্থানীয় মানুষের মৌখিক জবানি থেকে এবং বাস্তব পরিস্থিতি দেখে যা বোঝা গেছে তা হলো পরিবেশ ও কৃষির দ্রুত অবক্ষয়ের ফলে তারো অন্তত একশ' বছর আগে থেকে এখানকার জনসংখ্যা যেমন দ্রুত দশ বারো হাজার থেকে হাজারের কোঠায় নেমে এসেছে তেমনি দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির কারণে সময়টি দারুণ গণ অসন্তোষ, বিদ্রোহ, সংঘাত ও হানাহানি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কেটেছে। তাই প্রথম ইউরোপীয়রা অধিকাংশ মূর্তিকে খাড়া দেখলেও ক্যাপ্টেন কুক ও তাঁর পরবর্তী ইউরোপীয় আগন্তুকরা অনেক মূর্তিকে মঞ্চ থেকে ফেলে দেয়া ও কোন কোনটিকে ভাঙ্গা অবস্থায়ও পেয়েছে। মহাপতি-মহা-পুরোহিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে তিনি প্রকৃত ক্ষমতা হারিয়ে নেহাত একজন প্রতীকী প্রধানে পরিণত হয়েছিলেন বহুদিন থেকে। অভিজাত ও গোত্রপতিদের

অনেকে বিদ্রোহে নিহত হয়েছে; শাসনটি অনেকটা হয়ে পড়েছিল জোর যার মুল্লুক তার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ইউরোপীয়দের আসা যাওয়ার পর থেকে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে দাস ব্যবসায়ীরা দ্বীপটিতে হানা দিয়ে এখানকার অনেক মানুষকে দাস হিসেবে ওখানে ধরে নিয়ে যায়। কিছুটা এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে, খৃষ্ট ধর্মের প্রচারে এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে একদিকে ক্যাথোলিক চার্চ অন্যদিকে ফরাসী ও ইংরেজ কিছু খামার-অধিপতি ব্যবসায়ী এখানকার অবশিষ্ট মানুষদের ওপর ও স্থানীয় অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। পেরু থেকে মুক্ত দাস হিসেবে প্রত্যাবর্তনকারীরা বসন্ত ও অন্যান্য মহামারী বহন করে নিয়ে এসে দ্বীপের জনসংখ্যায় আরো ধস নামিয়েছে। ইস্টার আইল্যাণ্ডের পরবর্তী কাহিনী এভাবেই রচিত হয়েছে। অবশ্য সংখ্যায় অনেক কমে গেলেও এর বাসিন্দাদের পলিনেশিয়ান চরিত্র একেবারে বিলুপ্ত হয়নি— আধুনিক কালে দক্ষিণ আমেরিকান রাষ্ট্র চিলির শাসনাধীনে চলে যাবার পরেও। আর একটি জিনিস খুব ভালো হয়েছে, তা হলো মঞ্চ থেকে ফেলে দেয়া অভগ্ন মূর্তিগুলোকে আবার মঞ্চে যথাযথ ভাবে স্থাপন করে ইস্টার আইল্যাণ্ডের বহু শত বছরের এতিহ্যকে আবার স্বরূপে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছে।

ইস্টার আইল্যান্ডের মানচিত্র

সমুদ্র-তীরের বিশাল মূর্তিগুলো

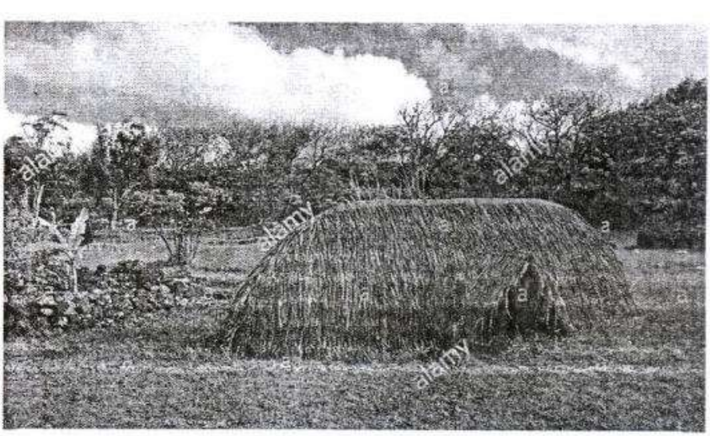

কড়িদের বাড়ির মত বাড়ি

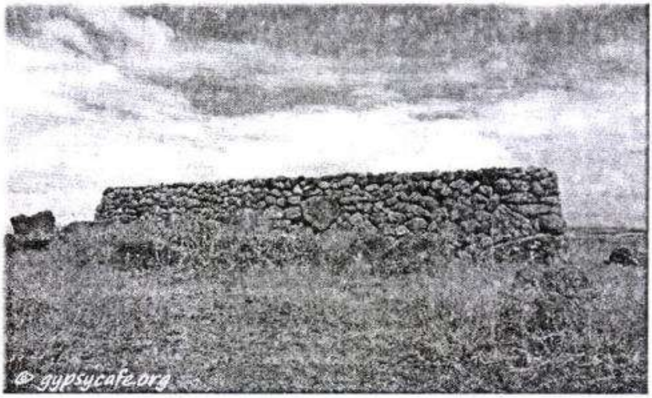

পাথুরে মুরগি-ঘর

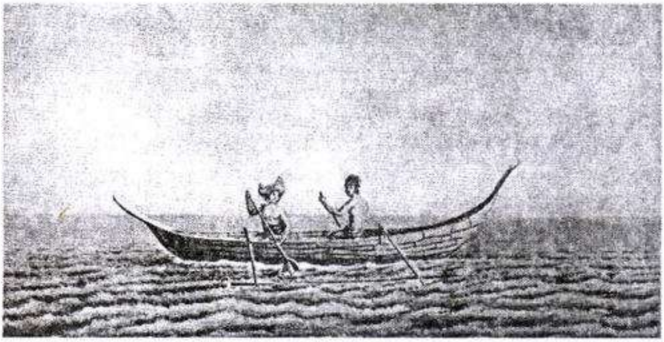

যে ধরনের নৌকা করে ওরা মাছ শিকার করতো

রানা রারাকুর পাথর-খনিতে অসমাপ্ত মূর্তি

পারোঃ অনুষ্ঠান উপলক্ষে
চোখ লাগানো

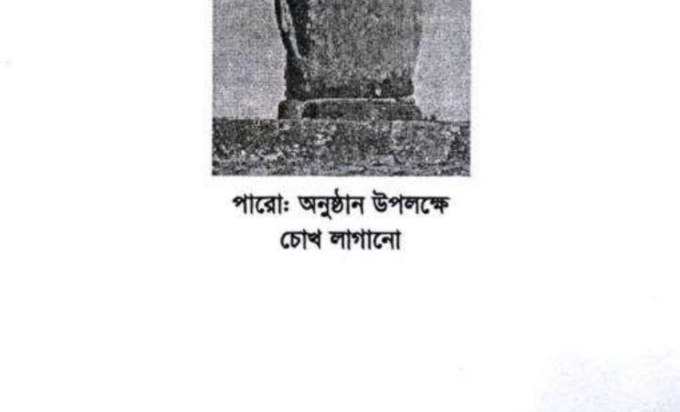

আজকের দিনে সেদিনের সম্ভাব্য পদ্ধতিতে মূর্তি খাড়া করে দেখা

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞান লেখক হিসেবে এবং নানা মাধ্যমে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকে এদেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করে আজ অবধি তার সম্পাদনা করছেন। সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সি এম ই এস), এখনো তিনি যার নেতৃত্বে। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বেশ কিছু সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার প্রাপ্ত এ লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর।

ড. ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ লিবারাল আর্টস বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান